

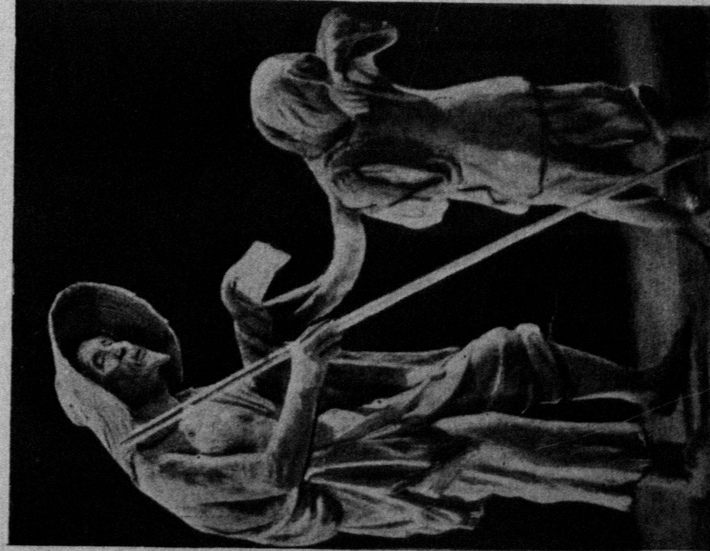
চিত্র-২৫
গ্রামবাসীরা খাজনা-আদায়ের কাছারিতে চলেছে (—পৃঃ ২১০)



চিত্র-২৬
"দিদি আর মা সেটা টেনে তুলতেই পারত না।" (—পৃঃ ২১০)



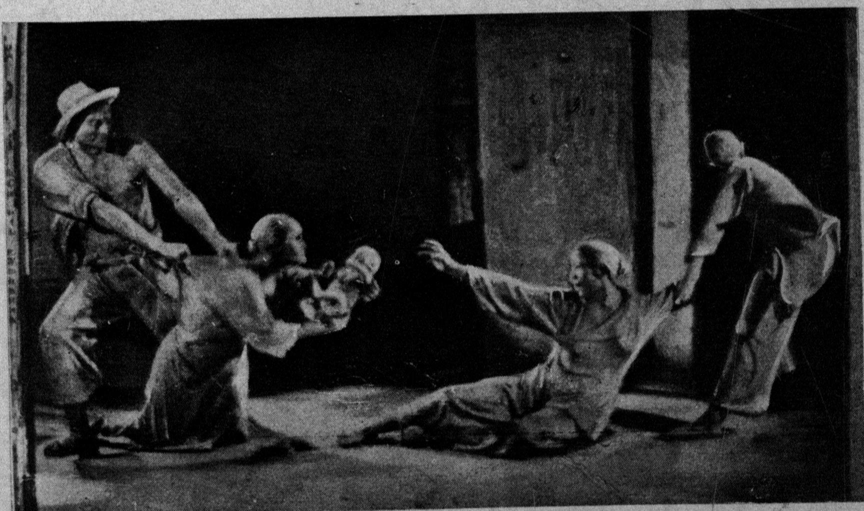
চিত্র-২৭
"ফটকের ভেতরে মা, আর বাইরে আমরা দু-জন।"
(—পৃঃ ২১১)



চিত্র-২৮
"দিদিই তাকে হাত ধরে নিয়ে এল কয়েদখানায়।"
(—পৃঃ ২১১)



চিত্র-২৯
"আমি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলাম বাপির বাঁ-হাঁটুটা।"
(—পৃঃ ২১৪)



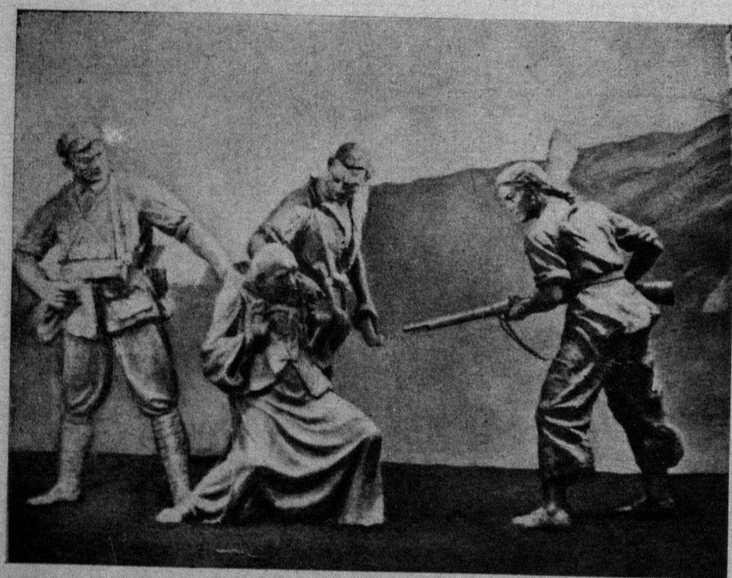
চিত্র-৩০
"না!...কিছুতেই না!...সেসব কথা আমি বলতে পারব না!"
(—পৃঃ ২১৪)

চীন-ভারত লঙ্ মার্চ

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯



চিত্র-৩৬
লিউ-ওয়েনের সন্ধানে দিদি
আর বাঘের বাচ্ছা।
(—পৃঃ ২৪৪)



চিত্র-৩৭
'গর্জে উঠ্‌ল দিদির হাতের বন্দুকটা।'
(—পৃঃ ২৪৪)

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

পুনর্মুদ্রণ— ১৯৬৩,

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোঃ
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

কৈফিয়ৎ

এই গ্রন্থের রচনা

রচনা শেষ করার পর প্রায় বছর-খানেক সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আমার ড্রয়ারে বন্ধ ছিল তারপর একদিন সেটি বার করে পড়ি, কিছু সংশোধন করে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য জনৈক প্রকাশককে হস্তান্তরিত করি। ছাপার কাজও শুরু হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত তার অল্পকিছুদিনের মধ্যেই 'ইন্টার্নাল এমার্জেন্সি' ঘোষিত হলো। ভারতীয় কথাসাহিত্যিকের দল বাক-স্বাধীনতা হারালেন। সত্য কথা প্রাণ খুলে আর কেউ বলতে পারতেন না। অগত্যা পাণ্ডুলিপি প্রেস থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। নির্বাচনের পরে নূতন সরকার এসে যখন আবার আমাদের বাক-স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিলেন তখন আবার সেই পাণ্ডুলিপি ছাপতে দিলাম।

এতসব ব্যক্তিগত কথা বলতে হচ্ছে এই কারণে যে, এ-গ্রন্থ পড়তে-পড়তে পাঠকের স্বতই মনে হতে পারে—লেখক সাদা কথা সোজা ভাষায় বলতে পারছেন না কেন? কংগ্রেস-কবলমুক্ত নবীন ভারতে তাঁরা সম্প্রতি-প্রকাশিত কুলদীপ নায়ারের 'দি জাজমেণ্ট' পড়েছেন, 'ডিক্লাইন এ্যাণ্ড ফল অব ইন্দিরা গান্ধী' পড়েছেন, গৌর ঘোষের 'আমাকে বলতে দাও' পড়েছেন! তার পরবর্তীকালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পরিবর্তে লেখক অতি সন্তর্পণে কেন অগ্রসর হয়েছেন এটাই পাঠক ভাবতে থাকবেন। তাই এত কথা বলা। এ রচনা তখনই লেখা, যখন আমাদের বলতে দেওয়া হতো না। প্রাক্-এমার্জেন্সি-যুগে রচিত এ গ্রন্থ আমি ইচ্ছা করেই পুনর্লিখন করি নি। কারণ ভবিষ্যৎ কালের কাছে এ বইটি একটা দলিল হয়ে থাকবে— [illegible], অর্থাৎ প্রাক্-এমার্জেন্সিযুগে কংগ্রেস-শাসিত ভারতবর্ষে একজন বাঙালী কথা-সাহিত্যিকের মানসিকতা কী অবস্থায় ছিল, তিনি কতটা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতেন, এ থেকে তা বোঝা যাবে।

এ-গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে পাটনা জয়সবাল ইন্সট্যুটের তদানীন্তন অধ্যক্ষ বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর কয়েকটি মূল্যবান সংযোজন করে দিয়েছেন। প্রাচীন [illegible] অনেক সংবাদ তিনিই আমাকে জানিয়েছেন

'পারস্পেক্টিভ' পত্রিকার এ্যাসিস্টান্ট এডিটার স্নেহাস্পদ শ্রীসুবাস মৈত্র আদ্যন্ত প্রুফ দেখে দিয়েছেন এবং কয়েকস্থলে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

মণ্ডল বুক হাউসের স্বত্বাধিকারী শ্রীসুনীল মণ্ডল বইটি প্রকাশে যে যত্ন নিয়েছেন সেটা আমার অভিজ্ঞতায় একটু নতুন ধরণের।

নীরদচন্দ্র সান্যাল

উৎসর্গ

ভারত-চীন সৌহার্দ্য-সেবার উত্তরসূরী

ডাক্তার বিজয়কুমার বসুর

করকমলে

"I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any."

—M. K. Gandhi

চীন-ভারত লঙ্‌মার্চ



চীন-ভারত লং মার্চ-এর অগ্রজ :

- বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প
- বল্মীক
- শ্রাত্য
- বাস্তুবিজ্ঞান
- মনামী
- নৈমিষারণ্য
- দণ্ডক শবরী
- অন্তর্লীনা
- অলকনন্দা
- মহাকালের মন্দির
- নীলিমায় নীল
- সত্যকাম
- পথের মহাপ্রস্থান
- অপরূপা অজন্তা
- নাগচম্পা
- তাজের স্বপ্ন
- আমি নেতাজীকে দেখেছি
- পাষণ্ড পণ্ডিত
- জাপান থেকে ফিরে
- কালো কালো
- শালিক ভোরে
- আবার যদি ইচ্ছা কর
- কলিঙ্গের দেবদেউল
- আমি রাসবিহারীকে দেখেছি
- গজমুক্তা
- বিহঙ্গ বাসনা
- বিশ্বাসঘাতক
- সোনার কাঁটা
- মাছের কাঁটা
- অশ্লীলতার দায়ে
- লালত্রিকোণ
- পথের কাঁটা
- নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা
- পঞ্চাশোর্ধে
- অবাক পৃথিবী
- আজি হতে শতবর্ষ পরে
- তিলোত্তমা (মনামী, অলকনন্দা)
- হংসেশ্বরী

চীন-ভারত লং মার্চ-এর অনুজ

(যন্ত্রস্থ) :

- প্যারাবোলা-স্যার
- ঘড়ির কাঁটা
- লিঙ্গুবাগ / লিঙ্গুবাগ
- আনন্দ স্বরূপিণী

ক থা র ম্ভ

"চীন ও ভারত এই দুই প্রাচীন ও প্রতিবেশী দেশের সত্যিকারের ট্রাজেডি হচ্ছে এই যে, এরা পরস্পরকে বাঁচতে সাহায্য করছে না, মরতে সাহায্য করছে। এদের মধ্যে বাণিজ্য নেই, লোক চলাচল নেই, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বহুদিন বন্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে···প্রকৃতিই মন্ত্রণা দেবে উভয়ের কানে: ওরা অসুর, তোমরা দেবতা। ওদের মারলে পাপ হবে না। ওদের মারো।"[১]

—কথাগুলো বলেছিলেন অন্নদাশঙ্কর তাঁর এক যুগান্তকারী প্রবন্ধে। জাতির জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে। সবাই যখন বিভ্রান্ত, অপ্রকৃতিস্থ; আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে। তারপর পৃথিবী এ-পর্যন্ত দ্বাদশবার সূর্য-প্রদক্ষিণ করেছে; কিন্তু অবস্থাটার কোনো পরিবর্তন হয় নি। কেন হয় নি?

সুদূর অতীতের খতিয়ান থাক, এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেও কিন্তু প্রকৃতি উভয়ের কানে অমন মন্ত্রণা দিত না! দুটি দেশ তখনও পরস্পরকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত, একে অপরকে বুঝবার চেষ্টা করত। এ-যুগে স্যার আশুতোষই ভারতবর্ষে চীনা ভাষায় অধ্যাপনার প্রথম ব্যবস্থা করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—সম্ভবত ১৯১৭ সালে তিনি চীন-প্রত্যাগত একজন বেলজিয়ান পণ্ডিতকে চীনা ভাষা পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করেন। ছাত্রের অভাবে চীনা-ক্লাস অবশ্য বেশীদিন চালানো যায় নি। তারও বছর পাঁচেক পূর্বে বিখ্যাত ভাষাবিৎ হরিনাথ দে নিজের বাড়িতে চীনা-শিক্ষক রেখে ঐ ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। পাটনার ব্যারিস্টার এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-বিষয়ে পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল অক্সফোর্ডে থাকতে চীনাভাষা কিছুটা শিখেছিলেন বলে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর ঊষাযুগ থেকেই চীনাভাষা পঠন-পাঠনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি প্যারিস থেকে এসে যখন শান্তিনিকেতনে অতিথি-অধ্যাপকরূপে কার্যভার গ্রহণ করলেন তখন থেকেই সেখানে চীনাভাষার চর্চা শুরু হল। পণ্ডিতপ্রবর বিধু-শেখর শাস্ত্রী এবং আচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী ঐ ভাষা আয়ত্ত করলেন। প্রবোধচন্দ্রই বস্তুত এ-যুগের প্রথম ভারতীয় চীনাবিদ্‌রূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন। অধ্যাপক লেভির আগ্রহে তাঁর সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র দূর প্রাচ্যের বহুদেশ ভ্রমণ করে আসেন এবং পরে একটি বৃত্তি লাভ করে প্যারিসে গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফলস্বরূপ ফরাসী ভাষায় প্রবোধচন্দ্র তিনখণ্ডে এক মহাগ্রন্থ রচনা করেন: চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র।[২]

এছাড়াও 'দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান'[৩] নামে গবেষণা-গ্রন্থ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করে প্রবোধচন্দ্র দক্ত্যোর-'এ লেত্র্ অর্থাৎ ডক্টর অব লিটারেচার বা সাহিত্যাচার্য উপাধি লাভ করেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসেও প্রবোধচন্দ্র চীন-ভারত বিষয়ে গবেষণার কাজ করতে থাকেন। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে ফরাসী ভাষায় তাঁর গ্রন্থদ্বয় 'সিনো-ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ সালে প্রধানত চীনা অধ্যাপক তান ইয়ান-সান্-এর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল 'চীন-ভারত সমিতি' বা 'সিনো-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি।' ঐ বছর ২২শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তার বঙ্গানুবাদ—

> "আমার শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতিকে আশ্রয় দিতে পারায় আমি আনন্দিত। আশা রাখি, আমার চীনা বন্ধুরা এই সমিতিকে স্বাগত জানাবেন এবং আমার সুহৃদ অধ্যাপক তান ইয়ান-সানকে আন্তরিক সাহায্য করবেন—তাহলেই চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী সংস্থারূপে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।"[৪]

ডঃ কালিদাস নাগ, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রভৃতি এর পর বিশ্ব-ভারতী থেকে চীন ভ্রমণে যান; শান্তিনিকেতনে একটি চীনা ভবন গড়ে ওঠে। বহু চৈনিক গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় এবং এ-দেশীয় গ্রন্থ চীনা-ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের নাম পুনরায় এসে পড়ে। চীনা ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থের সূচী বহু পূর্বেই জাপানী পণ্ডিত বুনয়ু নান্‌জ্যো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেছিলেন। এই সূচীখানি বহু বছর ধরে চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম আলোচনার জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বলে চিহ্নিত ছিল। প্রবোধচন্দ্রের মুখ্য কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি ঐ সমস্ত চীনা অনুবাদগুলির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেন। চীনা ও ভারতীয় অনুবাদকদের কালনির্দেশ এবং অনূদিত গ্রন্থের সমালোচনা করে প্রায় সহস্র-বর্ষব্যাপী অনুবাদ-সাহিত্য প্রচেষ্টার একটি প্রামাণ্য মূল্যায়ন করেন।

সে যাই হোক, অধ্যাপক সান যখন 'সিনো-ইণ্ডিয়ান সোসাইটির' জন্য অর্থসংগ্রহ করতে স্বয়ং চীনে ফিরে যান তখনও রবীন্দ্রনাথ চীনবাসীদের উদ্দেশ্যে যা বলে-ছিলেন তার বঙ্গানুবাদ:

> "আমার প্রিয় চীনবাসী বন্ধুরা,
>
> যে সত্য বহন করে এনেছিলেন এ-দেশে তোমাদের দেশের তীর্থযাত্রীরা,

অথবা এ-দেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এ-দেশী পরিব্রাজকেরা সে-সত্য আজও অমলিন। কী মহিমান্বিত সে মহাতীর্থযাত্রা! ইতিহাসের সে কী এক উজ্জ্বল অধ্যায়! সেই কালজয়ী পরিব্রজনার আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব তো আমাদেরই;—দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে, জাতি-ভাষা-ঐতিহ্যের বৈপরীত্যকে অস্বীকার করে প্রেম ও মৈত্রীর যে রাখী তাঁরা বেঁধেছিলেন তার ভিতরেই বিশ্বমানবাত্মার শাশ্বত আশ্রয়! সে পথ তো শুধু ভৌগোলিক নয়, সে যে চিরন্তন-ইতিহাসের মহামিলনের পথ।"[৫]

আরও কয়েক বছর পরের কথা। চীনে তখন অন্তর্বিপ্লব, জাপানের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকেও রুখতে হচ্ছে তাকে। সেই সময় ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি সেবাদল গেল চীনে। যুদ্ধক্ষেত্রে হাসপাতালে আহত চীনাদের সেবা করে কয়েক বছর পরে ফিরে এলেন তাঁরা। 'ফেরে নাই শুধু একজন'—ডক্টর কোটনিস্! প্রেম ও মৈত্রীর এক অমরজ্যোতির স্বাক্ষর তিনি রেখে এলেন চীন ভূখণ্ডে।

আরও কিছু পরের কথা। বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমাবিধ্বস্ত জাপান নতজানু হল। চীনের উপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হল। সেদিন জওয়াহরলাল এক তারবার্তা পাঠিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন চীনের তদানীন্তন নেতা মার্শাল চিয়াঙ কাই-শেককে।

কালের রথচক্র আবার পাক খেল। চিয়াঙ বিতাড়িত হলেন চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে। চীন লালে-লাল হয়ে গেল; চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হল; চীন এতদিনে স্বাধীন হয়ে প্রমাণ দিল যে, এতদিন সে পরাধীন ছিল! বস্তুত দুটি প্রতিবেশী রাজ্য, ভারত ও চীন স্বাধীনতা লাভ করল মাত্র দু-বছর আগে-পিছে। মহাচীন ও মহাভারত মুক্তির আনন্দে সেদিন আত্মহারা। রাবণবধের পর সে যেন বিজয়া-উৎসবের কোলাকুলি। তারপর যেমন হয়ে থাকে—দু'পক্ষেই আদর-আপ্যায়ন, নিমন্ত্রণ, আলিঙ্গন, শুভেচ্ছা বিনিময়, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। ভারতবর্ষ থেকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল আমন্ত্রণ পেয়ে গেলেন নয়া চীন দেখতে। রবিশঙ্কর ব্যাস, উমাশঙ্কর যোশি, প্রাণশঙ্কর শুক্লা এবং বাঙলাদেশ থেকে মনোজ বসু। ফিরে এসে সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সাম্যবাদী চীনের। মনোজ বসু তাঁর 'চীন দেখে এলাম' গ্রন্থে লিখলেন :

"দুই পুরানো পড়শি—মহাচীন আর বিশাল ভারত। হাজার হাজার বছর ধরে অচ্ছিন্ন সৌহার্দ্য। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে কত শতবার আমাদের গমনাগমন চলেছে। রণদুর্মদ সৈন্যবাহিনী নয়, প্রবীণ বিদগ্ধজন—হাতে জ্ঞানের মশাল, মুখে আনন্দ ও শান্তির পরম আশ্বাস। জ্ঞান গৌরবে

দেদীপ্যমান আত্মসমাহিত সুপ্রাচীন দুটি দেশ। নির্লোভ আত্মসন্তুষ্টি।…
পাঁচতারার আলোয় বিভাসিত নূতন চীন চাক্ষুষ দেখে এলাম। স্থবিরত্বের
খোলস ঝেড়ে ফেলেছে। চিরকালের বোঝা-বওয়া ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষগুলোর
অপরূপ বীরমূর্তি। লোহার নালবাঁধা পঙ্গুপদ ছিল যে মেয়েগুলো—তাদের
দাপাদাপিতে অস্থির আজ চীনের ভূমিতল।"[৬]

যাত্রামুহূর্তে অবশ্য শ্রদ্ধেয় মনোজ বসু বুঝতে পারেন নি কতবড় দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিল তাঁর স্বদেশ। তাঁর চোখ দিয়েই যে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম প্রতিবেশীকে। জানতে চেয়েছিলাম। বুঝতে চেয়েছিলাম। সে তত্ত্বটা উনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। তাই গ্রন্থারম্ভেই বলেছিলেন,

"নিমন্ত্রণটা এল অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমাকে শান্তি-সম্মেলনে প্রতিনিধি
করা হয়েছে। কেন হে বাপু? ভেবে-চিন্তে তো কোন গুণের হদিস
পাইনে। রাজনীতি করিনে, কোন দলে নেই। পড়ি এবং লিখি। যা সত্যি
বলে মনে হয়, সেটাই লিখে প্রকাশ করি—কোন দাদার ধার ধারিনে যে,
যুক্তি-পরামর্শ করে রেখে-ঢেকে লিখতে হবে। এত সমস্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি
যাবার জন্য তদ্বির-তাগাদা করছেন, তাঁদের ভীড় ঠেলে এ অভাজনের নাম
ওঠে কেমন করে?"[৭]

বিনা তদ্বির-তাগাদায় এবং দাদাদের ধার না ধেরেই মনোজ বসু নির্বাচিত হয়েছিলেন—তাই আমাদের আশা হয়েছিল, যা সত্যি বলে তিনি বুঝেছেন তাই শাশ্বত ভবিষ্যতের জন্য তিনি লিখে রেখে যাবেন। ফিরে এসে তিনি যে বই লিখলেন তা আগ্রহী পাঠকের হাতে হাতে ফেরে। কী উদ্দাম আগ্রহ আমাদের প্রতিবেশীকে জানতে! দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে গ্রন্থ 'নরসিংদাস পুরস্কার' পেল। সাত বছরে দশটি সংস্করণ! কিন্তু তারপর হঠাৎ সে-গ্রন্থের প্রকাশক-মশাই আর তার পুনর্মুদ্রণ করলেন না। দীর্ঘ আট বছর বইটির বিক্রয় বন্ধ ছিল। কেন?

কারণটা মর্মন্তুদ! ১৯৬২ সালে ঘটল একটা যুগান্তকারী ঘটনা!

চীন-ভারত সীমান্তবিরোধ!

সেদিন সব কথা সকলে বুঝতে পারে নি; আজ কিন্তু সেই চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের পূর্ণ ইতিহাস জানতে কারও বাকি নেই। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর 'আনার্মড্ ভিক্ট্রি', নেভিল ম্যাক্সওয়েল-এর 'ইণ্ডিয়াস্ চায়না ওয়র' এবং সাংবাদিক ফেলিক্স গ্রীন, ব্রিগেডিয়ার ডাল্‌ভি এবং আরও অনেকের অসংখ্য গ্রন্থ। সে ইতিহাসের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সে তো আজ সকলের জানা।

কিন্তু একটা প্রশ্ন যে তবুও রয়ে গেল! আজও যে অবাক হয়ে ভাবি এমনটা কেন হয়েছিল? কেন? কেন?

সেদিন হঠাৎ সংবাদপত্র পড়ে আমরা নিজেদের আক্রান্ত মনে করেছিলাম। আশঙ্কা করেছিলাম লাডাক আর তেজপুরের পথ দিয়ে বেঁটে বেঁটে চীনে-ব্যাটারা প্রবেশ করবে ভারত-ভূখণ্ডে। 'শক হুন-দল-পাঠান-মোঘল'-এর পদচিহ্নরেখা ধরে! পর্তুগাল, ফ্রান্স যেভাবে চেয়েছিল, পারে নি—আর ইংরাজ যেভাবে দু'শ বছর ধরে আমাদের শাসন ও শোষণ করেছিল লালচীনও বুঝি এবার তা করতে চায়। ফলে আমরা অনেকেই দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম, প্রায় সকলেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তদানীন্তন চীন-সরকারের অপরাধে মহাচীনের সহস্রাব্দীর সংস্কৃতিকে, ভারত-চীন সৌহার্দ্যকে, এমন কি সাম্যবাদের মর্মকথাকেও গাল পাড়তে শুরু করেছিলাম। অবাঞ্ছনীয় হলেও মনোভাবটা অস্বাভাবিক নয়—আতঙ্কতাড়িত মানুষের বিচার-বুদ্ধি এভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। গায়ে আরশোলা-টিকটিকি পড়লে আমরা যে পরিমাণ লাফাই তাতে হাতের-কাছে-রাখা চীনামাটির ফুলদানিটা ভেঙে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ওটা নিছক জৈবিক-বৃত্তি।

কিন্তু তারপর? যখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ভারত-জয়ের বিন্দুমাত্র বাসনা ওদের ছিল না, তখন? যখন স্বচক্ষে দেখলাম জেতা-খেলার শেষ-কিস্তিটা না দিয়ে ওরা দাবা-বোড়ের ছক উল্টে দিয়ে দেশে ফিরে গেল, তখন? কই, তখনও তো আমরা বলতে পারলাম না—প্রতিবেশীকে বাপ-মা তুলে গাল পাড়াটা আমাদের ঠিক হয় নি। কেন পারলাম না? লজ্জায়? সংকোচে? একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কথাটা ঠিক নয়। সরমে যদি বাধত তাহলে খোলাখুলি ক্ষমা না চেয়ে আমরা নলচের আড়াল দিয়ে ঘুরিয়ে বলতুম: যাক্ গে ভাই, যা হবার তা তো হয়ে গেছে—এস, সে-সব কথা ভুলে আবার আমরা ভাব পাতাই। ভাব-ভাব-ভাব: ভাব-ভাব-ভাব!

তা আমরা বলতে পারলুম না।

ওরাও পারল না কিন্তু! আর যাই হোক, কোনো নিরপেক্ষ লোক বলবে না সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ বা গণতন্ত্রের মূলনীতির নিরিখে পাকিস্তান এই হতভাগ্য ভারতবর্ষের চেয়ে কিছুমাত্র অগ্রসর। তবু চীন তাদেরই ডেকে ঐ 'ভাব-ভাব' শোনালো! 'আড়ি-ভাব'এর খেলায় এমনই নাকি হয়! কিন্তু আমরা সহজে ভুলটা স্বীকার করতে পারলুম না কেন? তার আসল কারণটা কি এই যে, আমরা চীনা সৈন্যকে ভয় পাই নি, চীনা সাম্রাজ্যবাদকেও নয়—আমরা ভয় পেয়েছিলাম ওদের মূল নীতিটাকেই? ঐ—সাম্যবাদকে?

তা কেমন করে হবে? 'সাম্যবাদ' জিনিসটা তো শুনেছি মোটামুটি ভালই। স্বাধীনতা-মৈত্রীর সঙ্গে তাকে এক পংক্তিতে বসিয়েছি সেই ফরাসী-বিপ্লবের আমল থেকে। তাহলে?

একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। চীনের তদানীন্তন সরকারের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবার পরেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল অথবা রাষ্ট্রপতি দার্শনিক শ্রীরাধাকৃষ্ণণ কিন্তু চীনের জনসাধারণ অথবা চীনের সংস্কৃতিকে কালিমালিপ্ত করেন নি। তবু প্রখর সূর্যের চেয়ে সূর্যতাপে উত্তপ্ত বালুবেলাই নাকি বেশি অসহ্য। 'বাবু যত বলে' তার চেয়ে পারিষদ-দল এক কাঠি উপরে উঠলেন। 'দেশ'-এর শিল্পী-সাহিত্যিক-গুণীজন কোমর বেঁধে লাগলেন। ২০শে পৌষ, ১৩৬৯-এ দেশ-পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে ছাপা হল—'শত্রুকে ঘৃণা':

> "শ্রী নেহেরু ও রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ দুজনেই উপদেশ দিয়াছেন, চীনা জনসাধারণ ও চীনা সংস্কৃতি সম্পর্কে বিরূপতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। দেশের অগণিত সাধারণ লোক যারা প্রতিবেশী চীনের অহেতুক মারমুখী আচরণে বিচলিত, ক্রুদ্ধ হয়েছে, যারা স্বদেশরক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত তাদের কাছে স্বভাবতই শ্রীনেহেরু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণণের এই 'সুসমাচার' অবিশ্বাস্য, অবান্তর।...হিমালয়ের গিরিপথ ধরে সুদূর অতীতে কবে কোন চীনা পরিব্রাজক মৈত্রীর সন্ধানে ভারতে এসেছিলেন তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আছে চীনের বিশ্বাসঘাতকতা ও দস্যুতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সুতীব্র ঘৃণা, পবিত্র প্রচণ্ড ক্রোধ! ...শত্রু হচ্ছে কম্যুনিস্ট চীন, ভারতের গণতন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস করে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের প্রসারই চৈনিক অভিযানের লক্ষ্য। শত্রুর এই চিত্র-চরিত্র জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলে তবেই পবিত্র ঘৃণার ইন্ধনে প্রতিরোধ শক্তি অনির্বাণ প্রজ্বলিত রইবে।"

'পবিত্র ঘৃণা'! অদ্ভুত শব্দটার ব্যঞ্জনা! সৌভাগ্যের কথা, দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বাঙলা ভাষাটা জানতেন না—তাই তাঁর গ্রন্থে এই শব্দ-মাধুর্য নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। বহুদূরে বসে তিনি শুধুমাত্র শুনেছিলেন আর একটা শব্দ: "পবিত্র জন্মভূমি।" সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> **"It was difficult to keep patience with the Indians for constantly referring to the 'Sacred soil' and the 'holy-land' of India....I love England passionately but it would not occur to me, or to others in like case, even in times**

of war to refer to her 'sacred soil.'[৮]

অর্থাৎ, "ভারতীয়রা যেভাবে প্রতিনিয়ত তাদের 'পবিত্র দেশ' অথবা দেবভূমির উল্লেখ করে চলেছিল তাতে ধৈর্য-রাখাই কঠিন...আমি ইংলণ্ডকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি কিন্তু যুদ্ধের সময়েও আমি অথবা আমার মত আর কোন ইংরাজ তাই বলে দেশটাকে 'পবিত্র-ভূমি' বলে উল্লেখ করবেন না।"

'পবিত্র ভূমি'তেই এই ? এ 'দেশের' 'পবিত্র-ঘৃণা'র সংবাদ পেলে ইংরাজ দার্শনিক কী বলতেন তা জানতে কৌতূহল হয়। সে খবর পাই নি, পেয়েছি এ-দেশীয় সাহিত্যিকদের মতামত :

ঐ 'পবিত্র-ঘৃণা'র ইন্ধন-সন্ধানে দেশ-সম্পাদক ইতিপূর্বেই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'দেশ'-এর পরিচিত শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তাশীলদের আহ্বান জানানো হলো 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শিরোনামা-সম্বলিত এক ধারাবাহিক রচনায় ঐ 'পবিত্র-ঘৃণা'র আগুন অনির্বাণ রাখতে। প্রথম ঋত্বিক সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার পেয়েছিলেন আরও পাঁচবছর পরে :

"সমরতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়ে গঠিত চীনের আদর্শ ও জীবন-ধাতু স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এই আদর্শে সারা দেশে নিত্য প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পঁচিশ কোটি যুবক-যুবতী সামরিক-পদ্ধতিতে কুচকাওয়াজ করে থাকে। এ আমি চীন-ভ্রমণের সময়ে নিজে চোখে দেখে এসেছি। স্বকর্ণে শুনে এসেছি—তার আদর্শের সঙ্গে সে-দেশের আদর্শের একাত্মতা নেই, আনুগত্য নেই, তাদের উপর এদের কী আক্রোশ! এর স্বাভাবিক পরিণাম বা পথ যুদ্ধ ও যুদ্ধের পথ।...১৯৫৮ সালে ফুয়েময়-এ এই যুদ্ধ চীন-নায়কেরা দিতে চেয়েছিলেন ফরমোজার অধিবাসী চীনাদের স্বর্গীয় ফলের আস্বাদ দেবার জন্য। কিন্তু সেখানে আমেরিকার নৌবহর উপস্থিত ছিল—একটি কামান গর্জনের উত্তরে দুটি কামান গর্জনের দ্বারা তারা উত্তর দিয়েছিল। চীনকে হাত গুটিয়ে সরে আসতে হয়েছিল। ব্যর্থতায় রোষে তাকে করেছিল উন্মত্ত। সেই উন্মত্ততায় সে ভারতবর্ষকে ভাবলে সহজ শীকার। ভারতবর্ষ অহিংসাবাদে বিশ্বাসী। ভারতবর্ষ মূর্খ। ভারতবর্ষ সমরচর্চা করে না তার মত। সুতরাং সে দুর্বল।"[৯]

জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় তারাশঙ্কর ওখানেই থামতে পারেন নি। উনি পর পর অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায়—তার মধ্যে ভাবালুতা যতটা আছে যুক্তি ততটা নেই। যেমন ধরা যাক—আমিষ-নিরামিষ আহার প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর যুক্তির সারবত্তা প্রতিষ্ঠা'র প্রয়াস। তারাশঙ্কর লিখলেন.

"ধাতুগতভাবে যারা হিংস্র ও আমিষভোজী জন্তু তারা ছাড়া যেমন নরখাদকতার নেশা অন্য কোনও জন্তুর পক্ষে সম্ভবপর নয়—তেমনি যেসব মানুষ বা জাতির জীবন-ধাতুতে এই হিংসা ও রক্তের নেশা নেই তাদের পক্ষেও এই ধরণের জাতীয়তা বা স্বভাবধর্ম গঠন করা সম্ভব নয়।...(শুধু প্রকৃতিই নয়, তাদের আকৃতির মধ্যেও এর ছাপ থাকে। এবং বহু হাজার বছরের মধ্যে সভ্যতার যে বিবর্তন হয় তার ধারা ও অন্য দেশের ধারা থেকে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ধর্মী। একেই আমি জীবন-ধাতু বলেছি। চীনের জীবন-ধাতু বলেছি সময়ধর্ম)...চীনের মধ্যে এটা ছিল এবং সেই কারণেই যে মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন উপজাতি একজন শক্তিমান নায়কের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হল সেই মুহূর্তেই তারা পঙ্গপালের মত বা দলবদ্ধ নেকড়ের মত ছুটে বের হল পার্শ্ববর্তী দেশ-দেশান্তরে।" (২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯)

তারাশঙ্কর এখানে মাওসে-তুঙ, তৈমুরলঙ্গ, এ্যাটিলা অথবা চেঙ্গিস্-এর মধ্যে 'জীবন-ধাতু'তে কোনোও পার্থক্য খুঁজে পান নি। তুলনায় ভারতের 'জীবন-ধাতুটা' কী সেটা বোঝাবার জন্য পরবর্তী আর এক সংখ্যায় লিখলেন,

"ভারতবর্ষের মধ্যেও বিকৃতি কম আসেনি—এসেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও এমন একটি তত্ত্ব বা সাধনা আমাদের জীবনে ছিল—আচারের আকারেই ছিল—যাতে অমূল্য প্রাণমুখ বীজ অক্ষয় হয়ে বেঁচেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি—ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজনের আচারের কথা। সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষের মানুষদের মধ্যে যত সংখ্যক লোক নিরামিষ-ভোজী, আহারের জন্য পশুহত্যা-বিমুখ, এত সংখ্যক নিরামিষ-ভোজী পৃথিবীর কোন দেশে নেই। বুদ্ধের উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব করুণার বীজ অক্ষয় হয়েই রয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে। এর কারণ ভারতের জীবনধাতু এই করুণাতত্ত্বের পক্ষে অমৃতময় ক্ষেত্র।"[১০]

বেশ বোঝা যায়, তারাশঙ্কর তাঁর চিন্তাশক্তির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। না হলে চীনবাসীর আকৃতির মধ্যে তিনি নরখাদকতার ছাপ এমন হঠাৎ আবিষ্কার করতেন না। খেয়াল করলে, অথবা বইপত্র ঘাঁটলে তিনি জানতে পারতেন স্বয়ং বুদ্ধদেব নিরামিষাশী ছিলেন না। কুশীনগরে উপনীত হবার পূর্বে তিনি যে রক্ত-আমাশয়ে আক্রান্ত হন, তার হেতু—পূর্ব রাত্রে শূকর-মাংস মিশ্রিত পলান্ন ভক্ষণ! অন্যত্র তারাশঙ্কর বলেছেন, "আমাদের পুরাণে আছে স্রষ্টা চতুর্মুখ। চারটি মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাণীমুখ, মহাত্মা গান্ধী ভারতের ধ্যানমুখ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের শৌর্যমুখ, প্রধানমন্ত্রী

শ্রীজওয়াহরলাল—ভারতের কর্মমুখ।"[১১]

আমিষ-নিরামিষ তত্ত্বের ধ্বজাধারী তারাশঙ্কর খেয়াল করলে দেখতেন এই ব্রহ্মার তিন-চতুর্থাংশ মুখেই আমিষ খাদ্য রুচত। একটা জাতির জীবন-ধাতু তার কত শতাংশ 'খটমল খিলানেবালা' শুধু সেই মাপকাঠিতেই বোঝা যায় না!

তবে তারাশঙ্কর ছিলেন মরমী কথাসাহিত্যিক। রাঢ়-দেশের একশ্রেণীর মানুষের হাসি-অশ্রুর বিচিত্র চিত্র-চিত্রণে তিনি আমাদের মন হরণ করেছিলেন। বাঙলা কথাসাহিত্যে তাঁর আসন চিরস্থায়ী; কিন্তু তাই বলে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে দেশবাসীকে পথের নির্দেশ দেবার দায়িত্ব মরমী সাহিত্যিকের উপর দেওয়া যায় না।

সেজন্য আরও বিস্মিত হয়ে যাই যখন দেখি অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন:

> "কমিউনিজম? তার সম্বন্ধে রায় দেবার অধিকার আমার নেই। কারণ, কোন মতবাদকে সম্পূর্ণ না জানা পর্যন্ত তাকে স্তুতিনিন্দায় কোনও শিরোপা আমি দিতে পারি না।...আমি পেশায় অধ্যাপক, সুতরাং একটা স্বাভাবিক কৌতূহলেই আরও দশটা জিনিসের সঙ্গে কমিউনিজম সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করেছি—কিন্তু তা নিতান্তই সামান্য।...আজ দেখছি কম্যুনিস্ট চীনের পররাষ্ট্র-লোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হয়েছে। এই কমিউনিজম্ আমার শত্রু, আমার দেশের শত্রু, সমগ্র মানবতার শত্রু।"[১২]

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সাতটা দিন অপেক্ষা করলে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় হয়তো "এই কমিউনিজম্" সম্বন্ধেও ঠিক ঐ সুরে লিখতেন না, কারণ ঐ সংখ্যা দেশেই প্রকাশিত হয়েছিল অন্নদাশঙ্করের রচনা 'যোগভ্রষ্ট'। হয়তো সেটি পাঠ করার পরে একটা মতবাদকে না জেনেই—চীনের ঐ 'পররাষ্ট্র-লোলুপতা'র পশ্চাদপটে কী আছে তা না জেনেই তিনি 'কমিউনিজম্'কে নিন্দার শিরোপা দিতেন না। বনফুল খোলাখুলি বললেন,

> "সাধারণতঃ আমি আমার সৃষ্টির জগতে কোনও 'ইজম্'কে বা রাজনীতিকে প্রাধান্য দিই না, প্রাধান্য দিই মানুষকে।"[১৩]

শ্রেণীসচেতন সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখলেন,

> "আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা, অনুন্নত দেশে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রই ফলপ্রসূ। এই পথেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। '৪২-এর আন্দোলনের সময় মার্ক্সবাদের প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছি।...ভারতের স্বাধীনতার পর আমি মনে করি তার অগ্রগতির নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীই করবে। আমি মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর। কমিউনিস্ট দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নির্যাতিত।"[১৪]

প্রথম কথা, 'বদ্ধমূল' ধারণা নিয়ে যিনি বসে আছেন তাঁর মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। দ্বিতীয়ত দেখছি, '৪২-এর আন্দোলনে তদানীন্তন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকার জন্যই তিনি গোটা মার্ক্সবাদ-এর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বসে আছেন। তৃতীয়ত তাঁর মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তিটা হচ্ছে: শ্রেণীস্বার্থ! নেহাৎ বদ্ধমূল ধারণা না থাকলে সঞ্জয়বাবুকে মাওয়ের **Analyses of Classes in Chinese Society (Mar' 1926)**, প্রবন্ধটা পড়তে বলা যেতে পারত—কারণ সেখানে মার্ক্সবাদে ঐ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকাটা নির্দেশিত হয়েছে। অবশ্য তাতে কোনো লাভ হতো না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে অংশ প্রগতি-বিমুখ হয়তো সেই অংশেই আশ্রয় খুঁজছেন উনি।

ক্রমে ক্রমে অনেকেই এই ধারাবাহিক রচনায় অংশ নিতে এলেন। শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিত দত্ত, গজেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, দীনেশ দাস, সুনীল রায়, প্রতিভা বসু, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী এবং দেশ-আনন্দবাজারে কর্মরত অনেক-অনেক সাহিত্যিক। দু-একজন অবশ্য 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রসঙ্গ নিয়ে নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা করলেন, সম্পাদকের মূল উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য করে—সেখানে সাম্যবাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হলো না। ঐ তালিকার বাইরেও ছিলেন অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁদের আদৌ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কি না জানার উপায় নেই। 'দেশ'-গোষ্ঠীর এই আন্দোলন ছাড়া ততদিনে 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' গঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের নামে শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব রচিত ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ স্বাক্ষরিত একটি ইস্তাহারে শিল্পীর কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশও আমরা পেলাম:

> "ললিতকলায় ও শুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের আত্মসমাহিতিও বিক্ষুব্ধ হয়েছে দেশপ্রেমের মতো সামষ্টিক অনুভূতির আলোড়নে।...সেদিন হয়তো দূর নয় যেদিন তাঁদের ডাক পড়বে যুদ্ধক্ষেত্রে বা দেশরক্ষা সংশ্লিষ্ট কোন বেসামরিক অথচ যুদ্ধের মতোই কোন কঠিন বিপদ-সঙ্কুল কাজে।"

আশ্চর্য! এই জাতীয়তা-ভাগীরথীর দুর্বার জলস্রোতে ভেসে যেতে অস্বীকার করলেন একজন, শুধুমাত্র একজন সাহিত্যিক। আপন বিবেকের বনিয়াদের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঐরাবতের মতো। যোগভ্রষ্ট হতে তিনি অস্বীকৃত। তিনি অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. অফিসার—সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। শুনতে অদ্ভুত

লাগবে, তবু ধীরভাবে বিবেচনা করলে মনে হয় তাঁর প্রবন্ধটার নামকরণই হওয়া উচিত ছিল : 'শিল্পীর স্বাধীনতা!'—যেমন তাঁর প্রবন্ধের যেটা ছিল শিরোনাম সেটা দেড় বছর ধরে দেশ-পত্রিকায় সিরিয়ালাইজড হতে পারত!

২০শে পৌষ দেশ-পত্রিকায় প্রকাশিত হল অন্নদাশঙ্করের খোলা চিঠি। সহ-সম্পাদককে লেখা :

"ভেবেছিলুম নীরব থাকব। কিন্তু যেখানে আর সবাই সরব সেখানে নীরব থাকলেও তার একটা কদর্থ হবে।...আমি দিনরাত চিন্তা করেছি। আমার কর্তব্য কী? নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য আমার রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। আমার স্ত্রী জওয়ানদের জন্য পশমের দস্তানা বুনেছেন, আমার মেয়েরা 'ফার্স্ট এড' শিখছে, আমিও চাঁদা দিচ্ছি, ট্যাক্স দিচ্ছি। ডাক পড়লে সিভিল সার্ভিসে আবার যোগ দিতেও রাজী। কিন্তু লেখক বা শিল্পী হিসাবে আমার নিজেরও তো একটা যোগসাধনা আছে। সৃষ্টিযোগে স্রষ্টার সঙ্গে ও তার সৃষ্টির সঙ্গে যোগসাধন। আমাকে যোগভ্রষ্ট করে কার কী কাভ? কতটুকু লাভ? আমি যদি আমার সাধনায় নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অতন্দ্র থাকি তবে কার কী ক্ষতি? কতটুকু ক্ষতি? আমিও তো একটা দিক সামলাচ্ছি। সংস্কৃতির দিক। বিশুদ্ধ সঙ্গীত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ প্রেম এ-সব সূত্র থেকেও তো প্রতিরোধশক্তি আহরণ করা যায়। যে কাজে আমি হাত দিয়েছি সেটাও একটা করবার মত কাজ। তার জন্য আমি জীবিকা ত্যাগ করেছি। এখন যদি তাকেও ত্যাগ করি তবে আমার জীবনের সম্বল আর কী রইল? ..

"কবি বা শিল্পী যেন গর্ভিণী নারী। তাকে তার গর্ভ রক্ষা করতে হয় অতি যত্নে, অতি সাবধানে। সেই তার দেশরক্ষা। দেশ কি কেবল দেশের মাটি? দেশের আদর্শ, দেশের ধ্যান, দেশের স্বপ্ন, দেশের রস, দেশের রূপ এসবও তো দেশ। চিন্ময় ভারতকে মৃন্ময় ভারতের মত রক্ষা করতে হবে। একাজ করবে কে, যার কাজ সে যদি না করে? সবাইকে সব কাজে ডাকতে নেই। দেশমাতার চল্লিশকোটি সন্তান রয়েছে। প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ ভাগ করে নিলেই হয়। তা হলে কোন কিছুর জন্য লোকের অভাব হবে না। আমাকেও লিখতে হবে না, এমন কোন রচনা যার জন্য আমার সৃষ্টি হয়নি, যা আমার সৃষ্টি নয়। যেটা আমি লিখছি সেটা যদি ঠিকমতো লিখতে পারি দেশ তার থেকেও প্রতিবাদ শক্তি পেতেপারে।"[১৫]

মনে আছে, সেদিন আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম এ রচনা পাঠ করে। মনে

হয়েছিল—কী আশ্চর্য, কী অপরিসীম আশ্চর্য—এই সোজা কথাগুলো আর কোনো সাহিত্যিক তো এতদিন বলেন নি! শিল্পী-স্রষ্টা-সাহিত্যিকের জীবনবেদ, তার শুভ-বুদ্ধি, তার ধ্যান-ধারণা-বিবেক এভাবে তাৎক্ষণিক খণ্ড-মুহূর্তের আতঙ্কে জলাঞ্জলি দিতে নেই। গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসাবার জন্য সৃষ্ট হয় নি শিল্পীমানস। 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ প্রেম, বিশুদ্ধ সত্য'কে গর্ভিণী নারীর মতো সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তাঁরা দশজনের দশম জন। নিতান্ত ঘটনাচক্রই বলতে হবে, অন্নদাশঙ্করের চিঠিখানার উপর ছাপা হয়েছিল তাঁর ঠিকানা। উনি হয়তো খেয়াল করেন নি, সম্পাদকমশাইও নয়—কিন্তু ঐ ঠিকানাটারও একটা ব্যঞ্জনা ছিল সেদিন। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, মানবসভ্যতায় দুর্দিনে দেশের অমন একটা প্রত্যন্তভাগ থেকেই এতদিন সঠিক নির্দেশ আসত বটে!

অন্নদাশঙ্কর চিঠিখানা লিখেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে!

ঐ 'যোগভ্রষ্ট' রচনার সাহায্যেই আসল প্রশ্নটার মর্মমূলে সেদিন প্রবেশ করা গিয়েছিল। বিবাদটা কেন, কি নিয়ে, কে বাধালো তা জানা গেল ঐ প্রবন্ধপাঠে।

পরবর্তী কালে অনেক বিদেশীও এ নিয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছেন; কিন্তু বিদেশীদের দৃষ্টিভঙ্গি থাক—একজন বিদগ্ধ ভারতীয় শিল্পীর দীর্ঘ উদ্ধৃতির মাধ্যমেই আমরা সেটা বরং বুঝে নিই। এমন একজন শিল্পী যিনি পূর্বাশ্রমে ছিলেন ন্যায়াধীশ; সাধনার জন্য যিনি জীবিকাকে ত্যাগ করেছিলেন! অন্নদাশঙ্কর লিখছেন:

> "ঝগড়া যে বাধতে পারে এ চেতনা আমাদের অনেকেরই ছিল সেই ১৯৪৯ সাল থেকেই। কারণ ওদের মানচিত্র আর আমাদের মানচিত্র মিলিয়ে দেখলেই বেশ খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে যেটা আমাদের মতে আমাদের, ওদের মতে ওদের। মানচিত্র সংশোধন করার সময় নেই, হচ্ছে হবে, দাঁড়াও দেখি, ভাবখানা এই।...এই যে শাশ্বত চীন, যার বৌদ্ধদের কাছে ভারত হচ্ছে 'হোলি ল্যাণ্ড', এর সঙ্গে শাশ্বত-ভারতের কি কোনদিন বিবাদ ছিল যে, অমন একটা অশুভ সম্ভাবনার জন্য আমরা সামরিক অর্থে বা অন্য কোনও অর্থে প্রস্তুত হব? আমরা জানতুম সীমানা নিয়ে বিরোধ একদিন আপসে নিষ্পত্তি হবে। এ ধরণের বিবাদ বহুদেশে বহুবার হয়েছে। এমনি একটা বিবাদ ছিল পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমানা নিয়ে, জায়গাটার নাম সেইস্তান, প্রাচীন নাম শকস্তান। দু' পক্ষ সালিশ মানে ইংরেজ সরকারকে। গোল্ডস্মিথ কমিশন গিয়ে ১৮৭২ সালে একটা সীমানা

অব.

টেনে দেন। কিন্তু গোলমাল তা সত্ত্বেও থামে না। কাগজে-কলমে একটা লাইন টেনে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, সরেজমিনে গিয়ে জরীপ করে পিলার পুঁতে পাকাপাকি করাও দরকার। ত্রিশ বছর পরে আবার দুই পক্ষ ইংরাজকেই সালিশ মানে। তখন ভারতের ইংরাজ সরকার ম্যাকমোহন কমিশন পাঠান। ম্যাকমোহন ছিলেন বড় ঘরের ছেলে, স্যাণ্ডহার্স্ট থেকে পাশ করা মিলিটারি অফিসার। পরে হন পলিটিক্যাল অফিসার। পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমানা জরীপ করে তিনি দু'পক্ষকেই সন্তুষ্ট করেন। এর জন্য তাঁকে খাটতে হয়েছিল দু'তিন বছর ধরে, ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল। সেই যে ম্যাকমোহন তিনি প্রমোশন পেতে পেতে একদিন ভারতের ইংরাজ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী হন। তখনকার দিনে আর সব বিভাগের সেক্রেটারীর উপর একজন করে একজিকিউটিভ কাউন্সিলার মেম্বার থাকতেন। কিন্তু পররাষ্ট্র বিভাগ ছিল খাস বড়লাটের দপ্তর। তাই তখনকার দিনে যিনি ফরেন-সেক্রেটারী হতেন তিনি বাছাবাছা লোকদের মধ্যেও বাছা লোক। বলতে গেলে তিনিই বড়লাটের সচীবস্থানীয়। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন লর্ড কিচ্‌নারকে ঈজিপ্ট থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায়। ঈজিপ্ট হয়ে যায় ব্রিটিশ প্রটেক্টরেট। সেখানে একজন হাইকমিশনারকে নিযুক্ত করা হয়। কাকে জানো? ম্যাক্‌মোহনকে। তিনি ভারত ছাড়ার আগে একটি কাজ করে যান। তিব্বত, চীন ও ভারত এই তিনপক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে একটি বৈঠক করেন। মানচিত্রের উপর দুটি লাইন নির্দেশ করেন। একটি হল ভারত ও তিব্বতের সীমানা সূচক। অপরটি তিব্বত ও চীনের সীমানা-সূচক। প্রথমটিতে চীনা প্রতিনিধির তেমন আপত্তি ছিল না, দ্বিতীয়টিতে ছিল। উপরওয়ালার হুকুম না নিয়ে তিনি স্বাক্ষর দিতে পারবেন না বলে চীন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাগজপত্র পাঠানো হল। চীন সরকার মঞ্জুরী দিলেন না।

"না দেওয়ার কী কী কারণ ছিল আমার জানা নেই। তবে একটা কারণ কিছু কিছু জানি। চীনের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক নিয়ে বহুকালের একটা বিবাদ ছিল। ভারত যেমন বলছে কাশ্মীরের প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হতে পারে না, কাশ্মীরের উপর ভারতের সোভরেন্‌টি, চীনও তেমনি বলত, তিব্বতের প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হতে পারে না, কারণ তিব্বতের উপর চীনের সোভরেন্‌টি। তিব্বতের উপর রাশিয়ারও নজর ছিল, ইংরেজেরও নজর ছিল। তাই নিয়ে একটা সিংহ-ভালুকের লড়াই বাধতে পারত।

ইংরেজ ও রুশ মিলে ১৯০৭ সালে একটা কন্‌ভেনশন করে। তাতে স্থির হয় যে, তিব্বতের উপর চীনের সোভরেন্‌টি। তাই যদি হয় ১৯০৭ সালের পোজিশন তবে ১৯১৪ সালে সে পোজিশন বদলে যেতে পারে না। চীন তখনও সোভরেন। তৎকালীন চীন-সরকার যদিও ইংরাজ সরকারের বন্ধু ও যুদ্ধকালীন মিত্র, তবু তাঁরা সীমানার প্রশ্নটি অমিমাংসিতই রেখে দেন। সম্ভবত এই কারণে যে, দলিলটিতে সই করলে তিব্বতকেও চীনের মত একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে স্বীকার করা হয়েযায়। তাহলে সোভরেন্‌টির দাবী টেকে না। নিজের স্বাক্ষরই তার বিরুদ্ধে যায়।

"ম্যাকমোহন ভারত ও তিব্বতের বেলায় হিমালয় ভূখণ্ডে সেই কাজটি করেন যে কাজটি করেছিলেন গোল্ডস্মিথ পারস্য ও আফগানিস্তানের বেলা সেইস্তানে বা শকস্তানে। অর্থাৎ মানচিত্রে একটি লাইন নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। গোল্ডস্মিথ লাইনের পরে ত্রিশ বছর কেটে গেল, তবু মিটমাট হল না। তার কারণ কাগজে-কলমে একটি লাইন টেনে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। সরেজমিনে গিয়ে জরীপ করতে হয়, পিলার বসাতে হয়। তার জন্য আলাদা একটা কমিশন দরকার। ম্যাকমোহন লাইনের বেলা কোনদিন সেটা হয়নি। এখনো বাকী। চীন-সরকার মঞ্জুরী দিলে সেটা জাতীয়তাবাদী আমলেই চুকে যেত। ইংরাজ সরকারের সঙ্গে চীন-সরকারের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। কিন্তু কী জানি কেন ইংরেজ সরকারও গরজ দেখাননি। ওরা এমন নির্বিকার ছিল যে, মানচিত্রেও ম্যাকমোহন লাইন দেখাতে পঁচিশ বছর দেরী করেছে, ততদিনে চীন জড়িয়ে পড়েছে জাপানী যুদ্ধে।

"মনে কর দুজন জমিদার নিজেদের মধ্যে একটা সীমানার প্রশ্ন অমিমাংসিত রেখে জমিদারী হস্তান্তরিত করে বা হারিয়ে দূরে সরে গেল। তাদের স্থান নিল আর দুজন নূতন জমিদার। আগেকার জমিদারদের মাঝখানে যেটুকু সমঝোতা ছিল সেটুকু পরবর্তী জমিদারদের মধ্যে নেই। কাজিয়া তো বাধবেই। স্বাধীন ভারত বলছে ব্রিটিশ-ভারতের আমিই এখন উত্তরাধিকারী। ইংরাজেরা শেষ মানচিত্রখানা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তাতে দেখছি এসব জায়গা আমার। আমি দখল করছি। তুমি যদি আমার সত্যিকারের বন্ধু হও তবে তুমি আমাকে ঐ তালুক মুলুক নির্বিবাদে ভোগ করতে দাও। লালচীন বলছে, এ সম্পত্তি আমি চিয়াং কাই-শেকের কাছ থেকে জয় করে নিয়েছি। তিব্বত যাকে বলছ সেটা আমাদের তিব্বত-অঞ্চল। ইংরেজ তাকে হাত করেছিল বটে, কিন্তু তার স্বাক্ষরের কোন দাম নেই—

কাঁচা দলিল। বে-আইনি আইন। এস, আবার কথাবার্তা চালাই,—আমাকে তুমি কিছু দাও, তোমাকে আমি কিছু দিই। আপসে নিষ্পত্তি হোক, তার-পরে পাকা দলিল হবে। কমিশন বসাব। জরীপ হবে। পাকা পিলার দেওয়া হবে।...

" 'চীনারা বিশ্বাসঘাতকতা করল'—এই সত্যটার আগে আর একটা সত্য বোধহয় আমাদের নজরে পড়েনি। আলাপ-আলোচনা চড়ায় ঠেকে বন্ধ হয়ে গেছিল। আলাপ-আলোচনার অচল অবস্থা হচ্ছে যুদ্ধের পূর্বাবস্থা। তখনই বোঝা উচিত ছিল, চীনের হাতে আর কোনও তাস নেই, এবার ওরা খেলবে আক্রমণের তাস।"[১৫]

সমস্ত বিশ্লেষণটাই প্রাঞ্জল, তবু দুটি খটকা লেগে রইল। যে কথা অন্নদাশঙ্কর পরিষ্কার করে দিলেন না। উনি বললেন, 'আগেকার জমিদারদের মাঝখানে যেটুকু সমঝোতা ছিল, পরবর্তী জমিদারদের মধ্যে সেটুকু নেই।'—কেন নেই? আগেকার জমিদারদ্বয় ছিল ভিন্ন মহাদেশের, ভিন্ন বর্ণের, ভিন্ন ধর্মের; অথচ বর্তমান জমি-দারদ্বয় প্রতিবেশী, উভয়েই এশিয়াবাসী, যাদের আলাপ-পরিচয়-সৌহার্দ্য দু'হাজার বছরের, যারা একদিন উভয়েই বুদ্ধদেবকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিল। তাহলে এই সমঝোতার অভাব কেন দেখা দিল জমিদারী লাভের এক-দশকের মধ্যেই? মূল গলদটা কোথায়? কি নিয়ে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অন্নদাশঙ্কর ভাববাচ্যে বললেন "আলাপ-আলোচনা চড়ায় ঠেকে বন্ধ হয়ে গেছিল।" কিন্তু কার উৎসাহে অথবা অনিচ্ছায় আলাপ-আলোচনাটা বন্ধ হয়ে-ছিল তা উনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন নি। স্পষ্টাক্ষরে না বললেও যে-ভাষায় ঐ অনুচ্ছেদটি রচনা করেছেন তাতে আমাদের পক্ষে সেটা অনুমান করে নেওয়া শক্ত নয়। পর-বর্তী পংক্তিতে সেটা আরও পরিষ্কার হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর অতঃপর লিখেছেন, "এবং আক্রমণটা ওরা করবে ওদের সুবিধামত এলাকায়, আমাদের সুবিধামত নয়। এখন তো আমরা ঠেকে শিখলুম, এর পরে আর সে ভুল করব না। যুদ্ধ চাই কি চাইনে এইটা আগে ভাল করে ভেবে নেওয়া যাক। যুদ্ধ চাইনে এই যদি হয় মনের কথা, তবে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, বন্ধ করলে চলবে না। যুদ্ধ চাই এই যদি হয় অন্তরবাসনা তবে সবরকম চমকের জন্য তৈরি থাকতে হবে।"

এই প্রসঙ্গে বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর গ্রন্থে বলছেন,

"ভারতবর্ষে ভারতীয় সরকার জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে রেখেছিলেন, বলে-ছিলেন চীনদের আইনত কোন দাবী থাকতেই পারে না, যদিও আপাত-দৃষ্টিতে দেখছি চীনাদের দাবীর যৌক্তিকতা ভারতীয় দাবীর চেয়ে কোনও

অংশে কম নয়। সমাধান হতে পারত সমঝোতার মাধ্যমে, প্রয়োজনবোধে সালিশীর দ্বারা। চীনারা তাতে রাজী ছিল, কিন্তু ভারত গররাজি। কারণ ভারত সরকার যে আগে থেকেই দেশবাসীকে বলে রেখেছে চীনাদের কোন যুক্তিসঙ্গত দাবীই নেই।"[১৬]

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ আজ অতীত ইতিহাস। অন্নদাশঙ্কর যখন ঐ লেখা লেখেন তখনও সে খেলার শেষ ফলাফলটা তাঁর জানা ছিল না। আজ সেটা আমরা জানি। জানি যে, খেলাটা শেষ হয় নি—আমরা যখন ওদের আক্রমণের তাসটা খেলতে বাধ্য করলাম তখন ওরা তা খেলল না। হাতের তাসটা হঠাৎ টেবিলের উপর বিছিয়ে দিয়ে ওরা খেলার আসর থেকে একতরফা উঠে চলে গিয়েছিল। ওরা চলে যাবার পর ওদের সেই চিতিয়ে দেওয়া তাসের গোছা আমরা পরখ করে দেখেছিলাম। অবাক কথা! ওদের হাতটা ছিল একেবারে 'গ্র্যাণ্ড-স্ল্যাম্'-এর!

ওদের এই একতরফা খেলা বন্ধ করাটাও আমাদের ভালো লাগে নি। ওদের এ ব্যবহারের হেতুটা বুঝে উঠতে পারিনি। এমন তো হবার নয়! রাগ করে লোকে খেলার টেবিল ছেড়ে উঠে যায় যখন সে গো-হারা হারে; কিন্তু বন্দী-বিনিময়ের আসরে খতিয়ানটা লক্ষ্য করে দেখি ওরা এ পর্যন্ত একটি পিঠও দেয় নি। তাহলে?

বার্ট্রাণ্ড রাসেল 'অ্যানার্মড্-ভিক্ট্রি'তে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"চীনা সৈন্যবাহিনী যখন বিজয়দর্পে এগিয়ে আসছিল ঠিক তখনই ভারত তার গান্ধীবাদের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ব্যাপক যুদ্ধপ্রচারে মনোনিবেশ করে। লোকে যখন যুদ্ধ-উন্মাদনায় সবে জেগে উঠ্‌তে শুরু করেছে তখনই চীনারা রণে ক্ষান্ত দিল এবং দেশে ফিরে গেল। যুদ্ধবাজদের এতে ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। তারা বলল: এ ওদের কী জাতীয় ব্যবহার? প্রচারের মাধ্যমে আমরা যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে না করতেই ওরা যুদ্ধাবসান ঘোষণা করে বসল: এবার যে আমরা ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম! এভাবে আমাদের অপমান করার মানে?"

অন্নদাশঙ্কর যখন 'যোগভ্রষ্ট' প্রবন্ধ লেখেন তখন এ পর্যায়টা তাঁর জানা ছিল না। তিনি শুধু তাঁর প্রবন্ধের শেষ দিকে সক্ষেদে বললেন,

"আলাপ-আলোচনা যে ব্যর্থ হবেই এমন অলক্ষুণে কথা আমি মুখে ধরব না। কিন্তু দুই দেশের মেজাজ যা দেখছি তার ফলে আমার ধারণা এখন অন্য খাতে বইছে। চীন ও ভারত এই দুই প্রাচীন ও প্রতিবেশী দেশের

সত্যিকারের ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই যে এরা পরস্পরকে বাঁচতে সাহায্য করছে না, মরতে সাহায্য করছে। এদের মধ্যে বাণিজ্য নেই, লোক চলাচল নেই, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বহুদিন বন্ধ।”[১৫]

যে-কথা বলছিলাম। চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ আজ অতীতের ইতিহাস। তাহলে যা চুকেবুকে গেছে তার জের টেনে এই দুই প্রতিবেশী রাজ্য আজও কেন মুখ ফিরিয়ে থাকবে? আজও কেন 'এদের মধ্যে বাণিজ্য নেই, লোক-চলাচল নেই, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বহুদিন বন্ধ' থাকবে? জাগতিক 'তন্থ'-এর হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে একদিন দুর্বার মরু-প্রান্তর পার হয়ে চীন এসেছিল ভারতে, জানতে তথাগতের অষ্ট-মার্গের নির্দেশ। রবিশঙ্কর ব্যাস,উমাশঙ্কর যোশি, প্রাণশঙ্কর শুক্লা এবং আমাদের মনোজ বসু চীন দেখে এসে বললেন—জাগতিক তন্থ থেকে উত্তরণের কী একটা নূতন সূত্র বুঝি খুঁজে পেয়েছে ঐ পাঁচ-তারার আলোয় উদ্ভাসিত প্রতিবেশী রাজ্যটা। তারাশঙ্কর সক্ষোভে স্বচক্ষে দেখে এলেন পাঁচশো কোটি নও-জোয়ান দুঃশাসকদের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী জমিদার, মিলমালিক, মুনাফাখোর, ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য নিত্য কুচকাওয়াজ করছে। আমাদেরও তো দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই, আমরাও তো "গরীবি হটাও" মন্ত্রে দীক্ষিত। তাহলে ওরা কেমন করে গরীবিটা হটালো সেটা জানতে দোষ কি? অবশ্য শুনেছি—ওরা নাকি 'গরীবি হটাও' মন্ত্র সফল করেছে তান্ত্রিক মতে—মহিষ-বলিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে। যারা চাল-তেল-কেরোসিন—বেবি ফুডের দাম নিত্য বাড়িয়ে চলেছে ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত মুনাফার লোভে, তাদের ওরা বলে নি, 'মেরেছ কলসি-কানা তা বলে কি প্রেম দেব না?' যারা দেশ-শাসনের নামে ঐ সব পুঁজিপতি মহিষাসুরগুলোর কুক্ষিগত হয়ে দেশ-শোষণ করতে চায় তাদের 'অপবিত্র' ঘৃণার আগুনে নিক্ষেপ করতে ওরা পরাঙ্মুখ নয়। আমরা ভারতবাসী, আমাদের 'জীবন-ধাতু' না কি ভিন্ন উপাদানে গড়া। তারাশঙ্কর বলছেন; যদিও রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছিলাম—নাগিনীরা যখন চারিদিকে নিশ্বাস ফেলে তখন নাকি শান্তির ললিতবাণীকে ব্যর্থ পরিহাস মনে হয়; এবং অহিংসা-মন্ত্রের ধ্বজাধারী গান্ধীজীকে বলতে শুনেছিলাম "If India had the sword, I would have called upon India to pull that sword"। সে যাইহোক, অহিংসা মন্ত্রই যখন আমাদের বর্তমান স্বীকৃতি নীতি তখন কোন অলৌকিক পন্থায় আমরা কি অহিংস উপায়ে অমন একটা সমাধানে পৌঁছাতে পারি না? কোনো অহিংসা-মন্ত্রে আমরাও কি পারি না 'স্থবিরত্বের খোলস ঝেড়ে ফেলে চিরকালের বোঝা-বওয়া ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষগুলোকে খাড়া করে' দাঁড় করাতে? নাকি সেটা অহিংস পদ্ধতিতে

হবার নয় বলেই এত বাধা, এত নিষেধ, এত প্রাচীর, এত পর্দা ? প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে চোখ তুলে তাকানোও মানা ?

লালচীনকে আমি চাক্ষুষ দেখি নি। হংকং শহরের মাইল কতক দূরে একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে দিগন্তরেখার কাছাকাছি অচেনা-চীনের একমুঠো ভূখণ্ডকে দূর থেকে একবার দেখেছি মাত্র। কিছুটা নীলাভ পাহাড়, জল-চিক্‌-চিক্‌ কী একটা নদী, আর মৌন গাছের সারি। গাইড বললে—ঐ গাছের সারির পিছনে আছে যে রাজ্য সেখানে গরীবি হটে গেছে ! ব্যস্‌ ! স্বকর্ণে ঐটুকুই শুনেছি, স্বচক্ষে ঐটুকুই দেখেছি। তার বেশী নয়। তাই সেই অচেনা চীনকে চিনতে গিয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগারে। নিত্য অফিসান্তে। যতবারই গিয়েছি, নজরে পড়েছে প্রবেশ-পথে একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড; তাতে মহাত্মা গান্ধীর একটি বাণী—যেটি উদ্ধৃত করেছি এ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায়। মহাত্মার নির্দেশে তাই প্রতিবেশীর 'অন্তর-মহল'টা খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছি। বুঝতে চেয়েছি—ওরা কেমন করে সংসার চালায়—কী প্রভেদ আমাদের এই নুন-আনতে-পান্তা-ফুরিয়ে-যাওয়া সংসারের সঙ্গে ওদের সচ্ছল পরিবারের। কেমন করে ওরা শেষ-বেশ ঐ গরীবিকে হটালো ! বার বার মনে পড়েছে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপদেশ: 'কোন মতবাদকে সম্পূর্ণ না জানা পর্যন্ত তাকে স্তুতি-নিন্দার শিরোপা আমি দিতে পারি না।' কিন্তু মতবাদটাকে জানার পথে যে নানান বাধা। জানানোতে ততোধিক। তাছাড়া এখানে অধিকারভেদের কথাটাও উঠে পড়ে। ও কাজটা আমার নয়। অন্নদাশঙ্করের ভাষায় 'সব কাজে সবাইকে ডাকতে নেই।' প্রবণতা ও যোগ্যতা হিসাবে কাজ করতে গেলে আমার ভাগে পড়বে গ্রন্থাগারের পরকলায় দেশটাকে দেখা এবং দেখানো। মতবাদটা পরের কথা। সেকথা বলবার জন্য আছেন রাজনীতিক, আছেন সমাজ-সংস্কারক। আমি শুধু বলে যাব—ঐ মতবাদ ঐ দেশে ঐ কালে কেন অনিবার্যভাবে স্বীকৃতি পেল। সে-কথাই জানতে গিয়েছিলাম আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সেখানেও সন্ধান পাই নি। এ পুস্তকে যে সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তার অধিকাংশই সেখানে নেই—সেগুলি পেয়েছি বিদগ্ধজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। পড়েছি তা, চিনতে চেয়েছি চীনকে, তার ইতি-হাসকে, সংস্কৃতিকে, তার 'জীবনধাতু'কে, তার সহস্রাব্দীর নিরবচ্ছিন্ন বঞ্চনার মর্মন্তুদ কাহিনীকে। প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার ইতিকথাকে।

আশ্চর্য ! অপরিসীম আশ্চর্য ! এ কী আমারই দৃষ্টিভ্রম ?

যতবার প্রতিবেশীর বাড়িটার দিকে তাকিয়েছি, জানালায় উঁকি দিয়েছি,

বেড়ার ফাঁকে নাক গলিয়েছি ততবারই চমকে উঠেছি! মনে হয়েছে—না! বাড়ি ছেড়ে আমি আদৌ কোথাও যাইনি। নিজের বাড়ির প্রমাণ-মাপের আয়নাটার দিকেই এতক্ষণ তাকিয়েছিলাম বুঝি বা! প্রতিবেশীকে নয়, দেখেছি শুধু নিজের প্রতিবিম্বটাকেই!

সে কথাই শোনাই! আপনারাই বলুন : এ কী আমার দৃষ্টিভ্রম?

প্রথম পরিচ্ছেদ

চীন-ইতিহাসের আদি পর্ব

প্রাগৈতিহাসিক যুগ : নর-বানরের আদিপুরুষের যে শাখাটি চার পায়ের বদলে দুপায়ে উঠে দাঁড়াতে শিখল তারাই ক্রমে হল মানুষ। সেই আদিমতম মানব-জাতির একটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল পিকিং-শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম চৌ-কৌতিন-অঞ্চলে। আদিম মানবের একটি করোটি বা শিরঃকঙ্কাল। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা তার নাম দিলেন 'পিকিং-ম্যান' (চিত্র—১)। আজ থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে ঐ পিকিং-ম্যানের স্বজাতীয়রা ঐ এলাকায় বাস করত। আজকের মানুষের তুলনায় তাদের কপাল ছিল অপ্রশস্ত, চিবুক কিছুটা ভিতরে চাপা, ভ্রূর অস্থিটা বাইরে ঝোঁকা—আর তাদের মস্তিষ্কের পরিমাপটা ছিল আপনার-আমার মস্তিষ্কের আন্দাজ বারো-আনা মাপের।

ওরা ততদিনে দু-পায়ে হাঁটতে শিখেছে ; পাথর ছুঁড়তে পারে, আগুন জ্বালতে না জানলেও তার ব্যবহারটা জানে—দাবানল থেকে সংগ্রহ করা আগুন সযত্নে গুহায় জিইয়ে রাখতে শিখেছে। শিকার-করা মাংস সেই আগুনে ঝল্‌সে নিলে যে খাদ্য রসনাতৃপ্তকারী হয় এ তথ্যটাও বুঝেছে। ওদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল 'ছোরা-দেঁতো-বাঘ' বা 'স্যেব্‌র্‌-টুথড্‌-টাইগার'। ওদের আশেপাশে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। তাতে নানানজাতের হরিণ, বন্য ঘোড়া, গণ্ডার আর লোমশ ম্যামথ। নৃতত্ত্বের হিসাবে সেটা প্যালিওলিথিক যুগ।



চিত্র—১
পিকিং ম্যান

পরবর্তী উদাহরণ পাচ্ছি একেবারে সাড়ে চার লক্ষ বছর পাড়ি দিয়ে ; যাকে বলে হাল-আমলে, অর্থাৎ আজ থেকে ধরুন হাজার-পঞ্চাশ বছর আগে। এই দীর্ঘ দিনে মনুষ্য-অস্তিত্বের কোনোও নিদর্শন খুঁজে না পেলেও বেশ বুঝতে পারি, পিকিং-ম্যানের বংশধরেরা বিবর্তনের পথে বহাল তবিয়তে টিকে ছিল—ছোরা-দেঁতো বাঘ কিংবা ম্যামথের মতো অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। কারণ এতদিনে তাদের চিহ্ন আবার পাওয়া যাচ্ছে—ঐ চৌ-কৌতিন অঞ্চলেই, পার্বত্য গুহায়। ততদিনেও ওরা চাষবাস শেখে নি,

বন্য জন্তু শিকার করে আর বনের ফলমূল কুড়িয়ে আনে, কিংবা বর্শা দিয়ে নদীতে মাছ ধরে। ইতিমধ্যে জন্তুর চামড়া দিয়ে দেহটা ঢাকতে শিখেছে—লজ্জা নিবারণের প্রয়োজনে ততটা নয়, যতটা শীতের হাত থেকে বাঁচতে। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালতেও শিখেছে এতদিনে।

ঐ সময়ে ভারতবর্ষে কারা বাস করত? হিসাবমত আর্যরা তখনও আসে নি। অর্থাৎ প্রাকার্য-যুগ। কিন্তু তারা কারা? নৃতত্ত্ববিদেরা বলেছেন—ভারতবর্ষে সে-যুগে বাস করত আফ্রিকা-থেকে-আসা নিগ্রয়েড-জাতির একটি শাখা। পরে বহিরাগত অস্ট্রো-এশিয়াটিক-জাতির নিষাদ-জাতীয় এক শ্রেণীর মানুষ এসে ঐ নিগ্রোদের দেশছাড়া করে। তারা ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নানান দ্বীপে পালিয়ে যায়। ঐ নবাগত নিষাদেরা নাকি এসেছিল প্যালেস্টাইনের দিক থেকে। ঐ নিষাদদের বংশধরেরা আজও টিকে আছে ভারতবর্ষে—কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, শবরদের মধ্যে—যাদের দেখে এসেছি, এই তো সেদিন, দণ্ডকারণ্যে।

সে যাই হোক, মোটামুটি আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে উত্তর-চীনে যারা বাস করত তারা অনেকটা উন্নত। কৃষি শিখেছে, শুয়োর-গরু-কুকুর-ভেড়াকে গৃহপালিত জীব হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছে, মাটির বাড়ি তৈরি করার কায়দাটা আয়ত্ত করেছে, এমন কি তুলোর চাষ করে কাপড় বুনতেও শিখেছে। তাদের তৈরি পোড়ামাটির অনেক পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতদিনে তারা এতই গোষ্ঠী-সচেতন হয়ে উঠেছে যে, তীর-ধনুক বা অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া ওদের সবকিছুই ছিল গোষ্ঠীভুক্ত সম্পত্তি—ঘর-বাড়ি, জমি, শিকার, কোনো কিছুতেই ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। হরিণটাকে মারত হয়তো একজন, কিন্তু ভাগ পেত সবাই। গোষ্ঠীপতি সবকিছু সমানভাবে ভাগ করে দিত। চীনা ইতিহাসে এটাকে বলা হয়েছে 'পোড়ামাটির যুগ'। এটা প্রায় আমাদের মহেন-জো-দারো কিংবা হড়প্পার প্রথম যুগের সমকালে।

এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর ঝগড়া-কাজিয়া লেগেই থাকত—ঠিক যেমন আজ লাগে এ-পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে ও-পাড়ার কাপ্তেনদের। আবার কখনও কখনও তারা একদলভুক্ত হয়ে যেত। এভাবেই গড়ে উঠল নানান উপজাতি বা 'ট্রাইব'। তার যে দলপতি তার ক্ষমতা স্বতই বেশী। বলা বাহুল্য যার দৈহিক ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী সেই হতো দলপতি—যেমন হয় বন্য হস্তিযূথে কিংবা বানরের দলে। দলপতির ছেলেই যে দলপতি হবে এমন কোনো কথা নেই, যেমন নেই বানরদলে, কিংবা এ-যুগের মস্তান-দলে। দলপতি পেটো খেয়ে হাফিজ হলে তার সহকারী আজও তৎক্ষণাৎ হয়ে ওঠে 'গুরু'!

চীনা-পুরাণে আজ থেকে চার-হাজার বছর আগে অমনি চার-পাঁচটি দলপতির পৌরাণিক নাম পাচ্ছি। যার শেষ সর্দার 'চী'-কে দলপতি করা হলো উত্তরাধিকার সূত্রে। সেটা খ্রীষ্ট জন্মের একুশ শ' বছর আগেকার কথা। তারপর থেকেই শুরু হলো ঐ উত্তরাধিকার-সূত্র—দলপতির ছেলে দলপতি হবে, যুবরাজ হবে রাজা। ঐ চী প্রতিষ্ঠা করেন চীনের প্রথম রাজবংশ—শিয়া রাজবংশ। হোয়াঙ হো বা পীত নদীর মাঝামাঝি অংশে ছিল তাঁর রাজত্ব।

শ্যাঙ-বংশ ঃ শিয়া-বংশের পতন হলো প্রায় দেড়-হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অর্থাৎ যে সময়ে ভারতবর্ষে, সিন্ধু নদের তীরে, পাঞ্জাবে আর্যরা প্রবেশ করেছে, ঋগবেদের জন্ম হচ্ছে। শিয়ার বদলে এলো শ্যাঙ বংশ। দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরে তারা রাজ্যবিস্তার করে যায়। হোয়াঙ হো-র বন্যায় বার বার রাজধানী স্থানান্তরিত করতে হয়েছে বটে কিন্তু ঐ পাঁচশ' বছরে চীনের উন্নতিও বড় কম হয় নি। ওদের দুটি আবিষ্কার ছিল যুগান্তকারী; প্রথমত রেশম-কীটের চাষ—অর্থাৎ সিল্কের উদ্ভাবন; দ্বিতীয়ত তামা আর টিন গালিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা। ইতিমধ্যে ওরা ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার করতেও শিখেছে। চার-ঘোড়ার রথ পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাত পচিয়ে মদ, ব্রোঞ্জ গালিয়ে নানান তৈজস-পত্র তৈরি করতে শিখেছিল শ্যাঙেরা। তাদের তৈরি ব্রোঞ্জের পাত্র যথেষ্ট পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। ওদিকে সভ্যতার যেমন অগ্রগতি হয়েছে তেমনি সভ্যতার কুফলগুলিও সমাজদেহে একে একে ফুটে উঠতে শুরু করেছে। পূর্ব-যুগের শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা আর নেই। মোটামুটি তিনটি শ্রেণীর জন্ম হয়েছে: অভিজাত, কৃষক এবং দাস। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দীরাই হয়েছিল প্রথম দাস—তারপর বংশানুক্রমে দাসের ছেলে দাস। মিশরে, আর্শারিয়ায়, পারস্যে, রোমে যে দৃশ্য দেখেছি এখানেও সেই একই দৃশ্য। দাসদের কৃচ্ছতার বিনিময়ে অভিজাত শ্রেণী বিলাসের স্রোতে গা ভাসাচ্ছে। একপ্রান্তে দাস অপরপ্রান্তে অভিজাত শ্রেণী—তার মাঝামাঝি আছে কৃষকেরা। তাদের সচ্ছলতা নেই—নুন-আনতে-পান্তা-ফুরায়; তবে দাসদের মতো অত করুণ অবস্থা তাদের নয়। শ্যাঙ আমলে দেখছি পঞ্জিকা তৈরি হয়েছে—পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের সময়কালটা বারোটি মাসে ভাগ করা হয়েছে; তার কোনোটায় ত্রিশ দিন, কোনোটায় উনত্রিশ। তাতে বর্ষাগম কবে হবে, কবে বীজ ছড়াতে হবে, শস্য কাটার লগ্ন আসবে তার হিসাব মোটামুটি আয়ত্তে এলো। শ্যাঙ-রাজাদের দরবারে গণক-ঠাকুর যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করত তা হাড়ের উপর কিংবা কচ্ছপের খোলায় খোদাই করে লিপিবদ্ধ করা হতো। চীনা হরফের সেগুলিই আদিমতম নিদর্শন।

শ্যাঙদের পরে চীনের সিংহাসনে এলো চৌ-রাজবংশ, খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে।

প্রায় নয় শ' বছর তারা চীনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। শ্যাঙ থেকে চৌ—ঐ ক্ষমতা হস্তান্তরের কাহিনীটা একটু বিস্তারিতভাবে বলতে হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে : চীন দেশের অসংখ্য রাষ্ট্রবিপ্লবের ভিতর এই ঘটনাটির একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে—চীনের ইতিহাসে।

শ্যাঙ-বংশের শেষ রাজা শিন ছিলেন অত্যাচারী, বিলাসী এবং প্রজাপীড়ক। ঈ-উপজাতিদের উপর তিনি একাধিকবার অহেতুক অভিযান চালান, স্বয়ং-রণ-হস্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে। একেবারে অহেতুক অবশ্য নয়, ওঁর শুভ উদ্দেশ্য ছিল ওদের বন্দী করে আনা, খাস-দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ঈ-রা কোনো বিদ্রোহ করে নি, বিপ্লব করে নি, শ্যাঙরাজকে কোনোভাবে উত্যক্ত করে নি—তারা নিজেদের চাষবাস নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। ক্রমে শিন হয়ে পড়ছেন প্রজাদের চোখে অত্যাচারী, অবাঞ্ছনীয় শাসক। কিন্তু রাজা হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি! তাঁর আচরণে নাকি কোনো রকম প্রতিবাদ করা মানা—এমনই হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ। অগত্যা প্রজাবৃন্দকে মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করে যেতে হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর কথা। বোধহয় ভারতবর্ষে তখনও মহাভারতের যুদ্ধটা হয় নি। হয়তো বা প্রজানুরঞ্জন শ্রীরামচন্দ্র তখন প্রজাবৃন্দের নির্দেশে সীতাকে বর্জন করছেন! ঐ সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একজন সামন্ত-রাজা—পশ্চিমাঞ্চলের চৌ-বংশের রাজা 'উ' ঐ শ্যাঙদের রাজত্ব আক্রমণ করে বসলেন। অত্যাচারী চীন-সম্রাট শিন তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হলেন; কিন্তু তাঁর সৈন্যদলে অধিকাংশই ছিল দাস। মওকা বুঝে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। তারা বরং আহ্বান জানালো আগন্তুককে। শ্যাঙ সম্রাটের চূড়ান্ত পরাজয় হলো। জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন শ্যাঙসম্রাট শিন।

সাল-শতাব্দীর হিসাবে মনে হচ্ছে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হয়তো সমসাময়িক ঘটনা! চীন ও ভারত দুটি দেশেই সমকালে ঐ যে আগুন জ্বলেছিল তার মূল কারণ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজার প্রতিবাদ। তফাৎ এই যে, শিন ছিলেন প্রজাপীড়ক, শ্রীরামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জন। তফাৎ এই যে, সম্রাট শিন করলেন নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর জানকী করলেন পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

শ্যাঙ-সম্রাটের বিরুদ্ধে এই প্রজাবিদ্রোহই হচ্ছে চীনের প্রথম বিপ্লব। মজার কথা এই যে, পরবর্তী পণ্ডিতেরা বললেন—এক্ষেত্রে প্রজাবৃন্দ কিছু অন্যায় করে নি। রাজা অত্যাচারী হয়ে উঠলে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার অধিকার স্বীকৃত হলো। কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো না তা বলে। শ্যাঙের বদলে এলো চৌ-রাজবংশ। ওদের রাজধানী ছিল 'হাওচিং'-এ (বর্তমান শেংসি-প্রদেশের 'সিয়ান' শহরের কাছাকাছি)

পরবর্তীযুগে যার নাম হয়েছিল 'চাঙ-আন'।

চৌ-রাজবংশ ঃ চৌ-রাজবংশের দুটি শাখা। পশ্চিমী চৌ আর পূরবিয়া চৌ। পশ্চিমী চৌরা রাজত্ব করে প্রায় তিনশ বছর—খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ থেকে খ্রী: পূ: অষ্টম শতাব্দী। তারপর আসে পূরবিয়া চৌ-রা। ওদের রাজত্বকাল খ্রী: পূ: ৭৭০ থেকে খ্রী: পূ: ২২১—ধরুন প্রায় সাড়ে পাঁচ-শ' বছর।

এই প্রায় পৌনে-এক সহস্রাব্দীকালব্যাপী চৌ-রাজবংশের আমলে চীন নূতন রূপ ধারণ করেছে। ওদের রাজ্যসীমা আর শুধু হোয়াং হো অববাহিকায় সীমিত নয়, ইয়াংসি কিয়াং-এর দক্ষিণেও কিছু কিছু রাজ্য এসেছে ওদের শাসনে। একাধিক দার্শনিক পণ্ডিত আবির্ভূত হয়েছেন চীনের সংস্কৃতি ইতিহাসে—লাও-ৎসে, কন্-ফুশিয়াস্, মো-ৎসে, স্যান-ৎসে, হান-ফেই প্রভৃতি। ইতিহাস, দর্শন, লোকগাথা, কাব্য রচিত হয়েছে। দেশের উৎপাদন শক্তি, বণ্টন-ব্যবস্থা, রাজা-প্রজার সম্পর্কেও নানা ভাবে বিবর্তিত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে লোহা আবিষ্কৃত হয়েছে—সেটাই একটা যুগান্তকারী ঘটনা। লোহার ফলা তৈরি হওয়ায় কৃষির উন্নতি হলো। তৃণাঙ্কুর নির্মূল করে কৃষিক্ষেত্রের বিস্তৃতি-লাভে রাজ্যসম্পদ বৃদ্ধি পেল। হোনান, হোপেই সাংতুন অঞ্চলে লোহার খনিতে কাজ করতে এলো যারা তারা হলো চীনের প্রথম মজদুর। ঐসব খনি-মালিকেরাই আবার চীনের প্রথম মিল-মালিক। তাদের অর্থ-সম্পদ এবং প্রতিপত্তি অনেক ক্ষেত্রে রাজ-কর্মচারীদেরও ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠল। পূরবিয়া চৌ বংশের রাজত্ব-কালের শেষের দু-তিন শ' বছর চীনের এক-এক অঞ্চলে এক-একজন ক্ষমতাশালী সামন্ত-রাজা প্রতি-পত্তিশালী হয়ে উঠলেন। তাদের মধ্যে লড়াই-কাজিয়া লেগেই ছিল। তার ভিতর সাতটি বংশের নাম উল্লেখযোগ্য—চী, চু, ঈয়েন, চী'ন, হান, চাও এবং উঈ। এদের ভিতর চী'ন-সামন্তরাজ প্রায় একশ মাইল লম্বা একটি খাল কাটান, তাতে প্রায় দেড় লক্ষ একর জমি চাষের আওতায় এলো। বড় বড় শহর প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল দেশের এ-প্রান্তে, ও-প্রান্তে। চী-রাজার রাজধানী লিন্‌ৎসে-র জনসংখ্যা দেখছি পৌঁচেছে সত্তর হাজারে। বড় বড় রাস্তাও তৈরি হতে শুরু করেছে। রেশম-শিল্প অসাধারণ উন্নতি করেছে, ব্রোঞ্জ, পিতল ও অন্যান্য ধাতুর বাসন ও শৌখীন তৈজস-পত্রও তৈরি হচ্ছে যথেষ্ট।

এত উন্নতি সত্ত্বেও সাধারণ কৃষকের জীবনে কিন্তু কোনো স্বাচ্ছন্দ্য এলো না। তাদের করভার অত্যন্ত বেশী, সুদের হার চড়া, বেগার দিতে দিতেই জীবন কাটে। মজদুরদের অবস্থাও তথৈবচ। আলেকজাণ্ডারের বাবা ফিলিপ যে বছর ম্যাসি-ডোনিয়ার সিংহাসনে উঠে বসেন সেই বছর (খ্রী: পূ: ৩৩০) চী'ন-বংশের সামন্তরাজা

শিয়াও কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে রাজা-প্রজার সম্পর্কটা উন্নত করতে চাইলেন। ওঁর প্রধান মন্ত্রী খ্যাঙ-ইয়াঙ এগুলি বিধিবদ্ধ করেন। কিন্তু সে আইন চীনে বেশীদিন চলে নি।

চৌ-আমলের দর্শন ও সংস্কৃতির কথা বলি এবার। চৈনিক সংস্কৃতির দুই স্তম্ভ কনফুশিয়াস এবং লাও-ৎসে এই আমলের লোক। এঁদের মধ্যে লাও-ৎসে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য কিছু নেই। তিনি যেন কিংবদন্তীর মানুষ।

লাও-ৎসে ঃ কেউ কেউ বলেন লাও-ৎসে ছিলেন সম্রাট চৌ-এর পুস্তকাগারের গ্রন্থাগারিক। তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর সহজ-সরল জীবনের পূজারী। সব রকম কৃত্রিমতার বিরোধী তিনি। 'প্রকৃতির কোলে ফিরে যাও'—এই ছিল তাঁর বাণী। লাও-ৎসের মতে সাঁকো, পাকা রাস্তা, নৌকাও নাকি প্রকৃতিকে অস্বীকার করা। তাঁর লিখিত বলে যে গ্রন্থখানি আছে তার ভাষাও খুব দুর্বোধ্য।

মো-ৎসে, সুন-ৎসে ঃ লাও-ৎসের পুরো হদিস না পাওয়া গেলেও মো-ৎসে এবং সুন-ৎসের সঠিক নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। মো-ৎসে ছিলেন বাস্তব-বাদী—শীতাতপ, ক্ষুধা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করাই তিনি মানুষের নৈতিক কাজ বলে মনে করতেন। সুন-ৎসেও বাস্তববাদী, তিনি বস্তুত ছিলেন কনফুশিয়াসেরই শিষ্য।

কনফুশিয়াস ঃ ঐতিহাসিকদের হিসাবমতো কনফুশিয়াস গৌতম বুদ্ধের চেয়ে মাত্র বারো বছরের বড়, এবং তাঁর মৃত্যু হয় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের মাত্র চার বছর আগে। অর্থাৎ বলা যায়—দুজনে একেবারে সমসাময়িক। গৌতমের মতো তিনি কিন্তু রাজার ঘরে জন্মান নি। পীত নদীর মোহনার কাছে শাংতুং প্রদেশে তাঁর বাড়ি। গৌতম বুদ্ধের মতোই তিনি বহু দেশে পরিক্রমা করেন, তাঁর বহু শিষ্য হয়। তিনি যে ধর্মমত প্রচার করেন তার মধ্যে নৈতিক আচরণের কথাই ছিল বেশী। বুদ্ধদেব যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব—অষ্টমার্গের আচরণবিধিই শুধু ঘোষণা করে গিয়েছিলেন, কনফুশিয়াসও তেমনি নীতিবোধের দিকেই বেশি জোর দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব ঠিক কী কী বলেছিলেন তা যেমন আমরা জানি না—জানি, যা কিছু তাঁর উপদেশ বলে লেখা আছে পিটকে, তেমনি কনফুশিয়াসের বাণীও আমরা জানতে পারি তাঁর ভাষ্যকারদের মাধ্যমে, বিশেষত মেন্‌সিয়াস-এর ভাষ্যে।

মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তাকে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছিলেন কন্‌ফুশিয়াস : রাজা-প্রজা, পিতা-পুত্র, বড়ভাই-ছোটভাই, স্বামী-স্ত্রী, এবং বন্ধু-বন্ধু। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একেবারে শেষোক্তটি ছাড়া অন্য কোথাও পাল্লা সমান-সমান নয়। বস্তুত ওঁর নীতির মূলে সাম্যের কথা নেই। বড়-ছোট সম্পর্ক মেনে নিয়েই তিনি

বলেছেন উভয়েই উভয়ের কর্তব্য করে যাবে। এর মধ্যে রাজা-প্রজার সম্পর্কটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কনফুশিয়াসের হাজার বছর আগে থেকেই সমাজে প্রধান তিনটি স্তর ছিল : প্রথমত শাসকশ্রেণী, যাদের নাম 'শতনাম' (পাই-সিঙ), দ্বিতীয়ত সাধারণ মানুষ—কৃষক, মজদুর প্রভৃতি, যাদের বলা হল 'মিন'। এছাড়া ছিল দাস। কনফুশিয়াস এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চান নি, চেয়েছিলেন একটা সমঝোতা; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য করে যাবে, বাড়াবাড়ি করবে না। রাজা দেশ শাসন করবার যে অধিকার পেয়েছেন সেটা কোনো পার্থিব ঘটনা পরম্পরায় নয়, ঈশ্বরের নির্দেশে। তিনি যদি প্রজানুরঞ্জক হয়ে সুশাসন করেন তবেই মঙ্গল, তবেই তিনি তাঁর অধিকারের মধ্যে আছেন। সেক্ষেত্রে প্রজাদের উচিত তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। কিন্তু রাজা যদি স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী এবং অন্যায়কারী হন তখন ঈশ্বরের নির্দেশেই প্রজারা তাঁকে গদিচ্যুত করতে পারে; যেমন করেছিল একবার শ্যাঙ-বংশের শেষ অত্যাচারী রাজাকে। সুতরাং রাজার রাজ্যশাসনের অধিকার বর্তাবে তাঁর নিজেরই নৈতিক শুভবুদ্ধিতে।

ঠিক একই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে মানুষে মানুষে অন্যান্য সম্পর্ক। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, বড়ভাই ছোটভাই। প্রতিটি পরিবার যেন ছোট ছোট এক রাজ্য—রাজা-প্রজার সম্পর্ক। এই নৈতিক-বন্ধনের মূল নীতিতেই গড়ে উঠল রাজনৈতিক শাসন-কাঠামো।

রাজা থাকবেন রাজধানীতে, সমগ্র দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসাবে; কিন্তু তাঁর নৈতিক চ্যুতি বরদাস্ত করা হবে না। রাজার অধীনে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী—তিনিই ব্যুরোক্রেসির সর্বোচ্চ ধাপে। বিভিন্ন প্রদেশে রাজার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুরা থাকবেন রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে। প্রজারা কর দেবে, বেগার দেবে, রাজা তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান যথাসম্ভব করবেন।

কনফুশিয়াস ঐ নীতিপুস্তক ছাড়াও রচনা করেছিলেন আরও কতকগুলি গ্রন্থ—'শ্যাঙ-বংশের ইতিহাস', 'বসন্ত ও হেমন্তের গাথা' (তিন শতাব্দীর চৌ-রাজবংশের ইতিহাস) এবং 'সঙ্গীত সংকলন'। শেষোক্ত গ্রন্থে তিন-হাজারটি সঙ্গীত সঙ্কলিত। গানগুলি সব যে কনফুশিয়াস নিজে রচনা করেছিলেন তা নয়, বিভিন্ন লোকগাথা সংকলন করেছিলেন তিনি ঐ গ্রন্থে। এটিই চীনের প্রাচীনতম সঙ্গীত পুস্তক। তার ভিতর শ'তিনেক বাছা বাছা গান নিয়ে একটি সংকলন চীনে বহুদিন প্রচলিত ছিল। দু-একটি উদাহরণ দিলে তার সুরটা বোঝা যাবে। বঞ্চিতকে আত্মসন্তুষ্ট হতে বলছেন কবি :

"এই অনাড়ম্বর দরজার পাশে
শান্তিতে কাটিয়ে দেব জীবনটা ;

এই প্রবহমান ঝরনার-ধারটিতে
ক্ষুধাকে অস্বীকার করতে পারি সানন্দে।
মাছের ঝোল চাই? ভাল কথা,
কিন্তু ইলিস ছাড়া আর কিছু কেন রুচবে না?
সংসারী হবে? বিয়ে করবে? ভাল কথা.
কিন্তু রাজবাড়ির সুন্দরী রাজকন্যা খুঁজছ কেন?"[১]

বঞ্চিত মানুষকে আত্মসন্তুষ্ট হবার উপদেশ দিয়েও কবি কিন্তু অন্তরে ক্ষুব্ধ। জগৎ-ব্যবস্থায় অনাচার, অত্যাচার তাঁকে পীড়া দেয়—ক্ষমতাশালীদের দুর্ব্যবহারে, নৈতিক চ্যুতিতে তিনি মর্মাহত। মুক্তির উপায় তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। সক্ষোভে বলছেন:

"সর্বশক্তিমান হে নিঃসীম আকাশ,
কল্যাণবর্ষণে কেন এত কৃপণতা তোমার?
দুইহাতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বর্ষণ করে চলেছ
মৃত্যু আর দুর্ভিক্ষ---দলিত মথিত করছ আমার স্বদেশকে!
হে অনন্ত মহিমময়! তোমার এ বিশ্বশাসনে
এত ঔদাসীন্য কেন, কেন এত বিশৃঙ্খলা?
প্রকৃত অপরাধীর প্রতি তুমি উদাসীন, আনমনা,
শুধু নিরপরাধকে ডুবিয়ে দিচ্ছ যন্ত্রণা-পঙ্ককুণ্ডে।
হে শক্তিমান প্রভু!
সততার ললিতবাণীতে কেন ঐ রাজশক্তি বধির?
উদ্দেশ্যহীন একক যাত্রীর মত একান্তসঞ্চারী?
শাসনদণ্ড তুলে দিয়েছ যাদের হাতে
তাদেরও শেখাও আত্মশাসনের মন্ত্র;
প্রজাকে ভয় না করলেও
তাদের শেখাও তোমাকে ভয় করতে!"[২]

কন্‌ফুশিয়াসের তিন হাজার কবিতার মধ্যে মাত্র দুটিকে আমরা বেছে নিয়েছি। একটি 'নাস্তি' দলের প্রতি, একটি 'অস্তি'দলের উদ্দেশ্যে। দুটি কবিতাই শেষ হয়েছে কবির প্রশ্নে, যার জবাব তিনি জানতেন না। সে দুটি প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব খুঁজে পেতে পাঠকের আড়াই হাজার বছর সময় লাগল; সামগ্রিকভাবে বুঝতে শিখল—ক্ষুধাকে অস্বীকার করায় কোনো মাহাত্ম্য নেই, এবং ন-মাসে ছ-মাসে ইলিস মাছের ঝোল খেতে চাওয়াও কোনো অপরাধ নয়! ওরা বুঝতে শিখল—

শাসক যখন হয় শোষক তখন উর্ধ্বমুখে আকাশকে গাল পাড়লে সমস্যার সমাধান হয় না!

চী'ন সাম্রাজ্যঃ আগেই বলেছি সাতটি সামন্ত রাজ্য ক্রমশঃ শক্তিমান হয়ে উঠছিল চীনের এক এক প্রান্তে: চী, চু, ঈয়েন, চী'ন, হান, চাও এবং উঈ। এদের ভিতর খ্রী: পূ: তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ চী'ন-সামন্তরাজ য়িং চেঙ্ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। একে একে বিরোধী সামন্তরাজদের পরাভূত করে তিনি এসে বসলেন মহাচীনের কেন্দ্রীয় সিংহাসনে, পূর্ববর্তী চৌ-বংশের সমাপ্তি ঘোষণা করে। নূতন রাজবংশের নাম হলো 'চী'ন-বংশ'। সম্রাট সিংহাসনে উপবেশন করে গ্রহণ করলেন নূতন খেতাব: শী হোয়াঙ তি, অর্থাৎ চীনের প্রথম সম্রাট। খ্রীষ্টপূর্ব ২২১ সালে।

স্বল্পকাল শী আসীন ছিলেন চীনের সিংহাসনে, কিন্তু তার ভিতরেই অনেক কিছু করে গিয়েছিলেন তিনি—ভালো ও মন্দ। ওঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো উত্তরাঞ্চলের দুর্ধর্ষ হুণদের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা। মঙ্গোলিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল থেকে প্রতি-দশকে দু-তিন বার করে হুণ আক্রমণ ছিল চীনের নিয়তি। অশ্বারোহী হুণ সৈন্য ছিল পদাতিক চীনা বাহিনীর কাছে অপ্রতিরোধ্য। ঝড়ের বেগে চীনের সম্পদশালী উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করত আর বিদ্যুদ্‌গতিতে ধনসম্পদ লুট করে ফিরে যেত তাদের মরু-আবাসে। শান্ত সমৃদ্ধ জনপদ বারে বারে শ্মশান হয়েছে তাদের অত্যাচারে। সিংহাসনে উঠে এটা বন্ধ করাই হলো শী হোয়াঙ-তির প্রথম কাজ। ওঁর প্রধান সেনাপতির অধীনে তিন লক্ষ সৈনিকের এক বিরাট বাহিনী তিনি হুণ-আক্রমণ প্রতিহত করতে নিয়োগ করলেন। সেনাপতি সাফল্যলাভ করলেন। সেবার হুণেরা ফিরে যেতে বাধ্য হলো। সম্রাট কিন্তু এ সাময়িক সাফল্যে সন্তুষ্ট না হয়ে এক চিরস্থায়ী সমাধান চাইলেন। ফলে, তাঁরই হুকুমে সমস্ত উত্তরাঞ্চল বরাবর গেঁথে তোলা হলো বিরাট এক প্রাচীর: চীনের প্রাচীর! এর সমস্তটা অবশ্য শী হোয়াঙ-তির আমলে তৈরি করা হয় নি, তবু তিনিই বস্তুত চীনের প্রাচীরের ভগীরথ, যে প্রাচীর প্রাচীন-বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। দৈর্ঘ্যে তা চৌদ্দশ' মাইল—অর্থাৎ বাঙলা থেকে পঞ্জাব, উচ্চতায় পনের থেকে ত্রিশ ফুট এবং পাঁচিলের উপর পনের ফুট চওড়া রাস্তা, প্রতি দুশ' গজ তফাৎ-তফাৎ পর্যবেক্ষণ-গম্বুজ।

দক্ষিণ দেশ জয় করতেও পাঠানো হলো আর একটি বিরাট বাহিনীকে। একে একে মাথা নত করল সব সামন্ত রাজ্য। সম্রাট বললেন, তিনিই হচ্ছেন চীনের প্রথম সম্রাট; তাঁর পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্ররা হবেন যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ সম্রাট—এই ভাবে চলবে অনন্তকাল পর্যন্ত। নানা ভাবে শাসন-সংস্কার করলেন,

মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করলেন, ওজন-দৈর্ঘ্য-ক্ষেত্রফলের মাপকাঠিগুলির সমতাবিধান করলেন। ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের আশঙ্কায় সাধারণ মানুষের যা-কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হলো। শুধু তাই নয়, প্রগতিশীল ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে যা কিছু প্রাচীন গ্রন্থ ছিল সব পুড়িয়ে ফেললেন। শুধু বাদ দিলেন—ভেষগ্‌শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ বা বিজ্ঞানের বই। অর্থাৎ পুড়িয়ে দেওয়া হলো প্রাচীন ইতিহাস, লোকগাথা, এবং কনফুশিয়ান্-ধর্মের গ্রন্থ। বহু কনফুশীয় পণ্ডিতকে নিহত কিংবা বন্দী করা হলো।

কিন্তু এত করেও সম্রাট যা চাইছিলেন তা হলো না। মাত্র দ্বাদশ বর্ষের ভিতরেই, প্রথম সম্রাটের মৃত্যুর বছর না ঘুরতেই শোনা গেল মহাকালে ডম্বরুনিনাদ: প্রজা বিদ্রোহ!

খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬ সালে নির্মূল হয়ে গেল শী হোয়াঙ-তি প্রতিষ্ঠিত এত সাধের সেই চী'ন রাজবংশ। বিদ্রোহ করল প্রজারা কিন্তু নেতৃত্ব দিল একজন সেনাপতি। তারই প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হলো আবার। গেল চী'ন এরা, এল হান-রাজ বংশ।

কিন্তু এবারের এই রাষ্ট্র বিপ্লবটাকেও আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখা দরকার:

চী'ন আমলের প্রজা বিদ্রোহ: খ্রীষ্টপূর্ব ২০৯ সালের কথা। তার মানে আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে ততদিনে সম্রাট অশোক গত হয়েছেন, মৌর্য-সাম্রাজ্য অস্তমিত হচ্ছে অথচ পুষ্যমিত্র শুঙ্গের অভ্যুত্থান তখনও ঘটে নি।

চীনের সিংহাসনে শী হোয়াঙ-তি-র পুত্র দ্বিতীয় সম্রাট তখন আসীন। ইয়াঙ-সিকিয়াঙ-এর মোহনার কাছাকাছি আনহোয়েই রাজ্য থেকে প্রায় হাজার খানেক বন্দীর একটি বাহিনীকে নিয়ে আসা হচ্ছিল রাজধানীর দিকে। ওরা কোনো বিদ্রোহ করে যুদ্ধে বন্দী হয় নি—ছিল নির্বিরোধী চাষী। সম্রাটের আদেশে ওদের বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মজদুর ঘাটতি মেটাতে। দ্বিতীয় সম্রাট তাঁর পূজ্যপাদ স্বর্গত পিতার একটি বিরাট সমাধি মন্দির তৈরি করাচ্ছিলেন, তার বেগার দেওয়ার লোকের অভাব। তাই এই ব্যবস্থা।

প্রহরী বেষ্টিত বন্দীরা পদব্রজে চলেছে উত্তরমুখো। দিবারাত্র হাঁটতে হয় ওদের। নির্দিষ্ট দিনে রাজধানীতে উপনীত হতে না পারলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বেচারীদের। হঠাৎ পথে হলো প্রবল বর্ষণ। ওরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো একটি গ্রামে। দু'দিন পরে বৃষ্টি থামল। পথ কর্দমাক্ত, দুর্গম। তবু রওনা হলো ওরা; কিন্তু শুনল, আইন বলছে এক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। অন্তত আইনের খাতিরে দলপতি দুজনকে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েই প্রাণ দিতে হবে। কৃষক দলের দলপতি দুজন হচ্ছেন চেন শেঙ এবং উ কুয়াঙ, ওদের সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়। রাতারাতি বন্দীরা স্থির করল এ অত্যাচার ওরা মানবে না। প্রহরী-

সর্দার ওদের অবাধ্যতায় রুষ্ট হয়ে একজনকে তরবারির আঘাত করা মাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে গেল বন্দীরা। লাঠি-সোঁটা, পাথর নিয়ে আক্রমণ করল প্রহরীদের। মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল অত্যাচারী প্রহরী দল। চেন আর উ বিদ্রোহ করলেন। যে গ্রামে ওরা রাত্রিবাস করছিল সেই গ্রামবাসীও যোগ দিল। ওদের সঙ্গে সদলবলে ওরা চলল পশ্চিমমুখো। মাস খানেকের ভিতরেই চেন আর উ-র দলে বিদ্রোহীর সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার অশ্বারোহী আর দশ-বিশ হাজার পদাতিক। গোটা আনহোয়েই প্রদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করল, সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিল পার্শ্ববর্তী হোনান প্রদেশ। সম্রাটের এক সেনাপতি চাও ওয়েন এই সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। দ্বিতীয় সম্রাট সমূহ বিপদ বুঝে স্থগিত রাখলেন পিতৃদেবের সমাধি মন্দির নির্মাণের কাজ। আত্মরক্ষার্থে সচেতন হলেন তিনি। বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করল। দক্ষিণাঞ্চলের ছয়-ছয়টি প্রদেশ যোগ দিল বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে। চেন আর উর যুগ্মনেতৃত্বে এই বিরাট বাহিনী অতঃপর চলল রাজধানী দখল করতে।

কিন্তু এত করেও কিছু হল না। ভারতবর্ষে মীরজাফর, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদেরা জন্ম নিতে পারে আর চীনে পারে না? ঐ ছয়টি প্রদেশকর্তার ষড়যন্ত্রে চেন আর উ হলেন বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। একে একে শহীদ হলেন তাঁরা। যুগ্মনেতা হত হলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের ঠেকানো গেল না। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিয়ে যুগ্ম-নেতার সহকারী লিউ পাঙ সসৈন্য রাজধীতে উপনীত হলেন। শী হোয়াঙ-তির বজ্র-বাঁধনে-বাঁধা রাজত্ব হস্তান্তরিত হয়ে গেল। লিউ পাঙ হলেন চীনের নূতন সম্রাট। যেহেতু পাঙ ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলের (শেংসি প্রদেশের সেই শিয়াঙ অঞ্চলের) লোক তাই এই নূতন রাজবংশের নাম হল পশ্চিমী হান বংশ।

সবই হল, কিন্তু কিছুই হল না। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে জিতল, রাজধানী দখল করল, সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করল—কিন্তু কই সাধারণ মানুষের তো কিছু লাভ হল না? ছিল 'চীন সাম্রাজ্য', হল 'হান-সাম্রাজ্য'! নতুন সম্রাট অনেক ভালো ভালো কানুন করলেন—যাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের তা ফেরত দেওয়া হল, ওদিকে আবার যারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তাদের ক্ষমাও করা হল, দুর্ভিক্ষে আর অজন্মায় যারা দাসখৎ লিখে দিতে বাধ্য হয়েছিল তাদের বিনামূল্যে মুক্তি দেওয়া হলো, বেগার দেওয়ার আইন রুদ্ধ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তেমন কিছু পরিবর্তন হল না সারা দেশে। প্রাচীন চীনের সেই তিনধাপ সমাজ,—অভিজাত, সাধারণ মানুষ আর দাস—যা ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে —মিল মালিক, ব্যবসায়ী, পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবী, ব্যুরোক্রেসীর বিভিন্ন ধাপ—তা অব্যাহত রয়ে গেল। মহাকালের রথচক্র এগিয়ে চলল একই ছন্দে।

হান সাম্রাজ্য ঃ পূর্ববর্তী চৌ-বংশের মতো হান-যুগকেও দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। পশ্চিমী হানদের রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ২০৬ থেকে ২৪ খ্রীষ্টাব্দ। আর পূর্বদিয়া হানদের সময়কাল ২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২২০ খ্রীষ্টাব্দ। একুনে মোটামুটি চারশ' বছর।

এই চারশ বছরে লড়াই কাজিয়া অনেক হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের না জানলেও চলবে। শুধু দু-একটি রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করব। প্রথমত, চীনের প্রাচীরের অস্তিত্ব সত্ত্বেও এই আমলে বারে বারে মঙ্গোলিয়া অঞ্চল থেকে হূণ আক্রমণ হয়েছে। হান-সম্রাটকে ক্রমাগত তা প্রতিহত করতে হয়েছে। বস্তুত চীনের ইতিহাসে শাশ্বতকাল ধরে দেখছি চারটি দুর্দৈব ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে আসছে—পীত-নদীর বন্যা, অজন্মা-জনিত দুর্ভিক্ষ, পঙ্গপাল আর ঐ হূণেরা। হান-সম্রাট পশ্চিমাঞ্চলের অর্থাৎ উত্তর-তিব্বতের তারিম নদীর-অববাহিকাস্থিত সামন্ত-রাজ্যগুলির সঙ্গে হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করলেন। অশ্বারোহী-হূণদের প্রতিহত করতে বিরাট এক অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করলেন। তারিম নদীর অববাহিকায় যে সব জনপদ ছিল তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের, পারস্যের এবং গান্ধারের যোগাযোগ ছিল অনেকদিন আগে থেকেই। ফলে যদিচ রাজনৈতিক কারণে হান-সম্রাট ঐ অঞ্চলবাসীর সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করলেন, কিন্তু ঐ পথেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি হলো। চীনের সিল্ক রপ্তানি বাড়ল। ভারতীয় দর্শন, চিত্রকলা, চীনে অনুপ্রবেশ করল। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

দ্বিতীয়ত ১৭ খ্রীষ্টাব্দের লুলিন বিদ্রোহ এবং তার পরের 'রক্ত-ভ্রূ' বিদ্রোহ।

লুলিন একটা পাহাড়ের নাম। হুপেই প্রদেশে। সে বছর অজন্মায় ঐ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল। ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসীরা দুজন নেতার নেতৃত্বে ঐ লুলিন পাহাড়ে সমবেত হলো। ওরা বিদ্রোহ করবে। যাদের গোলায় ধান আছে তাদের গোলা লুট করবে! বোধকরি এখানে চীনের সঙ্গে ভারতের 'জীবন-ধাতুতে' কিছু পার্থক্য আছে। বাঙলা দেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে গ্রামবাসীদের বিনা প্রতিবাদে হাজারে হাজারে মরে যেতে দেখেছি; অথচ চীনে দেখছি ওরা যুগে যুগে রুখে দাঁড়িয়েছে।

লুলিন-বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সম্রাটকে বধ করে রাজধানীর শস্যভাণ্ডার লুট করে নিয়েছিল ওরা। কিন্তু রাজতন্ত্রের তাতে কোন মৌলিক পরিবর্তন হল না। পশ্চিমী হান বংশের বদলে চীনের সিংহাসনে এসে বসল পূর্বদিয়া হান-বংশ।

লুলিন-বিদ্রোহের প্রায় সমসময়েই ঘটেছিল 'রক্ত-ভ্রূ' দলের বিদ্রোহ। তার দল-

পতি ছিলেন ফান চুঙ। কারণ একই : দুর্ভিক্ষ ও অজন্মা। লুলিনরা এসেছিল হুপেই প্রদেশ থেকে,—ইয়াঙ সিকিয়াঙ-এর উত্তর পার থেকে; আর রক্ত-ভ্রূ-অভিযান রাজধানীর দিকে এসেছিল শানতুঙ অঞ্চল থেকে, অর্থাৎ পীতনদীর মোহনার কাছাকাছি থেকে। লুলিন বাহিনীর মধ্যে তেমন শৃঙ্খলা ছিল না, বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীদলে ছিল নানান জাতের লোক, অপরপক্ষে রক্ত-ভ্রূ দলের পিছনে ছিল সুনির্দিষ্ট বিপ্লবাত্মক নীতি। ওরা ভ্রূর উপরে লালরঙের একটি দাগ দিয়ে নিজেদের সনাক্ত করত বলেই ওদের এই অদ্ভুত নাম—রক্ত-ভ্রূ দল। মোটকথা এই উভয়বিধ বিদ্রোহের ফলে রাজবংশের পরিবর্তন হলো। পশ্চিমী হানদের বদলে প্রতিষ্ঠিত হলো পুরবিয়া হান বংশ।

হান রাজত্বকালে আরও একটি প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল যার উল্লেখ এই সঙ্গে করে রাখা ভালো। সেটা ১৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা, অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে সুঙ্গ-বংশ এবং কুশান-বংশ অস্তমিত হয়েছে—উজ্জয়িনীতে শক-ছত্রক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সময়ে হুপেহ প্রদেশ থেকেই চাঙ চিয়াও-এর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী এসেছিল রাজধানী দখল করতে। ওদের দলকে ইতিহাসে বলা হয় 'হলুদ-পাগড়ির দল'। কারণ বিদ্রোহীরা নিজেদের সনাক্ত করতে হলুদ রঙের পাগড়ি পরত। দীর্ঘ দশ বছর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার চালিয়ে চাঙ তাঁর সংগঠন গড়ে তোলেন। স্থির হয় ১৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ সারা দেশে অভ্যুত্থান হবে; কিন্তু চাঙ-এর এক অনুচর আগে-ভাগে সংবাদটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ কিছু দলপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। চাঙ সুকৌশলে আত্মগোপন করেন এবং অভ্যুত্থানের দিন পরিবর্তন করে নূতনভাবে চেষ্টা করেন। সারা দেশে অভ্যুত্থান হলো—থানা সরকারী অফিস দখল করে নিল বিদ্রোহীরা। বহু অত্যাচারী সরকারী কর্মচারী হতাহত হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চাঙ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আরব্ধ কাজ শেষ হবার আগেই মারা যান। বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেল।

হান-আমলে চীনা-সংস্কৃতি : হান-আমলের ঐ তিন চারশ' বছরে ইতিহাস-সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানের অগ্রগতিটা এবার পরখ করতে হয়। এই যুগে হান-সম্রাট উতির আমলে যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট উতি তাঁর অধীনে একটি 'সঙ্গীত-মন্ত্রক' পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেন, যার কাজ ছিল লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করা, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের উৎসাহ দেওয়া। খ্রীষ্টজন্মের একশ' বছর আগেই দেখছি, চীনের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পুঁথির সংখ্যা পনের হাজার। মনে রাখতে হবে তখনও কিন্তু কাগজ আবিষ্কৃত হয় নি, ফলে ঐ সংখ্যাটি বড় কম নয়। আর একটি খতিয়ানে দেখছি, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সরকারী অর্থে পরিচালিত বিদ্যায়তনে হাজার ত্রিশেক ছাত্র পড়ছে; নিঃসন্দেহে এ ছাড়াও ছিল যথেষ্ট সংখ্যক বেসরকারী বিদ্যাপীঠ। ঐতিহাসিক সুমা চিয়েন ছিলেন সম্রাট উতির

রাজসভার সরকারী ঐতিহাসিক। রাজনির্দেশে তিনি একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন, অনেকটা আমাদের কলহনের রাজ-তরঙ্গিণীর মতো। তফাৎ এই যে, সুমা চিয়েন-এর গ্রন্থ অনেক ব্যাপক ও অনেক বৃহৎ। পৌরাণিক যুগ থেকে প্রায় তাঁর সমসময় পর্যন্ত গোটা চীনের ইতিহাস সঙ্কলন করেন তিনি, শব্দ সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। এমন প্রামাণিক বৃহৎ ইতিহাস ভারতবর্ষে রচিত হয় নি—রাজত-রঙ্গিণী গোটা ভারতের কথা বলে না, বলে শুধু কাশ্মীর রাজবংশের কথা। আরও লক্ষণীয়—রাজ-নিযুক্ত সুমা চিয়েন রাজপরিবারের ও রাজকর্মচারীদের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তিরস্কার করতে কুণ্ঠিত হন নি; এমন কি চৌ-আমলের সেই বিদ্রোহী চেন শেঙকে তিনি বীর ও শহীদ বলে বর্ণনা করেছেন। এই বৃহদায়তন ইতিহাসের ভাষাও নাকি এক সাহিত্য-সম্পদ। সুমা চিয়েন ঐ ইতিহাস রচনার কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থ শেষ করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্যান পরিবার। পিতা প্যান পিয়াও এবং পুত্র প্যান কু লেখেন অনেকখানি এবং শেষ করেন প্যান কু-র ভগ্নী শ্রীমতী প্যান চাও। ইনিই প্রাচীন চৈনিক ইতিহাসের সবচেয়ে নাম করা মহিলা পণ্ডিত।

ইতিহাসের পরে কাব্য-সাহিত্য। প্রথমেই মনে পড়ছে ঐ প্যান পরিবারের আর একটি মহিলার কথা। তাঁর নাম প্যান চি-উ। তিনি ছিলেন সম্রাট চেঙ-এর হারেমে আবদ্ধ সম্রাটেরই এক উপপত্নী। প্যান কু এবং প্যান চাওয়ের দূর সম্পর্কের এক ঠাকুমা। বিপুল বৈভবের মধ্যে জীবন কেটেছে তাঁর, কিন্তু শান্তির সন্ধান পান নি প্যান চি-উ। কারণ তিনি ছিলেন বস্তুত এক মহিলা কবি—অন্য জগতের বাসিন্দা। সৌন্দর্যই শত্রুতা সাধন করেছিল তাঁর, সামান্য কোনো চীনার ঘরণী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন। হারেমের একান্তে যে সব কবিতা লিখে গেছেন এই মহিলা কবি তা তাঁর অন্তর-নিঙড়ানো আর্তি। বিষয়বস্তু হয়তো সামান্যই কিন্তু তার ব্যঞ্জনাটা মর্মস্পর্শী। ধরা যাক্ সিল্কের হাত-পাখার উপর লেখা তাঁর ছোট্ট কবিতাটি :

"সাদা সিল্কের একটা টুকরো ; 'চী'-রেশমের ;
নিষ্কলুশ নির্মল একমুঠো জমাট-তুষার যেন।
গোল করে কাটা, পূর্ণিমার চাঁদের মত নিটোল ;
ওর পরিচয় : ও হাত-পাখা।
আমার প্রভুর হাতে ওকে নিত্য দেখি—
ডাইনে হেলছে, বাঁয়ে দুলছে, গরবিনী গোরি !
খুশিয়াল করে তুলছে প্রভুকে শীতল বাতাসে।

বেচারি ! ও জানে না—নিদাঘ-দিন নিঃশেষিত প্রায় ;
শরৎ এসে গেছে, দুরন্ত শীত দাঁড়িয়ে আছে বাহির-দ্বারে—
ও জানে না—ওর অসমাপ্ত সোহাগের খেলা
শেষ হয়ে এল বলে ! ওর অনিবার্য পরিণাম :
দেরাজের উপেক্ষিত অন্ধকারে দিনযাপন ![৩]

পড়তে পড়তে সন্দেহ জাগে, হাত-পাখার দিকে তাকিয়ে ঐ কবিতা লিখেছিলেন উনি, না কি হাত-আয়নার দিকে তাকিয়ে ?

এই আমলের কাব্য-গাথা হচ্ছে 'গোপালক ও তন্তুবায় কুমারীর কাহিনী'—অনেকটা আমাদের রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কথা। তফাৎ এই যে, চীনা-কৃষ্ণ রাখাল হলেও চীনা-রাধা ছিলেন তন্তুবায় পরিবারের কুমারী-কন্যা। আর ওঁদের প্রেমের পথে মূল বাধাটা শাশুড়ী-ননদিনী বা সমাজ নয়, সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার। আর একটি লোক-রঞ্জক গাথার নাম 'ময়ূরেরা উড়ে যায় দখিনে।'

কবি চিন চিয়া-র কথা বলি। স্ত্রীকে লেখা একটি কবিতায় পাচ্ছি মেঘদূতের বিরহী-যক্ষের প্রতিচ্ছবি। কবিকে রাজাদেশে ভিন্‌দেশে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে প্রোষিতভর্তৃকা কবিপ্রিয়াকে চিঠিতে লিখছেন :

"পুরুষমানুষের জীবন—যেন ভোরবেলাকার শিশির :
দুর্ভাগ্য তার নিত্য-সহচর, বিরহ-বেদনা তার নিত্যসাথী।
মধুর-মিলন মুহূর্ত—সে তো সুদুর্লভ প্রাপ্তি।
শুনলাম—রাজাদেশে যেতে হবে ভিন্‌দেশে,
দূরে, আরও দূরে, তোমার সঙ্গে ব্যবধান দীর্ঘতর ক'রে।
পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার রথ
যাবার আগে একবার তোমাকে দেখব বলে।
গেল শূন্যগর্ভ, ফিরেও এল রিক্ত-শকট।
রিক্ত নয়। এল তোমার হৃদয় নিঙড়ানো লিপি।
আহারে আজ আর রুচি নেই,
একা পড়ে আছি শূন্য-মন্দিরে।
ত্রিযামা যামিনী যায় বিনিদ্র যন্ত্রণায়।
উপাধানটা নিষ্পেষিত, বিপর্যস্ত।
বেদনা যেন বৃত্তাকার, তার চক্রাবর্তনের শেষ নেই।
মাদুরের মত তাকে গুটিয়ে শেষ করা যায় না।"[৪]

সহজ-সরল বক্তব্য, যদিও ভাষাটা সে-আমলে ছিল ক্লাসিকাল। কবি তাঁর

পত্রের শেষ দিকে প্রেয়সীকে লিখছেন :

> "পড়ে আছে মাথার কাঁটাটা, যা এতদিন মুখ লুকাতো তোমার খোঁপায়,
> পড়ে আছে আয়নাটা, যা এতদিন ছবি আঁকতো তোমার মুখের,
> অমূল্য সম্পদ এরা নয়,
> তবু এরা নয় অকিঞ্চন,
> এদের মধ্যেই আছে তোমার স্পর্শ
> আর আমার আকিঞ্চন।"[৫]

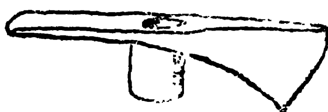
এ-যেন চীনাভাষায় শ্যামলীর পংক্তি 'চলতি মুহূর্তের খসে-পড়া উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা, তার মূল্য ছিল তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে।'

তফাৎ এই যে, চীনা-যক্ষের কবিপ্রিয়া স্বয়ং ছিলেন মহিলা-কবি। আর তাঁর প্রত্যুত্তরটিও দ্বিসহস্রাব্দীকাল ধরে টিকে আছে। প্রত্যুত্তরে কবিপ্রিয়া শেষদিকে লিখছেন :

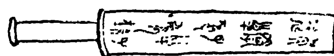
> "তোমার মুখখানা মনে পড়ছে কেবল।
> জাগরণে, নিদ্রায়, স্বপ্নে।
> বার বার মনে পড়ছে : তুমি চলে গেছ।
> মনে হচ্ছে, সে যেন কত যুগ-যুগান্তর।
> যদি ডানা থাকত একজোড়া
> উড়ে চলে যেতাম তোমার কাছে।
> এখন দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজলই আমার সম্বল।[৬]

মেনে তো নিতে পারছি না : চীনা প্রেমের জাতটা আলাদা, ধাতটা পৃথক!

কাব্যসাহিত্যের প্রসঙ্গ বন্ধ করে অন্যান্য চারু ও কারুশিল্পের সন্ধান নেওয়া যাক এবার। নর-বানরের বংশাবতংস যখন 'হোমোস্যাপিয়ান' আখ্যা প্রথম পাচ্ছে,



চিত্র ২ক
সিন্ধু-সভ্যতায়, হড়প্পায় প্রাপ্ত কুঠার



চিত্র ২খ
চীনে আবিষ্কৃত সমসাময়িক তরবারি

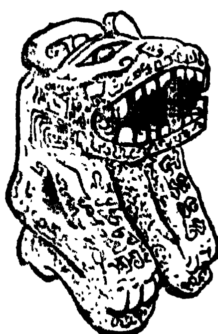
অর্থাৎ মানব-জীবনের উষাযুগ থেকেই দেখছি, অধরাকে ধরবার এক উদগ্র বাসনা তার মধ্যে জেগেছে, যার স্ফূরণ লক্ষ্য করেছি স্পেনের আলতামেরা গুহায়, আফ্রিকার থর্ন-নদীর অববাহিকায় বা পৃথিবীর অন্যান্য প্রত্যন্তদেশে। চীন ও ভারতেও রয়ে

গেছে তার স্বাক্ষর। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দুটি 'কেজো'-জিনিস-এর নিদর্শন এখানে উপস্থাপিত করছি—একটি পাওয়া গেছে সিন্ধু উপত্যকায়, হড়প্পায়, দ্বিতীয়টি চীনে। দুটিই কাজের জিনিস; এবং দুটি অস্ত্রের গায়েই খোদাই করা দুর্বোধ্য হরফ। হড়প্পায় শিল্পী কী বলতে চেয়েছেন তার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নি; চৈনিক শিল্পী ব্রোঞ্জের তরবারিতে যা লিখেছেন তার অনুবাদ: 'উ কি-ৎসির পুত্র চেঙ-এর শাশ্বতকালের অস্ত্র'। দুটিই খ্রীষ্টজন্মের দেড়-দু-হাজার বছর আগেকার। দুটিই লোহা-আবিষ্কারের পূর্বযুগের। ব্রোঞ্জের অস্ত্র। এই 'কেজো' জিনিস দুটিকে 'সুন্দর' করে তোলার কোনো প্রচেষ্টা দেখি না কিন্তু (চিত্র—২ক ও ২খ)।

সেটা নজরে পড়ছে পোড়ামাটির তৈজসে—চীনে এবং ভারতে। আধেয়কে ধারণ করাই এখানে আধারের শেষ কথা নয়, তার বহিরাবরণের আলিম্পন বলতে চাইছে, মানুষ শুধু খেয়ে পরে বাঁচলেই খুশী নয়, সে সুন্দর ভাবে বাঁচতে চায়।

তারপর শিয়া ও শ্যাঙ যুগের শিল্প-নিদর্শন। শ্যাঙ-সম্রাট সিয়াওতুঙ-এর সমাধি-স্থলে প্রাপ্ত রাক্ষসমূর্তিটিকে (চিত্র-৩ক) লক্ষ্য করে দেখুন: ওর কান নেই, ও বধির; আবেদন-নিবেদন অনুনয়-বিনয় ওর কর্ণগোচর হয় না। দানবটার চোখ মাত্র একটি—হোমার বর্ণিত সাইক্লোপ দৈত্যের মতো সে 'একদৃষ্টি'! ওর পরিদৃশ্যমান জগতে তাই নিকট-দূর বলে কিছু নেই—সবই এক সমতলে, খাদ্য-খাদকের সমতল! সর্বাঙ্গে তার একটাই ব্যঞ্জনা: ক্ষুধা! বিশ্বগ্রাসী মুখব্যাদানটাই নজরে পড়ে শুধু।

তুলনা করুন এর সঙ্গে হড়প্পায়-প্রাপ্ত বানরের মূর্তিটির (চিত্র—৩খ)। পঞ্জিকার



চিত্র ৩ক
শ্যাঙ যুগের প্রস্তরমূর্তি—চীনে

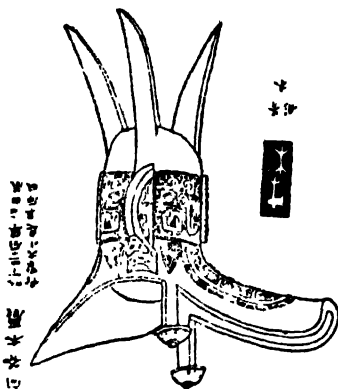


চিত্র ৩খ
হড়প্পায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি—ভারতে

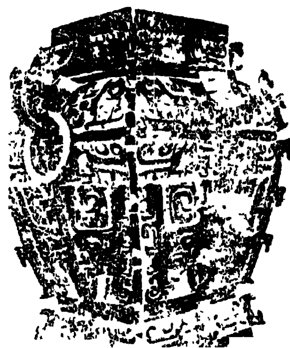
হিসাবে চীন-ভারতের এ দুটি শিল্প-নিদর্শন সমকালীন; তফাৎ এই যে, চীনা-রাক্ষস

বসেছে হাঁটু গেড়ে আর হড়প্পার বানর বসেছে উবু হয়ে। সেটা বাহ্যিক প্রভেদ। আন্তর-প্রভেদটা হচ্ছে রসের ক্ষেত্রে : চীনা-শিল্পীর মূল প্রেরণা ছিল বীভৎস-রসের পরিবশন, ভারতীয় শিল্পীর কৌতুক-রস। তাই চীনা-শিল্পী কল্পনার বল্‌গা আল্‌গা করে দিতে পেরেছেন, ভারতীয় শিল্পী 'রূপভেদ' আর 'প্রমাণ'কে অস্বীকার করেন নি।

আগেই বলেছি, তামা আর টিন গালিয়ে সিন্ধুসভ্যতায় এবং চীনারা ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র তৈরি করতে শিখেছিল বহু প্রাচীনকাল থেকে। তার গোটাদুই নিদর্শন এখানে পেশ করা গেল। প্রথমটি (চিত্র—৪ক) শ্যাঙ যুগের, দ্বিতীয়টি (চিত্র—৪খ) চৌ যুগের আদি পর্বে। অর্থাৎ এদুটিও খ্রীষ্টজন্মের হাজার বারোশ' বছর আগেকার। কী সূক্ষ্ম কারুকার্য, যেন কটকী মীনার কাজ! মনে পড়ে মহেনজো-দারোর বিখ্যাত ব্রোঞ্জের মূর্তিটি। এই প্রসঙ্গে বলব—চীনে প্রাপ্ত এ-যুগের ব্রোঞ্জ শিল্প-নিদর্শন অধি-



চিত্র ৪ক
শ্যাঙ যুগের ব্রোঞ্জের পাত্র

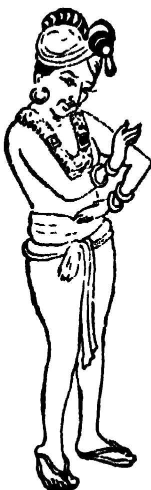


চিত্র ৪খ
চৌ-যুগের ব্রোঞ্জের পাত্র

কাংশই তৈজসপত্র। কারুকার্য যতই থাক, তার কেজো ভূমিকাটাই মুখ্য। কয়েক শ' চীনা শিল্পনিদর্শন যাচাই করে আমার তো মনে হয়েছে 'শিল্পের জন্য শিল্প' অর্থাৎ 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'-মত তখনও চীনে প্রবেশ করে নি। অপরপক্ষে মহেনজো-দারোতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ মূর্তিতে পাচ্ছি একটি নিটোল শিল্পী-মানস। এ মূর্তির কোনো 'কেজো'-ভূমিকা নেই ; অনাবৃতা নারীমূর্তির এক অঙ্গে আভরণের প্রাচুর্য, তার ভঙ্গিতে বিশ্ব-বিজয়িনীর ব্যঞ্জনা!

ঐতিহাসিক যুগে আসি এবার। চীন ও হান আমল—সেই যখন ভারতের বরাবর-পর্বতে, উদয়গিরিতে, কিংবা অজন্তার দশম ও নবম গুহায় শিল্পীরা পাথর খোদাই করছেন। ভারহুত, বুদ্ধগয়ায়, সাঁচীতে ভারতীয় শিল্পী যখন ছেনি-হাতুড়ি

চালাচ্ছেন তখন চীনা শিল্পী বসেছেন নরুন নিয়ে; পাথর নয়—পোড়া-মাটির টালির উপর আঁকছেন ছবি, খোদাই করে অথবা তুলি দিয়ে। তুলি দিয়ে আঁকা দুটি ছবি পাশাপাশি রাখি। দুটি চিত্রই সমসাময়িক। অজন্তা দশম গুহায় ছদ্দন্ত-জাতকের কাশীরাজের (চিত্র—৫ক) মুখোমুখি আমরা এঁকেছি এক চৈনিক বৃদ্ধকে (চিত্র—৫খ)[7]। উভয়ের আকৃতি, পোশাক, ভিন্নতর হলেও ওদের ব্যঞ্জনাটা অভিন্ন।



চিত্র ৫ক
'আমাকে বলতে দাও'—অজন্তা. দশমগুহা. ভারত (খ্রী: পূ: ১৫০ আ:)



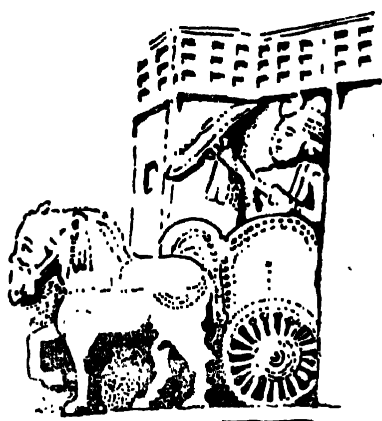
চিত্র ৫খ
'আমাকে বলতে দাও'—পোড়ামাটির কাজ, চীন (খ্রী: পূ: ১৫০ আ:)

ওরা দুজনেই শ্রোতাকে সাগ্রহে কিছু বলতে চায়। সেই বক্তব্য প্রকাশের দুর্বার ইচ্ছাটা ফুটে উঠেছে ওদের সর্বাঙ্গের দেহভঙ্গিমায়। কী বলতে চাইছে ওরা পরস্পরকে? ওরা কি এই কথাটাই বোঝাতে চাইছে: রাজনীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে—এস, আমরা শিল্পের জগতে হাত মেলাই?

চিত্র-৬-এ আমরা এঁকেছি পাশাপাশি দুটি রথ। ডাইনে সাঁচীর দক্ষিণ তোরণে উৎকীর্ণ একটি শিল্প-নিদর্শন (চিত্র—৬খ), আর বামে শানতুং প্রদেশে সম্রাট উ-র সমাধিস্থলে প্রাপ্ত একটি ভাস্কর্য (চিত্র—৬ক)। দুটিই পাথরের উপর খোদাই-করা বাস্-রিলিফ। দুটিই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর। তুলনামূলক বিচারে বক্তব্য: চৈনিক শিল্পে রেখার মিতব্যয়িতা, স্বচ্ছতা, সারল্য বিস্ময়কর; কিন্তু সেখানে ত্রি-মাত্রিক গভীরতাকে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা নেই। অপরপক্ষে সাঁচীর ভাস্কর রথারোহীকে পাথরের বুক ভেদ করে দর্শকের দিকে টেনে আনতে পেরেছেন। দ্বি-মাত্রিক প্রস্তরে ফুটিয়েছেন



চিত্র ৬ক
শানতুঙ-এ প্রাপ্ত সম্রাট উর সমাধিস্থলে
পাথরে উৎকীর্ণ রথ—চীন.
খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী



চিত্র ৬খ
সাঁচীর দক্ষিণ তোরণে পাথরে
উৎকীর্ণ রথ—ভারত.
খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী

শুধু কাব্য, সাহিত্য বা শিল্পকলাই নয়, ইতিমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। হান আমলের যুগান্তকারী ঘটনা হচ্ছে 'কাগজ-আবিষ্কার'। হাজার দেড়-হাজার বছর ধরে ওরা এতদিন লিখে এসেছে—হাড়ের উপর, কচ্ছপের খোলায়, বাঁশের গায়ে আঁচড় কেটে, পোড়ামাটি বা পাথরের উপর খোদাই করে কিংবা রেশম বস্ত্রের উপর তুলি বুলিয়ে। এতদিনে আবিষ্কৃত হল—কাগজ, ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে। আবিষ্কারকের নাম : ৎসাই লুন। দু-এক শতাব্দীর ভিতরেই তারিম উপত্যকা, খাসগড়, গিলগিট, খাইবার-পাস হয়ে সেই কাগজ এসে উপস্থিত হল ভারতবর্ষে। গেল আরবে, ব্যাকৃট্রিয়ায়, পারস্যে।

বিজ্ঞানাচার্য চাং চেঙ (চিত্র—৭) ছিলেন ৎসাই লুন-এর প্রায় সমসাময়িক। গণিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিলেন তিনি। আরও নিখুঁত পঞ্জিকা বানালেন, এবং তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর প্রথম ভূ-কম্পন নির্দেশক যন্ত্র—সিস্মোগ্রাফ্।



চিত্র ৭
বিজ্ঞানাচার্য চাং চেঙ, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী (আ:)

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদি-গুরু হচ্ছেন চ্যাঙ

চুং-চিঙ। ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আদি-গুরু চরকের সমসাময়িক তিনি, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর দুটি প্রামাণিক-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন চ্যাং। হিসাবে দেখছি, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের জনক, যিনি ছিলেন সম্ভবত কুশান-রাজ কণিষ্কের ব্যক্তিগত-চিকিৎসক, সেই চরক তক্ষশীলায় বসে চরক-সংহিতা রচনা করেছিলেন চ্যাঙ-এর 'সাং হান-লুন' গ্রন্থ-রচনায় প্রায় একশ' বছর পরে। কুশান রাজবংশ ছিল মঙ্গোলীয় 'য়ু-চি' উপজাতির। চীনের রাজ-পরিবারে বিবাহও করেছেন তাঁদের কেউ কেউ। একথা বলব না যে, চরকসংহিতাকার ঐ সূত্রে চ্যাঙ-চুং-চিঙ-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন; কিন্তু দুজনের লেখার সাদৃশ্যটা আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করুন :

চ্যাঙ তাঁর সাঙ হান-লুন (জ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম) গ্রন্থে লিখছেন :[৮]

> "ডাক্তার রোগীর চোখে দেবদূতের মতো। চিকিৎসক রোগীকে আশার বাণী শোনাবে, ভরসা দেবে, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রেরণা জোগাবে। ভরসা দেবে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকেও; কিন্তু রোগীর গুপ্তকথা কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে জানাবে না।"



চিত্র ৮ক
ভেষগাচার্য চ্যাঙ চুং-চিঙ [প্রাচীন চৈনিক-চিত্র অনুসরণে—পিকিং, চীন]



চিত্র ৮খ
ভেষগাচার্য চরক [শিল্পী রোরেরিখ্-এর চিত্র অনুসরণে—কাশী, ভারত]

এর পাশাপাশি পড়ুন চরক-সংহিতার তৃতীয় সর্গের অষ্টম শ্লোকের বঙ্গানুবাদ :[৯]

> "রোগীর গৃহে যখন উপস্থিত হবে তখন তোমার কায়মনোবাক্য এবং পঞ্চেন্দ্রিয় আর্তের প্রতি একাগ্র করবে...সে গৃহাভ্যন্তরে যা-কিছু দেখবে, শুনবে, তা কদাপি বহির্বিশ্বে আলোচনা করবে না। তাহলেই রোগী তোমাকে দেবতাজ্ঞানে তার উপসর্গের কথা অকপটে জ্ঞাপন করবে; তুমি তাকে রোগমুক্ত করে ইহলোকে অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি এবং পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকার লাভ করবে।"

পিকিং সংগ্রহশালায় রক্ষিত চ্যাঙ চুং-চিঙ-এর একটি আলেখ্য (চিত্র-৮ক) এবং কাশী কলাভবনে সংরক্ষিত শিল্পী নিকোলাস্ রোয়েরিখ্-এর আঁকা ভেষগাচার্য চরকের একটি আলেখ্য (চিত্র-৮খ) আমরা এখানে পাশাপাশি এঁকে 'হিন্দি-চীনী ভাই-ভাই'-এর এই দুই আদিসূরীকে প্রণাম জানাই।

হান-যুগের পরবর্তী কাল : হান-বংশের অবসান ঘটল ২২০ খ্রীষ্টাব্দে। তার পরের শ'-চারেক বছরে রাজশক্তি ক্রমাগত হাত বদলিয়েছে। এক-এক যুগে এক-এক সামন্তরাজা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছেন। কেউ বা সগৌরবে চীন-সম্রাটের খেতাবও গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বলতে যা বোঝায় তা গড়ে ওঠে নি ঐ চারশ' বছরের ভিতর। অনেকটা আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থা আর কি। মৌর্য-সাম্রাজ্যের অবসানে যে অবস্থা হয়েছিল এখানে। উত্তরে সুঙ্গ, শক, কুষাণেরা রাজত্ব করেছে, দক্ষিণে সাতবাহনেরা—কিন্তু কেউই প্রকৃত-অর্থে ভারত-সম্রাট নয়। দু-তিন শ' বছর পাড়ি দিয়ে আমরা পাই গুপ্তযুগের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। চীনেও তাই হয়েছিল প্রায় ঐ সময়ে। এ তিন-চারশ বছরে সেখানে লড়াই-কাজিয়া কিছু কম হয় নি ; কিন্তু সেসব বিবরণ আমাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন—আমরা বরং পরখ করে দেখি, এই ডামাডোলের বাজারে চীনা-সংস্কৃতি কোনো নূতন পদক্ষেপ করেছে কি না।

তা করেছে। কাব্য-সাহিত্যে এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানে। পঞ্চম শতাব্দীতে চীনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন একজন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত : ৎসু চাংচি। পঞ্জিকা সংস্কার করেন তিনি। তাঁর একটা বড় আবিষ্কার হচ্ছে—জ্যামিতিক বৃত্তের সঙ্গে তার ব্যাসার্ধের সম্পর্কটা হিসাব করে বার করা। যাকে আমরা গণিতের ভাষায় বলি π (পাই)। উনি একেবারে তার নিখুঁত মূল্যায়ন করেছিলেন। বলেছিলেন $\pi =$ ৩.১৪১৫৯২৬৫ ।[১০] একেবারে দশমিকের অষ্টমপাদ পর্যন্ত।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানী চ্যাং-এর জুড়ি পেয়েছিলাম তক্ষশীলাবাসী ভেষগাচার্য চরকে। এবার ৎসু চাং-এর কোনোও ভারতীয় সংস্করণ পাই না খুঁজে? কেন পাব না? ঠিক ঐ পঞ্চম শতাব্দীতেই ভারত-ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গণিত-সাগর আর্যভট্ট!

তিনিও পঞ্জিকা সংস্কার করেন একই ভাবে। আর কিমাশ্চর্যমতঃপরম! আর্যভট্টও বললেন,[১১] বৃত্তের সঙ্গে ব্যাসার্ধের সম্পর্কটা অপরিবর্তনশীল; হিসাব কষে বললেন। π = ৬২৮৩২ ÷ ২০০০০। (অর্থাৎ ৩·১৪১৬...)

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি: ৎসু চাং-এর হিসাবটা আমরা দেখিয়েছি দশমিকে, আর আর্যভট্টের হিসাব ভগ্নাংশে। ফলটা এক হলেও প্রশ্ন থেকে যায়—তবে কি আর্যভট্ট দশমিক-বিন্দুর কথা জানতেন না, যেটা জানতেন ৎসু চাং? কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। প্রামাণিক গ্রন্থে যা পেয়েছি তাই অনুবাদ করে দিয়েছি মাত্র; কারণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দশমিক বিন্দুর এ ব্যবহার পৃথিবীর কেউই জানত না।

বস্তুত দশমিকের অঙ্ক—বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্রের 'শূন্য' ভারতবর্ষই প্রথম আবিষ্কার করে। 'শূন্য-আবিষ্কার', অর্থাৎ একের পাশে শূন্য লিখে তাকে দশে পরিণত করা—স্থানমাহাত্ম্যে শূন্যের অবদান—আবিষ্কৃত হয় ভারতবর্ষেই। নিঃসন্দেহে এইটিই বিশ্বসভ্যতায় ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় দান। এ. এল. ব্যাসাম এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের কাছে পৃথিবীর যা ঋণ তার মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়। য়ুরোপ যে-সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গর্ব করে তা মূলত গণিত-শাস্ত্রের উন্নতির ফলশ্রুতি; এবং গণিত কিছুতেই এতটা ঔৎকর্ষ লাভ করত না যদি য়ুরোপ সেই রোমান সংখ্যাতত্ত্বের পঙ্গুতায় চিরকাল শৃঙ্খলা-বদ্ধ হয়ে থাকত। যে অজ্ঞাত ভারতীয় পণ্ডিত শূন্যের স্থানমাহাত্ম্যের আবিষ্কারে সংখ্যাতত্ত্বকে সরল করেন—বুদ্ধদেব-ব্যতিরেকে তিনিই ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান![১২]

শূন্য-আবিষ্কারক সেই অজ্ঞাত পণ্ডিতের অবদান কিভাবে বহির্বিশ্বে পৌঁছেছিল সে-কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। আপাতত ঐতিহাসিক ব্যাসাম-এর মতে সেই গণিতজ্ঞের চেয়েও যিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতর সন্তান—সেই তথাগত বুদ্ধের বাণী কী-ভাবে চীনদেশে পৌঁছেছিল তা খুঁজে দেখি। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বে সেটি একটি পৃথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হবার দাবী রাখে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চীনে বৌদ্ধধর্ম

প্রথম পরিচয় : চীন ও ভারত পরস্পরকে প্রথম কবে চিনল, একে অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হলো, তার কোনোও সঠিক হিসাব নেই। সরকারীভাবে বৌদ্ধধর্ম নাকি চীনে পৌছায় খ্রীষ্টজন্মের সমসময়ে ; বক্ষু উপত্যকার একজন নৃপতি চীন সম্রাটকে খ্রীষ্টপূর্ব ২ অব্দে একটি বৌদ্ধ পুঁথি উপহার দিয়েছিলেন।[১] কিন্তু তার পূর্বেও বুদ্ধের বাণী নিয়ে কোনো কোনো পরিব্রাজক যে চীনে গিয়েছিলেন এমন অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। চী'ন বংশের প্রথম সম্রাট শী হোয়াং-তি নাকি তাঁর রাজধানীতে একজন বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারককে গ্রেপ্তার করেছিলেন।[২] খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হান-বংশীয় সম্রাট উর একজন সেনাপতি—হো পুচিং তাঁর নাম—উত্তর-এশিয়ার এক উপজাতির কাছ থেকে একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানাচ্ছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পানিক্কর। ঐ যুগে হীনযানী বৌদ্ধরা বুদ্ধমূর্তি আদৌ নির্মাণ করত না। তবে কি ধরে নেব পানিক্কর বলতে চেয়েছেন[৩] সেটা ছিল স্তূপের প্রতীক ? জানি না। মোট কথা এটুকু বোঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীন-ভারতের মধ্যে পরিচয় ঘটেছিল। যোগাযোগের-ব্যবস্থা ছিল দুটি বিকল্প পথে। প্রথমটা হচ্ছে হিমালয়ের উত্তর দিয়ে স্থলপথ এবং দ্বিতীয়টা সমুদ্রপথ—সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ), কম্বুজদেশ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (কোচিন-চীন) হয়ে কান্তিগড় (ক্যান্টন) শ্রীবিজয় (যবদ্বীপ) বন্দরের পথ। দ্বিতীয় পথটা সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে পদচিহ্ন রাখে নি কিছু ; কিন্তু উত্তর-হিমালয়ের স্থলপথের প্রান্তে এখানে-ওখানে রয়ে গেছে সহস্রাব্দীর পদচিহ্ন রেখা।

যোগাযোগের স্থলপথ : চীন-ভারতের মিলনের পথে একাধিক প্রাকৃতিক বাধা, সারির পরে সারি। যেন তিন সারি দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এ-গ্রন্থের প্রথমে যে চিত্র আছে, তাতে দেখছি, চীনের দিক থেকে অগ্রসর হবার পথে প্রথম বাধার আধখানা হচ্ছে গোবি মরুভূমি, বাকি আধখানা তিয়েনশান পর্বতমালা। দ্বিতীয় সারির বাধা পরপর সাজানো কয়েকটি পর্বত-শৃঙ্খল—পশ্চিম থেকে পূর্বে : হিন্দুকুশ, পামীর গ্রন্থী, কারাকোরাম, কুনলুন শান, মিনশান পর্বত। এই দুই সারি বাধার মাঝখানে আছে দুরতিক্রম্য তাকলামাকান মরুভূমি। তৃতীয় এবং চূড়ান্ত বাধা—মহা হিমালয়! দেখে মনে হয়—প্রকৃতি যেন উভয়ের কানে মন্ত্রণা দিচ্ছে : ওরা অসুর! ওদের পানে চোখ

তুলে তাকিও না!

তবু মানুষ হার মানে নি। ঐ দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মাঝখান দিয়েই সে পথ করে নিয়েছে। খুঁজে বার করেছে কোথায় আছে অধিত্যকা, পাকদণ্ডীর পথ, পার্বত্য-গুহা, পানীয় জল। তাকলামাকান মরুভূমিকেই ভূগোলের শেষ কথা বলে তারা মেনে নেয় নি, জেনেছে তার সমান্তরালেই আছে তারিম নদীর অববাহিকা। সেই তারিম নদীর কুলুকুলু সঙ্গীতের সঙ্গে বোল তুলে নদীর কিনার ঘেঁষে হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে মানুষ, ঘোড়া, উটের সারি। গড়ে উঠেছে মরু-পান্থশালা, বাণিজ্যকেন্দ্র, সঙ্ঘারাম।

গ্রন্থারম্ভের ঐ ম্যাপটিতে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব তিনটি বিকল্প পথ। প্রথমটি তিয়েনশান পর্বতমালার উত্তর দিয়ে, সমরখন্দ, তাসখন্দ, খোকন্দ পার হয়ে, ইশ্‌কুকুল হ্রদের কিনার ঘেঁষে—যা ছিল চীন-ব্যাকট্রিয়া-পারস্যের বাণিজ্যপথ। ইতিহাস যাকে আদর করে কখনও ডেকেছে 'রেশম-পথ', কখনও 'মশলা-সড়ক' বলে! দ্বিতীয় পথটি তারিম নদীর অববাহিকা বরাবর—খাশগড়, তুমশুক্‌, খিজিল, কুচা, কারাশর, তুরফান হয়ে। আর তৃতীয় সড়কটা চলেছে তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্ত ঘেঁষে, হিমালয়ের উত্তরপারের কোল বরাবর। সে পথও শুরু হয়েছে ঐ খাশগড়ে, পথে পড়বে ইয়ারকণ্ড, নিয়া, চারচান, মিরান, লব-নরের প্রান্ত ঘেঁষে সে পথ শেষ পর্যন্ত এসে পড়বে চীনের প্রবেশ তোরণ তুনহুয়াঙে।

ঐ তিনটি পথরেখা ধরেই চীন থেকে এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজকেরা, ভারত থেকে গিয়েছিলেন ভারতীয় শ্রমণদল। আর এছাড়া ঐ তিনটি বিকল্প পথ ধরেই ক্রমাগত যাতায়াত করেছে সওদাগরের সারি—নিয়ে গেছে উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে লাক্ষা, মশলা, গজদন্ত, তৈজসপত্র, মৃগনাভি, কস্তুরী, চন্দন—আর নিয়ে এসেছে চীনাংশুক, ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র, জেড-পাথরের কারুকার্য-খচিত সৌখিন সামগ্রী। তাই ঐ তিন পথের বাঁকে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল—মরু-পান্থশালা, জনপদ—চীন-ভারত মৈত্রীর নীরব সাক্ষী।

চীনযাত্রী ভারতীয় শ্রমণ: ভারতে যেসব চীনা পরিব্রাজক এসেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ আমাদের পরিচিত। একজন তো ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে আবহমান-কাল 'ইম্পর্টেন্ট' কোশ্চেন'-রূপে চিহ্নিত। কিন্তু তাঁদের আগে এবং পরে যেসব ভারতীয় শ্রমণ মৃত্যু মুঠোয় করে ঐ পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাঁদের কজনকে আমরা জানি? আসুন আগে তাঁদের প্রণাম জানাই:

কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন: ওঁরা দুজন হচ্ছেন ভারতীয় পরিব্রাজক দলের যুগ্ম আদিস্বর। ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ওঁরা দুজন চীনদেশে উপনীত হয়েছিলেন; হিউএন-

থ্‌সাঙ-এর অর্ধ-সহস্রাব্দী পূর্বে। গল্প আছে,[৪] হান-সম্রাট মিঙ একরাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে, স্বর্ণমণ্ডিত এক মহাপুরুষ শূন্যপথে এসে তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করছেন। গণৎ-কারেরা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন—চীনদেশের দক্ষিণ-পূর্বে আছে আর্যাবর্ত নামে এক রাজা, সেখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহাজ্ঞানী শাক্যসিংহ। তিনি সম্রাটকে আশীর্বাদ করতে ইচ্ছুক। তখনই ছুটল দূত—কোথায় সেই আর্যাবর্ত, কে সেই শাক্যসিংহ! দীর্ঘদিন পরে রাজানুচরেরা ফিরে এলো প্রাসাদে। সঙ্গে দুজন ভারতীয় শ্রমণ। গৈরিক কাষায় তাঁদের পরিধানে, মুণ্ডিত মস্তক, হাতে ভিক্ষাপাত্র। ধর্মরত্ন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। চৈনিক উচ্চারণে তাঁর নাম চু ফা-লান[৫] (যেমন কাশ্যপ মাতঙ্গ হচ্ছেন চিয়া-য়েহ্‌ মো-ৎ'য়েঙ।) অপরপক্ষে কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনদেশে বসে রচনা করেন পাঁচখানি অমূল্য গ্রন্থ, যার ভিতর একটির সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে: দ্বাচত্বারিংশসূত্র। কোনো বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ নয়, হীনযান ধর্মের মূল বক্তব্যটুকু বেয়াল্লিশটি সূত্রে সঙ্কলিত করেছিলেন তিনি। দু'জন পরিব্রাজকই ছিলেন মধ্য-ভারতের লোক। হান-সম্রাটের রাজধানী লোয়াং-এ ওঁদের জীবিতকালেই একটি সঙ্ঘারাম গড়ে ওঠে। তার নাম 'শ্বেতাশ্ব সঙ্ঘারাম'। এ নামকরণের হেতু—ঐ দুই পরিব্রাজক একটি শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি প্রথমে চীনে নিয়ে এসেছিলেন।

চীনের নালন্দা: খ্রীষ্টজন্মের পর প্রথম তিন শ' বছরে লোয়াং-এর ঐ সঙ্ঘারাম ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করতে থাকে। ঐ আমলেই উত্তর-ভারতে কুশান সম্রাটদের রাজত্ব—তাঁরা ছিলেন য়ু-চী বংশ সম্ভূত, অর্থাৎ চৈনিক রক্ত ছিল তাঁদের ধমনীতে। ফলে বৌদ্ধ কুশান-রাজদের, বিশেষ করে সম্রাট কণিষ্কের প্রচেষ্টায় চীন-ভারত মৈত্রী দৃঢ়তর হয়। বহু ভারতীয় শ্রমণ ঐ তিন শ' বছরের ভিতর চীনদেশে যান এবং ভারতীয় শাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। অর্হৎ ধর্মকাল পাতিমোক্ষ অনুবাদ করেন, সঙ্ঘবর্মন এবং ধর্মসত্য 'কর্মবাচা' অনুবাদ করেন। নাগার্জুনকোণ্ডায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে প্রমাণ পাওয়া যায়, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই কয়েক-জন চৈনিক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী ঐযুগে দক্ষিণ-ভারতে আসেন—সম্ভবত সমুদ্রপথে। ইতিমধ্যে চীনে বিভিন্ন প্রত্যন্ত-দেশে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম নির্মিত হতে শুরু করেছে। শ্রী এইচ. সরকার বলছেন 'ৎসিন যুগে (২৮০-৩১৭ খ্রীঃ) চীন ভূখণ্ডে অন্যূন সতের হাজার বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম গড়ে উঠেছিল'।[৬] আরও একশ বছরের ভিতর বেশ কয়েক-জন কাশ্মীরী পরিব্রাজক ভারতবর্ষ থেকে চীনে গিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: সঙ্ঘভূতি, গৌতম সঙ্ঘদেব, পুণ্যত্রাত, বিমলাক্ষ, বুদ্ধভদ্র, এবং অর্হৎ বুদ্ধযশ। ইতিমধ্যে অনেক চৈনিক পণ্ডিতও ভারতবর্ষে এসেছেন। মিউ শান নামে একজন চীনা পরিব্রাজক যবদ্বীপ, চম্পা ঘুরে ভারত ভূখণ্ডে এসেছিলেন জলপথে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়

শতাব্দীতে। তাঁর শিষ্য চি চিয়েন 'অবদান শতকের' একটি অনুবাদ করেন চীনা ভাষায়। স্থলপথেও এসেছেন অনেক চীনা পণ্ডিত; য়ু চী উপজাতীয় অর্হৎ ধর্মরক্ষ দীর্ঘদিন ভারত পরিক্রমা করে, সংস্কৃত শিখে দ্বিশতাধিক গ্রন্থ একাই অনুবাদ করেন। তিনি ছিলেন ৎসিন যুগের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত, রাজধানী 'চাং-আন'-এ ছিল তাঁর আশ্রম। কিন্তু ঐ তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে কাশ্মীরী পণ্ডিত কুমার-জীবের। কারণ তিনিই হচ্ছেন চীনে মহাযান ধর্মমতের ভগীরথ। তাঁর পূর্বসূরীরা মূলতঃ হীনযান ধর্মই চীনে এতদিন নিয়ে গেছেন।

কুমারজীব[৭] : কুমারজীবের জননী ছিলেন কুচা-রাজের ভগ্নী; নাম 'জীবা'। ওঁর পিতৃদেব ছিলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, নাম 'কুমারযান'। অধ্যয়ন-অধ্যাপন জীবিকা ছিল তাঁর। ঐ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে কুচারাজ তাঁকে ভগ্নিদান করে-ছিলেন। ওঁদের যখন সন্তান হলো, তখন পণ্ডিত-পিতা তার নামকরণ করলেন 'কুমার জীব'। দ্বন্দ্ব-সমাস কিনা জানি না, নামের মধ্যে রইল পিতামাতার যুগ্ম আশীর্বাদ। জীবা ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী; পুত্রের সাত বছর বয়সে তাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেওয়া-লেন। আরও দু-বছর পরে কাশ্মীরের সর্বাস্তিবাদী অর্হৎ বন্ধুদত্তের সঙ্ঘে রেখে এলেন পুত্রকে। আরও কয়েক বছর পরের কথা, কুমারজীব তখন দ্বাদশবর্ষীয় কিশোর, এক-দিন খাশগড়ে এক মহা সন্ন্যাসীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। শুনলেন, সেই মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ শ্রমণের নাম যশ। এই মহাভিক্ষু যশের ভিতরেই কুমারজীব গুরুর সন্ধান পেলেন—দীক্ষা নিলেন মহাযান ধর্মে। গুরু বললেন, শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মের মর্ম-কথা শুনলেই তো চলবে না, তোমাকে বেদাভ্যাস করতে হবে। কুমারজীব সমান নিষ্ঠায় হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন।

মায়ের স্বপ্ন ছিল—ছেলে পণ্ডিত হোক। মায়ের বাসনা আশাতিরিক্তভাবে পূরণ করেছিলেন কুমারজীব। শিক্ষাসমাপনান্তে কুচা নগরীতে ফিরে এলেন তিনি। ততদিনে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে। ধর্মের শেষ মীমাংসা করতে সুদূর বিদেশ থেকে পণ্ডিতেরা ছুটে আসেন কুচা নগরীতে, কুমারজীবের কাছে। শেষ পর্যন্ত সে সুনাম একদিন গিয়ে পৌছালো অতি দূর চীন রাজ্যে। স্বয়ং চীন-সম্রাট একটি রাজ প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দিলেন ক্ষুদ্র জনপদ কুচার অধিপতির কাছে—কুমারজীবকে ভিক্ষা চেয়ে। কিন্তু কুমারজীব তো রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতই শুধু নন, তিনি যে রাজার ভাগিনেয়—তাঁর নয়নের মণি। সম্মত হলেন না কুচারাজ। ফলে যা হবার তাই হলো। পরম পরাক্রান্ত চীন-সম্রাট ফু-কিয়েন তাঁর এক সেনাপতিকে সসৈন্য পাঠিয়ে দিলেন কুচারাজকে শায়েস্তা করতে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কুচারাজ যুদ্ধে পরা-জিত হতেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পূর্বেই কুমারজীব আত্মসমর্পণ করলেন চীনা সেনা-

পতির কাছে—গিয়ে বললেন, আমিই কুমারজীব। অহেতুক রক্তপাত বন্ধ করুন। আমি চীনে যেতে প্রস্তুত।

তিন শ'বছর পরে যে পথরেখা ধরে হিউএন-থ্সাঙ ভারতে আসবেন সেই স্থল-পথেই যাত্রা করলেন কুমারজীব—মহাসম্মানিত বন্দী অতিথি। তুরফান, তুন-হুয়াঙ হয়ে, গোবি মরুভূমির প্রত্যন্তদেশ দিয়ে কাংসুতে উপনীত হলেন একদিন। কাংসু রাজধানী নয়, চীনের পশ্চিম-প্রান্তে। সেখানে যখন পৌঁছালেন তখন কুমারজীব প্রৌঢ়। সেখানে গিয়ে সংবাদ পেলেন, সম্রাট ফু-কিয়েন ইতিমধ্যে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহতহয়েছেন—রাজদণ্ড হস্তান্তরিত হয়েছে। নবীন সম্রাটের কোনোও উৎসাহ নেই বৌদ্ধধর্মের ব্যাপারে। ভাগ্যের বিড়ম্বনা একেই বলে! সেনাপতি আর কী করেন, ঐ দুর্গম মরুভূমি পাড়ি দিয়ে কুমারজীবকে তো আর একা ফিরে যেতে বলতে পারেন না; অগত্যা পণ্ডিতকে তিনি আশ্রয় দিলেন নিজ প্রাসাদে, বিশিষ্ট অতিথিরূপে।

কাংসুতেই কেটে গেল দীর্ঘ দিন। কুমারজীব অগত্যা চীনা ভাষাটা শিখলেন মন দিয়ে। ইতিমধ্যে চীনের রাজদণ্ড আবার হাত বদলালো। এবারকার নতুন সম্রাট য়ো-সাং আবার বৌদ্ধধর্মে উৎসাহী। তিনি যখন সংবাদ পেলেন—একজন মহাপণ্ডিত বন্দী হয়ে আছেন কাংসুতে, সেনাপতির প্রাসাদে, তখন তাঁকে মহা সমাদরে আমন্ত্রণ জানালেন। রাজশকট এসে দাঁড়ালো সেনাপতির প্রাসাদ দ্বারে।

রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে জীবনসায়াহ্নে একদিন কুমারজীব সত্যই এসে উপস্থিত হলেন চীনের রাজধানীতে—হোয়াং হো-র তীরে, চান্‌-আন-এ। কুমারজীব তখন অশীতিপর বৃদ্ধ! সম্রাট তাঁকে মহাসমাদরে বরণ করে বললেন, আপনিই আমার কুয়ো-শী (রাজগুরু)! বলুন প্রভু, আপনাকে কী দিয়ে সন্তুষ্ট করব?

কুমারজীব হাসলেন। বললেন, আপনার রাজকীয় গ্রন্থাগারে যে সকল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আছে সেগুলি সংশোধনের অনুমতি দিয়ে।

বিস্মিত হলেন চীন-সম্রাট। বলেন, সেগুলি কি সব ভ্রান্তিপূর্ণ?

কুমারজীব বললেন, আমার তাই অনুমান। পূর্বাচার্যদের দোষ নেই, তাঁরা আমার মতো ভাগ্যবান নন। দুটি ভাষায় সমান দক্ষতা ছিল না তাঁদের। আমার সৌভাগ্য যে, জীবনের আশীটা বছরের আধাআধি কেটেছে ভারতবর্ষে, বাকি অর্ধেক চীনের কারাগারে! ফলে ঐ গ্রন্থগুলি সংশোধন করাই হবে আমার বাকি জীবনের কাজ। অবশ্য জীবনের বাকিও আর কিছু নেই বোধহয়।

ভুল বলেছিলেন কুমারজীব। বাকি ছিল। আরও দ্বাদশবর্ষ। বিরানব্বই বছর বয়সে কুমারজীব দেহরক্ষা করেন। এই দ্বাদশবর্ষে তিনি এক শ ছয়-খানি মহাযান

ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন, যার ভিতর ছাপ্পান্নখানি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংবাদ হচ্ছে—ইতিপূর্বে শুধু হীনযানী ধর্মগ্রন্থই চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছিল। চীনের বৌদ্ধধর্মে মহাযান তন্ত্রের ভগীরথ হচ্ছেন এই কুমারজীব।

অনেক চৈনিক-পণ্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার ভিতর প্রধান ছিলেন অর্হৎ সেং-চাও। গুরুর বাণী ও জীবন কথা তিনি লিখে গেছেন সযত্নে। এক স্থানে কথাপ্রসঙ্গে তিনি লিখছেন 'একদিন গুরুদেবকে প্রশ্ন করলাম, আপনি শুধু অনুবাদই করে যাচ্ছেন, মৌলিক কিছু রচনা করছেন না কেন?' জবাবে কুমারজীব বলেছিলেন, এ তো ভারতবর্ষ নয়! আমার মৌলিক রচনার অর্থ বুঝবে কে? আমি এখানে পক্ষ-হীন পক্ষীশাবক—পিঞ্জরে বসে মহাকাশের স্বপ্ন দেখা বৃথা।

কৌতূহলী পাঠককে জনান্তিকে জানাই: অর্হৎ কুমারজীবের অদ্ভুত জীবনী আমার রাত্রের নিদ্রাহরণ করেছিল। তাঁকে নায়করূপে কল্পনা করে সম্প্রতি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে অনিদ্রা থেকে মুক্তি পেয়েছি আমি: "আনন্দ স্বরূপিণী।"

মহা-অর্হৎ কুমারজীবকে ভারতবর্ষ ভুলে গেলেও বোধ করি মহাচীন কোনোদিন ভুলবে না।

ধর্মক্ষেম[৮]: কুমারজীবের কাহিনী যদি করুণ হয়, তবে ধর্মক্ষেমের কাহিনী করুণতর। মধ্যভারতের পণ্ডিত। প্রথম জীবনে ছিলেন হীনযানী, পরে মহাযানী। কুমারজীবের মতই একদিন তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কোথায় ভারতের গয়া, কাশী, প্রয়াগ আর কোথায় মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমি! সেই মরুভূমির উত্তরাঞ্চলে মঙ্গোলিয়াতে একদিন পৌঁছালো তাঁর সুনাম। মঙ্গোলিয়ার তৃণাচ্ছাদিত মরু-অঞ্চলে বাস করে দুর্ধর্ষ ঘোড়-সওয়ার সৈন্য—হূণ জাতি; তাদের দলপতি হূণ রাজ আমন্ত্রণ জানালেন ধর্মক্ষেমকে। নিষেধ করলেন সতীর্থরা, শিষ্যেরা বললেন, হূণদের মধ্যে সদ্ধর্মের প্রচার করতে যাওয়া নিছক মূর্খতা। ওদের রক্তের মধ্যেই আছে ধ্বংসের বীজ। ওরা অহিংস-ধর্ম কোনোদিনই মেনে নেবে না; আপনি যাবেন না।

শান্ত সমাহিত বৌদ্ধ শ্রমণ বললেন, মনে নেই পূর্ণ অবদান কাহিনী?

অতঃপর পূর্ণ-অবদান শতকের কাহিনী শুনিয়েছিলেন শিষ্যদের:

বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ-শিষ্য পূর্ণ এসেছেন শাক্যসিংহের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে পূর্ণ বললেন, প্রভু, আমি শ্রোণপরন্তকদের মধ্যে সদ্ধর্মের প্রচারে যাত্রা করছি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন মহাভাগ!

বুদ্ধদেব বললেন, কিন্তু শুনেছি শ্রোণপরন্তকেরা হচ্ছে নরমাংসভুক উপজাতি। ওরা যদি তোমাকে ভৎর্সনা করে?

: সেটাকে আমি সৌভাগ্য বলে গ্রহণ করব প্রভু। বলব, ওরা তো কই আমাকে

প্রহার করছে না।

: আর ওরা যদি তোমাকে প্রহার করতে শুরু করে ?

: তবু আমি আমার সৌভাগ্যকে অভিনন্দন জানাব। বলব, ওরা তো কই আমার প্রাণহানি করছে না।

: কিন্তু ওরা যদি তোমাকে প্রাণে বধ করে ?

যুক্তকরে পূর্ণ সহাস্যে বললেন, প্রভু, তবু আমি আমার সৌভাগ্যকে অভিনন্দন জানাব। সদ্ধর্মের প্রচারে জীবনদান—সে তো পরম সৌভাগ্য। ওদের ডেকে বলব—তোমরা আমাকে যে দুর্লভ সুযোগ দিয়েছ সেজন্য ধন্যবাদ !

ঘৃতপ্রদীপজ্বলা সে সান্ধ্য-আসরে ধর্মক্ষেমের শিষ্যদল বোধ করি এ-কথার জবাব খুঁজে পান নি।

একই পথে—সেই খাইবার, খাশগড়, তুরফান, তুনহুয়াঙ হয়ে, দুর্ভেদ্য গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে, দুর্লঙ্ঘ্য চীনের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে ধর্মক্ষেম এসে উপস্থিত হলেন মঙ্গোলিয়ায়—হূণ রাজ্যে। কতগুলি রণোন্মত্ত দুর্ধর্ষ হূণ অশ্বারোহীকে তিনি অহিংসধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন ইতিহাস সে-কথা লিপিবদ্ধ করতে ভুলেছে ; কিন্তু ইতিহাস তবু বলছে—সেই তৃণাচ্ছাদিত মরুপ্রদেশে, অনলবর্ষী আকাশের নিচে বিরলপত্র খর্জুরবৃক্ষের ছায়ায় বসে তিনি একের পর এক অনুবাদ করে গিয়েছিলেন চীনা ভাষায়—বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। কোনো মরীচিকা তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি ; তারায় ভরা নির্মেঘ আকাশের নিচে মরুদ্যানের একান্তে বসে একে একে রচনা করে গেছেন পঞ্চবিংশতিখানি গ্রন্থ, যার দ্বাদশটি এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে। তার একখানি হচ্ছে 'মহাসন্নিপাত' নামে এক মূল্যবান গ্রন্থ। আর আছে অশ্বঘোষের বিখ্যাত 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যের চীনা-অনুবাদ। প্রসঙ্গত এখানে বলি—ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় অশ্বঘোষের যে 'বুদ্ধচরিত' পাওয়া গেছে তাতে আছে সতেরটি সর্গ, সে কাব্য শেষ হচ্ছে বুদ্ধদেবের বারাণসী আগমনে, যেখানে কোনো মহাকাব্য শেষ হতেই পারে না। এতদিন পণ্ডিতেরা সে কাব্য পড়তেন আর মনে মনে অশ্বঘোষকে প্রশ্ন করতেন—কেন 'সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে ?' তারপর আবিষ্কৃত হলো ধর্মক্ষেমের চীনা অনুবাদ—তাতে অষ্টবিংশতি সর্গ পর্যন্ত উপস্থিত ; মহাকাব্য শেষ হচ্ছে মহানায়কের কুশীনগর আগমনে, তাঁর মহাপরিনির্বাণে ! তাতেই বোঝা গেল, এ-যাবৎ অশ্বঘোষের যে কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা ছিল খণ্ডিত, অংশমাত্র। সে কাব্য সুসম্পন্ন করা হলো চীনা ভাষা থেকে পুনরায় সংস্কৃতে অনুবাদ করে। 'দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে।' তা এলো, কিন্তু ধর্মক্ষেম ফিরে এলেন না !

হূণ রাজার দরবারে একজন ভারতীয় মহাপণ্ডিত আছেন একথা কর্ণগোচর হলো তদানীন্তন চীন-সম্রাটের। তিনি হূণরাজকে আদেশ করলেন : ঐ পণ্ডিতকে চীন-রাজসভায় প্রেরণ করতে। স্বতই অস্বীকৃত হলেন হূণরাজ। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি। কুমারজীবকে নিয়ে কুচারাজের যে সমস্যা হয়েছিল, কিংবা জাতকের যুগে বিধুর-পণ্ডিতকে নিয়ে হয়েছিল কুরুরাজের, ঠিক সেই সমস্যার সম্মুখীন হলেন হূণ-অধিপতি। বেধে গেল লড়াই।

আগেই বলেছি—কুমারজীবের তুলনায় ধর্মক্ষেমের জীবন করুণতর।

সময়টা ৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। হূণরাজ যখন বুঝতে পারলেন—ধর্মক্ষেমকে হস্তান্তরিত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই তখন এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। চীন-সম্রাটের বিজয়-বাহিনী যখন হূণরাজের প্রাসাদ অধিকার করল তখন দেখল তা জনশূন্য। শুধু প্রবেশ-তোরণের সম্মুখে উবুড় হয়ে পড়ে আছে এক বৃদ্ধের প্রাণহীন দেহ। তাঁর অঙ্গে গৈরিক কাষায়, তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, তাঁর মুখে ক্ষমার প্রশান্তি—অদূরে পড়ে আছে বৃদ্ধের যষ্টি এবং ভিক্ষাপাত্র। আর রাজপথের পাষাণে জমাট-বাঁধা একমুঠো রক্তের ছোপ!

ইতিহাস বলে যায় নি—গুপ্তঘাতকের হাতে উদ্যত শাণিত ছুরিকা দেখতে পেয়ে সেই বৃদ্ধ শ্রমণ জীবনের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে কী কথা উচ্চারণ করেছিলেন। সেটা কিন্তু অনুমান করতে পারি আমরা। তিনি নিশ্চয় বলেছিলেন : তোমরা আমাকে যে দুর্লভ সুযোগ দিয়েছ সে জন্য ধন্যবাদ।

বুদ্ধযশ : কুমারজীবের সমসাময়িক ; বস্তুত তাঁর সতীর্থ ও সহকর্মী। তিনি ছিলেন খাশগড়ের রাজার পৃষ্ঠপোষক। যে সময়ে কুচারাজ চীন-সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তখন খাশগড়-রাজ সসৈন্য কুচারাজকে সাহায্য করতে যুদ্ধযাত্রা করেন। যাবার সময় তিনি নাবালক পুত্রকে রেখে যান সিংহাসনে, এবং অর্হৎ বুদ্ধযশকে তার অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করে। বুদ্ধযশ দশ বছর ছিলেন খাশগড়ের ভাগ্যবিধাতা—কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রায় তিলমাত্র পরিবর্তন হয় নি সেই সময়ে। যথারীতি ভিক্ষা-অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে গেছেন খাশগড় রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা! অনেক পরে কুমারজীবের আহ্বানে তিনি চীন দেশে চলে যান।

বুদ্ধভদ্র : জালালাবাদের পণ্ডিত। কাশ্মীরে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন-এর সঙ্গে পরিচিত হন ও বন্ধুত্ব হয়। জলপথে তিনি চীনদেশে চলে যান এবং কুমার-জীবের অনুগামী হিসাবে কাজ করেন।

গুণবর্মা : গুণবর্মা ছিলেন কাশ্মীরী রাজপরিবারের সন্তান। বস্তুত কাশ্মীর-রাজের মৃত্যু হলে তাঁর সভাসদেরা গুণবর্মার পাণ্ডিত্যে ও ন্যায়নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই

সিংহাসনে উপবেশন করতে আহ্বান জানান। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন গুণবর্মা। তিনি পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করে রওনা হলেন সমুদ্রপথে। প্রথমে সিংহল, পরে যবদ্বীপ। তাঁর কাছেই যবদ্বীপরাজ এবং তাঁর জননী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন এবং যবদ্বীপের রাজবংশ বৌদ্ধ হয়ে যায়। শোনা যায়, একবার একটি বৈদেশিক শত্রুদল যখন যবদ্বীপ আক্রমণ করে তখন যবদ্বীপরাজ তাঁর গুরু গুণবর্মার দ্বারে উপস্থিত হয়ে জানতে চান—কী তাঁর কর্তব্য। বৌদ্ধ হিসাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হবে কিনা। গুণবর্মা তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন—'বিদেশী দস্যুর দল তোমার নির্বিরোধী প্রজাদের অত্যাচার করতে আসছে, তাদের রক্ষা করাই তোমার রাজধর্ম! অহিংসা ব্রত মানে কাপুরুষতা নয়।' যবদ্বীপরাজ এই উপদেশে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে বিদেশী আক্রমণকারীদের সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করেন।[৯] গুণবর্মার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। চীন-সম্রাট অতঃপর তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। গুণবর্মা ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে নানকিং-এ উপনীত হন। যে অর্ণবপোতে তিনি চীনদেশে গমন করেন সেটি ছিল ভারতীয় সওদাগরের, নাম নন্দী। নানকিং-এর জেতবন বিহারে গুণবর্মার সমাধি আছে।

বিনীতরুচি : ৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে উপনীত হন। তন-কিন-এ তিনি ধ্যান-মার্গের সূচনা করেন।

পরমার্থ : কবি কালিদাসের প্রায় একশ বছর আগে উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরমার্থ। উজ্জয়িনীতে শিক্ষা শেষ করে তিনি এলেন পাটলিপুত্রে। ঐ সময় চীন-সম্রাট উ-তি—সেই যিনি ঐতিহাসিক সুমা চিয়েনকে চীনের ইতিহাস লিখতে বলেছিলেন—তিনি মগধরাজের কাছে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত-কে চেয়ে পাঠালেন। মগধরাজ তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পরমার্থকেই নির্বাচিত করলেন। পরমার্থ স্থলপথে যান নি, সমুদ্রপথে যবদ্বীপ ঘুরে নানকিং বন্দরে এসে পৌঁছান ৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানে সাড়ম্বরে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হলো বটে, কিন্তু অচিরেই তাঁকে অন্যত্র সরে যেতে বলা হলো। কারণটা গুরুতর : রাষ্ট্রবিপ্লব। দক্ষিণাঞ্চলের এক সঙ্ঘারামে পরমার্থ আশ্রয় নিলেন এবং জীবনের বাকি তেইশটি বছর ধরে প্রায় সত্তরখানি ধর্মগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন, এমনকি কপিলের সাংখ্যভাষ্যও।

বোধিধর্ম[১০] : পূর্বসূরীদের মতো বোধিধর্ম উত্তর ভারতের লোক ছিলেন না; তাঁর আদি নিবাস—কাঞ্চিপুরম্, দাক্ষিণাত্যে। কার আহ্বানে, কোন্ পথে তিনি চীনে গিয়েছিলেন জানি না (৫২০ খ্রীঃ), কিন্তু এটুকু জানা যায় যে, তাঁর ধর্মমত ছিল কিছুটা বিপ্লবাত্মক। তিনি কোনোও গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন বলেও শুনি নি—ধর্মের মূল তত্ত্ব শুধু প্রচার করে গেছেন। উনি ধ্যানের পথে নির্বাণের সন্ধান করতে বলে-

ছিলেন ; তাঁর মতে বুদ্ধকে বাইরের জগতে নয়, ধ্যানের জগতে অন্তরের অন্তস্তলেই পাওয়া যাবে। তাঁর ধর্মমতেই চীনে গড়ে উঠেছিল 'ধ্যানমার্গ' যার চৈনিক অভিধা —'চ্যান' এবং যা 'জেন-ধর্মমতের' জনক।

বজ্র-বোধি[১১] : ইনিও দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত। আদি নিবাস কেরলে। বস্তুত রাজপুত্র—রাজা ঈশ্বরবর্মার পুত্র। এবং পল্হবরাজ দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মার রাজগুরু। নালন্দায় শিক্ষা সমাপ্ত করে অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে চীনদেশে ধর্মপ্রচার করতে যান। তাঁর শিষ্য অমরঘোষও চীন দেশে গুরুর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার ব্রত গ্রহণ করেন।

প্রভাকরমিত্র : নালন্দার বিখ্যাত পণ্ডিত। চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে ধর্মপ্রচারে যান।

জিনগুপ্ত[১২] : (৫২৮—৬০৫) গান্ধারে ক্ষত্রিয়-পরিবারে জন্ম। নয়জন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে পরিব্রাজনায় যাত্রা করেন। কপিশ, বদকৃশান, তাশ্‌খন্দ্, খোটান হয়ে অবশেষে উপনীত হন কান্‌সুতে। পথেই ছয়জন সঙ্গী দেহরক্ষা করেন। যে চারজন শ্রমণ তীর্থপ্রান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন তাঁরা হলেন—জিনগুপ্ত, যশোগুপ্ত, জিনযশ এবং জ্ঞানভদ্র। চীন সম্রাট তাঁদের যথোচিত সম্মান দিয়েছিলেন। জিনগুপ্ত 'বুদ্ধচরিত' এবং 'সদ্ধর্ম-পুণ্ডরিক' গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ঐ চারজনের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানভদ্র ভারতবর্ষে ফিরে আসবার চেষ্টা করেছিলেন—এসে পৌছাতে পেরেছিলেন কিনা প্রমাণ নেই—বাকি তিনজন চীন দেশেই দেহরক্ষা করেন।

ধর্মগুপ্ত[১৩] : দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত। কপিশ থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাশখন্দ্, খাশগড়, কারাশর এবং তুরফানে দুই-দুই বছর করে বাস করে দীর্ঘ নয় বৎসর পরে ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে চাঙ্গানে উপনীত হন। পরে সম্রাটের সঙ্গেই তাঁর নূতন রাজধানী লো-য়াং এ চলে আসেন। চীনে সর্বমোট আঠাশ বছর ধরে তিনি অনু-বাদকের কাজ করে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

শিক্ষানন্দ[১৪] : খোটান থেকে চীনের রাজধানী লো-য়াং-এ আসেন এবং সেখানে সম্রাজ্ঞী উ-র (৬২৫—৭০৫) দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন। শিক্ষানন্দ চৈনিক পরিব্রাজক ঈ-ৎসিং এর সহকর্মী হিসাবেই অনুবাদকের কাজ করে যান। ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহান্ত হয়।

ভারতে চীনা পরিব্রাজক : খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী—এই ছয়শ' বছরের মধ্যে হাজার হাজার চীনা পরিব্রাজক এসেছিলেন ভারতে—কেউ স্থলপথে, কেউ জলপথে। শুধু তীর্থদর্শন মানসে নয়—ভারতীয় সংস্কৃতিকে, বৌদ্ধ-ধর্মকে স্বদেশে নিয়ে যেতে। তাঁরা সংস্কৃত ও পালিভাষা শিখেছেন, বুদ্ধদেবের স্মৃতি-

বিজড়িত তীর্থস্থানগুলি স্বচক্ষে দেখেছেন, নোট নিয়েছেন, ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং ভারতীয় পুঁথি চীনাভাষায় অনুবাদ করে দেশে ফিরে গেছেন। সেই অসংখ্য তীর্থযাত্রীদের মধ্যে মাত্র তিনজনের উল্লেখ করছি— তাঁরা ইতিহাসে সমধিক পরিচিত বলে।

ভারতীয় এবং চীনা পরিব্রাজকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কতকগুলি মৌল পার্থক্য আছে, যেটা প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার। ভারতীয় শ্রমণদল যেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ—কোনো এক কেন্দ্রাতিগ বেগে তাঁরা দেশ থেকে বিদেশে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরে আসার কথা মনে না রেখে। বস্তুত যে কয়জন ভারতীয় পরিব্রাজকের নাম এ পর্যন্ত উল্লেখ করেছি তাঁদের কেউ দেশে ফিরে এসেছিলেন বলে প্রমাণ পাই নি। তাঁরা মহাচীনেই দেহরক্ষা করেছেন। এঁরা কেউ যাত্রাপথের কোনো দিনপঞ্জিকা অথবা বিবরণ রেখেছেন বলেও শুনি নি। কেন? তাঁরা সকলেই ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত, সকলেই ধৈর্য ধরে লিখতে অভ্যস্ত। তাহলে? তাঁদের মন-ক্যামেরায় যেসব স্ন্যাপ-সট একের পর এক সঞ্চিত হয়েছিল তার একটা এ্যালবামও খুঁজে পাই না কেন? আমার বিশ্বাস তার একটিই হেতু। তাঁরা পণ্ডিত, তাঁরা বোদ্ধা, তাঁরা সুলেখক—চোখ বুজে তাঁরা দীর্ঘপথ পাড়ি দেন নি—কিন্তু 'ধনাত্মক' এশিয়া-সূর্যের আলোয় তাঁদের মন-ক্যামেরায় সব দুর্লভ 'নেগেটিভ' সাদা হয়ে গিয়েছিল! অপরপক্ষে চীনা পরিব্রাজকেরা এসেছিলেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁরা দিনপঞ্জিকা রেখেছেন, নোট নিয়েছেন, সব কিছু দিয়ে গেছেন উত্তরকালের হাতে। বস্তুত হিউএন-থ্‌সাঙ-এর দিনলিপি মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান। আর সেজন্যই হিউএন-থ্‌সাঙ ভারত-ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে 'পুনরাগমনায়চ' মন্ত্রে অভিষিক্ত।

ফা হিয়েন: (৩৯৯-৪১৪) চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে প্রথম নাম যেটি পাচ্ছি সেটি ফা-হিয়েন-এর। চতুর্থ শতকে। ভারতে গুপ্তসাম্রাজ্যের তখন স্বর্ণযুগ, কিন্তু ফা-হিয়েন তাঁর গ্রন্থ 'ফো কুই-কি'-তে ভারতের রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখে যান নি। লিখেছেন—বৌদ্ধ ধর্মস্থান ও সঙ্ঘারামাগুলির বিস্তারিত বিবরণ। তাঁর ভারতভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'বিনয় পিটক'-এর সম্পূর্ণ ভাষ্য সংগ্রহ করা। তা তিনি করেছিলেন। রওনা হয়েছিলেন চীনের রাজধানী 'চাঙ-আন' থেকে—যার প্রাক্তন নাম 'হাইফেঙ' এবং যার পরবর্তী নাম সিয়ান (চিয়াঙ কাই-শেক-এর অপহরণ-খ্যাত)। গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে, সহস্রাব্দীর পদচিহ্নলাঞ্ছিত সেই রেশম-বাণিজ্যের পথ ধরে, খোটান, হিন্দুকুশ পাড়ি দিয়ে খাইবার-পাসের ভিতর দিয়ে এসেছিলেন মথুরায়। ক্রমে কনৌজ, বৈশালী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, কপিলাবস্তু, সারনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ পরিক্রমা করেছিলেন। জেতবন-বিহার আর

কপিলাবস্তুর ধ্বংসস্তূপ দেখে তিনি কী পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন তার একটি হৃদয়-স্পর্শী বিবরণ আছে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে। আর একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে একটি বিশেষ রাত্রির! রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বত-চূড়ায় সম্পূর্ণ একা তিনি অরণ্যমধ্যে একটি রাত কাটান। শুভার্থীরা নিষেধ করেছিলেন। ফা-হিয়েন সে নিষেধ মানেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, গৃধ্রকূট পর্বতশিখরে তথাগত স্বয়ং তাঁকে পঞ্চভূত-দেহে দেখা দেবেন। সমস্ত রাত তিনি একাকী ধ্যানমগ্ন হয়ে বসেছিলেন পর্বতচূড়ায়।

স্থলপথে এলেও ফা-হিয়েন দেশে ফিরেছিলেন সমুদ্রপথে। তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে অর্ণবপোতে প্রথমে যান সিংহলে। চৌদ্দ দিনে। সেখানে অনুরাধাপুর এবং অন্যান্য বিহারে দুই বৎসর অবস্থান করে যবদ্বীপ ঘুরে অবশেষে দেশে ফিরে যান।

হিউএন-থ্সাঙ : (৬২৯-৬৪৫) রীতিমতো পণ্ডিতঘরের সন্তান। চার ভাই, উনিই সবার ছোট। ওঁর এক দাদা ছিলেন বৌদ্ধশ্রমণ, তাঁরই প্রভাবে বিশ বছর বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন এবং চীনাভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন। কিন্তু পদে পদে অনুপপত্তি! বুঝতে পারেন না, এসব অসঙ্গতির মূল কারণ অনুবাদকের অনবধানতায় কিনা। কেউ তাঁর প্রশ্নের মিমাংসা করে দিতে পারে না। চীনে তেমন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উনি পাবেন কোথায়? অতএব সিদ্ধান্ত নিলেন—নিজেই চলে যাবেন ভারতবর্ষে, শিখবেন সংস্কৃত। মূল গ্রন্থ খুঁটিয়ে দেখবেন, তাঁর মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তার সমাধান কোথাও আছে কি না।

তখন ওঁর বয়স উনত্রিশ। ভারতীয় ভিসা না হলেও চীনা-পাশপোর্ট তখনও লাগত! অর্থাৎ চীন-সম্রাটের কোনো প্রজা চীন ভূখণ্ড ত্যাগ করতে পারে শুধুমাত্র সম্রাটের অনুমতি-সাপেক্ষে। কী-কারণে জানি না, অনুমতি পেলেন না উনি। কিন্তু দুর্বার তাঁর মনোবাসনা। গোপনেই গৃহত্যাগ করলেন একদিন।

দুর্গম পথ। বিপদ সঙ্কুল। চলেছেন পরিব্রাজক পশ্চিমমুখো। গোবি মরুভূমি পাড়ি দিয়ে, তুনহুয়ান, তুরফান অতিক্রম করে তিয়ানশান পর্বতের উত্তর দিক দিয়ে, ইস্‌ক্‌-কুল হ্রদের কিনার ঘেঁষে এসে পৌঁছালেন একদিন তাশ্‌খন্দে। সেখান থেকে ক্রমে দক্ষিণমুখো—সমরখন্দ, বল্‌খ্‌, কাবুল হয়ে সেই ভারত-সিংহদ্বার খাইবার পাস-এ। এলেন ভারতে।

দীর্ঘ পনের বছর তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে। নালন্দাতেই ছিলেন বেশ কয়েক বছর। সেখানে তিনি এত জনপ্রিয় হয়ে পড়েন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা তাঁকে প্রধান আচার্যপদ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ পর্যন্ত করেছিলেন। হিউএন-থ্সাঙ্ সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন—তাঁর জীবনের আরব্ধ কাজ হচ্ছে ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ধর্ম, তার মৈত্রীর বাণী চীনদেশে বয়ে নিয়ে যাওয়া। নালন্দায়

অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকলে তিনি যোগভ্রষ্ট হবেন। বোধকরি তিনিও নালন্দার অধ্যাপকদের বলেছিলেন : সব কাজে সবাইকে ডাকতে নেই!

দীর্ঘ পাঁচ বছর নালন্দায় অতিবাহিত করে তিনি পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। কামরূপ বা আসামেও তিনি আসেন। এখানেই তাঁর আগমনের অন্ত এবং প্রত্যাবর্তন-পর্যায় শুরু। দক্ষিণে কাঞ্চীরাজ্য পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সিংহলে সম্ভবত যান নি। হর্ষ এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর সভায় যে তিনি এসেছিলেন সে কথা নিঃসন্দেহ।

পনের বছর পরে স্থলপথেই ফিরে যান তিনি। সঙ্গে নিয়ে যান ৬৫৭ খানি পুঁথি, বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিবিজড়িত পঞ্চাশটি স্মারকচিহ্ন এবং অসংখ্য সোনা, রূপা, স্ফটিক এবং চন্দনকাঠের বুদ্ধমূর্তি। এছাড়া রেশমবস্ত্রের উপর আঁকা বহু আলেখ্য। যদিও তিনি চীন-সম্রাটের বিনা অনুমতিতে দেশত্যাগ করেছিলেন তবু তাঁর প্রত্যাবর্তন-সংবাদে সম্রাট অভিভূত হয়ে পড়েন। নগরাভিমুখে তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে সপার্ষদ চীন-সম্রাট নগর-প্রাচীরের বাইরে এসে তোরণমুখে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন, কোনো বিজয়ী সেনাপতিও এতবড় সম্মান কখনও পান নি।

'কবে কোন্ চীনা পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন তাতে আমাদের কিছুমাত্র কৌতূহল নেই'—লিখলেই সে শাশ্বত কীর্তিকে অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসে হিউএন-থ্সাঙ-এর স্বাক্ষরটা সাপ্তাহিক পত্রিকার লাইনো-টাইপে ছাপা নয়, যে পরের সপ্তাহে তা মুড়ি-মশলার ঠোঙায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে!

কয়েকটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। হিউ-এন-থ্সাঙ্ অন্ধ্রদেশে এসেছিলেন, অথচ অমরাবতীর বিখ্যাত স্তূপের কোনো উল্লেখ করেন নি। হর্ষের রাজধানীতে এসেছিলেন, বিদিশায় রাত্রিবাস করেছেন—অথচ বিদিশা থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে অবস্থিত সাঁচী স্তূপের উল্লেখ কেন নেই তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—'সি-য়ু-কি'-তে? আমরা জানি, সাঁচীতে পাশাপাশি তিনটি স্তূপ আছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন স্তূপের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তথাগতের প্রধানতম দুই শিষ্যের পূতাস্থি—সারিপুত্ত ও মহামৌদ্গল্যায়নের। এ থেকে অনুমান করা চলে সর্ববৃহৎ স্তূপের গর্ভে কী অমূল্য সম্পদ রাখা ছিল, রাখা আছে! এ সমস্যার সমাধান হয় নি, হয়তো হবেও না কোনোদিন। হিউ-এন-থ্সাঙ্ যে তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে সবকিছু বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় সাঁচীর কথা তিনি আদৌ লিখলে আমরা হয়তো সেই অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধান পেতাম। অনুরাধাপুরের থূপারাম স্তূপের মতো সাঁচীও তাহলে হয়তো দাবী করত—তথাগত বুদ্ধের একটি দেহাবশেষ সে বুকে করে ধরে রেখেছে আড়াই হাজার বছর। দুর্ভাগ্য আমাদের—সাঁচী সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। অনুরূপভাবে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজধানী বাতাপীতে তিনি এসেছিলেন বাণিজ্যকেন্দ্র পৈঠান হয়ে। পৈঠান থেকে অজন্তা-গুহার দূরত্ব পঞ্চাশ

ওখান থেকেও অনবরত শিক্ষার্থীরা আসতেন এই সব বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে। এরই পরিণতিতে দেখছি শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর বা অতীশ তিব্বতে যাচ্ছেন, যে প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন 'জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।'

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ শুরু হবার পর বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু পণ্ডিত মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ ও বিগ্রহ নিয়ে তিব্বতে পালিয়ে যান। তিব্বত কয়েক শতাব্দীকাল ভারতীয় সংস্কৃতিকে আশ্রয় দিয়েছিল। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ল এক মহাবিপদে। এশিয়া-বিজয় সম্পন্ন করে চেঙ্গিস্ খান্ তিব্বতরাজকে এক লিপি পাঠালেন—'বিনা শর্তে মঙ্গোল সেনাপতির কাছে আত্মসর্পণ কর। তিব্বতরাজের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। এত যুগ ধরে কেউ তাদের রাজ্য কখনও আক্রমণ করে নি—কিন্তু মহা শক্তিমান চেঙ্গিস খানকে কেমন করে প্রতিহত করা যায়?

তথাগত রক্ষা করলেন। সংবাদ এলো চেঙ্গিস্ খান্-এর আকস্মিক 'এন্তেকাল' হয়েছে। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পেল না তিব্বত। চেঙ্গিসের উত্তরাধিকারী গোদন খান তাগাদা পাঠায়: কই, কি হলো? আত্মসমর্পণের দেরি হচ্ছে কেন?

উপায়ান্তরবিহীন তিব্বতরাজ চীনের মঙ্গোলীয় সম্রাটের বশ্যতা মেনে নিলেন। তিব্বত হলো চীনের করদ রাজ্য।

চীনের কাছে রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করলেও তিব্বত তার নাড়ির যোগ রেখেছিল ভারতের সঙ্গে—ধর্ম ও সংস্কৃতির পর্যায়ে। ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্যের সময়কাল থেকে যখন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হলো, বৌদ্ধধর্ম ক্রমে বিতাড়িত হলো ভারতবর্ষ থেকে তখন তিব্বতেই গিয়ে আশ্রয় নিল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম—বজ্রযান। ততদিনে নানান হিন্দু দেবদেবী স্থানলাভ করেছেন বৌদ্ধধর্মে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, কার্তিক, শিব, কালী, কুবের নূতন নাম-রূপ নিয়ে আসন পেতেছেন বৌদ্ধ শাস্ত্রে এবং শিল্পে। ইতিমধ্যে চীন-ভারতের দুটি গমনাগমন পথেই বাধার সৃষ্টি হয়েছে। স্থলপথে—খাইবার পাস্, কাবুল হয়ে যাবার পথে থানা গেড়েছে ইসলাম; আর সমুদ্রপথে জলদস্যু ও হার্মাদেরা। সে-আমলে ঐ তিব্বতের পথেই চীন-ভারতের যোগাযোগটুকু কোনোক্রমে অবিচ্ছিন্ন ছিল। চীনের মাঞ্চু রাজ-বংশ ও ভারতে কোম্পানীর আমলেও সে পথ অব্যাহত ছিল। তার পরের ইতিহাস আমরা জেনেছি অন্নদাশঙ্করের 'যোগভ্রষ্ট' রচনায়: ১৯০৭ সালের কনভেন্শনে ইংরাজ ও রুশ যৌথভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল তিব্বতের উপর চীনের সোভরেন্টি।

এবং তারও পরের ইতিহাস একেবারে হাল আমলের। দালাই লামার ভাষায় যা নাকি লালচীনের তিব্বত অধিকার এবং লালচীনের ভাষায়—তিব্বতী মেহনতী মানুষের স্বাধীনতা লাভ।

দালাইলামা আশ্রয় পেলেন ভারতবর্ষে।

তিব্বত লাল হয়ে গেল।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

চীনের স্বর্ণযুগ

এই পরিচ্ছেদে আমরা চীন-ইতিহাসের ট্যাঙ-যুগটা আলোচনা করব—প্রায় তিন শ' বছরের খতিয়ান, ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ। প্রশ্ন হতে পারে—চীনা ইতিহাসকে আমরা ছেড়ে এসেছি তৃতীয় শতাব্দীতে, হান-বংশের পতনের পর। তাহলে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করছি কেন? কারণ মাঝের ক'শ বছর যে তিনটি রাজবংশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে—উই, শু, এবং উ তাদের কথা বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তারপর এলো 'ৎসীন', 'সুঙ' এবং 'সুই'-বংশ। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে ঐ সুই-বংশের এক সেনাপতি প্রজাবিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে পীত নদীর তীরে অবস্থিত সাবেক রাজধানী চাং-আন দখল করে বসলেন। নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হলো—'ট্যাঙ' রাজবংশ। প্রায় তিনশ বছর এরা ছিল গদীয়ান হয়ে, আর সেই তিন শ' বছরে চীন-সংস্কৃতি দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিল—শিল্পে-সাহিত্যে-সঙ্গীতে, বাণিজ্যে-ব্যবসায়ে-কৃষিতে এবং বলা বাহুল্য রাজ্যসীমার সম্প্রসারণে।

ট্যাঙ-আমলে চীন: ইতিহাস পুনরুক্তি মুদ্রাদোষের অভ্যস্ত শিকার! চীন এ সূত্রের কোনোও ব্যতিক্রম নয়। কবি চিন-টিয়ার ভাষায়: 'ইতিহাসও যেন বৃত্তাকার, কিছুতেই তাকে মাদুরের মতো গুটিয়ে তোলা যায় না!' প্রতিবারই দেখছি—ক্ষমতার তুঙ্গে উপনীত হয়ে রাজতন্ত্র অত্যাচারী হয়ে পড়ছে, স্বাধিকার-প্রমত্ত সেই রাজশক্তিকে সায়েস্তা করতে জোট বাঁধছে বিক্ষুব্ধ প্রজার দল, বিদ্রোহ করছে। তৎক্ষণাৎ নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে আসছে কোনো রাজপুরুষ। বুকের রক্ত দিয়ে অত্যাচারী প্রায়শ্চিত্ত করছে—বিদ্রোহী নেতাকে জনতা বসিয়ে দিচ্ছে সিংহাসনে; আনন্দে চীৎকার করে উঠছে: নয়া নেতা! যুগ-যুগ জিও!

শুরু হচ্ছে নূতন চক্রাবর্তন। গদীতে অধিষ্ঠিত নয়া-নেতা যেন নতুন মানুষ! প্রথমেই কিছু গরম-গরম প্রতিশ্রুতি—গরীবিয়ানা হটাবার উদাত্ত আহ্বান! বিক্ষুব্ধ সর্বহারার দল শান্ত হয় সেই সোনালী স্বপ্নের প্রতিশ্রুতিতে। লাঠি-সোঁটা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যোয়ালে গিয়ে কাঁধ দেয়। ওদিকে রূপ বদল হতে থাকে নয়া-নেতার। আবার শুরু হয়ে যায় নয়া-সরকারের শাসন ও শোষণ!

সুই-বংশের পতনের পরে মহাকাল নির্লজ্জভাবে পুনরাভিনয় করলেন তাঁর সেই আদ্যিকালের নাটকের! বিদ্রোহী নেতা লি-য়ুয়ানকে গদিতে বসিয়ে জনতা জয়ধ্বনি

দিল। লি-য়ুয়ান অচিরেই পরিবর্তিত হয়ে গেলেন বিদ্রোহী নেতার ভূমিকা থেকে অত্যাচারী রাজার চরিত্রে। শুরু হলো ট্যাঙ বংশের শাসন ও শোষণ, ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে। পিতার মৃত্যুর পর লি-য়ুয়ান-তনয় তাই-ৎসুঙ গদিতে উঠে মনে করলেন কিছুটা শাসন-সংস্কার করা দরকার। না হলে রাজা-প্রজার সম্পর্কে ফাটল ধরবে। হাজার হোক ওঁর পিতৃদেব ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী—ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জওহরলালজীর মতোই জনপ্রিয় নেতা—তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরেও লি-য়ুনানের বিলাস-ব্যসনে আপত্তি করে নি নিরন্ন প্রজার দল। কিন্তু তাঁর নিজের সেই 'ইমেজ' নেই। ফলে সম্রাট তাই-ৎসুঙ গরীবিয়ানা হটানোর উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করলেন নূতন ভূমি-আইন। বলাবাহুল্য ওয়াঙ-ইয়াঙ প্রবর্তিত ভূমিবণ্টন-ব্যবস্থা, যা নাকি চী'ন-রাজ হাজার বছর আগে প্রবর্তন করেছিলেন, তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। সমস্ত জমিই আবার হয়েছে সম্রাটের খাস-সম্পত্তি। প্রজারা তা চাষ করে, করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে। এই নয়া-কানুনটা এরপর খতিয়ে দেখা যাক :

হিসাবটি প্রাঞ্জল। প্রথমেই কৃষি-নির্ভর গ্রামগুলিকে দু'জাতে ভাগ করা হলো—ঘনবসতিওলা গ্রাম এবং স্বল্প-বসতিওলা গ্রাম। ঘনবসতি-গ্রামে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক কৃষক পেল চল্লিশ 'মু' জমি (এক মু = ০'১৬৫ একর)। অর্থাৎ ঘনবসতি অঞ্চলের কৃষক মাথা-পিছু প্রায় ৬½ একর জমি পেল। তুলনায় স্বল্পবসতি-অঞ্চলে কৃষক পেল ১৬ একর জমি। চীনা-চাষীরা এ গরিবী-হটাও মন্ত্রের বাস্তব-প্রয়োগে দু' হাত তুলে নাচতে থাকে : তাই-ৎসুঙ যুগ-যুগ-জিও !

কিন্তু না। হিসাবটা অত সহজ নয়। কর্তা-ব্যক্তিরা বললেন, জমি তো পেলি, একটা 'কিন্তু' আছে ! যা জমি পাচ্ছিস্ তার পাঁচ-ভাগের একভাগ হচ্ছে তোদের 'য়াং য়ে-তিয়েন' জমি, আর বাদবাকি পাঁচভাগের চারভাগ হচ্ছে 'কাও ফেন-তিয়েন' জমি। বুঝলি ?

হতভম্ব চাষীভাই 'যুগ-যুগ-জিও' নাচ থামিয়ে জোড়-হাতে বলে, আজ্ঞে না !

: ব্যাটা মুখ্যু চাষা! শোন ! ঐ পাঁচভাগের একভাগ হচ্ছে তোদের নিজস্ব জমি। বংশ-পরম্পরায় ভোগ করতে পারবি—অজন্মার বছরে বন্ধক দিবি বা বিক্রি করবি। বুঝলি ? আর বাদবাকি জমিটা তোরা চাষ করবি জমিদারের অছি হিসাবে। তোর এন্তেকাল হলে ও-জমি তোর ছেলে পাবে না, সরকারে খাস্ হবে। তবে হ্যাঁ ! ঐ যে তোরা কিছুটা জমির মালিক হলি সেটা তো মৌফৎসে হতে পারে না। মনে আছে তো কনফুশিয়াস্ বলেছেন—'বিনামূল্যে পরদ্রব্য গ্রহণ কর না।' তাই সে-জন্য তোদের একটা মূল্য ধরে দিতে হবে। তাই ব্যবস্থা হয়েছে 'ৎসু-য়ুঙ-তিয়াও।'

গাঁও বুড়ো বলে : আজ্ঞে সেটার মানেটা কি দাঁড়ালো কর্তা ?

: ব্যাটা গো-মুখ্যু! 'ৎস্থ' মানে 'ধান দিয়ে শোধ করা', আর তিয়াও হচ্ছে 'রেশম অথবা বেগার দিয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার'। সোজা হিসাবে—তোরা বৎসরান্তে 'ৎস্থ' দিবি মাথা পিছু দুই 'তান' (১ তান=২২ গ্যালন মাপের পাত্র) ধান, আর 'তিয়াও' দিবি সাত গজ সিল্ক আর বছরে বিশ দিন বেগার। ব্যস্!

গাঁ-সুদ্ধ লোক মাথা নাড়ে। প্রাঞ্জল হিসাবটায় ওদের প্রাণ জল হয়ে যায়। শুধু গাঁও-বুড়ো তার কঙ্কালসার দেহখানা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। জোড়হস্তে বলে, প্রভু! তাহলে আমার কি ব্যবস্থা হবে? আমি তো প্রাপ্তবয়স্ক—অথচ বেগার দেবার মতো দৈহিক ক্ষমতা তো আমার নেই।

রাজকর্মচারী হেসে বলেন, আইন যারা বানায় তারা তোদের মতো গবেট নয়—সব সম্ভাবনার কথাই তারা ভেবে রাখে। বেগার যদি না দিতে চাস তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা আছে। একদিন অনুপস্থিতির জন্য মূল্য ধরে দিতে হবে এক গজ সিল্ক।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সবটাই ফক্কিকারি! 'গরীবি হটাও' মন্ত্রের এ বাস্তব প্রয়োগ আসলে স্রেফ একটা ভাঁওতা! তবু ঐটুকু পেয়েই ধন্য হয়ে গেল নিঃস্ব কৃষক। এতদিনে অন্তত এটুকু জমি তো পাওয়া গেল, যেখানে বংশপরম্পরায় ওরা পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারবে! যে জমিকে দেখিয়ে সাতপুরুষ বাদে ওদের অধস্তন উত্তরপুরুষ ছলছল চোখে একদিন বলতে পারবে: 'সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া!'

বস্তুত ঐটুকু উঞ্ছভিক্ষাতেই ওদের কৃষি উৎপাদন হার গেল বেড়ে। দেশটা মূলত কৃষি-নির্ভর, তাই সামগ্রিক উন্নতি হলো চীনের। প্রাচীন ভারতে যেমন এই যুগে বিভিন্ন নগরকেন্দ্রিক জীবনে কৃষির সমান্তরালে গড়ে উঠেছিল কুটির শিল্প—গান্ধারে, মথুরায়, উজ্জয়িনীতে, বাতাপীতে, কাশীতে, বিদিশায়, পাটলিপুত্রে যেভাবে গড়ে উঠেছিল ভাস্কর্য, স্বর্ণশিল্প, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, গজদন্তশিল্প—ঠিক তেমনিভাবে ট্যাঙ-আমলে চীনের নানান প্রান্তে গড়ে উঠল নানান জাতের 'সিটি-গিল্ড্'। রাজধানী চাং-আনে ছিল এই রকম শ'-দুয়েক ছোট-বড় কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠান। লোয়াঙ-এর পোর্সেলিন, তিংচাও-এর রেশমবস্ত্র, য়ানচাও-এর ব্রোঞ্জের আয়না, চেনতু-র সোনারূপার কারুকার্য-খচিত অলঙ্কার ও পাত্র কিংবা শিয়াংয়াং-এ তৈরি লাক্ষার শৌখীন জিনিসপত্র। নির্মিত হলো গমনাগমনের জন্য চওড়া সড়ক—দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। তার ধারে ধারে পান্থশালা, পুষ্করিণী, বিশ্রামাগার। অশ্বারোহী রাজপ্রহরী দিবারাত্র টহল দিয়ে ফেরে। ক্রমাগত বণিকদল যাতায়াত করে তাদের বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে।

যোগাযোগ বৃদ্ধি পেল বহির্বিশ্বের সঙ্গেও। মধ্য এশিয়া, ব্যাকট্রিয়া, ভারতবর্ষ, পারস্য এবং আরবের পথে দিবারাত্র চলতে থাকে উটের সারি। সে-আমলে যেমন

ভারতবর্ষের বড় বড় বন্দরে—ভৃগুকচ্ছ, সুপার, কালিকট, কাবেরীপট্টম, কাঞ্চী, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি বন্দরে সব সময়েই হাজির থাকত শ'য়ে শ'য়ে দেশী-বিদেশী অর্ণবপোত—সপ্তডিঙা, মধুকর, ময়ূরপঙ্ক্ষী, ঠিক তেমনি কর্মব্যস্ত ছিল চৈনিক বন্দরগুলিও: কোয়াঙচাও (বর্তমান ক্যান্টন), ইয়াং সিকিয়াঙ্-এর সঙ্গে বড় খালটা যেখানে এসে মিশেছে সেই ইয়াঙ চাও, নানকিং অথবা তিয়েনসিঙ। চীনা বণিকেরা সমুদ্রপথে পাড়ি জমাতো চম্পা, যবদ্বীপ, ভারতবর্ষ ঘুরে সুদূর পারস্যে, আরবে। বিচিত্র সে-সব সমুদ্রযান—এক একটা দু-শো ফুট লম্বা, পাঁচ থাক পাল। দেশ থেকে তারা নিয়ে যেত রেশম, পোর্সেলিন, ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র, লোহার যন্ত্রপাতি আর চা। হ্যাঁ, বহির্বিশ্বে ততদিনে চায়ের নেশা ধরেছে। আর সে-সব দেশ থেকে নিয়ে আসত মরিচ, জীরক, আর্দ্রক, কস্তুরী, চন্দন, গজদন্ত—হিমবন্ত-দেশ থেকে চমরি-গরুর লেজের চামর, মৃগচর্মের আসন—যোগীর জন্য যোগাসন, ভোগীর জন্য জিনাসন, এমন কি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-সিংহল-শ্রীবিজয় অরণ্যের হস্তিশাবক।

ট্যাঙ আমল—অর্থাৎ সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী চীনের স্বর্ণযুগ, যেন ভারতের গুপ্ত যুগ। তাঁর আমলে ট্যাঙ সম্রাট ছিলেন পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

ট্যাঙ-আমলে শিল্প-বিজ্ঞান ও ললিতকলা: দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকা মানেই অর্থনৈতিক উন্নতি। তাতে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা যে উন্নততর হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। 'অস্তিদলের হাতে জমবে উদ্বৃত্ত অর্থ। তার অর্থ: মানুষ অবসর পাবে, বড়লোকেরা অথবা সরকার আর্থিক সাহায্য করতে শুরু করবে সেই সব লোককে বা প্রতিষ্ঠানকে যারা শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-ললিতকলায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এটাকে আপনারা বড়লোকের অহৈতুকী ঔদার্য বলতে পারেন, মহানুভবতা বলতে পারেন, অথবা ধনতন্ত্রবাদের বুর্জোয়া-প্যাঁচও বলতে পারেন—সে আপনার যা অভিরুচি। এমন অবস্থাতেই কিন্তু গড়ে ওঠে অপূর্ব সব শিল্প-নিদর্শন—মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, স্মৃতিসৌধ। এমনটা পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে ঘটতে দেখেছি। মিশর, গ্রীস, রোম, বাইজেনটাইন এমন কি এই ভারতবর্ষেও। তখন আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই শাসনকর্তাকে বলি: 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!'—চীনই বা তার ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন? রাষ্ট্রের হাতে, অভিজাত শ্রেণীর হাতে, অস্তিদলের হাতে যেমন-যেমন জমতে থাকে উদ্বৃত্ত অর্থ তেমন-তেমন বিকশিত হতে থাকে—শিল্প, বিজ্ঞান, ললিতকলা। একে একে সেগুলি বিচার করি:

ট্যাঙ-আমল পর্যন্ত চিত্রশিল্পের বিবর্তন: পূর্ববর্তী অধ্যায়ে চীন ও হান আমলের কয়েকটি চীনা শিল্প-নিদর্শনের সঙ্গে তদানীন্তন ভারতীয় শিল্পের

তুলনা আমরা করেছিলাম ; কিন্তু শিল্পকলার মর্মমূলে প্রবেশের চেষ্টা করি নি। এবার সে চেষ্টাই করব—ভারত ও চীনা চিত্র-শিল্পের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

চিত্র-শিল্পের মোটামুটি দুটি ভাগ : আকৃতি ও প্রকৃতি। অর্থাৎ বাহ্যিকরূপ ও অন্তরাত্মা। প্রথমে বাহ্যিকরূপের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যটা তুলনা করি।

চীনা-চিত্রশিল্পের মৌল উপাদান হচ্ছে লিপিকুশলতা, যাকে বলি 'ক্যালিওগ্রাফি।' ওদের লিখিত বর্ণলিপি হচ্ছে চিত্র-কল্প, ধ্বনি-নির্ভর নয়। আর ওদের লিখিত-ভাষা ছিল হাজার হাজার বছর ধরে কথিত-ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিযুক্ত। এ নিয়ে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। ঐ লিখিত বর্ণমালা, লিখিত ভাষাটা ওদের শিখতে হতো অতি যত্নে, দীর্ঘকাল ধরে। সেই বর্ণমালা আয়ত্ত করাই ছিল চাকুরি-ক্ষেত্রে ওদের উন্নতির সোপান। পূর্ববর্তীযুগে রাজপরিবারের আত্মীয়-স্বজনেরাই বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা অথবা ব্যুরোক্রেসীর বিভিন্ন ধাপে চাকরিতে নিযুক্ত হতেন। সুই (ষষ্ঠ শতক) এবং ট্যাঙ (সপ্তম-অষ্টম শতক)-আমলে এ নিয়ম ক্রমশঃ লোপ পেল। পরিবর্তে সারা দেশে সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হলো। তার নাম : 'চিন্ শীহ্'। এ নিয়ম বিংশশতাব্দীর প্রথম কয়-বছর পর্যন্ত চালু ছিল। ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে ছাত্রদল পরীক্ষা দিতে আসত—পাশ করলে তাদের ভাগ্য ফিরে যেত। পরীক্ষায় দুটি আবশ্যিক প্রশ্ন থাকত : হস্তলিপি ও কবিতা রচনা। ফলে সুন্দর হাতের লেখা ম্যাজিস্ট্রেট-হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে সক্ষম! অবাক হবেন না—বর্তমান ভারতবর্ষেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে! বিজ্ঞান-শিক্ষা বিবর্জিত দর্শন-ইংরাজী-পালি-সংস্কৃত অনার্সের ছাত্রও আই. এ. এস্ পাশ করে ট্রম্বে-এ্যাটমিক রিসার্চ অথবা দুর্গাপুর কেমিক্যাল্স্-এর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসছেন! সে যাই হোক, ঐ সময় থেকেই চাকরির খাতিরে সুন্দর হাতের লেখার দিকে একটা সর্বাঙ্গীণ প্রবণতা লক্ষিত হলো। চীনারা লিখতে কলম ব্যবহার করত না, ওরা লেখে তুলি দিয়ে। তুলির সরু-মোটা টানেই ওদের লিপি-কুশলতা। ফলে চীনা-চিত্রে ঐ রেখা বা 'আউট-লাইন' হচ্ছে মৌল উপাদান। যাকে বলি বর্ণিকাভঙ্গ। পশ্চিমজগতে এবং ভারতবর্ষেও রেখা হচ্ছে চিত্রের এক আবশ্যিক অঙ্গ। কিন্তু সেটা চিত্রের শেষ কথা নয়, গোড়ার কথা। প্রতিমার বাঁশ-দড়ি-খড় যেমন তার আবশ্যিক অঙ্গ, কিন্তু সেটা চাপা দিতে হয়। চীনা চিত্রকর তা মানতে রাজী নন ; জলরঙের ছবিতেও বহিরঙ্গ-রেখাকে শেষ পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে চান। রেখা চৈনিক-চিত্রের শুরু ও শেষ কথা।

এবার চিত্রের অন্তরঙ্গের প্রসঙ্গে আসা যাক্ :

পরবর্তীযুগের 'চিন্-শীহ্'-তে অর্থাৎ সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় চিত্রাঙ্কণকেও আবশ্যিক

বিষয় করা হলো। 'জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টার হতে চাও?—ভালো কথা, ছবি আঁকতে জানো?'—ভাবখানা এই! ফলে প্রাণের দায়ে চীনা-যুবক ছবি আঁকা শিখেছে। চাকরি বলে কথা! তার মানে অবশ্য এ নয় যে, আমি বলতে চাইছি—চীনা শিল্পী আভ্যন্তরীণ সৃষ্টির তাগাদায় ছবি আঁকেন নি। মোটেই তা নয়। বস্তুত সেই আভ্যন্তরীণ তাগাদা যাঁর ছিল, যিনি জাত-শিল্পী, তিনিই পরীক্ষায় প্রথম হতেন—দেশকে ছবির মতো সাজাবার সুযোগ পেতেন। দু-একটা কৌতুককর উদাহরণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে—

একবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে চিত্রাঙ্কনের বিষয় ছিল—"সাঁকোর ধারে, বাঁশঝাড়ের কোল ঘেঁষা ভাঁটিখানার ঐ দোকানটা।"

চমৎকার বিষয়বস্তু! পরীক্ষাগারে পরীক্ষার্থীরা কল্পনায় দেখলেন দৃশ্যটা; কেউ বাঁশঝাড়টাকে প্রাধান্য দিলেন, কেউ সাঁকোটাকে, কেউবা সাঁকোর সূত্র ধরে ফুটিয়ে আঁকলেন নদীটাকে। আবার বুদ্ধিমান কেউ ভাবলেন: আরে বাপু! বাঁশঝাড় আর সাঁকো তো রাস্তা চেনাবার অভিজ্ঞান—মূল বিষয়বস্তুটা হচ্ছে ঐ ধেনো-মদের দোকানটা। নিখুঁত করে আঁকলেন সেটাকেই—খড়োচাল ঘর, ভূশয্যালীন মস্তপ এবং লেড়িকুত্তাসমেত! চিত্রশিল্পের ইতিহাসে দেখছি, সে-বছর যে ছেলেটি ফার্স্ট হয়, সে ভাঁটিখানাকে আদৌ আঁকে নি! এঁকেছে সাঁকোটাকে, বাঁশঝাড়টাকে আর বাঁশঝাড়ের একটি নুয়ে-পড়া বাঁশের গায়ে দোদুল্যমান একটি সাইনবোর্ড: তৃষ্ণানিবারণের আয়োজন এই পথে! ব্যস্! ভাঁটিখানা চিত্রে অনুপস্থিত!

এখানেই চীনাচিত্রের বৈশিষ্ট্য! শিল্পীর মূল লক্ষ্য কী? দর্শককে আনন্দ দেওয়া। তা সে দর্শক তখনই আনন্দ পাবে যখন সে শিল্পীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিল্পসৃষ্টিতে অংশ নেবে। দর্শক তার কল্পনার তুলি বুলিয়ে বুঝে নিক—বাঁশঝাড়ের আড়ালে যারা মদিরা-সুন্দরীর আলিঙ্গনে জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে ক্ষণিক-মুক্তি পেতে চায়—তারা পথ চল্‌তি সাঁকোর সামনে আসতে চায় না। সে দুর্ভাগার দল আড়ালেই থাকতে চায়। এ চিন্তা শুধু চীনা শিল্পীই করেন নি। করেছেন ভারতীয় শিল্পাচার্যরা। মনে পড়ছে অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশ—

"কুটিরটি আধখানা লিখিলাম, আর আধখানি গাছের আড়ালে ঢাকিয়া দিলাম; কুটিরের লেখা অংশটি কুটিরের ভঙ্গি বা কুটিরের ভাবের প্রকাশের দিকটা আমাদের দেখাইল, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কুটিরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকু জানাইতে লাগিল কুটিরের ভিতরের ভাব, কুটিরবাসীর নানা লীলা। সে দিকটায় আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি নানা অলিখিত বস্তু।"

এখানেই বাস্তববাদী গ্রীক, রোমক, রেনেসাঁ-যুগের পাশ্চাত্য-ধুরন্ধর শিল্পীদের

সঙ্গে ভারতীয় ও চৈনিক শিল্পী-মানসের পার্থক্য। শেষোক্ত দুজনেই বিশ্বাস করেন : 'মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর দেখায় বসুন্ধরা।' পাল্লা দুটি হাট করে খুলে দিলে শিল্পের মাধুর্য থাকে না।

আর একটা উদাহরণ দেখুন। এবার চিত্রাঙ্কনের বিষয় : "ধনকুবেরের অর্থ-প্রাচুর্য।"

এবারেও দেখছি পরীক্ষার্থীর দল ধনকুবেরের বিলাসিতা দেখাতে হিমসিম্ খেতে থাকে। মর্মরমূর্তি, গালিচা, আসবাব, ঝাড়লণ্ঠন, ফোয়ারা, নর্তকী, সুরাপাত্র—ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। এবারেও দেখছি যে-ছোকরা প্রথম হয়েছে সে ধনকুবেরের প্রাসাদে আদৌ প্রবেশ করে নি। এঁকেছে : একটা ফুটপাথ, একটা উপচীয়মান ডাস্টবিন, আর তার উপর হুমড়ি-খেয়ে পড়া একটা খেঁকি কুকুর আর একটা ভিখারী! এ কীরে বাবা! এই হচ্ছে 'ধনকুবেরের অর্থ প্রাচুর্য'? আজ্ঞে হ্যাঁ, নজর করে দেখুন, চিত্রের এক প্রান্তে আছে কারুকার্যখচিত একটা লোহার গেট-এর আভাস। তার পাল্লাটা আধখোলা; বেরিয়ে এসেছে একজন কিঙ্করীর কাঁকনপরা হাত—যে হাতে একটি পাত্র,তাতে ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী—চিংড়ি মাছের খোলা, কাঁকড়া, মুর্গির চর্বিত-ঠ্যাঙ! ব্যস, আর কিছু নয়। অর্থাৎ শিল্পী যেন দর্শককে ধমক দিয়ে বলছেন : কে হে বাপু তুমি, হরিদাস পাল! ধনকুবেরের বিলাসকুঞ্জে ঢুকতে চাও? তুমি আর আমি তো সগোত্র! দেখতে হলে তোমাকে দেখতে হবে আমার চোখ দিয়ে। সেই বিলাস-ব্যসনের অপচয়টাকে দেখে নাও—আমি যেভাবে দেখেছি, ঐ ফটকটার বাইরে দাঁড়িয়ে, ঐ খেঁকি কুকুর আর লোলুপ ভিখারীটার চোখের আয়নায়![১]

সাবাস! এই হচ্ছে চীনা শিল্পীর শিল্পবোধ!

বাৎসায়ণ প্রণীত কামসূত্রের টীকায় যশোধর প্রসঙ্গক্রমে একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলেছিলেন, ভারতীয় চিত্রের ছয়টি অঙ্গ : রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজনা, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ। এর ভিতর প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ অঙ্গটি হচ্ছে চিত্রের বহিরঙ্গ; বাকি তিনটি হচ্ছে তার অন্তর-অঙ্গ। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যাখ্যায় বলছেন, 'রূপভেদ' হচ্ছে যে বস্তুটাকে আঁকছি তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যটাকে ফুটিয়ে তোলা। সেটা করতে সাহায্য করবে 'প্রমাণ'—ঠিক মতো মাপজোপ। নর ও বানরের আকৃতিগত পার্থক্যটা হচ্ছে 'রূপভেদ' এবং ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আনুপাতিক মাপ হচ্ছে তার 'প্রমাণ'। চিত্রের 'ভাব' ও 'লাবণ্যযোজনা' ব্যাখ্যার বস্তু নয়, অনুভবের। 'সাদৃশ্য' ধারণাটা ভারতীয় চিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ হচ্ছে তুলির উপর শিল্পীর দখল, তার 'এলেম'! চিত্রের এই ষড়ঙ্গ বিষয়ে 'অপরূপা-অজন্তা' গ্রন্থে আমি

বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কী আশ্চর্য দেখুন, ভারতীয় শিল্পাচার্য যখন ঐ সূত্র লিপিবদ্ধ করছেন, সেই পঞ্চম শতাব্দীতেই চৈনিক শিল্পগুরু শিহ্-হো রচনা করেছিলেন শিল্প সম্বন্ধে এক মৌলিক গ্রন্থ : 'কু হুয়া প'ইন লু'। সেখানে তিনিও বলছেন—চিত্রের ছয়টি অঙ্গ, তিনটি বাহ্যিক, তিনটি আন্তর। সেই ছয়টি অঙ্গের চৈনিক নাম, বিখ্যাত ফরাসী শিল্প-বিযারদ De Morant[২] কৃত তার অনুবাদ (ফরাসী থেকে ইংরাজী করেছেন জি. সি. হুইলার) এখানে লিপিবদ্ধ করে দিলাম :

(১) কু ফা য়াং পি : তুলির সাহায্যে বহিরঙ্গের গঠন (=রূপভেদ ?)
Ku fa yang pi—Anatomical structure rendered by brush.

(২) য়িং উ সিয়াং হিং : নির্ভুল বহিরঙ্গরেখা (=প্রমাণ ?)
Ying wu siang hing—Correctness of outline.

(৩) ক'ই য়ুন শেঙ ডুঙ : জীবনছন্দের ব্যঞ্জনাময় আত্মার বিকাশ (=ভাব ?)
K'i yun sheng tung—operation of the spirit producing life's motion.

(৪) সুই লেই ফু ৎসে'ই : বর্ণানুলেপনের যাথার্থ্য (=লাবণ্যযোজনা+সাদৃশ্য?)
Sui lei fu ts'ai—Suitability of colouring.

(৫) কিং য়িং ওয়েই চি' : শৈল্পিক আঙ্গিক (=সাদৃশ্য+লাবণ্যযোজনা ?).
King ying wei ch'i—Artistic composition.

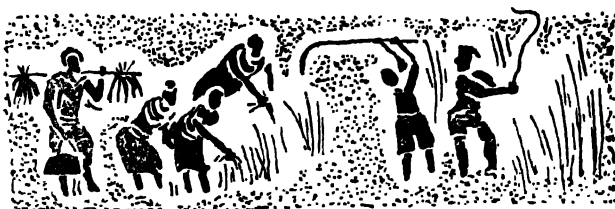
(৬) চ'উয়ান মু ই সী : অনুলিপি ও আলিম্পন চাতুর্য (=বর্ণিকাভঙ্গ ?).
Ch'uan mu i sie—Copying and transmitting designs.

আপনারা হয়তো অভিযোগ করবেন—আমি জোর করে মেলাবার চেষ্টা করছি। ছেড়ে দিন ও-তর্ক ; কিন্তু এ-কথা তো মানবেন—একই যুগে একই চিন্তায় চিত্রের ষড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন ভারতীয় ও চৈনিক শিল্পাচার্য। বৈপরীত্য কিছুটা তো থাকবেই ; যেমন 'সাদৃশ্য' ধারণাটা একান্তভাবে ভারতীয়—তার সমান্তরাল চিন্তাধারা অন্য কোনো শিল্পস্ফূরণে নেই; এবং ঐ 'অনুলিপি'কে প্রাধান্য দেবার চৈনিক প্রচেষ্টার মূলে আছে ওদের 'ক্যালিগ্রাফি', যা নাকি ভারতে অতটা প্রাধান্য পায় নি।

পরবর্তী চৈনিক শিল্পীরা শ্রেণীবিভাগটাকে সংক্ষেপিত করে বললেন, চিত্রের মূল অঙ্গ হচ্ছে তিনটি : শীন (বাহ্যরূপ), লী (আন্তর ব্যঞ্জনা) এবং য়ী (শিল্পীর প্রতীতি)। প্রথম দুটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, শেষ শব্দটি নিয়ে কিছু আলোচনা করি। আচার্য বললেন, শিল্প হচ্ছে শিল্পীর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ফল—শিল্প 'সাব-

জেক্‌টিভ' হতে বাধ্য। শিল্পীকে বাদ দিয়ে শিল্পের অস্তিত্ব নেই। ফলে শিল্পবস্তু তখনই সার্থক হবে যখন শিল্পী নিজে হবেন সার্থক ; শিল্প হবে সুন্দর, যখন শিল্পী নিজের অন্তরশুদ্ধি করতে পারবেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দাস কোনোদিন কালজয়ী-শিল্প রূপায়িত করতে পারবেন না। আপনি-আমি একমত হতে পারি না পারি এই ছিল চীনা শিল্পাচার্যের অভিমত। ধর্মের দিকে এক পা এগিয়ে গেল শিল্পবোধ, শুরু হল শিল্পীর একান্ত-সাধনা।

এই সাধনার উদ্দেশ্যে চৈনিক চিত্রকর ঘর ছেড়ে পথে নেমেছেন। প্রথম যুগ থেকেই নয় অবশ্য। নবম শতাব্দী থেকে এই প্রবণতাটা লক্ষ্য করছি—প্রকৃতিকে জানা ও জানানো। একাদশ শতাব্দীতে এর চরম বিকাশ। মনে হয় এর পিছনে মূলত কাজ করেছে লাও-ৎসের চিন্তাধারা—যিনি মানুষকে প্রকৃতির বুকে ফিরে যেতে বলেছিলেন। বর্তমান পরিচ্ছেদে অবশ্য আমরা আলোচনা করছি অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত। তখনও কন্‌ফুশিয়াস এবং বুদ্ধের বাণীই ছিল শিল্প-উন্মেষের মূল প্রেরণা—শিল্পী তখনও অমন ঘোরতর প্রকৃতি প্রেমিক হয়ে পড়েন নি। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়েছিল কয়েকটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে, সে কথা পরে আলোচনা করব। আপাতত আমরা দেখব কন্‌ফুশিয়াসের প্রভাব—রাজা-প্রজা, পিতা-পুত্র, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক শিল্পচেতনায় কী রূপ পরিগ্রহ করেছিল।



চিত্র—৯
ফসল কাটার দৃশ্য—পোড়ামাটির টালিতে।
[সিচুয়ান প্রদেশে প্রাপ্ত, আঃ প্রথম শতাব্দী]

হান-আমলের একটি চিত্র ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি (চিত্র-৫ক)। আর একটি এখন সংযোজন করা গেল (চিত্র-৯)। সিচুয়ান প্রদেশের চেংতুতে প্রাপ্ত একটি সমাধিমূলে পোড়ামাটির টালির উপর খোদাই করা এটি একটি ফসলকাটার দৃশ্য। সময় খ্রীষ্টজন্মের সমকাল অর্থাৎ সাঁচীস্তূপের নির্মাণকাল। কত অল্প আঁচড়ে শিল্পী তাঁর বক্তব্য বলেছেন! এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, এর সমপর্যায়ের ছবি অজন্তা-বাঘ-সারগুজার হাজার বছরের ইতিহাসে খুঁজে পাই না। চীন ও ভারত

উভয় দেশে সর্বযুগেই দেশের বারো আনা মানুষ ছিল কৃষিনির্ভর ; নবান্ন সবচেয়ে বড় উৎসব। কিন্তু অজন্তা-বাঘের নয় শত বছরের ইতিহাসে সে সত্যটা স্বীকৃত হয় নি। অজন্তার দ্বিতীয় গুহায় হলকর্ষণ উৎসবের একটি ম্যুরাল আছে বটে ; কিন্তু তার কেন্দ্রীয় চরিত্র কিশোর বুদ্ধ—কৃষিজীবী মেহনতি মানুষ নয়। অথচ এই চৈনিক শিল্পনিদর্শনটির সামনে দাঁড়িয়ে কান পাতলে আমরা দু' হাজার বছর পরেও শুনতে পাব গানের রেশ : কর ত্বরা—কাজ আছে মাঠ ভরা !

শিল্পী কু কাই-চি চতুর্থ শতাব্দীর সবচেয়ে নামকরা চিত্রকর। তিনি আঁকতেন জলরঙে, সিল্কের 'স্ক্রোল'-এর উপর। অজন্তার জাতক-কাহিনীর মতো পাশাপাশি আঁকা ছবি, মাঝে মাঝে সুন্দর হস্তাক্ষরে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা। ওঁর গুটি তিনেক স্ক্রোল, বা রেশমী-বস্ত্রের উপর চিত্র পাওয়া গেছে ; যদিও সেগুলি ঠিক তাঁরই আঁকা, না তাঁর



চিত্র—১

'কু কাই-চি' অঙ্কিত 'প্রসাধনরতা রাজকন্যা'—চতুর্থ শতাব্দী

অনুকরণে আঁকা এ-নিয়ে মতভেদ আছে। একটি স্ক্রোলের বিষয়বস্তু—'রাজান্তঃপুরিকাদের প্রতি নির্দেশ'। প্রায় সতের ফুট লম্বা আর মাত্র নয় ইঞ্চি চওড়া এই স্ক্রোলটি। তার একটি প্যানেল অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছি চিত্র-১০এ। পরিচারিকা অন্তঃপুরচারিকার কবরীবন্ধনে ব্যস্ত। রাজকন্যার সম্মুখে দর্পণ, পাশে লাক্ষানির্মিত মঞ্জুষা। নারীমূর্তি দুটি অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘকায় মনে হচ্ছে নাকি ? প্রায় 'এল গ্রেকো'-র

আঁকা ফিগারের মতো। অজন্তার সপ্তদশ বিহারে 'প্রসাধনরতা রাজকন্যার' চিত্রটির সঙ্গে এর তুলনা চলে। চতুর্থ শতাব্দীতে আঁকা এই ছবি দেখে বোঝা যায় যে তার পূর্বেই চিত্রশিল্প যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল।

কু কাই-চির আঁকা ছবির মধ্যে আরও কয়েকটি বিখ্যাত : লো-নদীর জলকন্যা, অর্হৎ বিমলাকীতির আলেখ্য, স্বর্গীয় তিন সুন্দরী, শীতের সুপ্তি থেকে বসন্ত-ড্র্যাগনের উত্থান, বৌদ্ধ সমাবেশ প্রভৃতি।

আমরা আলোচনাটা শুরু করেছি কু কাই-চি থেকে ; কিন্তু তাঁর শত খানেক বছর আগে 'উই শীয়ে'-র নাম বিখ্যাত হয়েছিল—যদিও তাঁর আঁকা কোনো ছবির হদিস পাই নি। অধ্যাপক গাইলস্‌তো ১৩২৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আঁকা একটি 'পোর্ট্রেট'-এর হদিস পেয়েছেন চীনা ইতিহাসে।[৩] কিন্তু সেসব শিল্প-নিদর্শনের কোনোও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেও চিত্রাঙ্কনের এই ধারা অব্যাহত ছিল। তার পরবর্তী দুটি শতকে বরং চিত্রাঙ্কনের স্ফুরণটা আরও প্রকট। এই যুগের দুই দিকপাল শিল্পী হচ্ছেন—উত্তরাঞ্চলের লিস্‌সু-শুন এবং দক্ষিণাঞ্চলের উ তাও-ৎজু। এঁদের কোনো অরিজিনাল কাজ খুঁজে পাওয়া যায় নি—যদিও উ তাও-ৎজুর 'বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ' চিত্রের বর্ণনা বহুস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। সে চিত্রে নাকি শ' তিনেক চরিত্র ছিল। গল্প আছে, সম্রাট নাকি একবার ঐ দুই দিকপাল চিত্রশিল্পীকে তাঁর প্রাসাদে পাশাপাশি দুটি প্রাচীরে দুটি নিসর্গ চিত্র আঁকবার জন্য আহ্বান করেন। সময় দেন এক মাস। লি গভীর নিষ্ঠায় এক মাস ধরে আঁকলেন উত্তরাপথের এক ধ্যানস্তিমিত পর্বত, তুষারশুভ্র শৃঙ্গে মেঘের খেলা। আর উ চুপচাপ বসেছিলেন সারাটি মাস তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে। একেবারে শেষ দিন তিনি প্রাসাদে এলেন, বসলেন একবাটি চাইনিস্‌-ইংক আর একমুঠো তুলি নিয়ে। মাত্র কয়েকঘণ্টায় ছোপ ছোপ তুলির আঁচড়ে এঁকে দিলেন দক্ষিণাঞ্চলের চিং লিঙ নদীর জনমানবহীন এক দৃশ্য। সম্রাট বিচার করতে এসে বলেছিলেন—লি সারা মাস ধরে যা করেছেন, উ তাই করেছেন মাত্র একদিনে!

উ প্রতিবাদ করেছিলেন, কথাটা আপনার ঠিক হলো না মহান সম্রাট। আমরা দুজনেই পুরো এক মাস পরিশ্রম করেছি!

শিল্পী উ তাও-জুর বক্তব্য : মাসের উনত্রিশ দিন তিনি মোটেই নিষ্কর্মা ছিলেন না। অন্তরের ক্যানভাসে মনে মনে চিত্রটি এঁকে চলেছিলেন তিনি—শেষদিনে সেটিকেই মূর্ত করেছেন প্রকাশ্যে।

কাহিনীটির ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। কিন্তু বক্তব্যটি প্রাঞ্জল।

পরবর্তী যুগের শিল্পী ওয়াঙ উয়েই শুধু চিত্রকর নন, তিনি ছিলেন খ্যাতনামা

কবি। হান কান বিখ্যাত হয়েছিলেন শুধু ঘোড়ার ছবি এঁকে। আর ব্যাং স্যুয়ান বিখ্যাত হয়েছিলেন নারী-চরিত্র চিত্রণে। নারীচিত্রের প্রসঙ্গে মনে পড়ছে চৈনিক-চিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্যের কথা :

নগ্ন নারীদেহ কোনো বিখ্যাত চীনা-চিত্রে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। এদিক থেকে শুধু গ্রীক-রোমক-পাশ্চাত্যশিল্পী নয়, ভারতীয় চিত্রকরদের সঙ্গেও চৈনিক শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এক মৌল পার্থক্য অনস্বীকার্য। গ্রীস এবং রোম অনাবৃতা নারীদেহের তরঙ্গভঙ্গিমার পূজারী—চার্চের শাসনে কিছুদিন সেটা চাপা পড়েছিল, কিন্তু রেনেসাঁ যুগে সে পর্দা উঠে যাওয়ায় নগ্ননারীর চিত্রে রেনেসাঁ যুগ ভেসে গিয়েছিল। ভারতবর্ষেও শিল্পস্ফুরণের উষাযুগ থেকেই দেখছি অনাবৃতা অথবা স্বল্প বস্ত্রাবৃতা নারীদেহ শিল্পমানসের অনেকখানি দখল করে আছে। মহেনজো-দারো থেকে ভারহুত-সাঁচী-অজন্তায় নিরাবরণা নারীর আধিক্য দেখেছি। তা হোক তবু পশ্চিমখণ্ড ও ভারতবর্ষে দৃষ্টিভঙ্গির একটা তফাতও নজরে পড়ে। পাশ্চাত্য শিল্পীর চোখে নারী রহস্যময়ী—অনাবৃত নারীদেহে সেই রহস্য-রোমাঞ্চকেই উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন গ্রীস-রোম-রেনেসাঁ শিল্পী। অপরপক্ষে ভারতীয় শিল্পীর চোখে নিরাবরণা নারীদেহ হচ্ছে জগৎ-প্রপঞ্চের আর পাঁচটি সৌন্দর্যের সমগোত্রীয়। একগুচ্ছ ফুল, একটি আল্পনার নক্শা, পাহাড়-অরণ্য-নদীতীরের সৌন্দর্যের সঙ্গে রমণীদেহের সুষমার জাত নির্ণয়ে কোনো মৌল প্রভেদ ধরা পড়েনি ভারতীয় শিল্পীর চোখে। তাই পশ্চিমী শিল্পীর মতো নগ্নিকা মডেলকে নিয়ে তাঁকে যেতে হয় নি স্টুডিওর একান্তে, স্নানাগারে অথবা নির্জন সৈকতে। নগ্ন নারীদেহের সঙ্গে যৌন-আবেদন বা রহস্য-রোমাঞ্চ অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ এ-কথা চূড়ান্তভাবে মেনে নিলে কিছুতেই অজন্তা-শিল্পী ষোড়শ-বিহারে 'মরণাহতা রাজকন্যাকে' অনাবৃতা-রূপে আঁকতে পারতেন না, কারণ ঐ চিত্রে করুণ-রসই একমাত্র উপজীব্য—চিত্রের প্রথম ও শেষ কথা।

অপরপক্ষে চীনা শিল্পী দেখছি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অনাবৃতা নারীদেহ তো দূরের কথা, স্বল্পবস্ত্রাবৃতা যৌবনপুষ্টা রমণীদেহের তরঙ্গ-ভঙ্গিমাও তাঁরা আঁকেন নি—নারীদেহ সর্বদাই প্রচুর বস্ত্রে আবৃত। বন্ধকাম তো নয়ই, মিথুন-চিত্রও চীনা লৌকিক চিত্রে দুর্লভ উপাদান—আমি ধনকুবেরদের গোপন সংগ্রহশালার কথা এ-ক্ষেত্রে অবশ্য বাদ দিচ্ছি—সাধারণ দর্শকের সামনে উপস্থাপিত শিল্প-নিদর্শনের কথাই বলছি শুধু।

চীনা শিল্পে বৌদ্ধ প্রভাব : এতক্ষণ আমরা চীনা-শিল্পে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা কিছু আলোচনা করি নি। এ প্রভাব কী ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তা গ্রন্থের প্রথম মলাটের মানচিত্রটি দেখলেই অনুমান করা যাবে। বস্তুত পূর্বদিক থেকে

এ প্রভাব মধ্য-এশিয়া পার হয়ে তিল তিল করে অগ্রসর হয়। হাড্ডা অথবা বামিয়ানের গান্ধার শিল্প-চেতনা ক্রমশ খাশগড়, খ্যিজিল, কুচা, তুরফান হয়ে অথবা মিরান, তুনহুয়ানের পথে এসেছিল চীন-ভূখণ্ডে। মিরান সম্বন্ধে পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বলছেন, "কী বৌদ্ধ শ্রমণ, কী সাধারণ মানুষ সকলেই ভারতীয় ধর্ম মেনে চলে··· সকলেই ভারতীয় ভাষায় কথা বলে এবং ভারতীয় গ্রন্থ পাঠ করে।"[৪] মিরানে প্রধান দর্শনীয় বস্তু একটি গোলাকৃতি চৈত্যগৃহ, যার উপর দিকের প্রাচীরে 'বিশ্বান্তর জাতক-কাহিনী' বিধৃত—যা আঁকা আছে অজন্তার প্রথম গুহায়। খোটানের শিল্প-নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে স্যার স্টাইন তো স্বীকারই করেছেন "এই অবলুপ্ত সংস্কৃতি দণ্ডায়মান ছিল নিছক ভারতীয় সংস্কৃতির বনিয়াদের উপর।"[৫]

এইভাবে মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে ভারতীয় শিল্পপ্রভাব ক্রমশঃ মূল চীন ভূখণ্ডে গিয়ে পৌঁছায়। এ প্রভাব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করছি উত্তর-চীনের তা-তুং-এ অবস্থিত এক সারি গুহায়, যার নাম 'য়ুন-কাং।' এগুলি পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে নির্মিত। অধিকাংশ গুহাতেই আছে বুদ্ধ মূর্তি, অথবা মহাযান ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবী। সপ্তম ও অষ্টম বিহারে হিন্দু দেবদেবীও স্থান পেয়েছেন—শিব অথবা বিষ্ণু। এই য়ুন-কান গুহার অদূরে অবস্থিত 'তান তাও'-এ আছে পাঁচটি গুহাবিহার; সেখানেও আছে একই রকম ভারতীয় মূর্তি। এই সব ভাস্কর্যে গান্ধার ও মথুরা শিল্পীদের অনুকরণ করা হয়েছে যথেষ্ট—কিন্তু বুদ্ধমূর্তিতে এখানে গান্ধার অথবা মথুরা শিল্পের অনুকরণে কোঁকড়ানো চুল নেই।

প্রসঙ্গত বলি, বুদ্ধমূর্তির প্রচলিত আকৃতির সঙ্গে স্বয়ং তথাগতের মুখাবয়বের সাদৃশ্য কতখানি তা কেউ অনুমান করতে পারে না, কারণ আমরা জানি বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর পাঁচ-সাতশ' বছর কেউ বুদ্ধমূর্তি গড়ে নি। কার কল্পনায় ঐ দীর্ঘায়ত লোচন, প্রলম্বিত কর্ণদ্বয়, উন্নত নাসিকা এবং কুঞ্চিত কেশদাম প্রথম রূপায়িত হয়েছিল ইতিহাস তা জানে না—শরদিন্দু 'চন্দন মূর্তি'-তে তার একটি অপূর্ব সাহিত্যিক অনুমান করেছেন মাত্র।

'শিয়াং তান-শান' পার্বত্য গুহায় গুপ্ত ভাস্কর্যের প্রভাব প্রখর। পীত নদীর দক্ষিণ পারে 'লুং-মেন' সঙ্ঘারামেও আছে অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি এবং জাতক কাহিনী। এগুলি অধিকাংশই ভাস্কর্যের নিদর্শন।

প্রাচীর চিত্রের সব চেয়ে ভালো উদাহরণ পাওয়া গেছে 'তুন-হুয়াঙ'-এ। স্যার আর্ল স্টাইন দীর্ঘদিন গবেষণা করে সেখানকার গুহাপ্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রের আলোক-চিত্র সংগ্রহ করে সভ্যজগতকে উপহার দিয়েছেন।[৬] তা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় সেই মরুপ্রান্তরবাসী শিল্পীদের কী পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেছেন ভারতীয় শিল্প আচার্যেরা।

প্রায় সাত আটশ বছর ধরে ঐ গুহা-প্রাচীরের চিত্রাবলীতে ভারত, পারস্য, মধ্য-এশিয়া এবং চৈনিক শিল্পের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছে। দু একটি উদাহরণ নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

তুন-হুযানের ২৫৭ নং গুহায় সহস্র-বুদ্ধের যে মূর্তিগুলি আঁকা হয়েছে তার সঙ্গে অজন্তা দ্বিতীয় বিহারে আঁকা চিত্রের অদ্ভুত মিল। কিন্তু তুনহুয়ানে আঁকা 'কোয়াং-ইন'-এর চিত্রটির সঙ্গে (চিত্র-১১) অজন্তা প্রথম গুহার 'অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি'র সাদৃশ্য অনস্বীকার্য (চিত্র-১২)। 'কোয়াং-ইন' হচ্ছেন 'অবলোকিতেশ্বর'-এর চৈনিক রূপান্তর, দুটি চিত্রের ভঙ্গিমাতেও অদ্ভুত মিল—সেই একই ভঙ্গি, একই মুদ্রা, একই



চিত্র—১১

'কোয়াং ইন' (অবলোকিতেশ্বর), তুনহুযান, ২৫৭ নং গুহা মধ্যএশিযা



চিত্র—১২

অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি, অজন্তা, প্রথম গুহা, হায়দ্রাবাদ

বিগলিত করুণার ব্যঞ্জনা। প্রশ্ন হতে পারে—এটা কি করে সম্ভব? কোথায় হায়দ্রাবাদের অজন্তা গুহা আর কোথায় উত্তর-চীনের তুন-হুয়াং! সে যুগে তো আর পিকচার-পোস্টকার্ড পাঠানোর রেওয়াজ ছিল না। তুন-হুয়াঙ শিল্পী কেমন করে হদিস পাবেন অজন্তায় অবস্থিত প্রাচীর চিত্রের?

জবাবে বলব—তুন-হুয়াঙ হচ্ছে চীন-ভারত বাণিজ্য পথে চীনের সিংহদ্বার। শত শত বৎসরব্যাপী যে সহস্র সহস্র বণিক, পরিব্রাজক, শ্রমণের দল রেশম-সড়ক ধরে ভারত থেকে চীনে গেছেন তাঁরা ঐ তুন-হুয়াঙে না-হোক তিন চার রাত বিশ্রাম নিয়ে গেছেন। বহু যাত্রী ভারতীয় চিত্র শিল্পের উপর আঁকিয়ে নিয়ে যেতেন—তুন-

হুয়াঙ-শিল্পী ভারতে পদার্পণ না করেও তা নিবিড়ভাবে দেখেছেন, কপি করে নেবার সুযোগ পেয়েছেন।

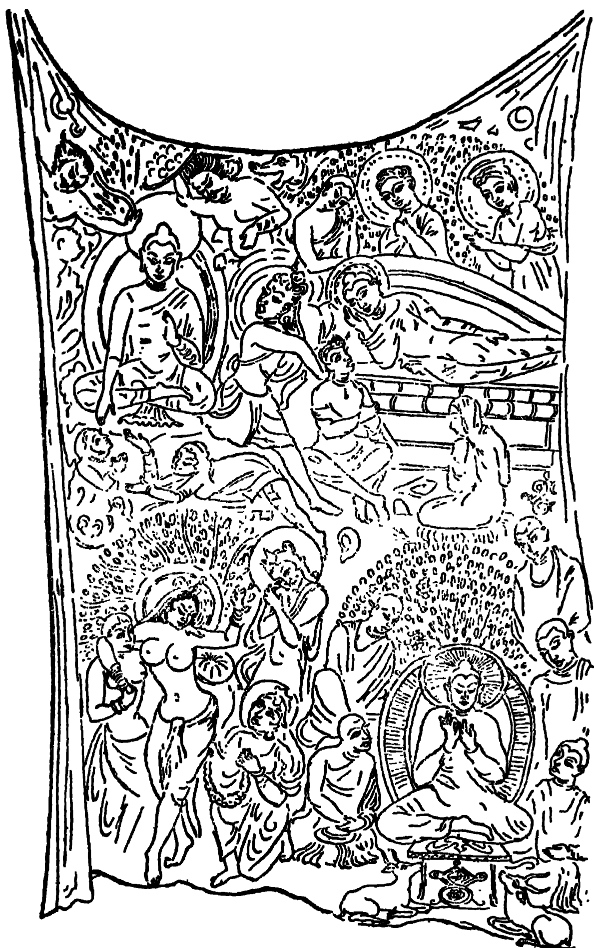
বিশ্বাস করতে পারছেন না? ঐতিহাসিক প্রমাণ দাখিল করছি:



চিত্র—১৩
রাজা অজন্তার ছবি দেখছেন—খিজিল গুহা, মধ্যএশিয়া

চিত্র-১৩ হচ্ছে খ্যিজিল সঙ্ঘারাম থেকে সংগৃহীত একটি চিত্রের অনুলিপি। খ্যিজিল হচ্ছে তাকলামাকান মরুভূমির উত্তরে রেশম-সড়কের উপর একটি জনপদ, কুচা নগরীর সন্নিকটে। চিত্রে দেখছি, রাজার সম্মুখে একটি রেশমের 'স্ক্রোল' মেলে ধরে তথাগত বুদ্ধের জীবন কথা তাঁকে বোঝানো হচ্ছে। এখানে লক্ষণীয় যে, রাজা ও রাজ-অমাত্যের আলেখ্যে পারসিক ও মধ্যএশিয়ার শিল্পের ছাপ পড়লেও অমাত্যের হস্তধৃত আলেখ্যে—অর্থাৎ চিত্রের ভিতর চিত্রে যে ছবি, সেটি নির্ভেজাল অজন্তা স্টাইলে আঁকা। প্রায় অনুকরণই বলা যায়। পাঠক যাতে চিত্রের ভিতর চিত্রটিকে ভালো করে যাচাই করতে পারেন তাই ঐ অংশটুকু আবার বড় করে এঁকে দিলাম (চিত্র-১৪)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওতে গৌতম বুদ্ধের জীবনের চারটি প্রধান ঘটনা আঁকা হয়েছে। অজন্তার চারটি বিখ্যাত চিত্রের / ভাস্কর্যের অনুকরণে। নিচে বামদিকে লুম্বিনীকাননে শালভঞ্জিকাভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম (অজন্তা দ্বিতীয় গুহার উত্তর-প্রাচীরে আঁকা বিখ্যাত 'সপ্তপদগমন'-চিত্রের অনুকরণ); নিচে দক্ষিণে সারনাথ মৃগদাবে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' (শুধু অজন্তা নয়, সারা ভারতে বিভিন্ন যুগে এ দৃশ্য লক্ষাধিক খোদিত); উপরে বামে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায়

তথাগতের মার-বিজয় (অজন্তা প্রথম গুহার অন্তরালে অবস্থিত চিত্র এবং ষড়-বিংশতি গুহাচৈত্যে অবস্থিত ভাস্কর্য তুলনীয়) এবং উপরে দক্ষিণদিকে মহাকারুণিকের



চিত্র—১৪

[চিত্র—১৩-তে যে ছবিটি রাজাকে দেখানো হচ্ছে তার বিস্তারিত রূপ]

কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ (অজন্তা ষড়বিংশতি-গুহায় খোদিত ভাস্কর্য তুলনীয়)। মোট কথা, মধ্যএশিয়ার গুহায় আঁকা ঐ চিত্রে—ঐ চিত্রের ভিতরকার চিত্রে, সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কী-ভাবে ভারতীয় শিল্প প্রভাব চীন-ভূখণ্ডে প্রবেশলাভ করেছিল—সেটা গিয়েছে ঐ রেশম-সড়ক বেয়ে, রেশমের ক্রোলে, বণিক এবং পরিব্রাজকদের মাধ্যমে। একা হিউএন-ৎ্সাঙ ৬৫৭খানি হস্তলিখিত পুঁথি ছাড়াও সহস্রা-

থিক চিত্র চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আর একটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। এবার যে নমুনাটি পেশ করছি সেটি তুরফান মরুস্থানে বেজেক্‌লিক গুহাভ্যন্তর থেকে সংগৃহীত (চিত্র-১৫)। বিষয়বস্তুটা ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের—চিত্রের উপরে লেখা শ্লোকটা সংস্কৃত ভাষায় এবং ব্রাহ্মী-অক্ষরে, অথচ কয়েকটি ফিগারে অবিমিশ্র চীনা তুর্কিস্থানের প্রভাব, আঙ্গিকে ট্যাঙ-আমলের চৈনিক-শিল্পের ছাপ। নকশায় মধ্যএশীয় এবং পারসিক প্রভাব যথেষ্ট। বিষয়বস্তুটা বুঝিয়ে বললে শিল্পবস্তুটির রসাস্বাদনে সুবিধা হতে পারে :

ব্রাহ্মী-অক্ষরে লেখা শ্লোকটি বাংলা হরফে দাঁড়ায় --

"হস্তাশ্বেন সুবর্ণেন নারীভি রত্নমুক্তাভিঃ
সন্নাস জিনানাম্ পূজার্থম্ উদ্যানম্ শ্রেষ্ঠিণাকৃতম্।[৭]

অর্থাৎ, "হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ, স্ত্রীলোক, মুক্তাদি রত্ন সমভিব্যাহারে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলাম, ছয়বার বিজয়ীকে অর্ঘ্যদানের উদ্দেশ্যে।"

এর পিছনে একটি কাহিনী আছে। বুদ্ধদেব তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মে বোধিসত্ত্বরূপে ধনবানের গৃহে জন্মলাভ করেছিলেন। সেই সেই যুগের বুদ্ধাবতারের সন্ধানে তিনি বারে বারে যাত্রা করেছিলেন এবং তাঁর যাবতীয় জাগতিক সম্পদ অর্ঘ্যস্বরূপ দান করেছিলেন। এইভাবে ছয় জন্মে ছয়বার আত্মসমর্পণ করে শেষ জন্মে তিনি কপিলাবস্তুতে শাক্যসিংহরূপে অবতীর্ণ হন এবং মহাপরিনির্বাণে চরম সিদ্ধিলাভ করেন।

চিত্রে দেখছি, সর্বনিম্নে বামদিকে দুইজন বণিক নতজানু হয়ে অর্ঘ্যদান করছেন—স্বর্ণ, মুদ্রা, অশ্ব, অশ্বতর এবং উট। তার উপর বুদ্ধদেবের এক দেব-অনুচর তাঁর তরফে দান গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়ে আসছেন। তার উপর বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির ও পদ্মপাণির দুটি আলেখ্য। মূল বুদ্ধমূর্তির বামে (দর্শকের দক্ষিণে) উপরদিকে তাঁর দুই প্রধান শিষ্য—সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের চিত্র। তার নিচে বুদ্ধের দুই দেব-অনুচর এবং সর্বনিম্নে দুজন স্থানীয় বণিক—যাদের রূপায়ণে পারসিক ও চৈনিক শিল্পের প্রভাব অনস্বীকার্য।

পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করব ঐ সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন-এর চিত্র দুটির দিকে। বুদ্ধদেবের এই দুই শিষ্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই চিত্রটি অঙ্কনের অন্তত হাজার বছর আগে। তাঁদের কোনো পোর্ট্রেট ছিল না এতদিন, যেমন ছিল না স্বয়ং বুদ্ধদেবের। তাহলে খিজিল শিল্পী কি-ভাবে ওঁদের চিত্র আঁকলেন? নিছক কল্পনায়? না কি রাফায়েল যেমন 'এথেন্স-এর পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা' আঁকতে গিয়ে তদানীন্তন দিকপালদের মডেল স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন [লিওনার্দোর অনুকরণে প্লেটোকে, মিকেলাঞ্জেলোর অনুকরণে হেরাক্লিটাসকে, ইত্যাদি]। সেইভাবে

তিনি খ্যিজিল সঙ্ঘারামের কোন্ দুজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় অর্হৎকে মডেল করেছিলেন? এই নিয়ে অনুসন্ধান করতে বসে একটি অদ্ভুত জিনিস আমার নজরে পড়ল। খ্যিজিল গুহায় অঙ্কিত সারিপুত্ত ও মহামৌদ্গল্যায়নের মুখাবয়বের সঙ্গে অজন্তা সপ্তদশগুহার অন্তরালে আঁকা 'সারিপুত্তের পরীক্ষা' চিত্রে ঐ দুই মহাশ্রমণের মুখাবয়বের অদ্ভুত



চিত্র—১৫
বণিকের অর্ঘ্যদান—বেজকলিক গুহা, মধ্যএশিয়া

সাদৃশ্য! কৌতূহলী পাঠকের জন্য নির্দেশ রেখে যাই: খ্যিজিল সঙ্ঘারামের চিত্রটি দেখতে পাবেন হেনরিক জিমার লিখিত 'দ্য আর্ট অফ ইণ্ডিয়ান এশিয়া' গ্রন্থের ৬১৩নং প্লেটে এবং 'সারিপুত্তের পরীক্ষা' চিত্রের সন্ধান পাবেন অজন্তার যে কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থে।

এ-থেকে আমার বিশ্বাস খ্যিজিল-শিল্পী সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়নের আলেখ্য রূপায়িত করেছিলেন অজন্তা-সপ্তদশগুহায় আঁকা ঐ দুই মহা-অর্হৎ-এর চিত্রের নিখুঁত অনুলিপি দেখে দেখে!

মোটকথা ভারত-চীন-পারস্য এবং মধ্য-এশিয়ার শিল্পচেতনার এক অপূর্ব সং-মিশ্রণ ঘটেছে এই চিত্রটিতে। আর বণিক-নগরীর পক্ষে চিত্রের বিষয়-নির্বাচনেও কী বিচক্ষণতা!

দশম শতাব্দীর পরে তুন হুয়াঙ-গুহায় তান্ত্রিক-প্রভাব পরিলক্ষিত—বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের নানান দেব-দেবী এসে আসন পেতেছেন ওখানে; কিন্তু বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা সেটা আলোচনা করব না। এখনও পর্যন্ত আমরা আছি চীনের ট্যাঙ-আমলে। ট্যাঙ-যুগ শেষ হচ্ছে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে।

শুধু একটি কথা বলে যাই এ পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে: অজন্তা বিষয়ে অনু-সন্ধান করতে বসে আমি একজন মাত্র শিল্পীরও নামের সন্ধান পাই নি। ভারতীয় শিল্পী এ বিষয়ে উদাসীন বলে কোনোও নির্দেশ ভাবীকালের জন্য রেখে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অপরপক্ষে চীনা-ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্য-রকম—তাই চীন-ভূখণ্ডে যেসব ভারতীয় শিল্পী শিল্পস্বাক্ষর রেখে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অন্তত তিনটি নাম আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের প্রণাম জানিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করি। তাঁরা হলেন—শাক্যবুদ্ধ, বুদ্ধকীর্তি, এবং কুমারবোধি।[৮]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চ-রাজবংশ, স্থঙ, মঙ্গোল ও মিঙ

আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে আমাকে দোষ দেবেন না—এ পুনরুক্তি দোষের জন্য আমি দায়ী নই, দায়িত্ব মহাকালের। ট্যাঙ-সাম্রাজ্যও শেষ হলো সেই চিরাচরিত মন্দাক্রান্তার গুরু-গুরু লঘু-লঘু ছন্দে। প্রথমেই প্রজাবিদ্রোহের সেই চারমাত্রার গুরু-গুরু বিদ্রোহ-গর্জন, তারপরেই লঘুপদে এলেন নবীন কর্ণধার—অত্যাচারী সম্রাটকে গদিচ্যুত করে উঠে বসলেন সিংহাসনে। ধ্বনিত হলো প্রজাবৃন্দের কণ্ঠে 'যুগ যুগ জিও' ধ্বনি! নবীন নেতা গরীবিয়ানা হটাবার চিরপুরাতন প্রতিশ্রুতি দিলেন নবীন কণ্ঠে। শুরু হলো নূতন যুগের শাসন ও শোষণ। 'ট্র্যাডিসন' অব্যাহত রইল।

ট্যাঙ-যুগ শেষ হলো নবম-শতাব্দীর শেষ পাদে। ৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সাংতুন ও হোনান প্রদেশে হলো চরম দুর্ভিক্ষ, কিন্তু রাজকর্মচারীদের ট্যাক্স-আদায়ের অত্যাচার রইল অব্যাহত। যারা সময়মত ট্যাক্স জমা দিতে পারল না তাদের প্রকাশ্যে চাবকানোর হুকুম হলো। সেটাই হচ্ছে উটের পিঠে শেষ খড়ের টুকরো।

বিদ্রোহটা শুরু হল সাংতুঙে, কিন্তু অচিরে প্রসারিত হয়ে গেল হোনান, হুপেই, কিয়াংসিতে। বিদ্রোহী নেতা চাষীঘরের ছেলে—হোয়াং চাও। প্রায় ছয় লক্ষ বিদ্রোহী নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজধানীতে। সম্রাট পালিয়ে গেলেন সিচুয়ান-অঞ্চলে। সামন্তরাজাদের সাহায্যে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন সেখান থেকে। হোয়াং চাও আত্মহত্যা করলেন—সম্রাট নিজেও নিষ্কৃতি পেলেন না। যে-সব সামন্তরাজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তাদেরই একজন তাঁকে হত্যা করে চড়ে বসল সিংহাসনে। বিদ্রোহীরা ধ্বনি দিয়ে ওঠে—নয়া নেতা যুগ যুগ জিও!

কিন্তু যুগ যুগ টিকে থাকার উপাদান কোথায় পাবে ঐ সব গদিসর্বস্ব ক্ষমতা লোলুপেরা? মাত্র পঞ্চাশ বছরের ভিতরে—৯০৭ থেকে ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর পাঁচ-পাঁচবার রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা হাত-বদলালো। চীনা ইতিহাসে এই অর্ধশতাব্দীর সংজ্ঞা পঞ্চবংশাবলীর যুগ।

তারপর এলো 'স্থঙ'-এরা; দু'দলে। উত্তর-স্থঙ আর দক্ষিণা-স্থঙ। ওরা চীনের ইতিহাসকে টেনে নিয়ে গেল ৯৬০ থেকে ১২৭৯—প্রায় তিনশ বছর। এই তিন সাড়ে তিন শ' বছরে লড়াই-কাজিয়া সত্ত্বেও চীনের আভ্যন্তরিণ উন্নতি হচ্ছিল

ঠিকই। দ্রুত ফলনের 'চম্পা' ধান এ-যুগেরই অবদান। সরকার ইতিমধ্যে খনি-সম্পদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে আনলেন। ট্যাঙ-আমলের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ সোনা রূপা, তামা, লোহা সংগৃহীত হতে থাকে। ফলে শিল্পেরও উন্নতি হলো যথেষ্ট। উন্নতিটা দক্ষিণাঞ্চলেই হলো বেশি, উত্তরাঞ্চলে রাজধানীর কাছাকাছি সাধারণ মানুষের বরং আর্থিক অবনতিই ঘটল। দাসপ্রথা ব্যাপক আকারে দেখা দিল, রাজ-পরিবার ও সামন্ততন্ত্রের উপর-মহলে বিলাস-ব্যসন গেল বেড়ে।

ত্রয়োদশ-শতাব্দীর শেষাশেষি চীনে দেখা দিল এক নূতন উপদ্রব—মঙ্গোল জাতির আক্রমণ। ঐ শতাব্দীর প্রথম্ দিকেই ইতিহাস-বিখ্যাত চেঙ্গিস্ খান বিস্তৃত অঞ্চলের অধিপতি হয়ে হাত বাড়ালেন চীনের দিকে। চীন-সম্রাট ঐ দুর্ধর্ষ অশ্বা-রোহী বাহিনীকে প্রতিহত করবার আদৌ কোনো চেষ্টা করলেন না। ইন্‌চিন (বর্তমান পিকিং) থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে সরে এলেন দক্ষিণাঞ্চলের কাইফেং-এ। মঙ্গোলবাহিনী চীনের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে নেমে এলো দক্ষিণাঞ্চলে—হোপেই, শাংসি, সাংতুং-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করল। কিন্তু চীন-বিজয় সুসম্পন্ন করার আগেই মৃত্যু হলো চেঙ্গিস খান-এর (১২২৭)। তাঁর পৌত্র কুবলাই পিতামহের আরব্ধ কাজ শেষ করে চীনের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বসলেন। প্রায় একশ বছর ওরা টিকে ছিল চীনের সিংহাসনে।

মঙ্গোলযুগে চীন : সমসাময়িক ইউরোপীয় ইতিহাসে মঙ্গোলযুগের চীনকে প্রায় স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার কারণ এই যুগেই ইউরোপ চীন-সাম্রাজ্যের জ াকজমকের একটা বিস্তারিত বিবরণ পেয়েছিল মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। তার আগে পর্যন্ত নাবিকদের কথায় বড় একটা কেউ বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। মার্কো পোলোর বাড়ি হচ্ছে ইটালির ভেনিসে। কিশোর বয়সে তিনি বাবা-কাকার হাত ধরে রওনা হয়েছিলেন পূব-মুখো। ইটালি থেকে সমুদ্রপথে জেরুজালেম, সেখান থেকে আর্মেনিয়া, পারস্য হয়ে পামীর গ্রন্থি পাড়ি দিয়ে এসে উপস্থিত হলেন, খাশগড়ে। তারপর সেই সহস্রাব্দী চিহ্নিত পথরেখা—যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন কুমারজীব, ধর্মক্ষেম—দেশে ফিরেছিলেন হিউএন্-থ্সাঙ। তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণ দিয়ে—খোটান, লবনর, তুন-হুয়ান পার হয়ে চীনের রাজধানীতে। যাত্রা শেষ হলো রওনা হবার সাড়ে তিন বছর পরে। দীর্ঘ ষোলো বছর মার্কো পোলো চীনদেশে ছিলেন। ওদের ভাষাটা যত্ন নিয়ে শিখেছিলেন। রাজসভায় পদস্থ কর্মচারী ছিলেন তিনি, কুবলাই খান-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সম্রাটের আদেশে বহুবার তাঁকে দৌত্য-কার্যে যেতে হয়েছিল ; একবার গিয়েছিলেন বর্মামুলুকে। ক্রমে মার্কোর মন ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল ; কিন্তু সম্রাট অনুমতি দিলেন না। বেচারি মার্কো

মর্মাহত। শুধু দেশের জন্য মন কাঁদত বলেই নয়, তিনি স্বদেশে না ফিরলে তাঁর এই বিচিত্র ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার কথা য়ুরোপ জানবে কেমন করে? অবশেষে হঠাৎ এক দুর্লভ সুযোগ এসে গেল তাঁর।

মার্কো পোলোর ঘরে-ফেরার কাহিনীটা ফাঁদিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে—বস্তুত এ-নিয়ে একটা ঐতিহাসিক উপন্যাসই ফাঁদা যায়; কিন্তু আপাতত আমি নাচার! সংক্ষেপে সে কথা বলি :

মার্কো তখন প্রায় বৃদ্ধ। দেশে ফেরার আশা একরকম পরিত্যাগই করেছেন। হঠাৎ একদিন চীন-সম্রাটের দরবারে এসে উপস্থিত হলেন পারস্যরাজ আর্গনের দূত। আর্গন সম্পর্কে ছিলেন কুবলাই-এর ভাই—পারস্যের গভর্নর। সংবাদবহ এক বিচিত্র সংবাদ এনেছে : আর্গনের প্রধানামহিষী সম্প্রতি নাকি দেহরক্ষা করেছেন। পাট-রাণী ছিলেন মঙ্গোলীয় বংশসম্ভূতা। রাণীর মৃত্যুশয্যায় আর্গন নাকি মৃত্যুপথযাত্রিণীকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি পুনরায় বিবাহ করলে কোনো মঙ্গোলীয় কুমারীর পাণিপীড়ন করবেন! তাই সংবাদবহ এসেছে একটি সুলক্ষণা মঙ্গোলীয় কুমারীর সন্ধানে! চীন-সম্রাট কুবলাই একেবারে মুগ্ধ! অহো! কী স্বদেশপ্রেম! আর্গন সত্তর বছরের বৃদ্ধ, তবু কী প্রচণ্ড তাঁর স্বদেশপ্রীতি! কুবলাই স্বয়ং নির্বাচন করলেন রাজান্তঃপুরের এক কিশোরী সৌভাগ্যবতীকে। সত্তর বছরের ভ্রাতার জন্য এক অনাঘ্রাতা সপ্তদশী!

রাজকন্যাকে সুদূর পারস্যরাজ্যে প্রেরণের যাবতীয় ব্যবস্থা হলো। সম্রাট মার্কো পোলোকে আদেশ দিলেন কন্যাকর্তা হিসাবে সঙ্গে যেতে। মার্কো হাজার হলেও সাহেব! ষোলো বছর চীন দেশে বাস করেও ঐ সপ্তদশী কুমারীর সৌভাগ্যকে অভিনন্দন জানাতে পারলেন না। কিন্তু সম্রাটের আদেশ! যেতে হলো তাঁকে। স্থলপথে নয়, অর্ণবপোত সাজিয়ে মালয় ভারতবর্ষ বেষ্টন করে রওনা দিলেন পারস্যের পথে। এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ঐ সপ্তদশী কুমারীটির সঙ্গে বৃদ্ধ মার্কো পোলোর কী জাতীয় আলাপচারী হয়েছিল সেকথা দিনলিপিতে লিখতে ভুলেছেন মার্কো। তিনি শুধু লিখে গেছেন কাহিনীর উপসংহার। পারস্যে উপনীত হয়ে কন্যাকর্তা সংবাদ পেলেন ইতিমধ্যে দেশপ্রেমিক বৃদ্ধ আর্গনের এন্তেকাল হয়েছে। সিংহাসনে উঠে বসেছেন তাঁর যুবক পুত্র, এতদিনের যুবরাজ। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বহু জাতের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন মার্কো পোলো—কিন্তু মৃত্যুর মাধ্যমে মহাকালের রসবোধের এমন সূক্ষ্ম পরিচয় তিনি এর আগে পান নি! চীন-সম্রাটের আদেশ তো আর মার্কো অবহেলা করতে পারেন না। নবীন পারস্যরাজকে শুনিয়ে দিলেন চীন সম্রাটের আদেশ : পারস্যের রাজার হাতে আমার এই কন্যাটিকে সম্প্রদান করবার আদেশ পেয়েছিলাম।

আপনি আমাকে দায়মুক্ত করুন !

সম্রাটের আদেশ পালন করে সুন্দরী অষ্টাদশীর পাণিপীড়নে যুবক পারস্যরাজ যে বিব্রত বোধ করেছিলেন এমন ইঙ্গিত মার্কো পোলো অবশ্য দিয়ে যান নি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে !

মার্কো পারস্য থেকে সোজা দেশে ফিরলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী পাঠে ইউরোপ ধারণা করল—কুবলাই খান-এর চীন হচ্ছে মর্ত্যের স্বর্গরাজ্য ! ভালোর চেয়ে তাতে মন্দই হলো বেশি। সাম্রাজ্যলোলুপেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল এ খবরে। আসলে চীনের প্রকৃত ইতিহাসে কিন্তু পাচ্ছি অন্যচিত্র—আপাত-ঐশ্বর্যের তলায় সে সময়েনাভিশ্বাস উঠেছে চীনের !

মঙ্গোল-যুগের চীনে সৃষ্ট হয়েছে চারটি শ্রেণী। প্রথম ধাপে নবাগত মঙ্গোলীয় শাসকেরা, তারা আছে রাজসুখে। দ্বিতীয় স্তরে তাদের অনুগ্রহভাজন পশ্চিমাঞ্চলের 'সেমু'রা। তৃতীয় ধাপে উত্তরাঞ্চলের বিজিত 'হান'রা এবং চতুর্থত দক্ষিণাঞ্চলবাসীরা। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে সংখ্যাগুরু শোষিতের দল—চীনের প্রকৃত অধিবাসী। উত্তরাঞ্চলে হানদের উপর খবরদারী করত নবনিযুক্ত মঙ্গোলীয় রাজপুরুষের দল। স্থানীয় লোকের পক্ষে সন্ধ্যার পর পথে বার হওয়া মানা—তারা বাজারে যেত নির্দিষ্ট সময়ে, মঙ্গোলীয়দের বাজার করা হয়ে গেলে। স্থানীয় লোকের বাড়িতে অস্ত্র সঞ্চয়, অশ্বশালায় অশ্ব রাখা নিষিদ্ধ হলো। দক্ষিণদেশের অবস্থা আরও করুণ। কুড়িটি পরিবারকে একত্র করে তৈরি হলো এক একটি 'চিয়া'; আর প্রতিটি চিয়ায় একজন করে 'চিয়াপতি' নিযুক্ত হলো—মঙ্গোলীয় রক্ত আছে যার ধমনীতে। ঐ রাজকর্মচারী বিনা নোটিশে স্থানীয় লোকের অন্দর-মহলে সরাসরি ঢুকে যেতে পারত—দেখতে যেত কোনো ষড়যন্ত্র কেউ কোথাও পাকাচ্ছে কি না। অন্দর-মহলে ঢুকে কোনো সুন্দরী বা যুবতীর সাক্ষাৎ পেলে তার উপর আদেশ হতো সন্ধ্যার পর ঐ রাজকর্মচারীর শয়নকক্ষে উপস্থিত হয়ে জবানবন্দী দিতে হবে। জবানবন্দী শেষ হতে অনেক সময় রাত-কাবার হয়ে যায়—ভোর রাতে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে দলিতযৌবনা হতভাগিনীর দল। প্রতিবাদ করার উপায় নেই—কারণ নয়া-আইন তৈরি হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে—দেশের প্রচলিত আইন ঐসব বিদেশী মঙ্গোলদের উপর প্রযোজ্য নয়। কোনো মঙ্গোলীয়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ এলে তা বিচার করবার অধিকার একমাত্র মঙ্গোলীয় বিচারকের !

এ অত্যাচার ভারতবর্ষেও হয়েছে। ইংলণ্ডেশ্বরী ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে শাসনদণ্ড গ্রহণ করার পর ঠিক ঐ জাতীয় আইন প্রচলন করেছিলেন—কোনো ইংরাজ কিছু অপরাধ করলে তার বিচার দেশীয় বিচারপতি ভারতীয় আইনে করতে

পারতেন না। এই কালা-কানুনের বিরুদ্ধে লর্ড রিপনের আইন-সচীব স্যার সি. পি. ইলবার্ট আইন-সভায় একটি বিল আনেন—'ইলবার্ট-বিল'। শাসকরাজকর্মচারীদের প্রবল আপত্তিতে সে বিল আইনে পরিণত হয় নি।

মঙ্গোলযুগ নাকি চীনের স্বর্ণযুগ। অথচ দেখছি, সে-যুগে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতিই হয়েছিল। ক্ষেত-খামার, জমি-জেরাতের মালিক হয়ে পড়ল মঙ্গোল অথবা তাদের তাঁবেদারেরা। হিসাবে দেখছি, রাজধানী চাঙ-আন্ অথবা ফুকিয়েন এলাকায় চাষযোগ্য যত জমি ছিল তার শতকরা আশিভাগের মালিক মাত্র পঞ্চাশটি পরিবার।

দক্ষিণাঞ্চলেও দেখছি, এক একটি বড় ভূম্যধিকারীর অধীনে দশ বারো হাজার ভাগচাষী কাজ করছে। 'ভাগচাষ' শব্দটা অবশ্য গৌরবে ব্যবহৃত, কারণ মঙ্গোল শাসন শুরু হবার পরে প্রথম চল্লিশ বছরের খতিয়ান অনুযায়ী করভারের বোঝা বিশ-গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার কারণ ছিল—বিজয়ী শাসকবৃন্দ কৃষিকার্য ব্যাপারটাই বুঝত না। চাষবাস ওরা সাতপুরুষে করে নি; ফলে যে-হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনের কথা ওদের ধারণাতেই আসে নি।

ফলে যা হবার তাই হলো। এত বড় সাম্রাজ্য, এত পুলিশ, এত মিলিটারি, এত খবরদারী—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ঘরে ঘরে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হতে থাকে। মাত্র এক শতাব্দীর ভিতরেই শেষ হলো মঙ্গোল-যুগ। চেঙ্গিস্ আর কুবলাই-য়ের বংশধরদের চলে যেতে হলো মঙ্গোলিয়ার মরু-অঞ্চলে।

এবার বিদ্রোহটা দেখা দিল হোনান-প্রদেশে। ইতিহাসে এই প্রজাবিদ্রোহের নাম 'লাল-পাগড়ি' বিদ্রোহ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর 'হলুদ-পাগড়ি'দলের নাটকটা পুনরায় অভিনীত হলো চীনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। ফলাফলটাও একই রকম। স্বদেশী নেতা প্রতিষ্ঠা করলেন নূতন রাজবংশ—মিঙ-বংশ। প্রায় তিনশ' বছর তারা ছিল গদী আঁকড়ে, ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪।

মঙ্গোলদের তাড়িয়ে যিনি স্বাধীন স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর নাম তাই-ৎসু। সদ্যস্বাধীন প্রজাবৃন্দকে তিনি নানান-জাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রথমেই। হুকুমজারী করলেন—যে সব মঙ্গোল এবং সিমু সিভিলিয়ানরা এতদিন বিদেশী সরকারের স্বার্থে দেশ শাসন করছিল, চীনাদের অন্দর-মহলে ঢুকে বিপ্লবীদের গলা টিপে মারছিল, আর তাদের মা বোনের উপর অত্যাচার করছিল তাদের স্ব-স্বপদে বহাল রাখা হলো! সদ্য-স্বাধীন সরকারের যুক্তিটি প্রাঞ্জল! ঐ ধুরন্ধর আমলা-গোয়েন্দা-টিকটিকি এবং 'চাইনিস-সিবিল-সার্ভিসে'র লৌহস্তম্ভ ছাড়া সদ্যস্বাধীন দেশটাকে শাসন করা যাবে কি করে? এতে অবাক হবার কিছু নেই—এ যুক্তি অন্য দেশে, অন্য যুগে, অন্য সদ্য-

স্বাধীন মানুষকেও শুনতে হয়েছে। কোথায়, কবে—সে কথা অবান্তর!

চীন সংস্কৃতির বিবর্তন: লড়াই কাজিয়া যতই হোক চীনের জ্ঞানী-গুণী-শিল্পী-সাধকের দল অতন্দ্রসাধনায় চীনা-সংস্কৃতিকে নানাভাবে বিকশিত করে গেছেন এই কয়েক শত বছরে। সেই হিসাবটা এবার দেখা যাক:

বিজ্ঞান-জগতে এই যুগে তিনটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে, যার অবদান বিশ্ব-সভ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে কৃতজ্ঞচিত্তে। প্রথমত সুঙ-বংশের মাঝামাঝি বৈজ্ঞানিক পি-শেঙ আবিষ্কার করলেন ছাপাখানার ছোট-ছোট সঞ্চরণশীল 'টাইপ', যা দিয়ে বই ছাপানোর শিল্পে যুগান্তর এলো। পাণ্ডুলিপির যুগ থেকে ছাপা-বইয়ের যুগ বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিরাট উত্তরণ। ক্রমে এই আবিষ্কার তির্যকপথে ইউরোপ-খণ্ডে একদিন এসে পৌছালো।

দ্বিতীয় আবিষ্কার বারুদ। কাঠকয়লা, গন্ধক আর সল্ট-পিটর সহযোগে বারুদ বানানোর কায়দাটা চীনই শিখিয়েছে দুনিয়াকে। তাতে মানব সভ্যতার অগ্রগতির বদলে পশ্চাদপসরণ হয়েছে বলে যদি অভিযোগ তোলেন তবে চীন নাচার। দোষ প্রয়োগকর্তার। নোবেল-সাহেবের ডিনামাইট আবিষ্কার, অটো হান বা এনরিকো ফার্মির পরমাণুর অন্তর বিদারণও সেক্ষেত্রেও সমপর্যায়ের অপরাধ!

তৃতীয় আবিষ্কার হচ্ছে—চুম্বকের সাহায্যে কম্পাস তৈরি করা। ঐ চুম্বক আবিষ্কার করে চীনা নাবিকের দল যে সব অভিযান চালিয়েছিল তার খতিয়ান ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কল্যাণে আমরা এদেশে ঠিক মতো জানতে পারি নি। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অথবা ভাস্কো-দা-গামার উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রমণের অর্ধশতাব্দী পূর্বে চীনা-নৌ-সেনাপতি চেঙ-হো যেভাবে একাধিকবার দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন তার কথা আমরা স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়িনি। পঞ্চদশ-শতাব্দীর প্রথম দিকেই প্রায় সাতাশ হাজার নাবিক নিয়ে এবং বাটখানি অর্ণবপোত ভাসিয়ে চেঙ-হো সমুদ্রপথে চম্পা (কোচিন-চীন), শ্রীবিজয় (যবদ্বীপ), সুবর্ণভূমি (বর্মা), পারস্য, আরব এমন কি আফ্রিকার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত এসেছিলেন। কলম্বাস তাঁর যাত্রা শুরু করার পূর্বেই ঐসব রাজ্যে চীনা উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব অধ্যায়েই বলেছি—নবম শতাব্দীর পর থেকে চীনা-শিল্পীরা ক্রমশ যেন প্রকৃতি-প্রেমিক হয়ে পড়লেন। পাহাড়-অরণ্য-নদীদৃশ্যই শুধু নয়, বিভিন্ন জাতের পাখি, পশু, পতঙ্গ, ফুল নিয়ে মেতে উঠলেন তাঁরা। কী তীক্ষ্ণ তাঁদের দৃষ্টি, কী বাস্তববোধ, কী অনুসন্ধিৎসা! রেনেসাঁ-যুগের ইউরোপ যখন গ্রীক-গাথা, ওল্ড-টেস্টামেন্টের নাটকীয় দৃশ্য অথবা তদানীন্তন রাজা-রাজরার ছবি আঁকতে ব্যস্ত—নরনারীর দেহ-সুষমায় মুগ্ধ, বিশেষ করে অনাবৃতা যুবতী নারীদেহের তরঙ্গ

ভঙ্গিমায় বিমোহিত, তখন প্রকৃতি-প্রেমিক চীনা শিল্পী আঁকছেন—ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, প্রজাপতি, পাখি, গঙ্গাফড়িং, মাছ, কেন্নুই এমন কি ব্যাঙ! আরও দুটি জিনিস কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি নিসর্গ চিত্রগুলিতে; প্রথমত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চীনা-শিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন বিহঙ্গদৃষ্টিতে, যাকে বলি গরুড়াবলোকন, 'বার্ডস্ আই-ভিয়ু'। পর্বতের উপরে চড়ে নিচের দিকে তাকানোটাই পছন্দ করছেন চিত্রকর, পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পতঙ্গ-দৃষ্টিতে দেখা পর্বতদৃশ্য নয়। দ্বিতীয়ত কুয়াশায়, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণায় বা জলীয় বাষ্প কিংবা মেঘে প্রাকৃতিক দৃশ্যে দূরের অংশটা যে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যায় এ সত্যটা তাঁরা শিল্পে প্রতিফলিত করেছিলেন সেই যুগেই। গত শতাব্দীতে ফরাসী শিল্পীর দল—স্যুরা, মিলে, কামীল পিসারো, কোরো প্রভৃতি যে সত্যটা অনুধাবন করেছিলেন—কয়েক শ' বছর আগেই সেটা চীনাশিল্পীরা ধরেছিলেন তাঁদের তুলির ডগায়। লাইন ব্লকে সে চাতুর্য আমি দেখাতে পারব না। আপনাদের কৌতূহল থাকলে ঐ যুগের চৈনিক প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রামাণিক গ্রন্থ ঘেঁটে দেখতে হবে।

ট্যাঙ আমলের দিকপাল শিল্পী যেমন উ তাও-ৎজু, তেমনি সুঙ আমলের সবচেয়ে নামকরা চিত্রকর হচ্ছেন লি লুংমিয়েন। সরকারী কর্মচারী হিসাবে তিনি ত্রিশ বছর চাকরি করেন, কিন্তু ছুটির দিনে একপাত্র মদ ও কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চলে যেতেন নির্জন পাহাড়ে। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি পুরোপুরি ভবঘুরে আর্টিস্ট হয়ে যান। অসংখ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য, বৌদ্ধ চিত্র এবং জীবজন্তুর ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা একটি চিত্রের অনুলিপি এখানে সংযোজন করে দেওয়া গেল



চিত্র—১৬
একজন অর্হৎ ও একটি সিংহী
শিল্পী: লি লুং-মিয়েন



চিত্র—১৭
কাশীরাজ সুদাস ও সিংহী
অজন্তা সপ্তদশ গুহা (সুতসোমজাতক কাহিনী)

(চিত্র ১৬)। লয়েন্স বিনিয়ন বলছেন চিত্রটির শিরোনাম 'একজন অর্হৎ ও একটি সিংহ'। চিত্রটি বিখ্যাত; কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থ ঘেঁটে সন্ধান পাইনি—কে এই অর্হৎ এবং কেন এই সিংহ। ফলে ভয়ে ভয়ে আমার ব্যক্তিগত গবেষণার 'আন্দাজি-

সূত্রটা' নিবেদন করি।

অজন্তার সপ্তদশ-গুহায় একটি প্রাচীর-চিত্র আছে—আছে নয়, ছিল—সেটি সুতসোম-জাতক কাহিনী। কাহিনী অনুসারে কাশীরাজ সুদাস মৃগয়ায় গিয়ে একটি সিংহীর প্রেমে পড়েন; সুদাস সিংহীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর একটি সন্তান হয়; যার নাম সৌদাস। অজন্তা চিত্রে দেখছি, রাজা সুদাস একটি প্রস্তরাসনে আসীন এবং সিংহী তাঁকে প্রেম নিবেদন করছে (চিত্র-১৭)। লি-লুং-মিয়েন এই জাতক কাহিনীটি আদৌ জানতেন কি না, অজন্তার ঐ চিত্রটির কোনো অনুলিপি তিনি আদৌ দেখেছিলেন কি না সেটা আপনাদের বিবেচ্য।

এই যুগের আর দু'জন দিকপাল শিল্পী হচ্ছেন কুয়ো শীহ্ এবং মি ফেই। 'কুয়ো শীহ্' বোধহয় ওঁর নাম নয়, উপাধি; কারণ তার অর্থ "রাজ-গুরু"। তাঁরা এঁকেছেন প্রাকৃতিক দৃশ্য, যার অনুলিপি করবার ক্ষমতা আমার নেই।



চিত্র—১৮
'রাজা বৌদ্ধধর্মের সূত্র ছিঁড়ে ফেলছেন'
শিল্পী: লিয়াঙ কা'ই

আমি বরং শিল্পী লিয়াঙ কা'ই-এর একটি চিত্র অনুকরণ করবার চেষ্টা করি

(চিত্র-১৮)। আগেই বলেছি, এই যুগে চীন দেশে 'চ্যাঙ' মতবাদ, (ধ্যান-বাদ, যা নাকি জেন-বৌদ্ধমতের জনক) চীনে বিস্তার লাভ করে। চ্যাঙ মতবাদের আদি জনক বোধকরি ভারতীয় ধর্মপ্রচারক বোধিধর্ম। এই মতবাদ বলছে—ত্রিপিটক পাঠ করে আর মন্ত্রোচ্চারণ করে নির্বাণলাভ সম্ভবপর নয়, চরম সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে ধ্যানের জগতে। লিয়াঙ কাই-এর চিত্রটির ক্যাপসান 'ষষ্ঠরাজ সূত্র ছিঁড়ে ফেলছেন'। নূতন রাজবংশের ছয় নম্বর রাজা হুই নেঙ এই ধর্মমত গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্মের সূত্রগুলি নাকি ছিঁড়ে ফেলেন। চিত্রে তাই দেখানো হয়েছে। নব-উপলব্ধির উত্তেজনায় রাজা হুই যেভাবে লাফিয়ে উঠে ধর্মগ্রন্থ ছিঁড়ে ফেলেছিলেন শিল্পীও যেন তেমনি ক্ষণিক উন্মাদনায় তিন মিনিটের ভিতর শেষ করেছেন তাঁর চিত্র। তিনি যেন একটানে ছবিটি এঁকেছেন—কাগজ থেকে তুলি তুলবার সময়ও পান নি। ফলে চিত্রটি হয়েছে—প্রায় যেন কার্টুন!

বিজ্ঞান ও শিল্পের কথা বলেছি, সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসি এবার। এই কয় শ' বছরে চীনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসেছে এক নতুন জাতের কবিতা—তার নাম 'ৎসু'। সুঙ-যুগেই তার আবির্ভাব, পরে ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করে। শিং চি-চি এই যুগের একজন বিখ্যাত 'ৎসু' কবি। তিনি ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের এক দেশপ্রেমিক কবি। তাঁর কাব্যে স্বদেশপ্রেমের কথাই বেশি করে আছে। সুঙ ও মঙ্গোলযুগে নাটক ও গীতিনাট্য বিশেষ প্রসারলাভ করে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠল শহরাঞ্চলে। আমাদের দেশে ইংরাজ-আমলে নাট্যকার গিরীশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে যেমন স্বাধীনতাস্পৃহা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, প্রায় তেমনিভাবেই বিদেশী মঙ্গোলযুগে চীনা নাট্যকার বিদেশী অত্যাচারীদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে নানান নাটক মঞ্চস্থ করেন। কোয়াং হান-চিং-এর লেখা 'নিদাঘদিনে তুষারপাত' আমাদের 'নীলদর্পণের' সঙ্গে তুলনীয়। কোয়াং-এর নাটকে দেখছি একটি সুন্দরী বিধবাকে সামন্ততন্ত্রের ক্ষমতাশালী এক কামাতুর সমাজপতি বলাৎকার করতে চাইছে। বিদ্যাসাগর মশাই ঐ সময় চীনে উপস্থিত থাকলে বোধকরি তাঁর আর এক পাটি চটি খোয়া যেত! ওয়াং শী-ফুর লেখা 'পশ্চিমের ঘর' আর একটি লোক-রঞ্জক নাটক। এখানে প্রতিবাদের লক্ষ্যস্থল ছিল সমাজ-ব্যবস্থার গ্লানি। নাটকের নায়ক ও নায়িকা সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে হৃদয়হীন অভিভাবকদের প্রাচীন ঘটকালি প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হয়। মোট কথা, এইসব নাটকের মাধ্যমে প্রাচীন সংস্কার বিচূর্ণ করবার দিকে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

এ-যুগে চীনা সমাজে আরও একটি লোক-রঞ্জক শাখার উদ্ভব হতে দেখছি। 'পেশাদার গল্প বলিয়ে।' চীনা উপন্যাসে এর উল্লেখ বারে বারে পেয়েছি—পার্ল বার্কের

'শুড আর্থ'-এও তার উল্লেখ আছে। কথাকোবিদ ভারতবর্ষেও ছিল, মেঘদূতেও তার উল্লেখ আছে ; কিন্তু পথের ধারে মূল্য ধরে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিছক গল্প শোনার ব্যাপার বোধহয় এদেশে ছিল না—আমরা বরং শুনেছি কথকতা, ভাগবত বা কীর্তন—গল্প শোনার উদ্দেশ্যে ততটা নয়, যতটা স্বর্গে যাবার লোভে ! 'জলকন্যা' এবং 'তিন রাজ্যের রোমাঞ্চ-গাথা' এই জাতীয় লোকরঞ্জক গল্প।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজতন্ত্রের অবসান

মঙ্গোল যুগের পরে এসেছিল মিঙ-যুগ ; তার ব্যাপ্তি—১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪। তার পর চীনের ইতিহাসে এলো মাঞ্চু যুগ। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ১৯১১-তে যার সমাপ্তি। আমরা ওদের শাসনকালের প্রথম একশ' বছর বাদ দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে চীনের ইতিহাসটা পর্যালোচনা করব। প্রথম একশ' বছরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যথেষ্ট আছে—শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে; কিন্তু সে আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ থাক। চীনারা মাঞ্চুদের ঠিক আপনজন কোনো কালেই ভাবে নি। ওরা এসেছিল উত্তরাঞ্চল থেকে। 'দ'খ্‌নেদে'র প্রতি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব তাদের বরাবরই ছিল। শাসিত সম্প্রদায়ের পুরুষদের মাথার সামনের দিকটা কামিয়ে পিছনে টিকি রাখার আইন এই আমলেই প্রচলিত হলো। মেয়েদের পা কাপড় জড়িয়ে বেঁধে রাখার নির্মম সৌন্দর্য-চর্চার ব্যাপক প্রচলনটাও এ যুগেরই অবদান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে সময় ইংরাজ কুঠিয়াল ড্রেক-সাহেবকে কড়া চিঠি লিখে জানালেন ব্যবসায়ের অজু-হাতে ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ মেরামতের অনুমতি তিনি বেনিয়া ইংরেজ কোম্পানিকে দিতে রাজী নন তার প্রায় বছর চল্লিশ পরের কথা। মাঞ্চু-সম্রাট চিয়েন লুং প্রায় একই ভাষায় একটি চিঠি লিখেছিলেন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জকে। জানিয়েছিলেন—বিনা শুল্কে ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার অজুহাতে তিনি ইংরাজকে চীন-ভূখণ্ডে কোনো কুঠি গড়তে দিতে নারাজ। চীন-সম্রাট প্রসঙ্গত লিখলেন "ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে এক-মাত্র ইংরাজই যে এই সুবিধা চাইছে তা নয়, আপনাকে এ সুযোগ দিলে অন্যান্য ইউরোপীয় বর্বর জাতিগুলি একই দাবী জানাবে।...আমার আদেশ অমান্য করে যদি আপনাদের কোনো জাহাজ চীনে উপনীত হবার দুঃসাহস দেখায় সে-ক্ষেত্রে তাদের কোনো চীনা-বন্দরে ঢুকতে দেওয়া হবে না! তার অর্থ আপনার বর্বর নৌ-সেনাপতিকে দীর্ঘ সমুদ্র-পথ অতিক্রম করে পুনরায় দেশে ফিরে যেতে হবে। আশা করি এ-কথা আপনি বলবেন না যে, সময়ে আপনাকে সাবধান করা হয় নি।"[১]

বর্বর জাতি! বর্বর নৌ-সেনাপতি! কথাগুলো পড়ে আজ মনে হতে পারে যে, সম্রাট বুঝি গায়ে-পা-তুলে-দিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছেন—আসলে

কিন্তু তা নয়। মধ্যযুগের চীন মনে করত ওরাই মানব-সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে এক-মাত্র সুসভ্য জাতি—ভারত, পারস্য প্রভৃতি আরও কিছু সুসভ্য জাতি তাদের আশে-পাশে আছে বটে—কিন্তু ইউরোপে শুধু অসভ্য বর্বরজাতির বাস।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা মিশর, রোম, বাইজেণ্টাইন, পারস্যের সম্রাটদের শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজগরিমায় অধিষ্ঠিত থাকতে দেখেছি—কিন্তু মধ্যযুগ পার হয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত সে গরিমা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় রক্ষিত হয়েছিল একমাত্র চীনের ক্ষেত্রে। জাপানের নিরবচ্ছিন্নতা আরও বিস্ময়কর—সেখানে রাজবংশের পরিবর্তন পর্যন্ত হয় নি; কিন্তু জাপান ছিল ছোট্ট রাজ্য—সাম্রাজ্য গড়বার স্বপ্ন সে তখনও দেখে নি। চীনের মতো তার মহিমা ছিল না। চীনের সেই বজ্র-বাঁধুনি রাজগরিমার বনিয়াদে প্রথম ফাটল দেখা দিল একেবারে উনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে। প্রাচীনপন্থী চীনা রাজনৈতিক নেতারা বনিয়াদের ঐ ফাটল চিহ্নটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না—ওঁরা সেটা বিশ্বাসই করে উঠতে পারলেন না। যাঁরা এ দুর্বলতার কথা বুঝলেন তাঁরাও নীরব রইলেন—ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীস্বার্থে।

কিন্তু বনিয়াদে ফাটল দেখা দেওয়ার অর্থই হলো বহিরঙ্গে ক্রমে তার চিহ্ন দেখা যাবে। চীনেও তাই হলো। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত মাঞ্চু সরকার দু শ' বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করার পর হঠাৎ পরপর কয়েকটি ভূ-কম্পনে নড়ে উঠল। পঞ্চাশ বছরের ভিতরেই বোঝা গেল ক্ষয় রোগে ভিতরটা তার ঝাঁঝরা হয়ে গেছে—রাজতন্ত্রের অবসান অবশ্যম্ভাবী। এই ভূ-কম্পনগুলি হলো: আফিং যুদ্ধ, তীরযুদ্ধ, তাইপিং বিদ্রোহ এবং বক্সার যুদ্ধ!

আফিং যুদ্ধ: এদেশে ইংরাজ-বেনের নীলচাষের সঙ্গে চীনদেশে তাদের আফিং ব্যবসায়ের প্রচেষ্টার বেশ মিল আছে। আমরা নীলের বিষে নীল হয়ে গিয়েছি, ওরা আফিঙের নেশায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমরা নীলচাষ করতে চাই নি, ওরাও আফিং খেতে চায় নি। দুজনকেই বাধ্য করা হয়েছিল। অত্যাচারের ধরনটা একই—চাবুক, কয়েদ, গুম-খুন আর সেই একই সুরে নারীকণ্ঠের আর্তি 'ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, আমারে পদিপিসীর সাথে ঘরে যাতি দাও!' তবু কিছুটা তফাৎ আছে। নীলচাষে ভুগেছে একমাত্র কৃষকশ্রেণী, যদিও তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ; আর আফিঙের বিষে নীল হয়ে গেছে চীনের সর্বশ্রেণীর মানুষ—সর্বনাশটা জাতিগতভাবে। আফিং ব্যবসায়ের মূলে ইংরাজের যে যুক্তিটা ছিল সেটা বুঝে নেওয়া দরকার:

চীন থেকে ইংরাজকে তখন নানান জাতের কাঁচামাল কিনতে হতো। কী দিয়ে কিনবে? এতদিন কিনতে হচ্ছিল কাঁচা রূপো দিয়ে। এতে ইংরাজ-বেনিয়ার রূপোর ভাঁড়ার খালি হয়ে যাবার উপক্রম হলো। তাই ইংরাজ ফন্দি করলো চীনাদের জাতি-

গতভাবে আফিঙের নেশা ধরাতে হবে। ও-দেশে আফিং রপ্তানি করে রূপোর ঘাটতি মেটাবে। যে-কথা সেই কাজ। ভারতের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর আদেশ হলো আফিঙ-চাষ শুরু কর, আর সেটা চীনে পাঠাও। ১৭৮১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তৈরি এক জাহাজ আফিং প্রথম পাঠালো চীনে। ইতিপূর্বে ও দেশে আফিং বেশি চলত না। ইংরাজের প্রচেষ্টায় চীনে আফিঙের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেল। মাঞ্চু সম্রাট চিয়েন লুং-এর শাসনকালের গোড়ার দিকে চীনে প্রতি বছর চারশ' কুইণ্টাল আফিং আসত, কয়েক বছরের ভিতরেই সেটা বেড়ে গিয়ে হলো চার হাজার কুই-ণ্টাল[২]। দশগুণ বৃদ্ধি! এতদিন চা, রেশম অথবা অন্যান্য কাঁচামাল আমদানি করতে ইংরাজ-বেনেকে দাম মেটাতে হচ্ছিল কাঁচা রূপো দিয়ে—দশ বছরের ভিতরেই অবস্থাটা পালটে গেল। এখন চীনকেই আফিঙের দাম মেটাতে হয় রূপো দিয়ে! মাঞ্চু সম্রাট বুঝলেন—সব সর্বনাশের মূল ঐ আফিং। রাজ্যের অর্থনীতিই শুধু নয়, দেশের স্বাস্থ্যও নষ্ট হতে বসেছে ঐ আফিঙের জন্য। ১৮০০ সালে তিনি ফতোয়া জারী কর-লেন: অতঃপর চীনদেশে বাইরে থেকে আফিং আনা নিষিদ্ধ করা হলো!

কিন্তু বিষক্রিয়া ইতিমধ্যে অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। আফিঙের নেশায় পেয়ে বসেছে অনেককে; এমনকি অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদেরও—অর্থাৎ যাঁরা কার্যকরী করবেন সম্রাটের ঐ আদেশ। আর ইংরাজও জানত এমন বিপদ আসতে পারে, তাই তারা ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে—প্রভাবশালী চীনা রাজ-কর্মচারীদের এ-ব্যবসায় এজেন্সি দিয়ে বসে আছে। ফলে সম্রাটের আদেশকে নস্যাৎ করার নানা ব্যবস্থা হলো। কন্ট্রোল, র‍্যাশন, কর্ডনিং ইত্যাদি কীভাবে এড়িয়ে যেতে হয় ঘুষখোর আমলা আর চোরা-কারবারীরা সেটা সব দেশেই সব যুগেই জানে। চোরা-কারবার অব্যাহত আছে দেখে আমেরিকাও এসে ব্যবসায়ে যোগ দিল। তুর্কস্থান থেকে ওরাও জাহাজ-জাহাজ আফিং চীনের বন্দরে পাঠাতে শুরু করল। চিরকাল যা হয়—আফিঙের জাতীয় দায় মেটাবার শেষ চাপটা গিয়ে পড়ল সাধারণ মানুষের ঘাড়ে, চাষীদের স্কন্ধে। কৃষকদের করভার কয়েক বছরের ভিতর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেল—এক-দশকের ভিতর পঞ্চাশ থেকে আশীভাগ।[৩]

অনেক খুঁজে সম্রাট একজন সৎ, নিষ্ঠাবান্, দেশপ্রেমিককে নিয়োগ করলেন ঐ আফিং-দৈত্যকে বধ করার কাজে। ক্যাণ্টন বন্দর দিয়েই আসছে চোরা-আফিং; তাই অসীম ক্ষমতা দিয়ে ঐ অফিসারটিকে তিনি নিযুক্ত করলেন ক্যাণ্টনের কমিশনাররূপে। সম্রাট লিখিতভাবে তাঁকে জানালেন: যেমন করে পার বন্ধ কর ঐ আফিং আমদানি! তোমার প্রতিটি কার্যের অগ্রিম অনুমোদন এতদ্বারা জানিয়ে রাখলাম।

এই সৎ এবং আদর্শনিষ্ঠ অফিসারটির নাম লিন ৎসে-মু। ক্যান্টনে কার্যভার গ্রহণ করেই তিনি বিদেশী ব্যবসায়ীদের হুকুম দিলেন—যার কাছে যত বে-আইনি আফিং আছে সব জমা দিতে হবে। তিনি আরও বললেন, ব্যবসায়ীদের একটি দলিলে সই দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, ভবিষ্যতে ওরা আর কোনো জাহাজে আফিং আনবে না। আনলে, সে আফিং বাজেয়াপ্ত হবে, এবং ব্যবসায়ীর গর্দান যাবে!

ইংরাজ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্যাপ্টেন এলিয়ট এ আদেশ সরাসরি অমান্য করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সমস্ত ব্যবসায়ীকে বললেন—যার ঘরে যত আফিং আছে সব তাঁর সরকারী গুদামে জমা দিয়ে রসিদ নিতে। অর্থাৎ আইনের প্যাঁচে ক্যান্টন বন্দরের সমস্ত আফিংই রাতারাতি হয়ে গেল ইংরাজ সরকারের সম্পত্তি—টম, ডিক, হ্যারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়! ক্যাপ্টেন এলিয়টের ভাবখানা এই—কমিশনার বুঝে নিক তাঁর প্রতিপক্ষ কয়েকজন সামান্য ব্যবসায়ী নয়, স্বয়ং ইংরাজ সরকার। কমিশনার লিন যখন দেখলেন যে, তাঁর হুকুম ওরা মানবে না, বরং অবস্থা এমন ঘোরালো করে তুলছে যে, তিনি অগ্রসর হওয়া মানেই ইংরাজ-চীন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন তিনিও কৌশল করলেন—সমস্ত চীনা কর্মচারীদের বললেন, ইংরাজ কুঠিয়ালের কাজ ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে। ইংরাজ ব্যবসায়ীদের একেবারে একঘরে করা হলো, যার নাম 'ধোপা-নাপিত-বন্ধ'! যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল! তিন-দিন ইংরাজ প্রভুরা নিজেরা রান্না করল, নিজেরা ঘর সাফা করল, বাসন মাজল। কিন্তু কমোড সাফা করে কে? বাধ্য হয়ে ক্যাপ্টেন এলিয়ট বিশ হাজার পেটি অর্থাৎ প্রায় দু'শ কুইন্টাল আফিং সমর্পণ করল। ১৮৩৯ সালের ৩রা জুন চীন ইতিহাসে একটা লাল তারিখ। ঐ দিন কমিশনার লিন-এর হুকুমে সমুদ্রের ধারে বিশ হাজার পেটি আফিঙের একটা প্রকাণ্ড স্তূপ বানিয়ে তাতে আগুন দেওয়া হলো। সে আগুন কয়েকদিন ধরে জ্বলেছিল এবং কমিশনার লিন সে-ক'দিন সমুদ্রতীর ছেড়ে কোথাও যান নি—তিনি জানতেন তাঁর কর্মচারীদের অনেকেই সুযোগ পেলে ঐ পেটি হাত-সাফাই করে সরাতে চাইবে।

বোস্টন বন্দরের চায়ের কাপের তুফান যেমন ঝড় তুলেছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে, ঠিক তেমনিভাবে ক্যান্টন সমুদ্রতীরের সে আগুন জ্বলল পৃথিবীর অপরপ্রান্তে—টেমস্ নদীর ধারে! ক্যাপ্টেন এলিয়ট সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে বিলাতে আর্জি পাঠালো। পরের বছর ইংরাজ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করল চীনের বিরুদ্ধে—ইংরাজ নৌবহর এসে উপস্থিত হলো ক্যান্টন বন্দরে। চীনকে আফিং না খাইয়ে ওরা ছাড়বে না। ইতিহাসে এরই নাম: 'প্রথম আফিং যুদ্ধ'।

এই যুদ্ধেই ধরা পড়ল বনিয়াদের ফাটলটা! বোঝা গেল, চীন সম্রাটের বাইরের জৌলুস আর জাঁক-জমকের পিছনে আছে অনেক দুর্বলতা। ইংরাজের আগ্নেয়াস্ত্র, যুদ্ধকৌশল, সমরশিক্ষা চীনাদের তুলনায় অনেক উন্নত। বহু চীনা সৈন্য এ যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে এটা প্রমাণ করে দিয়ে গেল। সম্রাট শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন। লিনকে ভর্ৎসনা ও পদচ্যুত করে নির্বাসন দিলেন এবং প্রায় নতজানু হয়ে 'নানকিন চুক্তি'তে স্বাক্ষর দিলেন। এই চুক্তি অনুসারে চীন-সম্রাট ইংরাজকে পাঁচ-পাঁচটি প্রধান বন্দরে অবাধ-বাণিজ্যের সুযোগ দিলেন। শুল্ক-কর ইংরাজ কী হারে দেবে তাও স্থির করবে ইংরাজ—সার্বভৌম চীন সম্রাট নয়! আরও স্থির হলো—চীনে যদি কোনো ইংরাজ স্থানীয় কারও সাথে ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তবে চীনা-আদালতে তার বিচার হবে না; সে বিচার করবেন ইংরাজ বিচারক! তাদের জন্য আলাদা আদালত তৈরি হলো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ১৯১৭ সাল পর্যন্ত চীনে আইনসম্মতভাবে আফিং আমদানির অধিকার বজায় ছিল ইংরাজ সরকারের এবং ১৯৪২ সাল পর্যন্ত চীনদেশে বাস করেও কোনোও ইংরাজ চীনা-আইনের আওতায় 'আইনত' পড়ত না। লালচীন এসব আইন মানতে চায় না—এতে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের রাগ হবার কথা।

এই সঙ্গে আরও একটা কথা বলে যাই—বিদেশী ব্যবসায়ীদের ঐ অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে কিছু দেশী ব্যবসায়ী বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠল। তারা হলো বিদেশী প্রভুদের দালাল। বিদেশীদের অনুগ্রহেই তাদের ভাগ্য ফিরেছে—তাই দেশের চেয়ে বিদেশের প্রতিই তাদের আনুগত্যটা বেশি! কম্যুনিস্ট-ভাষায় তাদের বলা হয় 'কম্প্রাডর বুর্জোয়া', আমরা তাদের সাদা বাঙলায় বলতে পারি: 'মুৎসুদ্দি দালাল'।

তাইপিং বিদ্রোহ: সাল-শতাব্দীর দিক থেকেই শুধু নয়, ঐতিহাসিক মূল্যায়নেও তাইপিং বিদ্রোহের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে আমাদের সিপাহী বিদ্রোহের। কার্ল মার্কস ব্যতিরেকে প্রায় প্রত্যেকটি বিদেশী ঐতিহাসিক দুটোকেই বলেছেন—বিদ্রোহ; 'মিউটিনি' অথবা 'রিবেলিয়ান'। বাস্তবে যদিচ দুটিই হচ্ছে পরাধীন জাতির 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম'। তাইপিং বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮৫১ সালে, সিপাহী-বিদ্রোহের মাত্র ছয় বছর আগে। দুটি বিপ্লবের জাত ও ধাতের মধ্যে পার্থক্যও আছে যথেষ্ট। চীনে তাইপিং বিদ্রোহের পিছনে ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, অপরপক্ষে সিপাহী-বিদ্রোহ সীমিত ছিল শুধুমাত্র ক্যান্টনমেন্টগুলিতেই—দেশের সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে তাতে যোগ দেয় নি।

শুধু সাধারন কেন, অসাধারণ সমসাময়িক মানুষরাও 'সিপাহী-বিদ্রোহ'টা টের

পায় নি। দেবেন্দ্রনাথ ঐ সময় মিউটিনি এলাকায় ছিলেন; কিন্তু 'আত্মজীবনী'তে তার কোনোও উল্লেখ নেই!

চীনের ইতিহাসে ১৮৪১ থেকে ১৮৪৯-এর ভিতর ছোট-বড় অসংখ্য বিদ্রোহ হয়; শতখানেকের উপর। তার মধ্যে দুটি বিপ্লব প্রচণ্ড আকার ধারণ করে: একটার নাম 'নিয়েন' বা 'মশাল-বিদ্রোহ'; অপরটার নাম 'তিয়েন-তি-হুঈ' বা বা 'স্বর্গ-মর্ত্য সমিতির' আন্দোলন।[৪] ঠিক ঐভাবেই ভারতবর্ষে মহাবিপ্লবের আগে ঘটেছিল বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বিদ্রোহ। রাজস্থানে ভীল-বিদ্রোহ (১৮৪৫)[৫], বোম্বাইয়ে শোলপুর-বিদ্রোহ (১৮৫২)[৬] কিংবা বৃহত্তর বাঙলার পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল-বিদ্রোহ (১৮৫৫)। সাঁওতাল-বিদ্রোহে তীর-ধনুক নিয়ে লক্ষাধিক সাঁওতাল যেভাবে আদিবাসী-নায়ক সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে কলকাতার দিকে অভিযান করে[৭] ঠিক সেইভাবেই হুনান প্রদেশের সাধারণ মানুষ বিপ্লব নেতা লি য়ুয়ান-ফার অধিনায়কত্বে শহরাভিমুখে এগিয়ে এসেছিল।[৮]

তাইপিং-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা হুং মিউ-চুয়ান ছিলেন কোয়াংটুং প্রদেশের এক সামান্য চাষীঘরের ছেলে। প্রথম জীবনে ছিলেন স্কুলমাস্টার। ধর্মে খ্রীষ্টান। তিনি নিজেকে যীশুখ্রীষ্টের ছোট ভাই বলে প্রচার করেন এবং কনফুশিয়াস্-এর নামে প্রচলিত সামাজিক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। যীশুর বাণী 'বড়লোকেরা কোনোদিন স্বর্গে যাবে না'—এটাই তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। মাত্র তিন বছরের ভিতরেই তাইপিং বিদ্রোহীরা মাঞ্চু সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল ছয়-ছয়টা প্রদেশ। নিঃসন্দেহে তাইপিংদের শক্তির মূল উৎস ছিল—বঞ্চিত নিরন্ন চাষীদের বিক্ষুব্ধতায়। ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহে এই শক্তি যোগ দেয় নি। ফলে সিপাহী-বিদ্রোহ সীমিত হয়েছিল মাত্র কয়েকটি শহরে, বস্তুত ঐসব শহরের ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকায়—ব্যারাকপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যায়। আর তাইপিং বিদ্রোহ সাময়িক সাফল্যলাভ করে চীন ভূখণ্ডে একটা সমান্তরাল বিকল্প রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। চীন দু' টুকরো হয়ে গেল। উত্তরে মাঞ্চু সরকার, দক্ষিণে তাইপিং বিদ্রোহীদের রাজত্ব। প্রথমটায় ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশী রাজ্য-গুলি নিরপেক্ষতার ভান করল—ওরা দেখতে চায় কোন্ পক্ষ শেষপর্যন্ত জয়ী হয়। যতো সাফল্যস্ততো মদৎদান! তারা আরও আশা করেছিল, খ্রীষ্টান হুং তাঁর সম-ধর্মীদের ব্যবসায়ে বাধা সৃষ্টি করবেন না। কিন্তু হুং মিউ-চুয়ানের ব্যবহারে সেরকম কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে বিদেশীরা শেষ পর্যন্ত মাঞ্চু সরকারের পক্ষ নেয়।

তাইপিং-বিদ্রোহের কয়েকটি লক্ষণ দেখেই বোঝা যায় চীনের জনগণ কোন্ পথে চলেছে। বস্তুত তাইপিং-বিদ্রোহেই লাল ফৌজ ও মাও-ৎসে-তুঙের দৃষ্টিভঙ্গির

দু-একটি পূর্ব-লক্ষণ নজরে পড়ছে। বিদ্রোহী বাহিনী বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে নিজেদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে ফেরার পথ রুদ্ধ করে দেয়[৬]—ঠিক যেমনভাবে সর্বস্বত্যাগ করে রওনা দিয়েছিল লঙ-মার্চের অভিযাত্রীরা। মাঞ্চু-সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে যেসব পোশাক-পরিচ্ছদ প্রচলিত ছিল ওরা তাই পরত এবং মাঞ্চুদের হুকুমে রাখা মাথার টিকি তারা কেটে ফেলে। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সম্পত্তি বলে কারও কিছু ছিল না—সবই দলের সম্পত্তি। চাষের জমি সমান হারে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হতো, নারী-পুরুষ নির্বিচারে। স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো, মেয়েরাও এখন সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা দিতে পারে; মেয়েদের পা বেঁধে রাখার প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা আইন করে বন্ধ করা হলো। বিবাহে পণ গ্রহণ বা পতিতাবৃত্তিও আইনানুসারে নিষিদ্ধ হলো। আফিং, তামাক আর মদ্যপান বন্ধ করারও আইন হলো, যদিও সেসব যে পুরোপুরি কার্যকরী করা গিয়েছিল তা মনে হয় না। তাইপিং বিদ্রোহীরা ছিল একেশ্বরবাদী—তাই বহু বৌদ্ধ বা কনফুশিয়ান মন্দির ও মূর্তি ওরা ধ্বংস করে। ওরা পঞ্জিকা সংস্কার করে, ভাষার ক্ষেত্রেও কথ্যভাষাকে সাহিত্যে আমদানি করার চেষ্টা করে।

কিন্তু এত করেও কিছু হলো না। প্রায় আট-নয় বছর নানকিং-এ একটা বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত রেখেও তাইপিং-বিদ্রোহীরা শেষরক্ষা করতে পারল না। বিদেশী রাষ্ট্রগুলি মাঞ্চু-সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওদের ধ্বংস করল। বিদ্রোহের নেতা লি আত্মহত্যা করলেন। আর এক নেতা প্রিন্স শিহ্‌ তা-কাইকে কী নিষ্ঠুর-ভাবে বধ করা হলো সেকথা পরে বলব। তা হোক, তবু ১৮৪০ থেকে ১৮৬৪ এই চব্বিশ বছরের ঘটনায় বোঝা গেল চীনের জনগণ এগিয়ে চলেছে—পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে। ভোট দেবার স্বাধীনতা নয়, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার স্বাধীনতার দিকে। মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকারের দিকে।

বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ : গদি-সর্বস্ব মাঞ্চু-সরকার বিদেশী বেনিয়াদের সহায়তায় তাইপিং বিদ্রোহীদের কবর দিল বটে কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে সেই মাঞ্চু সরকারকেই আবার বিদেশীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হলো। ফল হলো মারাত্মক! একের পর এক পরাজিত হয়ে মাঞ্চুরাজ বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে থাকে নানান জাতের সুযোগ সুবিধা। ১৮৭১ সালে রাশিয়ার জার সিনাকিয়ান অঞ্চলে একটা থাব্‌লা বসালেন; বছর বারো পরে ফ্রান্স ছিনিয়ে নিল আন্নাম অঞ্চল। আরও বছর তিনেক পরে পর্তুগাল এ্যাময়-বন্দর কুক্ষিগত করে নিল। ১৮৯৪-এ বাধল চীন-জাপান যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে হেরে মাঞ্চু-সরকার চরম লজ্জাজনক চুক্তি করতে বাধ্য হলো জাপানের সঙ্গে : শিমোনোসেকি চুক্তি!

ত্রিশ কোটি আউন্সের মত রূপো ক্ষতিপূরণ দিয়ে এবং কোরিয়া, ফরমোজা প্রভৃতি অঞ্চল জাপানকে হস্তান্তরিত করে মাঞ্চু-সরকার কোনোক্রমে নিজের গদি বাঁচালো। চীন মরে মরুক, গদী তো বাঁচল।

ক্ষুদে জাপানের কাছে চীন নতজানু হয়েছে দেখে পশ্চিমী শকুন-সম্প্রদায়ের সাহস গেল আরও বেড়ে। জার্মানী উত্তর-পূর্ব চীনের একটি বড় বন্দর দখল করে নিল, রাশিয়ার জার দখল করল পোর্ট আর্থার আর দাইরেন বন্দর। এর পর বিদেশী বেনিয়ারা এক বিচিত্র ব্যবস্থা করল—চীনকে কী-ভাবে শোষণ করা হবে তার একটা সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছকে ফেলা হলো। এক-একজনের এক-একটা শোষণ-এলাকা! ইয়াংসি নদীর উর্বর উপত্যকা পড়ল সে-যুগের বড়দা ইংলণ্ডের ভাগে; চীনের প্রাচীরের উত্তরাঞ্চলটা, অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়া আর মঙ্গোলিয়া পড়ল রাশিয়ার জারের এক্তিয়ারে। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটায় ফ্রান্স, পূর্বদিকের ফুকিয়েন প্রদেশে জাপানী এবং উত্তর-পূর্বের শানটুং প্রদেশের কর্তা হলো জার্মানী। কেউই 'দখল' শব্দটা ব্যবহার করল না, বললে'—প্রভাবের এলাকা'। অর্থাৎ শোষণের এক্তিয়ার। মাঞ্চু-সরকার গদীর খাতিরে সব কিছুই হেঁ-হেঁ করে মেনে নিল।

এতদিন আমেরিকা অন্যত্র ব্যস্ত ছিল। কিউবাকে 'মুক্ত' করতে গিয়ে সে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। পুরানো বৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী স্পেনকে শায়েস্তা করে এতদিনে শ্যামচাচার নজর পড়ল চীনের দিকে। বুঝল—একটু দেরী হয়ে গেছে। আমেরিকা বললে—"এই যে তোমরা এক-এক এলাকায় এক-একজনকে প্রভাব বিস্তার করবার অনুমতি দিয়েছ এটা ঠিক নয়। এস, আমরা সবাই মিলে আপসে 'খোলা দরজা' নীতি চালু করি। অর্থাৎ চীনের বাজারটা হক লুঠের মাল; যে যেখানে পারব থাবলা মারব—ফ্যাক্টারি বানাব, ব্যবসা ফাঁদব, কাঁচামাল কিনব, তৈরি মাল বেচব। লুঠেরাদের উদার হওয়া উচিত।" এ বিষয়ে খাস চীনকে কেউ কোনো প্রশ্ন করল না, যেন চীনের কোনো বক্তব্য এতে থাকতেই পারে না। মাঞ্চু-সরকার বললে, তা বেশ তো, কিন্তু আমার গদী? ওরা বরাভয় জানায়: তোমার গদী অটুট থাকছে!

ব্যস! রাজী হয়ে গেল মাঞ্চু সরকার।

বক্সার বিদ্রোহ: বিদেশীদের কাছে দেশকে বিকিয়ে দিতে মাঞ্চু-সরকার রাজী হলো বটে, কিন্তু সেটা খুশিমনে মেনে নিল না চীনের আপামর জনসাধারণ। তারা প্রতিবাদ করল—তারই নাম বক্সার-বিদ্রোহ। শুনলে মনে হয় বক্সার বুঝি কোনো জায়গার নাম; আসলে তা নয়—নামটা এসেছে 'বক্সিং' বা মুষ্টিযুদ্ধ থেকে। বক্সার মানে মুষ্টিযোদ্ধা। চীনা-ইতিহাসে এরা বক্সার নয়, এই বিদ্রোহী সমিতির নাম 'ঈ

হো তুয়ান' অর্থাৎ 'ন্যায় ও শৃঙ্খলা সমিতি'। এই সমিতি কেন কী-ভাবে গড়ে ওঠে সেই কথা বলি :

একাধিক কারণে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রথমত জাপানের কাছে হেরে যাওয়ার পর থেকে চীনের অর্থনৈতিক কাঠামোটা ভেঙে পড়েছিল ; প্রতিদিন বিদেশী মাল এসে স্থানীয় বাজার ছেয়ে ফেলছে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৯৯ এই পঁয়ত্রিশ বছরে চীনের আমদানির পরিমাণ সাড়ে সাত কোটি আউন্স রূপো থেকে বেড়ে গিয়ে হয়েছিল চল্লিশ কোটি। ফলে আগে যেখানে চীন ত্রিশ লক্ষ আউন্স বৈদেশিক রূপা ঘরে আনত সেখানে তার ঘর থেকে এখন দশ কোটি আউন্সের মতো রূপা বিদেশে চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত যেভাবে ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় ভারতবর্ষের তাঁতি পরিবার-গুলিকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে কোটি কোটি চীনা-তাঁতি নিঃস্ব বেকার হয়ে গেল। তৃতীয়ত শিমোনোসেকি চুক্তি অনুযায়ী খেশারত দেবার প্রয়োজনে মাঞ্চু-সরকার প্রজার উপর করভার চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিল। তার উপর আছে অসাধু আমলাদের অত্যাচার। ঘটনাচক্রে ঐ সময় পর পর ক'বছর হলো প্রাকৃ-তিক দুর্যোগ—বন্যা, অজন্মা আর দুর্ভিক্ষ। দেশের মানুষ নিরুপায় হয়ে বিপ্লবের পথে সমাধান খুঁজল, আর তাকেই নেতৃত্ব দিয়েছিল 'ঈ হো তুয়ান' দল।

এতক্ষণ যে কয়টি হেতুর কথা বলেছি সে তো চীনের চিরকালের দুর্ভাগ্য ; এবার আবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর একটি নূতন শাবক। সেটা চীনের কাছে অনাস্বাদিতপূর্ব। সেটা হচ্ছে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভূমিকা :

বক্সার বিদ্রোহে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভূমিকা : প্রায় চল্লিশ বছর আগে তাইপিং বিদ্রোহীরা খ্রীষ্টধর্মের পতাকা কাঁধে নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল; অথচ এবার বক্সার বিদ্রোহীরা সেই খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। মাত্র চল্লিশ বছরে এমনটা হলো কেন ? তার একমাত্র কারণ ইতিমধ্যে খ্রীষ্টান পাদরীদের নূতন ভূমিকা গ্রহণ। তারা খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ধর্মপ্রচারের নামে শোষণের কাজে হাত মিলিয়েছিল। চীনের গভীরে চার্চ তৈরি করে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে তারা দালালি করত। সাধারণ মানুষ না বুঝলেও বক্সার-নেতারা ওদের উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেললেন ; তাই আক্রমণটা গিয়ে পড়ল ঐ মিশনারীদের উপর।

সে-যুগের ইউরোপীয় ঐতিহাসিক আর মিশনারী কর্তারা অবাক হবার ভান করে বলতেন—আমরা বুঝতে পারি না কেন চীনারা ইউরোপীয় মাত্রকেই ঘৃণা করে, খ্রীষ্টান ধর্মকেই শত্রু মনে করে। এর জবাবটা আমরা খুঁজে পাব পরবর্তী যুগে লেখা লেনিনের প্রবন্ধে "একথা অনস্বীকার্য যে, চীনারা ইউরোপীয়দের ঘৃণা করে ; কিন্তু তারা কোন্ জাতের ইউরোপবাসীকে ঘৃণা করে, এবং কেন তা করে ? ইউ-

য়োপের সাধারণ মানুষকে তারা ঘৃণা করে না, তাদের সঙ্গে চীনাদের কোনো বিরোধ নেই। তারা অন্তর থেকে ঘৃণা করে ইউরোপের পুঁজিবাদী শোষকদের, আর তাদের পৃষ্ঠপোষক ইউরোপীয় সরকারগুলোকে—যারা চীনে এসেছে সভ্যতার নামে অকুণ্ঠ-ভাবে লুট করতে, হামলা করতে, শোষণ করতে! মানুষের শরীরে আফিং-এর বিষ ঢুকিয়ে যারা ব্যবসা করতে চায়, আর খ্রীষ্টধর্মের নলচের আড়ালে সেই পৈশাচিক ভূমিকাটা গোপন করতে চায় চীন তাদের ঘৃণা না করে পারবে কেন?"

উদ্ধৃতিটা পড়তে বসলে স্বতই মনে পড়ে যায় মিস্ রাথ্‌বোনকে লেখা রবীন্দ্র-নাথের খোলা চিঠি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক অখ্যাত মহিলা সদস্যা ঠিক ঐ রকম ন্যাকা সেজে বলেছিলেন—'ভারতীয়রা এমন ইংরাজ-বিদ্বেষী কেন হয়ে উঠল তা বোঝা ভার।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোগশয্যা থেকে তার জবাবে যে কথা লিখেছিলেন তার সঙ্গে লেনিনের প্রবন্ধ এক সুরে বাঁধা। 'চীন' শব্দটার বদলে 'ভারত' শব্দটা বসাতে হবে।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে একটি কৌতুককর সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করার লোভ হচ্ছে :

১৯৬০ সালে পিকিং-এ প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ সম্প্রদায় একটি মহতীসভার আয়োজন করে। শুধুমাত্র চীনা খ্রীষ্টানরাই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেখানে। সৌজন্যবোধে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইকে ওঁরা সভাপতিত্ব করতে আমন্ত্রণ জানান। নানান বিষয়ে আলোচনার পর চৌ তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, "আপনারা যদি ধর্মপ্রচারের অনুসঙ্গ হিসাবে সমাজসেবার কাজটাও চালিয়ে যান তাহলে লালচীন আপনাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। আপনারা এবং আমরা উভয়েই বিশ্বাস করি : অন্তিমে সত্যের জয় হবেই। আমরা কম্যুনিস্ট, আমাদের ধারণায় আপনাদের মতটা ভ্রান্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং শ্রেণীস্বার্থ-প্রণোদিত। আমরা তাই বিশ্বাস করি চীনের জনগণ সমাজসেবার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানালেও আপনাদের ধর্মমতটা গ্রহণ করবে না। অপরপক্ষে আপনাদের ধারণা আপনারাই সত্য পথে আছেন, আমরা ভ্রান্ত। আপনারা চেষ্টা করে দেখুন—আমরা আপত্তি করব না।"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শেষ হতেই একজন মাতব্বর শ্রেণীর পাদরী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, মহামান্য প্রধানমন্ত্রী খ্রীষ্টানদের ভ্রান্তি বিষয়ে এতই যখন নিঃসন্দেহ তখন এদেশে নূতন ধর্মপ্রচারক আমদানিতে তাঁর সরকার এত বিধিনিষেধ আরোপ কর-ছেন কেন?

চৌ এন-লাই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "সে নিষেধ আমি এখনই প্রত্যাহার করতে রাজী আছি—একটি মাত্র শর্তে। যে দেশ থেকে যতজন খ্রীষ্টান

ধর্মপ্রচারক আসবেন সেই দেশে ততজন চীনা কম্যুনিস্ট প্রচারককে যেতে দিতে হবে—"প্রোরাটা-বেসিস্"-এ। আপনারা বরং আপনাদের নিজ নিজ এম্ব্যাসীর সঙ্গে কথা বলে দেখবেন। আমাদের মতবাদের ভ্রান্তি বিষয়ে আপনারাও যখন নিঃসন্দেহ তখন নিজ নিজ দেশে আমাদেরও প্রচার করতে দিতে আশা করি আপনাদের আপত্তি হবে না।"

বলা বাহুল্য এ প্রস্তাবটা কেউ বিবেচনার যোগ্যই মনে করে নি। এ তথ্যের পরিবেশক বলছেন :

> "What faith these Chinese missionaries would preach is not specified, but can easily be predicted. Nor it is likely that the Christian countries who formerly sent missionaries to China will be willing to accept a quota of Chinese Communist propagandists in return."[৭]

বক্সার বিদ্রোহে মাঞ্চু-সরকারের ভূমিকা : বক্সার বিদ্রোহীরা প্রথম যুগে ছিল মাঞ্চু-সরকারের বিরুদ্ধে; কিন্তু ক্রমশ তাদের লক্ষ্যমুখ তিল তিল করে ঘুরে গেল। এর মূলে আছে তদানীন্তন মাঞ্চু-সম্রাজ্ঞী ৎজু মি-র অপূর্ব রাজনৈতিক চাল। বক্সার বাহিনী যখন পিকিং-এ ঢুকে পড়ে তখন সম্রাজ্ঞীর নির্দেশে মাঞ্চুবাহিনীও তাদের সঙ্গে যোগ দিল—অন্তত যোগ দেবার ভান করল। ফলে আক্রমণের লক্ষ্যমুখটা গিয়ে পড়ল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে। এই বিপদে আটটি বিদেশী শক্তি একযোগে রুখে দাঁড়াল চীনের বিরুদ্ধে—যাকে বলে অষ্টবজ্রসম্মেলন! ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ইটালি, পর্তুগাল, জারের রাশিয়া, জার্মানি এবং ফ্রান্স। তারা কৈফিয়ৎ তলব করল সম্রাজ্ঞী ৎজু মি-র কাছে : এ আপনার কী রকম ব্যবহার? আপনার গদী টিকিয়ে রাখতে আমরা প্রাণপাত করছি, আর সেই আপনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—

সম্রাজ্ঞী গোপনে মিনতি জানালেন, "আপনাদের মহান দেশ...কখনও পররাজ্য লাভের বিন্দুমাত্র লোভ দেখায় নি; কিন্তু বিদ্রোহীদের রুখতে হলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। আমি তো দেউলিয়া, আপনাদের মহান দেশের কাছে হাত পাতা ছাড়া আমার উপায় কি?"[৮]

সুতরাং অনতিবিলম্বে মহারাণীর হাতে প্রচুর অর্থ এসে গেল। তিনি প্রকাশ্যে বক্সারদের সাহায্য করতে করতে একেবারে চরম মুহূর্তে পলাশীপ্রান্তরের মীরজাফর হয়ে গেলেন। বক্সার বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেল!

আট-আটটি তথাকথিত সুসভ্য দেশ পিকিং দখল করে যে অত্যাচার করেছিল,

ইতিহাসে তার তুলনা অল্পই আছে। শহরের প্রত্যেকটি বাড়ি নম্বর মিলিয়ে লুট করা হলো। অস্থাবর সম্পত্তি লুট হয়ে গেলে পুরুষদের হত্যা এবং নারীদের ধর্ষণ করে বাড়িতে আগুন দেওয়া হলো। লক্ষ লক্ষ চীনার রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে মহাচীন ইউ-রোপের সভ্যতার স্বরূপটা বুঝে নিল। অতঃপর হলো সন্ধি। স্থির হলো চীনকে ক্ষতি-পূরণ দিতে হবে ৩৯ বছরের ভিতর ৯৮ কোটি আউন্স রূপো।[৯] এ-ছাড়াও পিকিং থেকে তিয়েনৎসিন বন্দর পর্যন্ত রেলপথটা বিদেশীদের দখলে চলে গেল, আর ব্যবস্থা হলো—পিকিং শহরে বিদেশী দূতাবাসে চীনাদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। খাস চীনের অংশ স্বাধীন চীনাদের কাছেই 'আউট-অব-বাউন্ড্‌স' হয়ে গেল!

যুদ্ধ শেষে প্রধান সেনাপতি তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন :

> **"Neither any European nor American nation nor Japan has the intellectual or military strength to rule over such a country with a quarter of the world's population. The partition of China is therefore the best feasible policy."**
>
> [কোনো ইউরোপীয়, মার্কিন অথবা জাপানী জাতির ক্ষমতা নেই যে, বুদ্ধি-বৃত্তিতে কিংবা সামরিক শক্তিতে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষের এই দেশ-টাকে পদানত করে রাখতে পারে। ফলে, একমাত্র সমাধান হচ্ছে চীন-বিভাগ : অর্থাৎ চীনের পার্টিশান][১০]

পাঠকের যাতে ভুল না হয় তাই বলে রাখা ভালো যে, আমরা বঙ্গভঙ্গ আন্দো-লনের কথা আলোচনা করছি না, যদিও সে ঘটনা মাত্র কয়েক বছর আগে-পিছের। উদ্ধৃতিটা ভারত ছাড়ার আগে কোনো ইংরাজ রাজনীতিকেরও নয়—ওর রচয়িতা ভন ওয়ালডার্সি, যিনি ছিলেন বক্সার যুদ্ধে অষ্টবজ্র সম্মেলনে প্রধান সেনাপতি।

১৯০৫-এর গুপ্ত সমিতি : চীনের গুপ্ত সমিতির কথা বলতে গিয়ে ঠিক ঐ সময়ের বাঙলাদেশের কথা মনে পড়ছে। বাঙালী অরবিন্দ ঘোষ কৈশোরে ছিলেন আপাদমস্তক ইউরোপীয়—বিদেশেই শিক্ষিত তিনি, বিদেশী কেতায়। বিলেত থেকে ফিরে চাকরি করছিলেন বরোদায়। বাঙলাদেশে এসে দেখলেন একাধিক ছোট ছোট বিপ্লবী দল গোপনে সংগঠন গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে—আপারসার্কুলার রোডে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে সতীশচন্দ্র বসুর অনুশীলন সমিতি, কিংবা ব্যারিস্টার পি. মিত্রের আখড়া, উত্তরবঙ্গের যুগান্তর সমিতি প্রভৃতি। বিদেশে শিক্ষিত অরবিন্দ সব কয়টি দলকে এক নেতৃত্বে আনার চেষ্টা করলেন—গড়ে তুললেন অগ্নিযুগের গুপ্তসমিতি।

সমান্তরাল ইতিহাস লিখেছেন মহাকাল চীনের ক্ষেত্রে, একই ছন্দে, একই কালে।

১৯০৫ সালে স্থন ইয়াৎ-সেন ইউরোপ থেকে জাপানে এসে পৌছান। সেখানে এসে দেখেন ছোট ছোট তিনটি বিপ্লবী দল ইতিপূর্বেই জন্ম নিয়েছে, তাদের শৈশবাবস্থা তখন : সিং চুঙ হুই, কোয়াঙ ফু হুই, এবং হুয়া শিঙ হুই। স্থন-ইয়াৎ-সেন ছিলেন ইংরাজী-কেতায় শিক্ষিত—রীতিমত পাশকরা ডাক্তার। তিনি ঐ তিনটি বিপ্লবীদলকে এক ছত্রচ্ছায়ার তলায় আনলেন ; গড়ে উঠল যৌথ প্রতিষ্ঠান : 'তুং মেঙ হুই' বা বিপ্লবী দল। অরবিন্দ যেমন প্রথমেই একটি প্রচার-পত্রিকার কথা ভেবেছিলেন, জন্ম নিয়েছিল বারীন্দ্র-সম্পাদিত 'যুগান্তর' পত্রিকা, ঠিক তেমনিভাবে স্থন প্রকাশ করলেন ওঁদের মুখপত্র 'মিঙ পাও' (চীন বার্তা)। অরবিন্দ বা অগ্নি-যুদ্ধের ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মতো স্থন ইয়াৎ-সেনও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন গ্যারিবল্ডি-মাৎসেনির আদর্শে, দু-পক্ষই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন রাশিয়ান নিহিলিস্ট বা এ্যানার্কিস্ট-দলের রাষ্ট্রবিরোধী কর্মপন্থা। দু-দলের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভেদও যথেষ্ট। বাঙলার বিপ্লবীদলের ছিল একটিমাত্র লক্ষ্য : ইংরাজদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া, তার পরের কথা তাঁরা ভাবেন নি ; অপরপক্ষে স্থন ইয়াৎ-সেনের লক্ষ্য ছিল অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট—তিনটি লক্ষ্য। প্রথমত—জাতীয়তাবাদ, দ্বিতীয়ত—গণতন্ত্র, এবং তৃতীয়ত সাধারণ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। বাঙলার বিপ্লববাদীরা স্বাধীন-ভারতবর্ষ কী রূপ পরিগ্রহ করবে সে সম্বন্ধে বাস্তববাদী কর্মপদ্ধতির কোনো পরিকল্পনা রচনা করেন নি—সবই ছিল স্বপ্নময়, ভাববাদী উচ্ছ্বাস। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য পঞ্চাশ বছর আগেও দেখেছি। সিপাহী বিদ্রোহের নায়কদেরও ছিল একটি মাত্র লক্ষ : কোম্পানির রাজত্বের অবসান ; অথচ তাইপিঙ বিদ্রোহীরা প্রথম থেকেই স্বাধীনতা-উত্তর কর্মসূচী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পঞ্চাশ বছর পরেও সেটা দেখলাম। 'গরীবি হটাও' মন্ত্রটা তাই এদেশে একটা প্রচার-মাধ্যমের শ্লোগানের বেশি অগ্রসর হতে পারল না—লালচীনে 'আমীরি হটাও' মন্ত্রটা বাস্তবে রূপায়িত !

সে যাই হোক ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত ছয় বছরে চীনে একাধিক বিপ্লব-বিস্ফোরণ হয়েছে। ১৯১১-তে শেষ যে বিপ্লবটি ব্যর্থ হয়ে গেল তাতে যোগ দিয়েছিল ত্রিশটি গোপন সমিতি। মূল নিয়ামক স্থন ইয়াৎ-সেন। এখন আর তিনি অরবিন্দের সঙ্গে তুলনীয় নন ; অরবিন্দ ততদিনে ধ্যানমার্গের পথিক হয়ে গেছেন—এখন তাঁর সাথে তুলনীয় ভারতবর্ষের রাসবিহারী বসু। স্থন-এর পরিকল্পিত বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেল একই কারণে। নেতাদের আদেশ ও সংকেত বার বার পরিবর্তিত হওয়ায় বিপ্লবীদলের মাত্র চারটি শাখা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে—১৯১১ সালের ২৭শে এপ্রিল। বাহাত্তর জন বীর সৈনিক সেদিন দেশের জন্য শহীদ হয়।

মাত্র চার বছর আগে পরে। ১৯১৫-র ফেব্রুয়ারিতে মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর

বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেল পাঞ্জাবে, আর সেপ্টেম্বরে বুড়িবালামের যুদ্ধে শহীদ হলেন বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন এবং জ্যোতিষ। তফাৎ এই যে, চীনা-শহীদদের স্মৃতি বুকে করে ক্যান্টন শহরের উপকণ্ঠে স্বাধীন চীনে আজও দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক স্মৃতি মন্দির—'হুয়াঙ হুয়াকাং স্মৃতিসৌধ'; আর রাসবিহারীর সঙ্গী পিংলে, বসন্ত বিশ্বাস, রামশুকুল, কর্তার সিং কিংবা বাঘা যতীনের সহকর্মীদের কোনোও স্মৃতিমন্দির ভারতবর্ষে আমরা তৈরি করার প্রয়োজন বোধ করি নি—বোধকরি আমাদের 'জীবনধাতু' অহিংসা দিয়ে গড়া বলে। অক্টারলোনি মনুমেন্টের নতুন নামেই আমরা সন্তুষ্ট!

মাঞ্চু সরকারের পতন : ১৯১১ সাল। বাহাত্তর জন বিপ্লবীর মৃত্যুতে বিপ্লবের অগ্রগতি রুদ্ধ হলো না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেগে উঠল সাধারণ মানুষ—সিছুয়ান, হুনান, হুপেই, কোয়াঙতাং-এ। সিছুয়ানে হলো রেল ধর্মঘট; মাঞ্চু-সরকারের আমলার দল ধর্মঘটিদের নির্বিচারে হত্যা করল, তাতে ফল হলো উল্টো। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য অঞ্চলে—বিশেষ করে ইয়াং সি নদীর দক্ষিণে উচাং-এ। বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার দখল করল, থানা কেড়ে নিল, লাটের কুঠি দখল করল। ক্রমে ওরা হ্যাংকাও, হানিয়াং অধিকার করে দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করল বিকল্প সরকার।

ইতিমধ্যে সম্রাজ্ঞী ৎজু-সির এন্তেকাল হয়েছে। চীনের সিংহাসনে তখন এক নাবালক। তাকে শিখণ্ডী করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো খুঁজতে শুরু করল এক কড়া শাসক, যে লোক এই অবস্থায় চীনের চিরকালের ট্র্যাডিসানকে বজায় রাখতে পারবে। অর্থাৎ বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়ে গদীতে উঠে বসবে এবং শাসন ও শোষণ নূতন রাজবংশের মাধ্যমে চালিয়ে যাবে। অচিরেই এমন লোকের সন্ধান পাওয়া গেল। লোকটার নাম য়ুয়ান-শিহ-কাই।

করিতকর্মা ব্যক্তি। জীবনে একাধিকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জঙ্গীমানুষ। তার পিছনে সামরিক শক্তি। তাকেই মদৎ যোগাতে থাকে বিদেশী শক্তিগুলো। য়ুয়ান তো এক পায়ে খাড়া। শক্ত হাতে এসে হাল ধরল সে। দেখা গেল তিন বছরের খোকা সম্রাট ফরমান জারি করেছেন: আমি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করছি, কিন্তু আমার প্রধানমন্ত্রী য়ুয়ান-শিহ-কাইকে শেষ আদেশ দিয়ে যাচ্ছি, যে, চীনকে দু টুকরো করা চলবে না—চীনের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলকে এক-শাসনভুক্ত করতে হবে। আমি আশা করব দক্ষিণের সুন ইয়াৎ-সেন প্রভাবিত নানকিন সরকার চীনকে দু-টুকরো হতে দেবে না!

এই ফর্মানে আরও বলা হলো গদীটা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার জন্য খোকা সম্রাটকে বছরে বিশ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে যেতে হবে। বলা বাহুল্য তাঁর এবং সুদীর্ঘ

তপশীলভুক্ত তাঁর তাঁবেদার-অনুগ্রহভাজন-বশংবদদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দেওয়া চলবে না।

একদল রাজনীতিবিদ আনন্দে দু হাত তুলে নাচলেন। এতদিনে মাঞ্চু-সরকার স্বেচ্ছায় গদি ছেড়েছে। দেশ এবার স্বাধীন! জমিদার, মহাজন, বাণিজ্য-চুম্বক আর কোটিপতিদের শোষণ-ব্যবস্থা অব্যাহত রইল? তাতে কি? দেশ তো স্বাধীন হলো—'প্রজাতন্ত্র' তো প্রতিষ্ঠিত হলো?

ছবিটা অচেনা নয়। ইংরাজও একদিন 'স্বেচ্ছায়' ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল! স্বাধীনতা তথা 'প্রজাতন্ত্র' লাভ করে আমরা দুহাত তুলে নেচেছি, পটকা ফুটিয়েছি, হাউই ছুঁড়েছি, শোভাযাত্রা করেছি, গরম গরম বেতার ভাষণ শুনেছি!

মোটকথা মাঞ্চু সরকারের পতন হলো। দেশ বাস্তবে তখন দু টুকরো। উত্তরের পিকিঙে য়ুয়ান-শাসিত সরকার, যে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করতে চাইছে, আর দক্ষিণের নানকিঙে সুন ইয়াৎ-সেনের সরকার যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে। সুন-এর সামনে তখন দুটি পথ খোলা আছে। হয় প্রতিবিপ্লবী য়ুয়ানের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, অথবা আপোষে 'চীন-বিভাগ' রুখতে হয়।

গান্ধীজী নাকি 'ভারত-বিভাগ'-ঠেকাতে একবার বলেছিলেন—গোটা ভারতবর্ষই জিন্না-সাহেবকে রাষ্ট্রপতি বলে মেনে নিক—ভারত-ভাগ বন্ধ রেখে! কথাটায় সেদিন কেউ কান দেয় নি। কান দিলে কি হতো সেটা পরের কথা—কিন্তু জওয়াহরলাল, আজাদ, বল্লভভাই প্রভৃতি সেটা বিবেচনার যোগ্য মনে করেন নি। সুন কিন্তু ঐ জাতীয় সিদ্ধান্তই নিলেন। অখণ্ড চীনের খাতিরে তিনি সরে দাঁড়ালেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে। সুন পদত্যাগ করলেন। য়ুয়ান শিহ-কাই অখণ্ড চীনের একচ্ছত্র কর্ণধার হয়ে পড়ল। অবসান হলো চীনের ইতিহাসে হাজার হাজার বছরের রাজতন্ত্র। প্রতিষ্ঠিত হলো 'প্রজাতন্ত্র'। শিহ-কাইয়ের দলের ক্যাডাররা দু' হাত তুলে বললে: 'য়ুয়ান শিহকাই—যুগ যুগ জিও।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চীনের কাছে ভারতের ঋণ

১৯১২ সালে রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে আমরা উপনীত হয়েছি। রাজতন্ত্রের যবনিকা পড়ল, শুরু হলো চীন-রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ নূতন যুগের নূতন নাটক : প্রজাতন্ত্র। সেদিন চীনে সে কী আনন্দ, কী উৎসব! যেন ১৯৪৭-এর ভারতবর্ষ! দেশ স্বাধীন হয়েছে এতদিনে; কে দেশকে শাসন করবে তা নির্বাচন করে দেবে দেশের সাধারণ মানুষ—ভোট দিয়ে।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা কিন্তু রাজনীতি আলোচনা করতে বসি নি। আমরা এতক্ষণ ভারত কী-ভাবে চীনকে প্রভাবিত করছিল তাই দেখছিলাম; এখন দেখতে চাই উল্টো স্রোতটা। এই কয়েক হাজার বছরে ভারত-সংস্কৃতি কী-ভাবে চীনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আমরা যেমন দিয়েছি, তেমনি নিয়েছি। সেই দানটা স্বীকার করব এবার :

বিস্মৃত অতীতকাল থেকে ভারত নানা যুগে নানান সম্পদ আহরণ করেছে মহাচীনের কাছে হাত পেতে—চীনাংশুক, চীনা-কর্পূর, চীনা-সিঁদুর, বাঁশের বাঁশী, কাগজ, বারুদ, কম্পাস কিংবা ন্যাসপাতি ফল। কিন্তু সে-সব তো বস্তুতান্ত্রিক জগতের লেন-দেন। চীনা সংস্কৃতি কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণা—শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ধর্মবিশ্বাসে?

আমরা জানি খ্রীষ্টজন্মের তিন-চারশ' বছর আগেই ভারতবর্ষে গ্রীক-দর্শন, গ্রীক-শিল্প এবং গ্রীক-বিজ্ঞান অনুপ্রবেশ করেছিল। গান্ধারের পথে শুধু ভারতীয় ভাস্কর্য-কেই নয়, ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানকেও প্রভাবিত করেছিল। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম-পাদের ভিতরেই এই গ্রীক-সংস্কৃতির কল্যাণে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রাচীন ধারণাগুলি সংশোধন করলেন, আরও নির্ভুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করলেন। ঐ প্রসঙ্গে বহু গ্রীক শব্দ ভারতীয় ভাষায়, সংস্কৃতে, চিরস্থায়ী আসন পাতে। ধ্বনি-সাদৃশ্যে সেই গ্রীক ও রোমক শব্দগুলি আজও সনাক্ত করা যায়। ঠিক একইভাবে মহাচীন ভারতবর্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে বৌদ্ধ-দর্শন। কিন্তু ধ্বনি-সাদৃশ্য থেকে চীনা ভাষায় সেগুলি সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। গ্রীক শব্দ 'পাতের্', 'মিতির্' যদি সংস্কৃতে 'পিতৃ, মাতৃ' রূপে চেনা যেতে পারে তা-হলে সংস্কৃত শব্দ 'বুদ্ধ, সঙ্ঘ, কাশ্যপ' অথবা 'কুমারজীব' চীনা ভাষায় কী রূপ পরিগ্রহ

করল ? ঐ শব্দ-চতুষ্টয় চীনা ভাষায় উচ্চারিত হয় যথাক্রমে 'কু (অথবা কো), সেঙ, চিয়া-য়েহ্, এবং 'চিউ-মো-লো-শীহ্' রূপে। প্রশ্ন জাগে—শব্দগুলির খোল্-নল্চে এমন ভাবে বদলে গেল কেন ? তার কারণ গ্রীক, রোমক, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ধ্বন্যাত্মক, অপরপক্ষে চীনা ভাষাটা মূলত চিত্রকল্প। ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া দরকার। যদিও স্বীকার করি এ হচ্ছে এক অন্ধের পক্ষে দ্বিতীয় অন্ধকে পথ প্রদর্শন—কারণ চীনা ভাষায় পাঠক ও লেখকের এখানে সমান অধিকার। আমরা দুজনেই সমান বৈকুণ্ঠ! অর্থাৎ কেদারদা বৈকুণ্ঠবাবুর পরিবর্তে আপনার-আমায় হাতে চীনে-বাড়ির জুতার হিসাব তুলে দিলে আমরা উভয়েই তাকে চীনা সঙ্গীতের স্বরলিপি বলে স্বীকার করে নেব!

চীনা ভাষার প্রভাব : আগেই বলেছি, চীনা ভাষার লিখিত রূপের সঙ্গে তার কথিত রূপের আশ্‌মান-জমীন ফারাক। তবু গোটা চীনদেশে কিন্তু একটিমাত্র লিখিত ভাষা, যা সত্য নয় ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। এই 'এক ভাষা' মহাচীনকে একতা বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে সাহায্য করেছে, ভারতবর্ষের মতো ভাষাগত বিরোধ সেখানে প্রকট নয়। ফলে কী-দক্ষিণাঞ্চল, কী-উত্তরাঞ্চল যে কোনো শিক্ষিত চীনা একই ছাপা বই পড়তে পারেন, যদিও তাঁদের কথ্যভাষা এবং লিখিতভাষার উচ্চারণ একরকম নয়। একজন কেরালাবাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যদি কোনো সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠ করেন তাহলে কোনো কাশ্মীরী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তা বুঝবেন; কিন্তু কোনো দক্ষিণবাসী চীনার চীনাগ্রন্থ পাঠ উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারবেন না একজন উত্তরাঞ্চলবাসী চীনা-পণ্ডিত। তার হেতুটা এই : চীনা অক্ষরগুলি ধ্বনি-মূলক নয়, চিত্রকল্প। ব্যাপারটা কেমন জানেন ? ধরুন যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ-চিহ্ন। ইংরাজ তাকে বলছে 'ক্রশ', ফরাসী বলছে 'ক্রোয়া', বাঙালী বলছে 'ক্রুশ'; কিন্তু উচ্চারণ যাই হোক ঐ চিহ্নের একটি চিত্রকল্প আছে এবং তার ব্যঞ্জনাটা তিনজনের কাছেই অভিন্ন। একটু আগে বলেছি 'চীনা অক্ষরগুলি চিত্রকল্প'—কথাটা কিন্তু ঠিক নয়; চীনা-ভাষায় অক্ষর আদৌ নেই। ওদের সব শব্দই এক ধ্বনির এবং হস্-অন্ত যুক্ত—যাকে বলি এক সিলেব্‌ল্-এর। তাদের এক-একটি করে চিত্রকল্প আছে। এ রকম হাজার চল্লিশ চিত্রকল্প খুঁজে পাবেন চীনা অভিধানে। তার ভিতর হাজার সাতেক শব্দ এতদিন সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হতো আর ওর ভিতর হাজার-তিনেক কেউ যদি আয়ত্ত করতে পারতেন তবে তিনি অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত বলে চিহ্নিত হতেন। এই শব্দগুলির দুটি করে অংশ আছে। একটা হচ্ছে মূল ধাতু বা মূল রূপ, অপরটি তার প্রত্যয় বা রূপান্তর। 'সূর্য' এবং 'চন্দ্র' এ দুটি শব্দের প্রতীকচিহ্ন যখন পাশাপাশি বসবে তখন তার যোগফল 'সূর্যচন্দ্র' হবে না, হবে ভিন্ন অর্থবহ যোগরূঢ় একটি শব্দ : ঔজ্জ্বল্য। তেমনি দুটি গাছ চিহ্ন

যদি পাশাপাশি বসে তবে তার অর্থ হবে—অরণ্য[১]। মূলচিত্রের সঙ্গে নানান প্রত্যয় জুড়ে কী ভাবে নূতন শব্দ গড়ে ওঠে তা চিত্র ১৯-এ বোঝাবার চেষ্টা করেছি। 'পাও' এই ধ্বনিটির যেটি চিত্রকল্প তার সঙ্গে নানান জাতের প্রত্যয় জুড়ে নানান অর্থবহ শব্দ হতে পারে—বিশেষ্য অথবা ক্রিয়াপদ। মূল ধাতু 'পাও'-এর অর্থ হচ্ছে 'পুঁটুলি'। এর সামনে অথবা পিছনে নানান প্রত্যয় জুড়ে শব্দটার অর্থ হতে পারে—বহন করা, ছুটে পালানো, জল-বুদ্বুদ অথবা ফুলের কুঁড়ি। অথচ মজার কথা এই যে, সবকয়টি নূতন শব্দের উচ্চারণ থাকছে অপরিবর্তিত—সেই আদি অকৃত্রিম 'পাও'। অনুরূপভাবে 'ডুঙ' এই মূল ধাতুর সঙ্গে 'জল' বা 'গাছ' প্রত্যয় জুড়ে তার অর্থ হতে পারে 'জমে যাওয়া' অথবা 'ছাদের কড়ি'। যদিও উচ্চারণ থাকবে সেই ডুঙ। প্রসঙ্গত 'মাও ৎ-সেতুং' নামের শেষ শব্দটা হচ্ছে ঐ 'ডুঙ'; যদিও ইংরাজের অনুকরণে আমরা ওটাকে 'টুং' অথবা 'তুং' বলি, যেমন 'বর্ধমানকে' বলি 'বার্ডওয়ান' অযোধ্যাকে 'আউদ'।

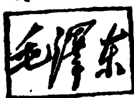
† = Cross (ইংরাজী); Croix (ফরাসী); ক্রুশ (বাংলা)

日 (সূর্য) + 月 (চন্দ্র) → 明 (ঔজ্জ্বল্য)

木 (গাছ) + 木 (গাছ) → 林 (অরণ্য)

包 (পাও)
- (+) 扌 (হাত) → 抱 (বহন করা, উচ্চারণ 'পাও')
- (+) 足 (পা) → 跑 (ছুটে পালানো, ঐ)
- (+) 氵 (জল) → 泡 (বুদ্বুদ, ঐ)
- 艹 (+) (ঘাস) → 苞 (ফুলের কুঁড়ি, ঐ)

東 (ডুঙ)
- (+) 冫 (জল) → 凍 (জমে যাওয়া, 'ডুঙ')
- (+) 木 (গাছ) → 棟 (ছাদের বীম, 'ডুঙ')



মাও ৎসে-ডুঙ-এর স্বাক্ষর; শেষ শব্দ 'ডুঙ' চীনা হাতের লেখায় কী রূপ পরিগ্রহ করেছে সেটা লক্ষণীয়।

চিত্র—১৯
চীনাভাষার চিত্রকল্প

এমন একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সব ভাষাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বাঙলায় 'কাল' লিখলে সেটা গতকাল, আগামীকাল, সময় অথবা কালো রঙ সব কিছুই বোঝাতে পারে। 'তীর' বললে নদীর কিনারা অথবা ধনুকের পরিপূরক দুটোই

বোঝাতে পারে। বাক্যে শব্দটির ব্যবহার দেখে আমরা অর্থ বুঝে নিতে পারি, তার কারণ এ জাতীয় 'দ্ব্যর্থ-বোধক' শব্দের ব্যবহার অল্প। অপরপক্ষে চীনাভাষায় এমন শব্দের ব্যবহার অঢেল। একই বাক্যে ব্যবহৃত চার-পাঁচটি শব্দের প্রত্যেকটিই যদি চার-পাঁচটি অর্থবহ হয় তাহলে ভাষাটা ক্রমশই দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। সেই দুর্বোধ্যতা দূরীকরণের জন্য স্বাধীনতার পর চীনা পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়ে মাত্র ২১৪টি মূল শব্দে ভাষাটাকে সীমাবদ্ধ করেছেন। বর্তমানে ঐ ২১৪টি মূল শব্দ বা ধাতু চীনা ভাষায় সেই ভূমিকাটাই নিচ্ছে, যা নেয় ইংরাজি-সাহিত্যে ছাব্বিশটি এ্যালফাবেট।

যে প্রসঙ্গ থেকে এত কথার অবতারণা সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসি এবার। ভাষাগত ঐ মৌল পার্থক্যের জন্য হাজার হাজার বছরের সৌহার্দ্য সত্ত্বেও যথেষ্ট সংখ্যক চীনা শব্দ সংস্কৃতে আমদানি করা যায় নি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মাত্র ছয়টি সংস্কৃত শব্দ উদ্ধার করতে পেরেছেন যা চীন থেকে এসেছে। সেই ছয়টি[২] শব্দ হচ্ছে :

(১) চীন : খ্রীষ্টপূর্বযুগের চীন রাজবংশ থেকে।

(২) তশর : চীনা শব্দ 'তাই-সৃস্' অথবা 'তাই-সুসে'র থেকে।

(৩) কীচক : যার অর্থ বাঁশের বাঁশী—চীন শব্দ "ক'ই-চক্" থেকে।

(৪) সিন্দুর : প্রাচীন সংস্কৃতে 'নাগরক্ত' শব্দটি 'সিঁদুরে-লাল', রঙ বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। জানি না তার সঙ্গে চীনের ড্র্যাগনের আত্মীয়তা আছে কি-না। পরবর্তী যুগে 'সিন্দুর' শব্দটি এসেছে চীনা শব্দ "ৎস'ইনৎ-উঙ" থেকে।

(৫) শায় : যার অর্থ 'কাগজ'। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচির মতে অষ্টম শতাব্দীতে চীনা ও সংস্কৃত ভাষায় যথাক্রমে 'ৎসীহ্' এবং 'শায়ঃ' শব্দ ব্যবহৃত হতো।

(৬) মুসার : মহাভারত ও হরিবংশে ব্যবহৃত এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ একটি অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের পাথর। এ শব্দটি নাকি চীনা ভাষা থেকে এসেছে।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে যে প্রশ্নটি আছে সেটিও প্রকৃত অধিকারীদের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করে যাই। চীনদেশে প্রচলিত শব্দ 'মান্দারিণ' (mandarin)-এর অর্থ মন্ত্রীস্থানীয় রাজপুরুষ। চীনা-সংস্কৃতির উপর লিখিত ইংরাজি-গ্রন্থে ঐ শব্দটিকে বরাবর 'ইটালিক্স'-এ মুদ্রিত হতে দেখেছি। শব্দটির ব্যবহার কি চীনা ভাষায় আছে? থাকলে, সেটি কি সংস্কৃত শব্দ 'মন্ত্রীন্'-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়? আচার্য সুনীতিকুমারের তালিকায় ঐ শব্দ দুটি অনুপস্থিত।

ভারতীয় সাহিত্যে 'চীন'-এর উল্লেখ : 'চীন' শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে যথেষ্ট ব্যাপক। মনু-সংহিতা, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ললিতবিস্তর, চরক ও বৃহৎ সংহিতা এবং কালিদাসের কাব্যে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত।

প্রধানত চীন দেশকে বোঝাতেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও এর আরও চার পাঁচটি ভিন্ন অর্থবহ প্রয়োগও দেখা যায়। 'চীন' অর্থে সেখানে একজাতের ধান অথবা একশ্রেণীর হরিণ, সুতা, পতাকা, সীসা প্রভৃতি। 'চীন' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্যান্য সমাসবদ্ধ পদও নজরে পড়ে। যথা :

চীন-কর্কটিকা—তরমুজ-জাতীয় ফলবিশেষ (নির্ঘণ্টপ্রকাশ); চীনাংশুক—রেশমী-বস্ত্র (হরিবংশ, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মহাভারত, অমরুশতক প্রভৃতি) ; চীনপট্ট—রেশমী বস্ত্র (পণ্হবণাসুত্ত) ; চীন কর্পূর—কর্পূর (রাজনির্ঘণ্ট) ; চীনম—লোহা (ঐ) ; চীন পিষ্ট—সিঁদুর (বিক্রমাঙ্কদেবচরিত); চীনরাজপুত্র—ন্যাসপাতি গাছ (বৌদ্ধ গ্রন্থ)।

মহাভারতে 'চীন'-এর উল্লেখ পেয়েছি বারে বারে। যথা :

সভাপর্বে অর্জুনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে—'স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগজ্যোতিষেশ্বরঃ ॥[৩]

সভাপর্বেই পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যে সন্তপ্ত দুর্যোধন কর্তৃক রাজসূয়যজ্ঞে উপঢৌকন এবং উপঢৌকন-দাতাদের বর্ণনায়—'চীনাহ্ণকাংস্তথা চৌড্রান্ বর্বরান্ বনবাসিনঃ'[৪] এবং 'প্রমাণরাগস্পর্শাঢ্যং বহ্লীচীন সমুদ্ভবম্।[৫]

উদ্যোগপর্বে সেনোদ্যোগ উপপর্বে ভগদত্তের সৈন্য ছিল—'চীনৈঃ কিরাতৈশ্চ... সংবৃতম্।[৬]

ঐ উদ্যোগপর্বেই ভগবদ্যান উপপর্বে ভীম যে অষ্টাদশজন কুনৃপতির নামোল্লেখ করছেন তার মধ্যে রয়েছে চীন দেশের রাজা ধৌতমূলকের নাম।[৭] তাছাড়া দেখছি, রাজা ধৃতরাষ্ট্র চীন-দেশোদ্ভব সহস্র সহস্র অজিন (মৃগচর্ম) শ্রীকৃষ্ণকে উপঢৌকন দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছেন।[৮]

ভীষ্মপর্বে পুনরায় পাচ্ছি 'যবনাশ্চীনকাম্বোজাঃ দারুণা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ'[৯]

নজির আর দীর্ঘতর করে লাভ নেই। ম্লেচ্ছ বলে উল্লেখ করলেও চীনের অস্তিত্ব ও ঋণ যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে স্বীকৃত এ কথা অনস্বীকার্য।

চীন শিল্পের প্রভাব : ভারতীয় আর্যশিল্পের আদি-শিল্পীরা যখন ভারতের বিভিন্ন প্রত্যন্ত দেশে শিল্পের প্রথম স্বাক্ষর রাখছেন—পূর্বভারতের বরাবর পর্বতে, উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে, মধ্যভারতের সাঁচী-বুদ্ধগয়া-ভারহুতে কিংবা পশ্চিমাঞ্চলের ভাজা, কার্লে, কাহ্নেরী, অজন্তায়—তখনও কোনো চীনা প্রভাব ভারত-শিল্পে নজরে পড়ে না, যদিও চীন-ভারতের পরিচয়টা তার আগেই ঘটেছে। তার পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ভারত শিল্পী যখন অজন্তা, এলোরা, মহাবলীপুরমের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি রূপায়িত করছেন তখন ভারত-চীন সম্পর্কটা অনেকখানি নিবিড়। ভাবধারায় জোয়ার-ভাঁটা

খেলাতে শুরু করেছে দু তরফেই। সমুদ্রপথে, রেশমের পথে, বণিক, পর্যটক ও পরিব্রাজকদের মাধ্যমে। হাজার হাজার চীনা বণিক এসেছেন তাম্রলিপ্তি, কাঞ্চীপুরম, ভৃগুকচ্ছ বন্দরে—শত শত চীনা পর্যটক তীর্থদর্শন করে গেছেন ভারতবর্ষে। কৌতূহলী ভারতীয় শিল্পী নিশ্চয় কথাপ্রসঙ্গে তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছেন চীনা শিল্পের বিবরণ, হয়তো সংগ্রহও করেছেন চীনা-শিল্পের নমুনা। ইতিহাস বলছে—সম্রাট হর্ষবর্ধন হিউএন-থ্‌সাঙের কাছে একটি চীনা নৃত্যনাট্য—"চী'ন রাজকুমারের গাথা" মুখে মুখে শুনেছিলেন; হয়তো লিখিয়েও নিয়েছিলেন, কারণ গুপ্তযুগে ঐ চীনা নৃত্যনাট্য রাজসভায় অভিনীত হয়েছিল বলেও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর ভারতের কুশান রাজবংশের ধমনীতে মঙ্গোলীয় রক্ত ছিল—ব্যাপক অর্থে তাঁরা চীনাই। কুশানরাজ কনিষ্ক চীন সম্রাটের অনুকরণে উপাধি গ্রহণ করেছিলেন "ৎ'ইয়েন-ৎজু" অর্থাৎ স্বর্গের পুত্র—যা নাকি সংস্কৃত ভাষায় বলা হলো 'দেবপুত্র', পারসিক ভাষায় 'বাগ-পুথ্‌র।'

গুপ্তযুগের মুদ্রায় চীনা প্রভাবের এক তির্যক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তযুগের মুদ্রার অক্ষরগুলি খোদাই করা হয়েছে 'গুপ্ত-ব্রাহ্মী' লিপিতে। মুদ্রার কিনার দিয়ে বাম থেকে দক্ষিণে অক্ষরগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে খোদাই করা হতো—যেমন ধরা যাক হয়তো লেখা হয়েছে 'অপ্রতিরথো রাজা জিত্বা মহীং সুচরিতৈঃ দিবং জয়তি' (অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা পৃথিবী জয় করে তাঁর কীর্তির মাধ্যমে স্বর্গরাজ্য জয় করেছেন)। মাঝখানে দেখছি ছাপা হয়েছে মহারাজের দণ্ডায়মান মূর্তি; কিন্তু রাজার নামের অক্ষরগুলি—যেমন 'স-মু-দ্র-গু-প্ত' লেখা হয়েছে উপর থেকে নিচে, বাম থেকে দক্ষিণে নয়। ঠিক চীনা হরফ যেভাবে লেখা হয়। ইতিপূর্বের কোনো ভারতীয় মুদ্রার এমন উপর থেকে নিচে লেখার কায়দাটা দেখি নি। এই সঙ্গে যখন মনে পড়ে যে, ইতিমধ্যে চীনামুদ্রা পর্যটকদের মাধ্যমে ভারতে এসেছে তখন এটাকে চৈনিক প্রভাব বলে গ্রহণ করতে বাধা দেখি না।

প্রকৃতির প্রতি ভারতীয় এবং চৈনিক শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিযুগ থেকেই একটা মৌল প্রভেদ লক্ষ্য করা গেছে। ভারতীয় শিল্পী প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। প্রকৃতি যেন মানব-জীবন নিরপেক্ষ কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়—দ্রষ্টা বা বোদ্ধা হিসাবে শিল্পী যেন দূর থেকে অসংস্পৃষ্ট দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখেন নি, যেমন ভাবে প্রেক্ষাগৃহে-বসা দর্শক প্রত্যক্ষ করে মঞ্চের উপর অভিনয়। পরন্তু ভারতীয় শিল্পীমানস যেন মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়ানো স্বয়ং একজন কুশীলব। প্রকৃতির যা কিছু—গাছপালা, নদী-নির্ঝর, অরণ্য-পর্বত, পশুপাখী, তাঁকে ঘিরে একই বিশ্বনাট্য-মঞ্চে অভিনয় করছে; শিল্পী স্বয়ং সেই মহানাটকে অভিনয় করতে করতে তা

দেখছেন, তা থেকে আনন্দ আহরণ করছেন—ঠিক যেমনভাবে মঞ্চে অভিনয়কালে এক-কুশীলব অপর অভিনেতার অভিনয়-চাতুর্য উপভোগ করেন। ভারতীয় শিল্পীর কাছে প্রকৃতি প্রাণময় সত্তা; তাই শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যায় তখন শুধু অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কাছে বিদায় নিলেই তার কর্তব্য শেষ হয় না, তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হয় হরিণশিশু এমন কি 'বনজ্যোৎস্না'কেও! তাই অজন্তা প্রথম গুহায় অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণিকে ঘিরে রয়েছে যে সব গাছপালা, বানর-ময়ূর-পর্বত-কিন্নর তারা ঐ চিত্রের পশ্চাৎপট নয়—প্রাণ! তাই মহাজনক-জাতকে দেখছি (অজন্তা প্রথম গুহা) হিমাবলী পর্বতে সন্ন্যাসী যখন সদ্ধর্মের বাণী শোনাচ্ছেন তখন হরিণ-পাখী-বৃক্ষ উদ্ভিদেরাও উৎকর্ণ হয়ে তা শুনছে। সুতসোম জাতকে (অজন্তা, সপ্তদশ) রাজা অনায়াসে সিংহীর প্রেমে মত্ত হয়ে ওঠেন। প্রকৃতি ও মানুষ ভারতীয় শিল্পে একাত্ম, সংশ্লিষ্ট।

অপরপক্ষে চীনা শিল্পী রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় এ বিশ্বপ্রপঞ্চকে অনুভব করতে চেয়েছেন রঙ্গমঞ্চ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে, ঐ প্রেক্ষাগৃহে বসে। তাঁর দৃষ্টি যাকে বলি 'সাবজেকটিভ্'; শিল্পীমানসের জারকরসে জীর্ণ করেই শিল্পবস্তু রূপায়িত হচ্ছে বটে কিন্তু শিল্পী স্বয়ং থাকছেন শিল্পের বাইরে। শুধু তাই নয়, প্রেক্ষাগৃহে গিয়েও তিনি শান্ত হচ্ছেন না—তিনি যেন দ্বিতলের বক্সে বসে গরুড়াবলোকনে এ বিশ্বনাট্যের অভিনয় উপভোগ করতে চান! কারণ নবম-দশম শতকের পরবর্তী যুগে আঁকা অধিকাংশ চীনা নিসর্গ-চিত্রই ঐভাবে 'বার্ডস্-আই ভিয়ু'-তে আঁকা। এই যে চীনা শিল্পী রঙ তুলি নিয়ে উদাসীনের মতো ঘর ছেড়ে পথে নামলেন—এই যে পাহাড়-চূড়ায় বসে অধিত্যকার দিকে তাকানোর নির্জন সাধনা তাঁর, এর মূলে আছে সেই আদিগুরু লাও ৎসে-র প্রভাব, যিনি মানুষকে বলেছিলেন প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে। লাও ৎসে-র সেই আদিম চিন্তাধারার সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের ধ্যানযোগ—যার ফলশ্রুতি চীনের 'চ্যান'-মার্গ (সংস্কৃত ধ্যান-মার্গ), যা জাপানে গিয়ে হয়েছিল 'জেন ধর্ম'। এদিকে ভারতীয় শিল্পীর শিল্পচেতনায় কাজ করে গেছে উপনিষদের বাণী—তিনি শুধু তোমাতেই নয়, তিনি মধুময় ঐ রাত্রির তমিস্রায়, ঐ ওষধির আশীর্বাদে, ঐ বনস্পতির ছায়ায়। সব নিয়েই তিনি পূর্ণ, সব কিছু বাদ দিলেও তিনি তেমনি পূর্ণ!

ভারতীয় ও চীনা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই যে মৌল প্রভেদ এটা প্রথম দূরীভূত হয়েছিল গুপ্তযুগে, কালিদাসের কাব্যে—বিশেষ করে মেঘদূতে। আচার্য সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন "আমার ব্যক্তিগত মননের ফল, ভারতীয় (সংস্কৃত) কাব্যে এই যে প্রকৃতিবন্দনায় ক্ষেত্রে অসংশ্লিষ্ট থাকার আধুনিক মনোভাব—যার

বিকাশ কালিদাসের অদ্ভুত-সুন্দর প্রকৃতি-আলিম্পনে আমরা পেয়েছি, তার মূলে আছে ভারতীয় কবি ও ভাবুকদের উপর চীনা ভাবধারার প্রভাব।...প্রকৃতিকে দূর থেকে উপলব্ধি করার এই যে বিশিষ্ট ভঙ্গি সেটি খুব সম্ভব এসেছিল ফা হিয়ান অথবা ঐ জাতীয় চৈনিক পণ্ডিত এবং ভক্তের সান্নিধ্যে আসার ফলে।"[১০]

চীনা সাহিত্যের প্রভাব : কবি কালিদাস যে সময়ে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলঙ্কৃত করছেন বলে ধরা হয় প্রায় সেই সময়েই চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন ভারতে এসেছিলেন। তাই সুনীতিকুমারের ঐ মতামতের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কালিদাস কি মেঘদূত রচনা করেছিলেন ফা-হিয়েন-এর সঙ্গে পরিচিত হবার পর ? জানি না। দুজনের আদৌ কোনো সাক্ষাৎকার ঘটেছিল কি না ইতিহাস সে-কথা স্পষ্টাক্ষরে বলে যায় নি। কিন্তু ইতিহাস এ-কথা বলছে যে, মেঘদূত-কাব্য রচিত হবার শতবর্ষ পূর্বে সুবিখ্যাত চীনা কবি চু' য়ুয়ান তাঁর কাব্যে একাধিকবার মেঘকে দূত হিসাবে ব্যবহার করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। মেঘকে দূত করার চিত্রকল্পগুলি আমি পেয়েছি ইংরাজি অনুবাদে—তা থেকেই বাংলায় সাধ্যমত কাব্যানুবাদ করে দিলাম ; তবু ইংরাজি-অভিজ্ঞ পাঠকের কথা স্মরণ করে ঐ ইংরাজী অংশটুকুও পাশে পাশে ছেপে দিলাম।

এই চিত্রকল্পটি সর্বপ্রথম পাচ্ছি একটি ছোট্ট গীতিকবিতায়—'বিরহ' তার নাম। কবি বলছেন :

"Lovely, loving for my Love,
I gaze afar in my Distress,
Far from Home and Go-between
How shall I my Grief express ?
... ...
Clouds I seek as Messengers,
My petition they deny ;
Swallows would swift Envoys make,
Heedless they have flown on high."[১১]

"নির্জনে বসি বিরহবিধুর সুরে
গাহি গান, চাহি অসীম দূর আকাশে,
কোথা পাব দূত গৃহ হতে অতি দূরে
কেমনে পাঠাব বার্তা প্রিয়ার পাশে ?

...   .

পুষ্কর মেঘে বৃথা তোষামোদ করি
যাচ্ঞা আমার শোনে না নিঠুর মেঘ ;
দূর হতে ঐ বিহগে যখন স্মরি
হেসে সরে যায় ওরা বিদ্যুদ্‌বেগ।"

ঐ ছোট্ট গীতি-কবিতায় চৈনিক কবি অবশ্য মেঘকে দূত হিসাবে নির্বাচনের চিত্র-কল্পটা আভাসে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু দেখছি তাঁর পরবর্তী আর একটি দীর্ঘায়ত কাব্যে—'লি সাও' তার নাম, কবি ঐ মেঘকে প্রেয়সীর কাছে দূতরূপে প্রেরণ করবার অদ্ভুত ইচ্ছাটা পুনরায় প্রকাশ করেছেন। এবার কবি বলছেন :

"I wandered eastward to the Palace green,
And Pendants sought where Jasper Boughs were seen,
And vowed that they, before their Splendour fade,
As gifts should go to grace the loveliest Maid.
The Lord of Clouds I then bade mount the Sky,
To seek the Stream where once the Nymph did lie.
As pledge I gave my Belt of Splendid Sheen,
My Counsellor appointed go-between.
Fleeting and wilful like Capricious Cloud,
Her Obstinacy swift no change allowed,
At Dusk retired she to the crag withdrawn,
Her Hair beside the Stream she washed at Dawn."[১২]

অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় :
পূর্বাচলে গিয়েছিলেম মরকতের পুরে
হরিৎ-শোভায় খুঁজেছিলেম প্রিয়ার কণ্ঠহার,
বলেছিলেম : ঝরাপাতার দিনের আগেই তোরা
অনিন্দ্য সেই তনুদেহ সাজিয়ে তুলিস তার।
মেঘরাজে বলি : খুঁজে দেখুক গগনপথে
মন্দাকিনীর কোন বাঁকেতে অপ্সরী সে আছে,
পান্নাগাঁথা কোমরবন্ধ দিয়েছিলেম খুলে
দৌত্যকাজে অস্বীকৃত হয় যদি সে পাছে।

খেয়ালী ঐ মেঘের মত চঞ্চলা মোর প্রিয়া
খেয়ালখুশীর পাগলামি যার নাই ক' অবশেষ—
সাঁজের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে কোন পাহাড়ের কোলে
ভোরের বেলায় ঝরণাধারে ঝাড়ে চিকুর কেশ ॥

একথা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারব না যে, কালিদাস মেঘদূত রচনা করেছিলেন ফা-হিয়েন জাতীয় কোনো চৈনিক পরিব্রাজকের মুখে ঐ সব চীনা কবিতা শুনে। প্রভাবিত হয়ে। কিন্তু প্রাক মেঘদূত যুগের ঐ চৈনিক কবিতাটি আমাদের কৌতূহল জাগায় বই কি! এমন কৌতূহল কি আমাদের ইতিপূর্বে জাগে নি—যখন খোঁজ নিয়েছি কপালকুণ্ডলা চরিত্রচিত্রণের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'মিরাণ্ডা' চরিত্রটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কিনা; অথবা 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার আগে তিনি 'আইভান-হো' পাঠ করেছিলেন কি না! বিশেষ: আচার্য সুনীতিকুমার এবং পণ্ডিত হরিনাথ দের[১৩] মতো ভাষাবিদরা যখন জানাচ্ছেন—এ দুটি কাব্য-সম্পদে সাদৃশ্য আছে। প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে পাঠককে লক্ষ্য করতে বলব: যক্ষপ্রিয়া যতই সুন্দরী হন, নৃত্যগীত-পটিয়সী হন না কেন, চীনা কবির নায়িকার মতো তিনি প্রকৃতি-কন্যা ছিলেন না। এখানেও সেই লাও-ৎসের প্রভাব।

এ-ছাড়া প্রথম অধ্যায়ে যে বিখ্যাত চৈনিক প্রাচীন গাথাটির উল্লেখ করেছিলাম—সেই 'রাখাল বালক ও তাঁতিকন্যার উপকথা' সেটিও মেঘদূতের পূর্বযুগে লিখিত। সেখানেও কিন্তু এমন কিছু আছে যার সুর কালিদাসের কাব্যের সুরের সঙ্গে সম-তানে বাঁধা। তন্তুবায়কন্যা ৎসি-নু ছিল সূর্যদেব শেন-ঈর আত্মজা। পিতার আদেশে সেই কুমারী কন্যা প্রতিদিন দেবতাদের জন্য পোশাক তৈরি করে দিত। শেষে রাখাল বালক খিয়েন-নিউ-এর প্রেমে পড়ে বেচারী একদিন তার কাজে ভুল করল। ক্রুদ্ধ পিতৃদেব যখন মেয়েটির কৈফিয়ৎ তলপ করলেন তখনও বেচারী তার দয়িতের চিন্তায় বিভোর—পিতার আহ্বান তার কানে যায় না! ঠিক এমন ঘটনাই ঘটতে দেখেছি শকুন্তলার জীবনে, যখন দুর্বাসা তার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঐটুকুই সেই অভাগিনী নারীর অপরাধ—আর কোনোও 'স্বাধিকারপ্রমত্ততা' নয়, কিন্তু ফল হলো একই—'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা' হয়ে মেয়েটি নির্বাসিত হলো ধরাধামে এক বছরের জন্য। সেই বিরহ-কাহিনীই ঐ মহাকাব্যের মূল উপজীব্য! এই জন্যই হয়তো জাতীয়-অধ্যাপক বলছেন "এই কাহিনীটি মেঘদূত কাব্যের মূল প্রেরণা; এ ছাড়াও ঐ ধরনের আরও অনেকগুলি চীনা উপকথা আছে। সাদৃশ্যের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মনে হয় খুব সম্ভবত কবি কালিদাস ঐ মোদ্দা-কাহিনীটা কোনো সূত্রে শুনেছিলেন এবং সেটিকে ভারতীয় বাতাবরণে রূপান্তরিত করেছিলেন।"[১৪]

চীনাতন্ত্রের প্রভাব : 'চীনাচার' : বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতবর্ষের মহাযান বৌদ্ধধর্মের বহু দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় চৈনিক প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন।[১৫] তাঁর মতে হিন্দুদের ধ্বংসের দেবতা শিব এবং তাঁর শক্তিস্বরূপা দুর্গা যথাক্রমে মহাযান ধর্মের ভৈরব ও তারার সমতুল্য। আর এই দেবমূর্তিদ্বয়ের পরিকল্পনায় চৈনিক বামাচার কার্যকরী। পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভী বলছেন[১৬]—হরপ্রসাদ-বর্ণিত তারাতন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে সব দেবদেবীর বর্ণনা আছে সেগুলি তিব্বত, নেপাল ও চীনে পূজিত দেবদেবীর মূর্তির রূপান্তরমাত্র। তিনি আরও বলছেন, তন্ত্রে পঞ্চ 'ম'-কার (মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন) ভারতে এসেছে চীন দেশ থেকে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণায় বলছেন[১৭] চীন থেকে এই বামাচার এসেছে বশিষ্ঠের মাধ্যমে ; তারা-বশিষ্ঠ উপাখ্যান এই সিদ্ধান্তটির মূল উৎস।

তারা-বশিষ্ঠের উপাখ্যানটি আমরা নানা সূত্র থেকে পাচ্ছি। যথা—'রুদ্র-যামল তন্ত্র', 'মহাচীনাচার-ক্রম', 'তারা-রহস্য', 'চীনাচার প্রয়োগবিধি'। বিভিন্ন পুঁথিতে সামান্য প্রকারভেদ হলেও মূল-কাহিনীর কাঠামোটি এই রকম :

মুনি বশিষ্ঠ কামাখ্যা-মন্দিরের অদূরে কঠোর তপশ্চর্যায় নিরত থেকেও সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না। তখন কামাখ্যাদেবী ভক্তের সম্মুখে স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে বললেন, তুই দক্ষিণাচারে শক্তি-সাধনা করছিস, কিন্তু চরম সিদ্ধি পেতে হলে তোকে বামাচারে অগ্রসর হতে হবে।

দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বশিষ্ঠ বললেন, আমি বামাচার পদ্ধতি জানি না মা, তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও।

কামাখ্যাদেবী তখন ওঁকে বললেন, তুই মহাচীন-খণ্ডে চলে যা ; সেখানে গিয়ে দেখবি স্বয়ং বুদ্ধদেব ঐ 'চীনাচারে' নিরত। তাঁর কাছ থেকে ঐ বামাচার তুই শিখে আয়। এ দেশে প্রচার কর।

অগত্যা বশিষ্ঠ চীন দেশে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন 'অসংখ্য লোকেশ্বর-সেবিত বুদ্ধ' বামাচারে রত। সবিস্ময়ে দেখলেন, বুদ্ধদেব সেখানে সহস্রাধিক নায়িকা পরিবেষ্টিত, এবং নায়িকাগণ 'সালঙ্কারা, মদালসা, কামাতুরা ও নগ্নিকা'। শুদ্ধাচারী মুনি বশিষ্ঠ অসংখ্য রত্যাতুরা কামিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন, কিন্তু কামাখ্যার আশীর্বাদে তিনি ক্রমশ পঞ্চ 'ম'-কারে অভ্যস্ত হয়ে অন্তিমে সিদ্ধিলাভ করে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন।

কামাখ্যা-মন্দিরের অনতিদূরে বশিষ্ঠাশ্রমের ভৌগোলিক অস্তিত্ব এ কাহিনীর সমর্থক। মোট কথা বোঝা যায়—কামাখ্যা-মন্দিরের কোনো সাধক চীন দেশ থেকে

বামাচার শিখে এসে সেটি এ দেশে প্রথম প্রচার করেন। ঐ চীনাচার বা বামাচার তান্ত্রিক-শাক্ত ধর্মে এবং বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে ক্রমে অনুপ্রবেশ করে। এমনকি বহু পরবর্তী যুগে ঐ জাতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বৈষ্ণব ধর্মেও স্থান পায়।

এই বামাচার অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীন দেশে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় দর্শনে যেমন বলা হয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতির নন্দনেই সৃষ্টির মূল বিধৃত, নর ও নারীর মিলনই যেমন ভারতীয় রসতত্ত্বে আদিরস, ঠিক তেমনি চৈনিক পণ্ডিতেরাও বলছেন —সৃষ্টির মূলে আছে 'য়াঙ' এবং 'য়িন'-এর পারস্পরিক আকর্ষণ। য়াঙ—পুরুষ, য়িন—প্রকৃতি। বুদ্ধদেব মারকে অস্বীকার করেছিলেন, ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বৌদ্ধ-ধর্মে। চীন সেটাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারে নি। বুদ্ধদেবের ধ্যানযোগকে মেনে নিলেও তাও-দর্শনের 'য়াঙ-য়িন'-এর নিত্য-নন্দনকে তারা অস্বীকার করতে পারে নি। ওরা বুঝেছিল—সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখতে হলে 'য়াঙ-য়িন'-এর মিলন অনস্বীকার্য! তাই ওরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির একটা সমন্বয় করতে চাইল। পরবর্তীকালে ভারতীয় পরিব্রাজকেরা চীনে গিয়ে দেখলেন চীনা দার্শনিকেরা বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে বুদ্ধের নিবৃত্তি-মার্গের পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন 'য়াঙ-য়িন' তত্ত্বকে। তাঁদের কেউ কেউ প্রভাবিত হলেন। আরও কয়েক শতাব্দী পরে ঐ চিন্তাধারা ভারতবর্ষে এসে পৌছায়।

ভারতীয় ভাস্কর্যে ঐতিহাসিক-উষা যুগে—ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়া, উদয়গিরিখণ্ডগিরি কিংবা ভাজা-কার্লে-কাহ্হেরীতে মিথুন-মূর্তি নজরে পড়ে না, বদ্ধকাম মূর্তি তো একেবারেই নয়। যুগল-মূর্তি আছে, দাতা এবং তাঁর সহধর্মিণীর কিন্তু তাতে কামগন্ধ নাই। অথচ বিবসনা নারীমূর্তি, যাকে বলি 'নিউড-স্টাডি' তা কিন্তু সেই মহেন্‌জো-দারোর আমল থেকেই পাচ্ছি। এমন কি প্রথম সহস্রাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় ভাস্কর্যে বদ্ধকাম-মূর্তি আদৌ প্রাধান্যলাভ করে নি। লক্ষণীয় এই যে, ঐ বদ্ধকাম মূর্তির প্রথম আবির্ভাব চৈনিক পরিব্রাজকদের ভারত ভ্রমণের পরবর্তী কালে। অপরপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই চীনের শিল্পে বদ্ধকাম-মূর্তি নির্মিত হতে শুরু করেছে, যদিও সেগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকত।[১৮] হয় সামন্তরাজগণের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়, অথবা চীনাচারী মন্দির পুরোহিতের হেপাজতে। ডঃ যোসেফ নীডহ্যাম [১৯] বলছেন—তাও-দর্শনে অমৃতলাভের (চীনা শব্দটি হচ্ছে : 'শিয়েন') জন্য সাধকের পক্ষে ছয়টি আচার মেনে চলতে হতো। সেগুলি হচ্ছে (১) শ্বাস-সংযম বা প্রাণায়াম (২) সূর্যপ্রণাম (৩) হঠ-যোগ (৪) মৈথুন (৫) রাসায়নিক প্রক্রিয়া (৬) আহার-সংযমবিধি। এর ভিতর চীনা যোগীরা প্রাণায়াম ও সূর্যপ্রণাম অভ্যাস করেছেন ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসার বহু পূর্বযুগ থেকে—চৌ-যুগ থেকে, অর্থাৎ

খ্রীষ্টজন্মের সহস্রাব্দী কাল পূর্ব থেকে। আর ঐ চতুর্থ আচার—'মৈথুন' হচ্ছে চীনের নিজস্ব অবদান। সাধনমার্গে মৈথুন-এর আবশ্যিক স্থান নির্দেশ তার পূর্বে অন্য কোনো ধর্ম বোধকরি করে নি। হিন্দুধর্ম মৈথুনকে অস্বীকার করে নি—কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে তাকে সীমিত করতে চেয়েছে। বাণপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস পর্যায়ে তার কোনো ভূমিকা ছিল না, যতদিন না চীন থেকে ঐ ভাবধারা এসে তন্ত্রে প্রবেশ লাভ করল।

এই চীনাচার আমদানির প্রসঙ্গে মুনি বশিষ্ঠের সঙ্গে আরও একজনের নাম লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার। তিনি প্রাকজ্যোতিষপুরের নৃপতি ভাস্করকুমার। বশিষ্ঠ ইতিহাস-চিহ্নিত ব্যক্তি নন, তাঁর সাল-শতাব্দীর হিসাব নেই; কিন্তু ভাস্করকুমার ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ কামরূপরাজের প্রচেষ্টায় চীনা বামাচার তন্ত্র 'তাও তে চিং' সংস্কৃতে অনূদিত হল[২০]। তাই কি 'মা' কামাখ্যা "কাম-রূপ"-কামাখ্যা হয়ে গেলেন? হিসাবে দেখছি ভাস্করকুমারের জীবিতকালেই হিউএন-থ্‌সাঙ ভারতে আসেন; কিন্তু তিনি ছিলেন মহাযান ধর্মের উপাসক; তান্ত্রিক বজ্র-যান তখনও ভারতবর্ষে প্রকট নয়। ফলে চীনাচার প্রচারে সম্ভবত হিউএন-থ্‌সাঙ-এর কোনো ভূমিকা ছিল না। বরং পরবর্তী পরিব্রাজক ঈ-ৎসিং-এর প্রভাব ভারতীয় তন্ত্র-সাধনায় পড়ে থাকতে পারে, কারণ ঈ-ৎসিং ছিলেন তান্ত্রিক-বৌদ্ধ। মোটকথা ক্রমে ঐ চীনাচার গুহ্য সাধন-চর্চা রূপে সমগ্র ভারতকে একসময়ে গ্রাস করতে বসে-ছিল—কী শাক্ত-মন্দিরে, কী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে। আচার্য শঙ্কর হিন্দুধর্মকে ঐ ভ্রষ্টাচার থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু এই আচারধর্মের মর্মমূলে এমন গভীর-ভাবে প্রবেশ করেছিল যে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্মের সহজিয়া আচারে স্বকীয়া-পর-কীয়া-তত্ত্বে পর্যন্ত ঐ চীনাচারের তির্যক প্রকাশ দেখা যায়। মহাভারত ও রামায়ণে 'ঊর্ধ্বরেতা' শব্দের ব্যবহার আছে—কিন্তু তার অর্থ ছিল ইন্দ্রিয়-সংযমী; অপরপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রে ঐ শব্দের যে যোগরূঢ় অর্থ প্রচলিত সেটিও এসেছে ঐ চৈনিক যৌনাচার থেকে।

ভারতীয় মহাযান ও বজ্রযান-ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবী চীন দেশে গিয়ে নূতন নাম-রূপ গ্রহণ করেছিলেন এ কথা আগেই বলেছি। তাঁদের সেই রূপান্তর নূতন নূতন তত্ত্বের ইঙ্গিত দেয়। বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন কিন্তু একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত না উল্লেখ করে থামতেও পারছি না:

অজন্তার প্রথম গুহায় আঁকা 'অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি'-র আলেখ্য বিশ্বের শিল্প-ইতিহাসের এক অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। একাধিক শিল্পবিশারদ (লরেন্স বিনিয়ন, কুমারস্বামী, ডঃ জীমার প্রভৃতি) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন এই পুরুষমূর্তিকে কি-জানি-কেন নারীমূর্তি বলে ভ্রম হয়—এতই কমনীয় এবং রমণীয় এই শালপ্রাংশু-

মহাভুজ পুরুষ-চিত্রটি। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির এই স্ত্রী-সুলভ সৌন্দর্য বা 'ফেমিনিন-বিউটি'-র মূল উৎস কোথায় তা কিন্তু কোনোও আর্ট-কনৌসার বলেন নি। শিল্পের ইতিহাসে সেটি একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসাবেই রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে আমার যেটা মনে হয়েছে তা বলি : দেখছি, অবলোকিতেশ্বর মহাচীনে গিয়ে হয়েছেন 'কোয়ান-য়িন'। লক্ষণীয় তিনি 'য়িন', অর্থাৎ দেবী, দেব নন। অর্থাৎ চীন-ভূখণ্ডে অবলোকিতেশ্বর হয়েছেন স্ত্রীমূর্তি! আরও দেখছি, ঐ মহান-চিত্রটি অজন্তাগুহায় আঁকা হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে—ফা-হিয়েন, হিউয়েন-থ্‌সাঙ-এর ভারত ভ্রমণের পরবর্তী যুগে। এখন আপনাদের অনুরোধ করব চিত্র-১১ এবং চিত্র-১২ তুলনা করে বলুন অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির ঐ রমণীসুলভ কমনীয়তা কি চৈনিক প্রভাবে?

চীনা-বিজ্ঞানের প্রভাব: রেশম, কাগজ, ছাপাখানার টাইপ, কম্পাস, বারুদ আবিষ্কার ভারতীয় বিজ্ঞানকে কী-ভাবে প্রভাবিত করেছিল সে কথা আগেই আলোচনা করেছি। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় চৈনিক ও ভারতীয় আচার্যেরা কী-ভাবে সমান্তরাল সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন সে-কথাও ইতিপূর্বে বলেছি। কে কাকে কোন্ ব্যাপারে কতটা প্রভাবিত করেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। 'শূন্য-আবিষ্কার' এবং শূন্যের স্থান-মাহাত্ম্য নিরূপণে সংখ্যাতত্ত্বে ও গণিতে যে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে—সেটা যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার তা-ও আমরা দেখেছি। বলেছি—চীন ঐ সূত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। এখন মনে হচ্ছে চীন ঋণী নয়, সে তার ঋণ শোধ করেছে কড়ায় গণ্ডায়। বস্তুত ভারতই ছিল চীনের কাছে গণিত রাজ্যে ঋণী—ঐ 'শূন্য' দিয়ে ভারত সেই পূর্বতন ঋণটাই শোধ করেছিল। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা দরকার।

১ থেকে ৯ সংখ্যা এবং শূন্যের ব্যবহার ইউরোপ শিখেছে আরবদের কাছে, একেবারে হাল-আমলে—এই তো সেদিন, দ্বাদশ-শতাব্দীতে। আরব ঐ সংখ্যাগুলিকে বলত 'রকম্ অল-হিন্দ্' অর্থাৎ 'ভারতীয় সংখ্যা'। ফলে ইউরোপ আজও স্বীকার করে ভারতের কাছে সে সংখ্যাতত্ত্ব-বিষয়ে ঋণী। কিন্তু ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখা দরকার :

অশোকের শিলালেখে শূন্যের ব্যবহার নেই, কিন্তু ১ থেকে ৯ সংখ্যার ব্যবহার আছে। ৯-এর পর ১০ বোঝাতে একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। ১১ বোঝাতে ঐ চিহ্নের পরে লেখা হতো ১। এইভাবে ২০, ৩০, ৪০…৯০ পর্যন্ত বোঝানোর জন্য বিভিন্ন চিহ্ন প্রচলিত ছিল। ১০০, ২০০, ৩০০ প্রভৃতির জন্যও পৃথক পৃথক চিহ্ন। অর্থাৎ অশোকের আমলে 'একক-দশক-শতক'—স্থান মাহাত্ম্যে সংখ্যার পদোন্নতির ব্যবস্থা হয় নি।

একক-দশক-শতকের ব্যবহার শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীতেই প্রথম দেখতে পাচ্ছি ৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। একটি শাসনে। সেটা কলচুরি সন ৩৪৬। এখানে পূর্বেকার নিয়ম মেনে "তিনশ-জ্ঞাপক চিহ্ন+চল্লিশ-জ্ঞাপক চিহ্ন+ছয়" এ ভাবে সনটা লেখা হয় নি—হয়েছে সরাসরি ৩৪৬! অর্থাৎ একক-দশক-শতক-রীতি, স্থান মাহাত্ম্যে সংখ্যার পদমর্যাদাবৃদ্ধির গাণিতিক সূত্র প্রবর্তিত হয়েছে।

এবার বলি, ১ থেকে ৯ সংখ্যার ব্যবহার ('শূন্য' বাদে) চীন দেশে কিন্তু সেই চৌ-যুগ থেকে অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের তেরশ বছর আগে থেকে প্রচলিত। ভারতে ঐ ভাবে নয়টি সংখ্যার ব্যবহার অত আগে হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, বা মায়া-সভ্যতাতেও সংখ্যার ব্যবহার ছিল—কিন্তু তাদের কায়দা ছিল অন্য রকম। ব্যাবিলনে শুধু ছিল ১ চিহ্ন এবং তাদের গুণিতক ছিল ৬০, 'দশ' নয়। যে কারণে মানব সভ্যতা আজও ঘণ্টা-মিনিটকে ষাট ভাগে ভাগ করছে, বৃত্তকে ৩৬০ (৬০ × ৬) ডিগ্রিতে ভাগ করছে। মায়া সভ্যতায় (খ্রীঃ পূঃ ১০০০ থেকে) গুণিতক ছিল 'পাঁচ' এবং 'কুড়ি'। ঐ সব সভ্যতার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল না। ফলে এ কথা অনুমান করা যায় যে, ১ থেকে ৯ সংখ্যা ভারত আমদানি করেছে চীন থেকে, যেমন স্থানমাহাত্ম্যে তাদের পদমর্যাদা-বৃদ্ধি করার গাণিতিক সূত্র, যাকে বলি 'একক-দশক-শতক পদ্ধতি' এবং শূন্যের ব্যবহার চীন শিখেছে ভারতবর্ষের কাছ থেকে। চিত্র-২০-তে বিভিন্ন-সভ্যতায় সংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহারটা দেখাবার চেষ্টা করেছি :[২১]

v	vv	vvv	vvv v	vvv vv	vvv vvv	vvv vvv v	vvv vvv vv	vvv vvv vvv	<	ব্যাবিলন-মেসোপটেমিয়া আ: ৩০০০ খ্রী: পূর্ব
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	রোমান আ: ৭০০ খ্রী: পূর্ব
•	••	•••	••••	—	• —	•• —	••• —	•••• —	=	মা য়া আ: ১০০০ ঐ
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	চী না আ: ১৩০০ ঐ
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	ভারত ৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	বর্তমান সভ্যতা ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ

চিত্র—২০

'দিবে আর নিবে' সূত্রে ভারত এবং চীন বহু শতাব্দী ধরে দান প্রতিদানের মাধ্যমে পরস্পরকে সাহায্য করে আজ এসে দাঁড়িয়েছে বিংশ শতাব্দীর এই শেষপাদে;

যখন তাদের মাঝখানে উঠেছে পর্দা—প্রতিবেশীর দিকে চোখ তুলে তাকানোটা হয়েছে মানা। আচার্য স্নীতিকুমার তাঁর মস্কো বক্তৃতার উপসংহারে বলেছিলেন,

> **"It is the bounden duty of scholars, both in India and China, to pick up the lost threads of this co-operation, and along different lines of investigation which were not known in ancient days, to pursue the story of this international co-operation, directly in the domain of philosophy and religion and indirectly in that of Science."[২২]**

জাতীয় অধ্যাপক ১৯৫৯ সালে মস্কোর বক্তৃতামঞ্চে যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন—দর্শন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দুই প্রতিবেশী-রাজ্যের অবলুপ্ত সাহচর্যের সম্পর্কটা পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন—মূলত রাজনৈতিক কারণে তাতে প্রকৃত অধিকারীরা সাড়া দিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই বর্তমান অনধিকারীর এই অক্ষম প্রয়াস। এবং যেহেতু বর্তমান লেখক প্রকৃত অধিকারী নন, তাই তিনি দর্শন-ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যেই তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ করতে পারেন নি, তাঁর দৃষ্টি গেছে অন্যান্য নিষিদ্ধ মহলেও!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম যুগ।

চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসকে আমরা ছেড়ে এসেছি ১৯১২ সালে—রাজতন্ত্রের অবসানে যখন দেশ-বিভাগের দুর্দৈবকে এড়াতে নয়া-চীনের জনক স্থন ইয়াৎ-সেন সরে দাঁড়ালেন দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে—সেনাপতি য়ুয়ান শী-কাই হলো চীনের ভাগ্য-বিধাতা। বর্তমান পরিচ্ছেদে তার পরের দ্বাদশ বর্ষের ইতিহাস আমরা আলোচনা করব—১৯১২ থেকে ১৯২৪। প্রথমে এই যুগটার একটা চুম্বকসার বলে নিই :

রাজতন্ত্রের অবসান হলো—কিন্তু নয়া-নেতা য়ুয়ান শী-কাই চীনের সেই শাশ্বত ইতিহাসের বাইরে পা বাড়াতে চাইল না। তার স্বপ্ন ছিল নূতন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা। সম্রাট হতে চাইল য়ুয়ান। বিপ্লবী নেতারা, বিশেষ করে স্থন ইয়াৎ-সেন বুঝলেন—কী ভুল তাঁরা করেছেন য়ুয়ানকে গদিতে বসিয়ে। স্থন জাপানে চলে গেলেন। ঘটনাচক্রে য়ুয়ান তার স্বপ্ন সফল করার আগেই মারা গেল। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। য়ুয়ান শী-কাই মারা গেল বটে কিন্তু সামরিক ক্ষমতা চলে গেল একাধিক জঙ্গীনেতার হাতে। এক-এক অঞ্চলে এক-এক সেনাপতি হলো দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বছরে ক্যাণ্টনের চীনা-সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল—চীন মিত্রপক্ষে যোগ দিল। ঐ বছরেই রাশিয়াতে হলো বিপ্লব—জারকে গদিচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করল রাশিয়ার জনগণ।

বিশ্বযুদ্ধে হার হলো জার্মানীর ; কিন্তু ভার্সাই-চুক্তিতে বোঝা গেল, চীন-শোষণ নীতি থেকে একতিলও সরে আসতে রাজী নয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। ফলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল চীনের ছাত্র-সমাজ, যাকে ইতিহাস বলছে 'চৌঠা মে-র বিপ্লব'। ধর্মঘট আর বিপ্লবে এখানে-ওখানে বিস্ফোরণ হতে থাকে—সাংহাইয়ের কারখানায়, মাঞ্চুরিয়ার রেল-শ্রমিকদলে। বিদেশী শক্তিগুলোর সহযোগিতায় দেশীয় পুঁজিপতিরা সে বিদ্রোহ দমনের জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়।

ইতিমধ্যে আরও দুটি ঘটনা ঘটেছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। এক নম্বর : চিন্তা-জগতে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। দু-নম্বর : রাশিয়ার বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ একদল লোকের নূতন চিন্তাধারা। দুটিই হয়তো মূলত এক।

১৯২১শে স্থন ইয়াৎ-সেন নবপর্যায়ে 'কুয়োমিংতাং' সরকার গঠন করলেন। ঐ বছরই

চীনে প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হলো এবং স্থন ইয়াৎ-সেন রাশিয়ান কমিণ্টার্নের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। উল্লেখযোগ্য, এই বছরই চীনা সাহিত্যের নবস্থর্য লু স্থন তাঁর 'Ah Q-র আত্মকাহিনী' প্রকাশ করেন।

মোটকথা, বিংশশতাব্দীর প্রথমপাদ যখন শেষ হচ্ছে তখন চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখছি দুটি বিপরীত শক্তির টানাটানি চলছে। একদিকে য়ুয়ান-শী-কাইয়ের উত্তরসাধকের দল, যারা বিদেশী শক্তিগুলোকে তোষামোদ করে ক্ষমতাশালী হয়ে শাসন-শোষণে অংশ নিতে চায়, অপরদিকে আপোস-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বজা-ধারী বামপন্থী স্থন ইয়াৎ-সেন। রাশিয়ান কমিণ্টার্নের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে স্থন যখন তাঁর আপোষ-বিরোধী সংগ্রামকে বাস্তবায়িত করতে প্রস্তুত ঠিক তখনই আকস্মিক-ভাবে স্থন দেহরক্ষা করলেন!

ঠিক ঐ যুগে, এই শতাব্দীর প্রথমপাদের শেষাশেষি ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখছি ভারতবর্ষেও। গয়া-কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের পরাজিত করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন তাঁর আপোষ-বিরোধী সংগ্রাম বাস্তবায়িত করতে চলেছেন ঠিক তখনই মহা-কালের নির্দেশে একইভাবে বজ্রপাত হয়েছিল দার্জিলিঙ-এর স্টেপ-এসাইড-এ!

পার্থক্যও আছে। দেশবন্ধুর উত্তরসাধক আপোষ-বিরোধী সুভাষচন্দ্র, অপরপক্ষে স্থন ইয়াৎ-সেনের উত্তরসাধক বর্ণচোরা চিয়াঙ-কাইশেক! দুজন মানুষ যেন দুই ভিন্ন-মেরুর বাসিন্দা!

এই হলো দ্বাদশবর্ষের চুম্বকসার।

য়ুয়ান শীহ্ কাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতা: য়ুয়ান শীহ্কাইয়ের মতো একজন স্বার্থান্বেষী, প্রতিবিপ্লবী জঙ্গীনেতার স্বপক্ষে স্থন ইয়াৎ-সেন কেন পদত্যাগ করলেন জানতে হলে ঐ যুগের ইতিহাসটাকে আরও খুঁটিয়ে দেখা দরকার; কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে সেটা বাহুল্য। নিঃসন্দেহে স্থন ইয়াৎ-সেন বাধ্য হয়েছিলেন এ সিদ্ধান্ত নিতে—অন্তর্বিপ্লব এড়াতে। আশা করেছিলেন, য়ুয়ান শী-কাইকে বাধ্য করা যাবে জনগণের সরকার গড়ে তুলতে। য়ুয়ান লোক-দেখানো এক পার্লামেণ্ট খাড়া করল। প্রকাশ্যে ভোট কেনা-বেচা হতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশী শক্তিগুলো য়ুয়ানকে সামরিক-ঋণ দিতে শুরু করে। য়ুয়ান তখন পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে সম্রাট হয়ে বসতে চাইল। জাপান ঐ সময় য়ুয়ান শী-কাইয়ের কাছে একটি 'একুশ-দফা দাবী' পেশ করে। তাতে চীনের সর্বনাশ হতে বাধ্য কিন্তু নিজের গদি অব্যাহত রাখতে য়ুয়ান শী-কাই অম্লানবদনে সে দাবীর অধিকাংশই মেনে নিল। তবু শেষরক্ষা হলো না। যাদের শক্তিতে য়ুয়ান শী-কাই ছিল বলবান, তারাই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। ১৯১৫ সালের বড়দিনের সময় এই বিপ্লব ব্যাপক আকার ধারণ করে

এবং য়ুয়ান শী-কাই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্বাসিত হয়। ভগ্নহৃদয়ে অচিরেই মারা যায় সে।

চৌঠা মে'র ছাত্র-বিক্ষোভ : যে দেশ-বিভাগের দুর্দৈবকে এড়াতে সুন-ইয়াৎ-সেন য়ুয়ান শী-কাইকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জাপানে চলে গিয়েছিলেন বাস্তবে কিন্তু সেই দেশ-বিভাগটাই ঘটে গেল। য়ুয়ান শী-কাইয়ের মৃত্যুর পর চীনে ফিরে এসে সুন ইয়াৎ-সেন দেখলেন—চীনে দুটি শাসনকেন্দ্র চালু আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'কুয়োমিনতাং' সরকারের ক্ষমতাকেন্দ্র হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের ক্যান্টনে, আর উত্তরাঞ্চলে একাধিক জঙ্গীলাট দেশটাকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে শোষণ করছে। তাদের পৃষ্ঠ-পোষক হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী জাপান, যার 'একুশ-দফা দাবী' ঐ জঙ্গীলাটেরা মোটা-মুটি মেনে নিয়েছে। সুন ইয়াৎ-সেন কুয়োমিনতাঙের 'জেনারালিসিমো' রূপে অধি-ষ্ঠিত হলেন বটে কিন্তু অচিরেই তিনি দেখলেন—তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলেও জঙ্গীলাটেরা মাথা তুলতে চাইছে।

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। সে যুদ্ধে চীন মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছে—জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলে লড়াই করছে। অবশেষে লড়াই একদিন ফতে হলো। প্যারিসে মিত্রপক্ষ সন্ধিপত্র সই করতে উপস্থিত হলেন—ইংরাজ, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং হ্যাঁ—চীন। ইতিপূর্বেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সন তাঁর ইতিহাস-খ্যাত 'চতুর্দশ-নির্দেশ' ঘোষণা করেছেন—তার পঞ্চম নির্দেশ বলছে যে, কোন্ দেশের শাসন-ব্যবস্থা কী হবে তা নির্ভর করবে সেই দেশের জনগণের ইচ্ছার উপর। চীন এ বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জান দিয়ে লড়াই করেছে—ফলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল অন্তত চীন-ভূখণ্ডে জার্মান-অধিকৃত অঞ্চল এবার চীন ফিরে পাবে! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! দেখা গেল, ভার্সাই প্রাসাদে বিজয়ী মিত্রপক্ষ ঘোষণা করলেন-- অতঃপর জার্মান-অধিকৃত ঐ চীনা ভূখণ্ড ভোগ দখল্ করবে জাপান!

সংবাদটা প্রথমে চীনারা বিশ্বাসই করে নি। তারপর বিক্ষোভে ফেটে পড়ল পিকিং-এর ছাত্র-সমাজ। তারিখটা ৪ঠা মে ১৯১৯। হাজার-হাজার ছাত্র বেরিয়ে পড়ল পথে। জাপানী-দালাল যেসব চীনা-মন্ত্রী ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে-ছিল তাদের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের বিক্ষোভ ইতিহাস রচনা করল। ছাত্রদল প্রথমেই গেল বৈদেশিক দপ্তরে—আমেরিকান, ইংরাজ, ফরাসী কন্‌সুলেটে। যা হয়ে থাকে—কোথাও কর্তাব্যক্তির দপ্তরে নেই। ছাত্রদের ঢুকতে দিল না পুলিশ। শেষে ওরা গেল ওদেরই বৈদেশিক মন্ত্রীর দপ্তর ও বাড়িতে। পুলিশ লাঠি চার্জ করল, ওরা ইট ছুঁড়ল। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল ছাত্ররা। ও পক্ষও যথারীতি শান্তিরক্ষার্থে আক্রমণ করল। গ্রেপ্তার হলো প্রচুর এবং হতাহতও হলো বেশ কয়জন। এসব জিনিস

আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। বাঁধা-ফর্মুলার শেষ দৃশ্য অবশ্য সে-দেশে অভিনীত হয় নি : ঐ বিচার-বিভাগীয় তদন্তটা।

চৌঠা মে'র এই ছাত্র-বিক্ষোভ চীনের আধুনিক ইতিহাসে এক দিক্‌চিহ্ন। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা সামান্য। যতদূর জানি, মৃতের সংখ্যা মাত্র একজন। গ্রেপ্তার এবং আহতের সংখ্যাও চীনের জনসংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য ; কিন্তু ঐ ঘটনাটি চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে এ-জন্য যে, ঐ ঘটনার সূত্র ধরে চীনের বিপ্লব-ইতিহাস দীর্ঘ পদক্ষেপ করেছিল। চীনের ছাত্র-সমাজ ঐ ঘটনার পর থেকেই জেগে ওঠে ; তারা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করে, চীনের নবজাগরণ অধ্যায় শুরু হয়ে যায়।

তুলনা করা চলে ঠিক ঐ সময়ে ভারতবর্ষের একটি ঘটনার সঙ্গে। ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯। সেখানেও মৃতের সংখ্যা নাকি ৩৭৯ জন, ভারতীয় জন-সংখ্যার তুলনায় যা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু সেই পৌনে চারশ' জন শহীদের প্রাণদান ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ থেকে শুরু করে মাইকেল ও' ডায়ারের হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত। আমি জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা বলছি। ৪ঠা মে চীনা-বিপ্লব থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের দূরত্ব—কালের মাপে, মাত্র তিন সপ্তাহ !

চীন-সংস্কৃতির নবজাগরণ : ৪ঠা মে'র আন্দোলন একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কিছু উৎসাহী ও নব্যপন্থী বললেন—চীনের জাগরণের একটা বড় অন্তরায় হচ্ছে যে, লিখিত কোনো ইস্তাহার পড়ে সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। ভাষাটা আছে শিক্ষিত মহলের কুক্ষিগত। ওঁরা চাইলেন —সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় এবার থেকে সাহিত্য রচনা করা হবে। সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা, যাকে ওরা বলে 'পাই হুয়া।' কেউ কেউ সেই 'পাই হুয়া'তে সাহিত্য রচনা করতে চাইলেন। প্রাচীনপন্থীরা হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এলেন ! এ কী অনাচার ! সহস্রাব্দীর পবিত্র ভাষাকে ওঁরা পথে নামাবে ? লেগে গেল নব্য-পন্থী ও প্রাচীন-পন্থীদের লড়াই।

নব্য-পন্থীদের বক্তব্য নানাদিক থেকে যুক্তিসহ। ওঁরা উদাহরণ দিয়ে দেখালেন। খানদানী সাধুভাষায় বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ সম্ভবই নয়। ডিকেন্স কিংবা ডস্টয়েভস্কির চরিত্র চীনা অনুবাদে যা দাঁড়াচ্ছে তা হাস্যকর ! যেমন ধরুন 'পল্লী সমাজের' চরিত্র আকবর সর্দারের বক্তব্য "দিদি ঠাকরান, তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, কৈফিয়দি হব কোন কালামুয়ে ?"—লাইনটা যদি সাধু ভাষায় লেখা যেত "জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, তোমার আজ্ঞামাত্র আমি কারাযন্ত্রণা স্বীকার করিতে সম্মত

হইতে পারি। পরন্তু অভিযোগকর্তা হইব কোন দণ্ডাননে?"—তাহলে গল্পের সে মেজাজটা কোথায় থাকে? কিন্তু প্রাচীন-পন্থীরা কিছুতেই রাজী নন। তাঁদের মূল আপত্তি সংস্কারে! হাজার হাজার বছর যা হয় নি তা হতে দেবেন না তাঁরা।

আপাত দৃষ্টিতে এটা সাহিত্যসেবীদের লড়াই বলে মনে হলেও এর রাজনৈতিক অবদান যথেষ্ট। নব্যপন্থীরাই জয়ী হলেন এ সংগ্রামে। তার ফলে নূতন চিন্তাধারা জনগণের মধ্যে লিখিতরূপে প্রচার করা সহজ হয়েছিল পরবর্তী দশকে। ১৯২০ সালের ভিতর পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইমারী পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে ঐ 'পাইহুয়া'কে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো, তার দু বছরের ভিতর স্কুল পর্যায়ের শেষ শ্রেণীতেও। ঐ দু বছরের ভিতর ছাত্ররা প্রায় বারশ' সাময়িক পত্র প্রকাশ করেছিল 'পাইহুয়া' ভাষায়।[১]

ভাষার এই পরিবর্তনটা যে কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তা ঠিক মতো বুঝে নিতে হলে আমাদের কয়েকটা কথা খেয়াল রাখতে হবে। প্রথম কথা—ভারতবর্ষের মতো সেখানে এক-এক অঞ্চলে এক-একটা কথ্য ভাষা নয়; দ্বিতীয় কথা—এতদিন নিরক্ষরেরা কোনো লেখা পাঠ শুনে কিছুই বুঝত না (যেমন বাঙলার গ্রামে গিয়ে কেউ যদি মূল সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করে শোনায়) এখন অক্ষর-পরিচয় না থাকলেও কানে শুনে বুঝতে পারে (যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ হলে বাঙলার নিরক্ষর গ্রামবাসী বুঝতে পারবে)। তৃতীয় কথা—ভাষার সঙ্গে বিষয়বস্তুও দ্রুত পালটে যেতে শুরু করল। নব্যযুগের নব্য লেখকেরা মানুষের সুখ দুঃখের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শোনাতে শুরু করলেন—ঐতিহাসিক রাজা-রাজরার রোমান্টিক কাহিনী নয়, উপকথা নয়, তাদের প্রাণের কথা। এই নব্যসাহিত্যের ভগীরথ হলেন 'লু স্যুন'।

লু স্যুন : নয়াচীনে লু স্যুনের যে স্থান ভারতবর্ষে সেই স্থান কিন্তু কাউকেই দিতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথকেও নয়। কারণ শিক্ষিত ভারতবাসীর চৌদ্দ আনা অংশ রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়তে পারে না—বাঙালী বাদে আর সব ভারতীয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, মোপাসাঁ বা ডস্টয়েভস্কিতে বিশেষ কোনোও ফারাক নেই। অপর পক্ষে চীন দেশের সব শিক্ষিত মানুষ লু স্যুন পড়তে পারেন। পাই-হুয়া ভাষায় অনেক নব্যপন্থীই লিখতে শুরু করেছিলেন—চেন তু-সিউ, লি তা-চাও, প্রভৃতি। কিন্তু লু স্যুন যেভাবে সাধারণ মানুষের মনোহরণ করেন, বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দেন বোধ করি আর কোনো চীনা সাহিত্যিক তা পারেন নি। তাঁর গুটি তিনেক ছোট্ট লেখা এখানে অনুবাদ করে দিলাম, ইংরাজি থেকে, যাতে তাঁর লেখার মেজাজটা আন্দাজ করা যায়।

(ক) লু স্যুনের : চীনের প্রাচীর[২]

: আমাদের বিশ্ববিখ্যাত মহান প্রাচীর!

ইঞ্জিনিয়ারদের ঐ মহান কীর্তি মানচিত্রে পর্যন্ত দাগ ফেলেছে। সারা পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই যে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখেছে অথচ চীনের প্রাচীরের নাম শোনে নি।

সত্যি কথা বলতে অবশ্য ওটা অসংখ্য দাস আর বন্দীর মৃত্যুর কারণ—আর হূণদের ওটা কোনো কালেই ঠেকাতে পারে নি। এখন ওটা একটা পুরাতত্ত্বের নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়; হয়তো ধুলায় মিশিয়ে যেতে ওর কিছুটা দেরী হবে, কারণ ওটাকে জিইয়ে রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমার সব সময় মনে হয় পাঁচিলটা আমাকে ঘিরে রেখেছে। মহান প্রাচীরটা! পুরানো ইটের মাঝে মাঝে নতুন ইটের জোড়াতালি। পরবর্তী যুগের মেরামতি। ঐ জোড়াতালি-দেওয়া প্রাচীরটা আমাদের ঘিরে রেখেছে!

ঐ মহান প্রাচীরকে টিকিয়ে রাখার জন্য নূতন নূতন ইটের জোড়াতালি দেবার এ ব্যবস্থা কবে বন্ধ হবে?

হে চীনের মহিমময় বিশাল প্রাচীর! তোমার মৃত্যু হলে যে বাঁচি!

(খ) লু সূনের : পথচলতি চিন্তা—বর্তমানকে যারা খুন করে :[৩]

সংস্কৃতির ধ্বজাধারী ভদ্রলোকেরা বলেন—'কথ্যভাষাটা নোংরা এবং নীচ। সুশিক্ষিতের কাছে ঘৃণারও অযোগ্য!'

বটেই তো! চীনের অশিক্ষিত তামাম মানুষ জানে শুধু কথা বলতে, ফলে তারা সবাই নোংরা এবং নীচ। আমার মতো মানুষ কথ্য ভাষার আশ্রয় নিতে চায় কেন? কারণ আমরা 'অশিক্ষিত, কথ্য ভাষায় অজ্ঞতাটাকে ঢাকতে সুবিধা হয় বলেই।' তাই আমরা সবাই, গোটা চীন দেশটাই, নোংরা এবং নীচ—তা তো বটেই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি ঐসব সংস্কৃতিবান উচ্চবিত্তের মহাশয় ব্যক্তিরা 'দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুষ্প' উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র রেস্তোরাঁর ওয়েটারের মতো সব সময়েই খানদানী ভাষায় কথা বলতে পারেন না—সে যেমন দু পাত্র মদ অথবা এক প্লেট খাবার পরিবেশনের সময় চোস্ত লিখিত ভাষায় কথা বলে ওঁরা তা পারেন না। কাগজ-কলম হাতে পেলে তবেই ঐ চোস্ত লিখিত ভাষাটা তাঁরা ব্যবহার করেন—কিন্তু কথা বলতে শুরু করলেই এ্যা-ছি ছিছি! সেই নোংরা আর নীচ কথ্যভাষাটা বেরিয়ে আসে! চীনের চল্লিশ কোটি মানুষ মুখ খুললেই হয়ে পড়ে নোংরা আর নীচ! ওরা নাকি তখন ঘৃণারও অযোগ্য। কী মুশকিল বলুন!

ঐ ভদ্রলোকেরা মরণশীল দুনিয়ায় অমর হয়ে থাকতে চান। তাঁরা আছেন মাটিতে আর ভাব দেখান যেন অমর্ত্যচারী! এ যুগের মানুষ, এ যুগের বাতাসে নিশ্বাস নেওয়া মানুষ কেমন করে অমন মরে-ভূত হয়ে-যাওয়া ভাষায় কনফুশিয়াসের

নীতিবাক্য মানুষের গলায় ঢেলে দিতে চান, ভাবলে অবাক লাগে! বর্তমানকে এঁরা অস্বীকার করতে চান, অপমান করতে চান। এঁরা বর্তমানকে হত্যা করতে উদ্যত! এবং বর্তমানকে হত্যা করা মানেই ভবিষ্যতকে হত্যা করা।

অবশ্য ভবিষ্যৎ ওঁদের নাগালের বাইরে—সেটা আগামী যুগের এক্তিয়ারে!

(গ) **লু সুন: 'আর একটি লোকগাথা'**[৪]: "একুশ দিন পরের কথা। সকাল বেলা। থানাতে জবানবন্দী নেওয়া হচ্ছে। অন্ধকার একটা ছোট্ট ঘরে দুজন অফিসার বসে আছেন; একজন বাঁ দিকে, একজন ডাইনে। ডানদিকের অফিসারটির ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি চীনা কোট, বাঁদিকেরটি স্যুটধারী। শেষোক্ত ভদ্রলোকই ইতিপূর্বে বলেছিলেন, মানুষ কখনও মানুষের মাংস খায় না। তিনিই জবানবন্দী লিখে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। কয়েকজন পুলিশ গাল পাড়তে পাড়তে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো একটি ছাত্রকে। আঠারো বছর বয়স তার। মুখটা রক্তশূন্য, জামাকাপড় ধূলি-ধূসরিত—ছোকরা এসে দাঁড়ালো ওঁদের সামনে। চীনা-কোট ছেলেটির নাম-ধাম, বয়স ও জন্মস্থানের কথা জেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি ঐ স্কেচ-ক্লাবের মেম্বার? ছবি আঁক?

: হ্যাঁ।

: ক্লাবের পাণ্ডা কে?

: আজ্ঞে সভাপতি হচ্ছেন 'চ', আর সহ-সভাপতি—'হ'—

: তারা কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে বল তো?

: তা তো জানি না। ওঁদের দুজনকেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

: তা স্কুলে এসব ছেলে খ্যাপানো হুজ্জোৎ শুরু করেছিলে কেন?

: আজ্ঞে?—ছেলেটির বিস্ময়ে অভিনয় নেই।

: হুম্!—চীনা-কোট এবার একটি ছবি বার করে বলেন, এ ছবিটা তোমার আঁকা?

: আজ্ঞে হ্যাঁ!

: মহাপ্রভুটি কে?

: উনি একজন সাহিত্যিক!

: নাম?

: লুনাচারস্কি।

: ও লোকটা সাহিত্যিক তা তোমাকে কে বলেছে? কোন্ দেশের মানুষ ও?

: তা তো জানি না—এবার সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ করল ছেলেটি, ভয়ে ভয়ে।

: জান না? ন্যাকামি হচ্ছে? জান না লোকটা রাশিয়ান? জান না ও বিপ্লবাত্মক

লেখা লিখত, ও একজন রাশিয়ান—কম্যুনিস্ট পার্টির কর্তাব্যক্তি। অস্বীকার করতে পার?

: না না! ও কথা সত্য নয়—ভয়ে ছেলেটি প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

: এটাই তোমার কাছে প্রত্যাশা করছি! জনদরদী আর্টিস্ট হয়েছ, লালফৌজের মহান নেতা ছাড়া আর কার ছবিই বা আঁকবে তুমি?

: আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন…আমি কোনদিনই…

: আবার বাজে কথা! এই পুলিশ থানা একগুঁয়েমির ঠাঁই নয়, বুঝলে হে ছোকরা? সব কথা বেমালুম কবুল খাও তো বাছা! আদালতে তোমাকে সাজা নিতে পাঠিয়ে দিই। জেলখানা জায়গাটা নেহাৎ মন্দ নয়, জানলে—বিনা পয়সায় ওখানে লপ্‌সি পাওয়া যায়!

ছেলেটা নিশ্চুপ। জানে—কথা বলা আর না বলায় তফাৎ নেই কিছু।

: স্ট্যাচু মেরে গেলে কেন বাওয়া? কথা কও—খিঁচিয়ে ওঠে চীনা-কোট—সত্যি করে বল তো বাওয়া—তুমি কোন্ পার্টিতে? সি. পি. নাকি সি. ওয়াই?*

: কোনোটাই নয়…বিশ্বাস করুন…আপনি কী বলছেন বুঝতেই পারছি না আমি!

: বটে! বুঝতেই পারছ না? ন্যাকা! লালফৌজের 'ন্যাতা'র ছবি আঁকতে পার অথচ সি. পি.—সি. ওয়াই.-এর ফারাকটা বোঝে না? গাল টিপলে দুধ বের হয় এদিকে একটি ঝুনো নারকেল!

চীনা-কোট বাঁ-হাতটা নাড়তেই এ-কাজে-দড় একজন পুলিশ খপ করে চেপে ধরে ওর জামার কলার। হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যায় নেপথ্যে!

…আপনাদের কাছে ক্ষমা চাওয়াটা বাকি আছে। 'একটা লোকগাথা' শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, নয়? কী করতে পারি বলুন—এটাকে যদি 'লোকগাথা' না বলি তাহলে কী বলব? লোকের মনে যা গাঁথা হয়ে রইল তাই তো লোকগাথা, নয়? একটা কথা শুধু বলতে পারি: এ ঘটনাটা কবে ঘটেছিল। সালটা ১৯৩২।"

* * *

…আপনাদের কাছে অনুবাদক হিসাবে আমারও ক্ষমা চাওয়াটা বাকি আছে। 'একটা সমান্তরাল চিত্র' দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, নয়? কী করতে পারি বলুন—চীনা-সাহিত্যের এই তিনটি স্কেচের সমান্তরাল কোনো রম্যরচনা ভারতবর্ষে লেখা হয়েছে বলে শুনিনি। সারা ভারতবর্ষ বুঝতে পারে এমন ভাষায় কোনোও ভারতীয় দিকপাল সাহিত্যিক লেখেন নি:

"সত্যি কথা বলতে কি ওটা অসংখ্য বন্দী আর মেহনতী বান্দার বঞ্চনার সাক্ষী! আর সম্রাটের বিস্মৃতিকে ওটা কোনো কালেই ঠেকাতে পারে নি। এখন ওটা পুরাতত্ত্বের নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়; হয়তো ধূলায় মিশিয়ে যেতে ওর কিছুটা দেরী হবে—কারণ ওটাকে জিইয়ে রাখতে আমরা বদ্ধ-পরিকর।

আমার সব সময় মনে হয়—ঐ পাষাণভার আমার বুকে চেপে বসেছে! মহান স্মৃতিসৌধ! ওটা দেখলেই আমার মনে পড়ে সদ্য-গদি-পাওয়া আলমগীর যেমন করে বিস্মৃত হলো ঐ সাহজাহানকে—যে তাকে জন্ম দিয়েছে, পালন করেছে, তার জন্য ময়ূর-সিংহাসন বানিয়ে দিয়েছে!

ঐ মহান ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার এই জোড়াতালি দেবার ব্যবস্থা কবে বন্ধ হবে?

হে ভারতের মহিমময় তাজমহল! তোমার মৃত্যু হলে যে বাঁচি।"

•

কিংবা, ভারতবর্ষের কোনো দুঃস্বপ্ন-নগরীর লোকের-মনে-গাঁথা-হয়ে-থাকা কোনো লোকগাথা শুনিয়ে উপসংহারে বলতে: সালটা ১৯৭১।

চীনে প্রথম কম্যুনিস্ট-পার্টির জন্ম: চীনে যুগ-যুগান্তকালের রাজতন্ত্রের মৃত্যু হলো ১৯১২তে—তার মাত্র পাঁচবছর পরে রাশিয়াতে হলো অক্টোবর-বিপ্লব। ফল একই—রাজতন্ত্রের অবসান। কিন্তু কোনো কোনো চীনা পণ্ডিতের মনে হলো—দুটি ঘটনা এক হলেও তাদের ফলাফলটা তো এক নয়? কেন নয়? খুঁটিয়ে দেখতে বসলেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে দুজন পণ্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য: চে'ন তু-সিউ এবং লি তা-চাও। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পাঠচক্রের সূচনা হলো—ওঁরা মার্কস্‌বাদ ও লেনিনবাদ গভীরভাবে বুঝে নিতে চান। চে'ন ছিলেন আনহোয়াই-এর রাজপরিবারের সন্তান, প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন তিনি। পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯১৫ সালেই তিনি 'নব-যৌবন' নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন; তাতে চীনের যুবসম্প্রদায়কে উদাত্তকণ্ঠে এই নবজাগরণে আহ্বান জানান। সেই সময়ের একজন ছাত্র বলছেন "প্রবন্ধটা যেন বজ্রদৃঢ় হাতের এক থাপ্পড়! আমরা ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে জেগে উঠলাম!…সবাই ঐ প্রবন্ধ পড়বার জন্য যে কী হুড়োহুড়ি। জানি না, প্রফেসর চে'ন কতবার সেই সংখ্যাটা পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্তত দু'লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল।"[৬]

রাজতন্ত্রের অবসানে কুয়োমিংতাং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ

দিতে পারল না, ভার্সাই চুক্তিতে পশ্চিমী-শক্তিরা চীনের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল—চীনের চিন্তাশীলেরা স্বতঃই দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে ঘটল আর একটি ঘটনা। সদ্যস্বাধীন সাম্যবাদী রাশিয়া চীনকে জানালো যে, ইতি-পূর্বে জার-তন্ত্র চীনের যে-সব ভূখণ্ড দখল করেছে, চীনের স্বার্থের পরিপন্থী যেসব চুক্তি করেছে, নয়া কম্যুনিস্ট-সরকার তা সব বাতিল করবে। অনতিবিলম্বেই তা করল রাশিয়া। ফলে চীন একটা আশার আলো দেখল। রাশিয়ার দিকে ফিরে তাকালো সে। ১৯২১ শে মারিং এবং তার দু বছর পরে বোরোদিন রাশিয়া থেকে এলেন চীনকে সাম্যবাদের পথে চালনা করতে। ততদিনে সুন ইয়াৎ-সেন ফিরে এসেছেন স্বদেশে। রাশিয়ান কুওমিণ্টার্ন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করল। সুন রাশিয়ান পন্থায় চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেন, বোরোদিন হলেন তাঁর পরামর্শ-দাতা। সুন তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য চিয়াঙ কাই-শেককে মস্কোতে পাঠিয়ে দিলেন সাম্য-বাদের শিক্ষা নিয়ে আসতে।

ইতিমধ্যে চে'ন তু-সিউ এবং লি তা চাওয়ের চিন্তাধারা নানান খাতে বইতে শুরু করেছে দেশের এক-এক দিকে, এমন কি বিদেশেও। পিকিং এবং সাংহাইতে কল-কারখানায় ইউনিয়নগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠছে—ছাত্রেরা সন্ধ্যার পরে সেখানে গিয়ে মিটিং করে, মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিনের বাণী পড়ে শোনায়, শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে শেখায়। ফ্রান্সে, জাপানে এবং বিশেষ করে প্যারিসে প্রবাসী ছাত্ররা সভা-সমিতি গড়ে তোলে—ঠিক যেভাবে হরদয়াল প্রভৃতিরা আমেরিকায়, কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতিরা ইউরোপে ভারতীয় ছাত্রদের একত্র করেছিলেন। প্যারিসের ঘাঁটিটাই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—চেন য়ি, তেং শিয়াও-পিং ছাড়াও সে দলে ছিলেন লি লি-সান এবং চৌএন-লাই।

বিশসাল নাগাদ এঁদের অনেকেই চীনে ফিরে এলেন। বিভিন্ন দল মিলে তখন একটি কেন্দ্রীয় পার্টি করার প্রশ্ন উঠল। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে সাংহাইতে বারোজন সদস্য এসে মিলিত হলেন সেই প্রথম কংগ্রেস-এ। এটাই চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি'র জন্ম মুহূর্ত বলে ধরা যেতে পারে। স্থান-কাল আর পাত্র। কালটা আগেই বলেছি; স্থানটা প্রথমে ছিল সাঙহাই শহরের ফরাসী উপনিবেশে একটি মেয়েদের স্কুল। কিন্তু ওখানে সভাটা শেষ পর্যন্ত করা যায় নি। টিকটিকির উপদ্রবে! পুলিশ সন্ধান পেয়ে মেয়েদের স্কুলটা তল্লাস করে—কারও সন্ধান পায় নি। পাবে কি করে? ততক্ষণে কর্মকর্তারা নীপু হ্রদের বুকে একটি বজরার ভিতর মিটিং করছেন। পাত্র বারোজন কে কে? সব কজনকে চিনব না। বরং বলি—চেনা লোকদের মধ্যে কে কে ছিলেন, কে কে ছিলেন না। চে'ন তু-সিউ অথবা লি তা-চাও এ-দুজনের

একজনও ছিলেন না। চৌ এন-লাই এবং লিলি-সান তখন প্যারিসে, ফলে সভায় ছিলেন না। লিউ' শাও-চি তখন মস্কোয়। তবে ছিলেন কারা ? সবই প্রায় অজানা নাম—চ্যাঙ কুয়ো-তাও, মাও ৎসে-তুঙ। মাও ৎসে-তুঙ ? সেটা আবার কে ? শোনা গেল, চাঙশা অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে উনি কাজ করেন—বছর আঠাশ বয়স তার। তা পরস্পরের নাম জানা না থাকলেও বোঝা গেল এই দ্বাদশব্যক্তি সর্বসমেত সাতান্নজন চীনা-মার্ক্সবাদীকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। ছয়টি বিভিন্ন উপদলে ছড়িয়ে আছেন তাঁরা, এমন কি একটি দল আছে জাপানে।[৭] এই প্রথম কংগ্রেসে সেক্রেটারী-জেনারেল রূপে নির্বাচিত হলেন মিটিং-এ অনুপস্থিত চেন তু-সিউ।

কিন্তু না-ঢাল, না-তরোয়াল—এই নিধিরাম-সর্দারের দলকে কে পাত্তা দেবে ? অপরপক্ষে সুন ইয়াৎ-সেনের কুয়োমিনতাং-এর বয়স তখন নয় বছর। ফলে রাশিয়ান কুওমিণ্টার্ন সুনকেই সাহায্য করতে থাকে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বছরখানেক পরে ঐ দু-দলের একটা সমঝোতা হলো। দুই উপদলই বিশ্বাস করত রাশিয়ার পথে পুঁজিবাদী স্বার্থসর্বস্ব শাসকদের তাড়িয়ে এশিয়ার জনগণ ক্ষমতালাভ করবে। এই চিন্তাধারার মূল প্রেরণা এসেছিল লেনিনের নির্দেশে। লেনিনের একটি সমসাময়িক বাণী :

জনসংখ্যার উপর—রাশিয়া, ভারত ও চীন মিলিতভাবে বিশ্বের জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। গত কয়েক বছরের ইতিহাসে আমরা দেখেছি এই বিপুল জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মুক্তিসংগ্রামের শেষ পর্যায়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে। ফলে বিশ্বে এ সংগ্রামের ফলাফল বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। এদিক থেকে সাম্যবাদের চূড়ান্ত জয় সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়।"[৮]

কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাং আঁতাত মাত্র চার বছর স্থায়ী হয়েছিল। এক নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতায় এই যুক্তফ্রন্টের অবসান ঘটল। এই কয় বছরের ভিতর কতকগুলি ঘটনা ঘটল যার ফল হলো সুদূরপ্রসারী। ১৯২৪-এ লেনিন লোকান্তরিত হলেন। পরের বছর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন সুন ইয়াৎ-সেন। ইতিমধ্যে চিয়াঙ কাই-শেক ফিরে এসেছেন মস্কো থেকে। তিনি হলেন সুন ইয়াৎ-সেনের স্থানাভিষিক্ত কুয়োমিনতাঙের সর্বময় কর্তা—জেনারালে-সিমো। ক্ষমতা লাভ করেই চিয়াঙ চাইলেন উত্তরাভিমুখে অভিযান চালাতে। কুয়োমিনতাঙের ক্ষমতার পরিসর ছিল ইয়াং সিকিয়াঙ-এর দক্ষিণে—ক্যাণ্টন ছিল তার কর্মক্ষেত্র। অপরপক্ষে উত্তরাঞ্চলে তখনও ক্ষমতাশালী ছিল একদল জঙ্গীলাট। তাদের বিরুদ্ধেই এ অভিযান—চীনকে এক শাসনতন্ত্রের অধীনে আনার জন্য। রাশিয়ান এজেণ্ট বোরোদিন এবং চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি চিয়াঙকে এ কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো।

এখানেই শেষ হচ্ছে আমাদের প্রথম দ্বাদশবর্ষের খতিয়ান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লঙ-মার্চ-এর পটভূমিকা

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা চীনের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করব ১৯২৭ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত। অর্থাৎ সাত বছরের খতিয়ান। আমাদের কাহিনী শুরু হচ্ছে কুয়োমিনতাং-কম্যুনিস্ট যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়া দিয়ে এবং সারা হবে লঙ-মার্চের সূচনায়। এই সাত বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের চুম্বকসার হচ্ছে এই রকম :

১৯২৭ : জেনারালেসিমো চিয়াঙ কাই-শেক সাংহাইতে ১২ই এপ্রিল কম্যুনিস্ট উৎখাতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। মাও ৎসে-তুঙ হুনান অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহে ব্যর্থ হলেন। ক্যান্টন কম্যুন ধূলিসাৎ হলো। কোয়াঙতাঙ-এ একটি সোভিয়েত জন্ম নিল।

১৯২৮ : মাও ৎসে-তুঙ এবং চু তে কিয়াংসিতে একটি ঘাঁটি বানিয়েছেন এবং কৃষকদের জমি-বণ্টনের যুগান্তকারী ব্যবস্থা করছেন। চিয়াঙ উত্তরদেশ জয় করে নানকিঙে চীনের একচ্ছত্র শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। বিদেশীরা সেটাকে চীনের একমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা বলে মেনে নিল।

১৯৩০ : চিয়াঙ 'দস্যু-দমন' নীতিতে কম্যুনিস্ট-উৎখাত সুপরিকল্পিতভাবে শুরু করলেন।

১৯৩১ : জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করল। নানকিং-সরকার জাপ-বিরোধী আন্দোলন দমন করল। মাও এবং চু-কিয়াংসিতে একটি সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩২ : কম্যুনিস্টরা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ; চিয়াঙ-এর নানকিং-সরকার জাপানের সঙ্গে চুক্তি করল।

১৯৩৪ : চিয়াঙ 'দস্যু-দমন' নীতির শেষ প্রয়োগে সর্বশক্তি দিয়ে কম্যুনিস্ট-নিধন শুরু এবং 'নব-জীবন আন্দোলন' চালু করলেন। গণফৌজ লঙ-মার্চ শুরু করে।

আরও সংক্ষেপে বলতে পারি ১৯২৭—১৯৩৫ চীনের ইতিহাস : প্রথম গৃহযুদ্ধ!

সাংহাই বন্দরে একদিন : ১২. ৪. ১৯২৭[১] : রাত চারটের সময় হঠাৎ বিউগ্‌ল্‌ বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এলো মেশিনগানের শব্দ—শহরের নানান প্রান্ত থেকে। ব্যাপার কি? ঘুম ভেঙে জেগে উঠে এ-ওকে শুধোয়। কেউ কিছু বলতে পারে না। না, সবাই নয়—শাসনতন্ত্রের উপর মহলের সকলেই এবং বিদেশী মল্লুকের কর্তাব্যক্তিরা সন্ধ্যা-রাত থেকেই জানতেন—সকালবেলা এমন একটা কাণ্ড

ঘটবে। তাঁরা শয্যাসঙ্গিনীকে শুধু বললেন : ও কিছু নয়, ঘুমাও!

সূর্যোদয়ের আগেই রক্তে ভেসে গেল সাংহাই-য়ের রাস্তা। বিশেষ করে কুলি-বস্তিগুলো। রাতের অন্ধকারে কোথা থেকে এসে জমায়েত হলো বেয়নেট আর মেশিন-গানধারীর দল—তাদের পরিকল্পনা ছক করাই ছিল—ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা আক্রমণ করল কুলি-ধাওড়াগুলো। বেছে বেছে, ঠিকানা মিলিয়ে বার করে আনল কুলি-সর্দারদের। এবং সে বাড়ির বুড়ো-বাচ্চা-মেয়েদের ছয়-সাত ঘণ্টার মধ্যেই নারকীয় ধ্বংসলীলা সুপরিকল্পিতভাবে শেষ হলো।

এই ১২ই এপ্রিল-এর ধ্বংসকার্যের নায়ক জেনারালেসিমো চিয়াঙ কাই-শেক। সুন ইয়াৎ-সেনের কাছ থেকে চীনের শাসনদণ্ড যিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন—ঐ কম্যুনিস্ট-নামধারী বিপ্লবীরা মজদুর ইউনিয়ন-গুলিতে প্রভাব বিস্তার করছে। রাতারাতি ওদের শেষ করে ফেলার একটি চমৎকার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। বিদেশী শক্তিগুলোর সহযোগিতাও ছিল। সাংহাইয়ের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ান হচ্ছে জেনারেল লেবার ইউনিয়ান, বা সংক্ষেপে 'জি.এল.ইউ'। পুরোপুরি কম্যুনিস্ট প্রভাবিত। এটা কুয়োমিনতাঙের বরদাস্ত হচ্ছিল না। শ্রমিক ইউনিয়ানের ইলেকসানে কুয়োমিনতাঙ পাত্তা পায় না। তাই এই গণনিধনের সিদ্ধান্ত।

এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা পড়তে পড়তে স্বতই মনে হয়—ইতিহাসটা অতিরঞ্জিত। আমার নিজেরই মাঝে মাঝে সন্দেহ জেগেছিল—এর ভিতর নির্যাতিত দলের অতিরঞ্জন মিশে আছে কি? তাই পাঠককে বিশেষ করে বলে রাখতে চাই যে, এ অনুচ্ছেদটি আমি রচনা করেছি সমসাময়িক অ-কম্যুনিস্ট পত্রিকার বিবরণের ভিত্তিতে—'নর্থ-চায়না ডেলি নিউস্','চায়না প্রেস', প্রভৃতি সরকার-ঘেঁষা পত্রিকার বিবরণ থেকে এবং সেগুলি সঙ্কলন করেছিলেন বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক 'অ-কম্যুনিস্ট' **Prof. Franz Schurmann**। তাঁর রচনার আক্ষরিক অনুবাদ দাখিল করি :

> "পরদিন, ১৩ই এপ্রিল দুপুরে চাপেই-মহল্লার চিহ্ন্যয়েন রোডে সমবেত হলো শ্রমিকদের একটা বড় দল। [ওদের তখনও ধারণা ছিল চিয়াঙ কাই-শেকের অজ্ঞাতসারে তাঁর তাঁবেদারেরা এ কাণ্ডটা করছে।] মিটিঙে ওরা সিদ্ধান্ত নিল নানান জাতের—গুণ্ডারা ওদের যেসব আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে গেছে তা ফেরত দিতে হবে, মৃতদেহের নির্বিঘ্নে সৎকার করতে দিতে হবে, গুণ্ডাদের শাস্তি দিতে হবে, এবং 'জি.এল'-ইউনিয়ান দপ্তর রক্ষা করার দায়িত্ব নানকিং (অর্থাৎ চিয়াঙ-এর) সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। সেই দরখাস্তের একটা অনুলিপি

নিয়ে ওরা মিছিল করে এগিয়ে চলল সরকারী দপ্তরে। মিছিলে পুরুষদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, এমন কি লাঠিও ছিল না। সঙ্গে ছিল সগুমৃত মজদুরদের স্ত্রী ও পুত্ররা। প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তবুও ওরা মিছিল ভাঙল না। পাওসান-রোড ধরে ওরা স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলে। সান্ তি টেরাসের কাছাকাছি আসতেই পথের বাঁক থেকে চকিতে আবির্ভূত হলো একদল মিলিটারি মেশিনগানধারী। কোনোও সতর্কীকরণ না করেই তারা গুলিবর্ষণ শুরু করল। নর-নারী-শিশুর মৃতদেহে ভরে গেল রাজপথ। এমন কি রুদ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে যারা পালাচ্ছে তাদের তাড়া করে ওরা পিছন থেকে গুলিবর্ষণ করল। শুধু তাই নয়, হত্যাকাণ্ড শেষ হয়ে যাবার পর সব শান্ত হয়ে গেলে যারা ফিরে এলো আহতদের উঠিয়ে নিয়ে যেতে, তাদের ওরা টিপ করে করে গুলি করল। অগত্যা আহতরা মরল সারাদিন পথের উপরেই ধুঁকতে ধুঁকতে! সরকারী হিসাবে তিনশ' মৃতদেহ ওরা একসঙ্গে সমাধিস্থ করে। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, সেই সংখ্যাটা অনেক বেশী, এবং তার ভিতর অনেককে সমাধিস্থ করা হলো যারা তখনও মারা যায় নি। যাদের তখনও জ্ঞান ছিল![২]

চিয়াঙ কাই-শেক 'এমার্জেন্সি' বুঝে অত্যন্ত দ্রুতগতি কতকগুলি সামরিক-আইন জারী করলেন। ধৃত মজদুরদের সামরিক-বিচারের ব্যবস্থা হলো। মাসখানেকের ভিতরেই সামরিক আদালতে হাজার-কয়েক অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। এ-ছাড়া এই সুযোগে চিয়াঙ প্রচুর অর্থ সংগ্রহও করলেন। যেসমস্ত শিল্পপতির কারখানা থেকে এই কম্যুনিস্ট-উপদ্রব দূর করা হলো তাদের এ পরিকল্পনায় 'অর্থ-সাহায্য' করতে 'অনু-রোধ' জানানো হলো। যাঁরা ইতস্তত করলেন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হলো এবং অনুরোধ রক্ষিত হওয়ামাত্র তাঁদের কারামুক্ত করার হুকুম হলো। এ বিবরণও সংগ্রহ করেছি 'নিউ-ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার '৪ঠা মে' ১৯২৭-এ মুদ্রিত সংবাদ থেকে—কোনোও কম্যুনিস্ট প্রচার-পত্রিকা থেকে নয়।

চিয়াঙ রাতারাতি যে এভাবে সাংহাই বন্দরকে কম্যুনিস্ট প্রভাবমুক্ত করতে পারেন তা কল্পনাও করতে পারে নি চীনা কম্যুনিস্ট-পার্টি। তখনও কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাং আঁতাত বজায় আছে। কম্যুনিস্টরা সাংহাইয়ের কল-কারখানার মজদুর ইউনিয়ান-গুলিতে কাজ করছে কুয়োমিনতাঙের আপাত-অনুমোদন সাপেক্ষে। তাই এ অতর্কিত আক্রমণ তারা বিশ্বাসই করে উঠতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে চিয়াঙ-এর বাহিনী কী-ভাবে 'জি.এল'-ইউনিয়ানের সদর-দপ্তরটা দখল করল সে কাহিনী এবার শোনাই:

ঐ ১২ই এপ্রিল তারিখেই। ভোর তখন সাড়ে চারটে। চায়ে'ঙ্গ মহল্লার একটি বড় বাড়িতে জি.এল. ইউ-এর সদর দপ্তর। ইউনিয়ান-অফিস প্রহরা দেবার ব্যবস্থা

আছে। প্রহরীদলের প্রধান হচ্ছেন কুচেঙ-চুঙ। প্রৌঢ় পোড়-খাওয়া এক সামরিক অফিসার। আর তাঁর প্রধান সহকারী একটি অল্পবয়সী ছোকরা—চৌ। দুজনেই দফতরে উপস্থিত। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই সদর দরজার সামনে দুমদাম গুলি চলতে শুরু করল। কু ছুটে বেরিয়ে এলেন, চিৎকার করে বললেন, 'কে তোমরা? গুলি চালাচ্ছ কেন?'

সিং-দরজার বাইরে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে একসার বন্দুকধারী। পঞ্চাশ-ষাট জন হবে। তাদের মধ্যে একজন বললে, 'আমরা উত্তরাঞ্চল সহকারী বাহিনীর সামরিক দল।'

: গুলি চালাচ্ছ কেন?

ওরা জবাব দিল না। গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল আবার। ফলে ইউনিয়ানের প্রহরী দলও জবাব দিল। বন্দুকের জবাব বন্দুকে। মিনিট কুড়ি পরে রাস্তায় অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। ও-পক্ষের গুলিবর্ষণ বন্ধ হলো। বোঝা গেল, যারা এতক্ষণ গুলি চালাচ্ছিল তারা গুণ্ডার দল। এতক্ষণে সত্যিকারের পুলিশ অথবা মিলিটারী এসেছে। তাদের আবির্ভাবে একটা থমথমে ভাব। অন্ধকারের মধ্যেই নবাগত অশ্বারোহী অফিসার হুঙ্কার দিয়ে উঠল: গুলিবর্ষণ বন্ধ কর! দু-পক্ষই!

সেটা আগেই বন্ধ হয়েছিল। অফিসার তখন বললেন, আমি শিং-তং-য়ু। শান্তিরক্ষা বাহিনীর অফিসার! একটি বন্দুকের শব্দ হলে মেশিনগান চালাব কিন্তু।

গুণ্ডারা এসেছিল বন্দুক নিয়ে। মেশিনগান নয়। তাই তারা থমকে পড়ে। অফিসারের আদেশে কয়েকজন মেশিনগানধারী এগিয়ে যায়। গুণ্ডাদের নিরস্ত্র করে এবং দড়ি দিয়ে বাঁধতে থাকে। গুণ্ডারা গজরাচ্ছে, কিন্তু প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছে না। গোটা গুণ্ডা-বাহিনীকে গ্রেপ্তার করে অফিসার এবার সিং-দরজার দিকে ফিরে বললেন, গেট খুলে দাও—তোমাদের কতজন হতাহত হয়েছে দেখব।

কু-র আদেশে তার সহকারী ঐ 'চৌ' নামের ছোকরা এসে খুলে দিল সিং-দরজা। অফিসার সদলবলে দপ্তরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এ-পক্ষে হতাহত কেউ হয় নি—ভগবান রক্ষা করেছেন।

অফিসার কু-কে অভিনন্দন জানালেন। কু-র নির্দেশে চা-সিগ্রেট এলো অফিসারটিকে আপ্যায়ন করতে এবং ধন্যবাদ জানাতে। একটু পরে অফিসার উঠে পড়লেন। বললেন, মিস্টার কু, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে জবানবন্দী দিতে।

: নিশ্চয় নিশ্চয়!—কু তখনই উঠে পড়লেন। যে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী গেটের কাছে পাহারা দিচ্ছিল তারাও জবানবন্দী দিতে চলল। সহকারী চৌ-ও এলো সঙ্গে।

পথে নেমে এসে অফিসার বললেন, মিস্টার কু, আপনি এবং আপনার সহকারীরা আমাকে আপনাদের অস্ত্রগুলো সমর্পণ করুন!

: সে কি? আমাদের নিরস্ত্র করার মানে?

: আপনি তো স্বচক্ষে দেখেছেন আমি গুণ্ডাদেরও নিরস্ত্র করেছি—

: কিন্তু ওরা ছিল গুণ্ডা। আমরা সরকার-অনুমোদিত ইউনিয়ানের—

কথাটা ওঁর শেষ হলো না। মেশিনগানধারীরা ঘিরে ধরল ওঁদের। বিনা বাক্য-ব্যয়ে ওঁরা অস্ত্র সমর্পণ করে এগিয়ে চলেন। থানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি। তার আগেই গুণ্ডার দল—সেই যাদের গ্রেপ্তার করার অভিনয় করেছিলেন অফিসারটি—ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র দলটির উপর। বলাবাহুল্য অফিসার সরে দাঁড়িয়ে ওদের পথ করে দিলেন। শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি। একপক্ষ নিরস্ত্র, অপরপক্ষ বেয়নেটধারী। তৃতীয় পক্ষ, চিয়াঙ কাই-শেকের সেই অফিসার অবশ্য বর্তমানে দর্শক। মিনিট পাঁচ-সাতের ব্যাপার। রাজপথে পড়ে আছে চারটে মৃতদেহ!

অফিসার ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললেন, চারটে কেন? ছটা মৃতদেহ থাকার কথা!

: ওদের দলপতি কুচেন-চুঙ সটকে পড়েছে!

: হুম্। লোকটা বুদ্ধিমান। আর ওর সেই ছোকরা সহকারী।

: সে লোকটাও মনে হয় কিছুটা বুদ্ধি রাখে। কেটে পড়েছে সেও।

: কী নাম ছোকরার?

: চৌ। এতদিন ছিল ফ্রান্সে। পয়লা-নম্বর মস্তান! সম্প্রতি দেশে ফিরেছে।

: হুম্। নজর রেখ ছোকরার উপর। এতগুলো বন্দুকধারীর ফাঁক দিয়ে যে কেটে পড়তে পারে সে-ছোকরা কম তুখোড় নয়। রাতারাতি গুম খুন করতে না পারলে ছোকরা একদিন আমাদের মাথায় চড়ে বসবে! কী নাম বললে যেন? চৌ? পুরো নামটা কি?

: তা জানি না।

সিন টিং-য়ু গণৎকার ছিল না, কিন্তু আচমকা মারাত্মক একটা ভবিষ্যৎ-বাণী করে-ছিল সে, ঐ বারই এপ্রিল শেষরাত্রে। ঐ তুখোড় ছোকরা সত্যই মাথায় চড়ে বসে-ছিল—কালে হয়েছিল লাল-চীনের প্রধানমন্ত্রী! চৌ এন-লাই!

কম্যুনিস্ট-পার্টির দুর্বৎসর: ১৯২৭ সালটা চীনা কম্যুনিস্ট-পার্টির তরফে সত্যই দুর্বৎসর। সাংহাইতে যে কাণ্ডটা ঘটল তারপর কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাং আঁতাত যে টিকতে পারে না এ-কথা বলাই বাহুল্য। দায়িত্বটা আইন অনুসারে গ্রহণ করতে হলো সেক্রেটারী জেনারেল চেনতু-সিউকে। চীনা-কম্যুনিজম্-এর সেই আদি-গুরুকে। পদত্যাগ করলেন তিনি। নূতন সেক্রেটারী-জেনারেল হলেন চু চিউ-

পাই। পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর না ছিল বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, না অনুচর দল।

প্রসঙ্গত বলি, চৈনিক রাজনীতির সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিরও 'জীবনধাতু'তে এ-বিষয়ে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। ও-দেশে বড় রকমের বিপর্যয় হলে নেতার বদল হয়, আমাদের হয় না। 'হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি' স্বীকার করার পরও এদেশে নেতৃত্ব অটুট থাকে।

কুয়োমিনতাং-কম্যুনিস্ট আঁতাত ভেঙে যাওয়ার পরেও কিন্তু দেখছি রাশিয়া চিয়াঙকে মদৎ দিতে চাইছে। তার মূলগত কারণ স্তালিন ও ট্রটস্কির মতদ্বৈধ। সে সব ইতিহাস আমাদের বিস্তারিত না জানলেও চলবে। শুধু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি—১২ই এপ্রিল ঐ নারকীয় ঘটনার পরেও, পরদিন চিয়াঙ একটি টেলিগ্রাফ পেয়েছিলেন হ্যাংকাও-স্থিত রাশিয়ান কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে—বক্তব্য : যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেবার পরিকল্পনা থেকে চিয়াঙ যেন বিরত হন ; তাহলে রাশিয়া তাঁকে সাহায্য করে যাবে। এই টেলিগ্রাফটিতে থার্ড-ইন্টারন্যাশনালের তরফে সই করেছেন একজন ভারতীয় কম্যুনিস্ট, বস্তুত বাঙালী : মানবেন্দ্রনাথ রায়।[৩]

ঐ বছরই পার্টির নির্দেশে মাও ৎসে-তুঙ তাঁর কর্মক্ষেত্রে, হুনান প্রদেশে শরৎ-কালীন ফসল তোলার পূর্বে এক কৃষক বিদ্রোহ রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন। এই কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। মাও পার্টিকে এক দীর্ঘ বিবৃতি পাঠিয়ে ব্যর্থতার কারণ-গুলি বিশ্লেষণ করেন, কিন্তু পলিটব্যুরো তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে পার্টি থেকে মাও ৎসে-তুঙকে বহিষ্কার করেন।

হুনানের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ হচ্ছে কিয়াংসি। তার প্রধান শহর নানচাঙ-এ আর একজন কম্যুনিস্ট নেতা আর একটি সামরিক অভ্যুত্থান করেন। এটা মোটামুটি সাফল্য লাভ করে। বিদ্রোহী দলের নেতা ছিলেন হো-লাঙ, যাঁকে আমরা পরে ঘনিষ্ঠভাবে জানব। বিজয়ী বাহিনী সদর্পে এগিয়ে চলে ক্যান্টনের দিকে। কিন্তু অন্তিমে সেখানেও পরাজয় ঘটে। নানচাঙ কম্যুনিস্ট ফৌজের অধীনে ছিল মাত্র কয়েকদিন—আর ক্যান্টনের পথে গণ-ফৌজকে চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দিল চিয়াঙ কাই-শেকের বাহিনী। কম্যুনিস্ট নেতারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। এক একজন পালিয়ে গেলেন এক এক দিকে। হো-লাঙ পালিয়ে গেলেন সাংহাইতে ; চৌ-এন লাই নৌকায় চেপে রাতারাতি পাড়ি দিলেন হংকং-এ। মাও ৎসে-তুঙ তাঁর বাহি-নীর অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে আশ্রয় নিলেন হুনান আর কিয়াংশি প্রদেশের সীমান্তে এক পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলে—চিঙ্কানশান তার নাম। এখানেই তাঁর সঙ্গে কিছুদিন পরে এসে মিলিত হলেন চু-তে।

১৯২৮ : দুর্বৎসর শেষ হবার আগেই কমিণ্টার্ন চীনের এখানে-ওখানে কয়েকটি 'সোভিয়েত' প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 'সোভিয়েত' অর্থে একটি ভূখণ্ড যেখানে কম্যুনিস্ট-পার্টি সাম্যবাদের নীতিতে দেশটাকে শাসন করে অর্থাৎ সেখানে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা হবে যৌথ স্বার্থে, জমিদার বা কারখানা মালিকের নির্দেশে নয়। কিন্তু জমি বা কারখানার মালিক সে-ব্যবস্থা মেনে নেবে কেন? নিতে চাইবে না। তাদের বাধ্য করা হবে। কী ভাবে? মালিকদের সহায়তা করবে পুলিশ, দরকার হলে মিলিটারী। তা ঠিক, তবে বাধা দেবে সাধারণ মানুষ, যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ—কৃষক ও মজদুর। ফলে লড়াই-কাজিয়া অনিবার্য! তা তো হবেই। সে জন্য কম্যুনিস্টরা ফৌজ তৈরি করতে সচেষ্ট হলো। 'সোভিয়েত' প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক অঙ্গ তার নিজস্ব ফৌজ—তাকেই ওরা বলল 'গণ-ফৌজ।'

প্রথম সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কোয়াংতুং প্রদেশে—হাই লু-ফেং সোভিয়েত। তার নেতা ছিলেন পেং পাই; প্রায় সাত-আট লক্ষ কৃষক যোগদান করল এই সোভিয়েতে; কিন্তু বছর খানেকের ভিতরেই—'২৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই তাকে নির্মূল করে ফেলা গেল। কিন্তু ঐ কয়েক মাসের মধ্যেই তারা ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা আংশিকভাবে সফল করেছিল আর মহাজন-জোতদারদের কাছ থেকে তমসুক আর দলিল কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল।[৪]

ইতিমধ্যে শান্ত মানুষ চু চিউ-পাই সেক্রেটারী-জেনারেলের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, চলে গেছেন মস্কো। দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন লি লি-সান। তাঁর প্রধান সহকারী সে সময় চৌ এন-লাই। মাও ৎসে-তুঙ তো ইতিপূর্বেই বিতাড়িত হয়েছেন দল থেকে।

ঐ বছর গ্রীষ্মকালে মস্কোতে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির যে অধিবেশন হলো তাতে লি লি-সানই মুখ্যত এই পরিকল্পনা দিলেন যে, ওভাবে দেশের অভ্যন্তরে সোভিয়েত রচনা করলে কিছু লাভ হবে না। কৃষকেরা জমি-আঁকড়ে থাকতে ভালবাসে—সব কিছু ঝেড়ে ফেলে বিপ্লবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে না। বরং নূতন করে কাজ শুরু করতে হবে শহরের কলকারখানা অঞ্চলে। মজদুরেরাই কম্যুনিজম্-এর মূল শক্তি—তারাই প্রলিতারিয়েৎ, সর্বহারা বলতে যা বোঝায়। শ্রম বেচে খায়। না বাড়ি, না জমি!

কেউ কেউ বললেন, হেলুফেঙ সোভিয়েত ব্যর্থ হয়েছে বটে; কিন্তু খবর পাওয়া যাচ্ছে চিঙ্কানশাং অঞ্চলে মাও আর চু জবর ঘাঁটি বানিয়েছেন।

তা শুনে লি লি-সান বলেছিলেন, 'একমাত্র কারখানার মজদুরদের মধ্যেই আশা করার মতো কিছু এখনও আছে[৫]। মাও ৎসে-তুঙের পথে চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ

করতে করতে আমাদের সকলের চুল পেকে যাবে[৬]।'

মাও এবং চু-তে ঐ জঙ্গলের ভিতর কী করছেন সে সম্বন্ধে লি লি-সান মস্কোতে বসে কোনো ধারণাই করতে পারেন নি। স্বয়ং স্তালিন পর্যন্ত ঐ সময় বলেছিলেন, 'আমি এ কথাও শুনেছি যে, চীনের অভ্যন্তরে নূতন একটি সোভিয়েত স্থাপন করা হয়েছে। হয়ে থাকলে আমি অবাক হব না।'[৭]

নানচাঙ : দ্বিতীয় দফা : তিন বছর যেতে না যেতেই লি লি-সান ব্যাপক আকারের বিপ্লব-কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। লি-র আশা ছিল এই বিপ্লবই হবে চূড়ান্ত বিপ্লব, শুধু চীনের নয়, গোটা বিশ্বের। সেণ্ট্রাল কমিটি থেকে ১৯৩০ সালের জুন মাসে লি হুকুমনামা জারী করলেন যে, মাও আর চু-তের অধীনে যে গণ-ফৌজ আছে তারা সদলবলে পার্শ্ববর্তী কারখানার অঞ্চলময় শহরগুলি দখল করে নিক—বিশেষ করে উহান আর হুনান-প্রদেশের রাজধানী চাংশা। লি-র বিশ্বাস ছিল এই যুদ্ধই হবে বিশ্বের শেষ এবং চূড়ান্ত শ্রেণী সংগ্রাম : **the final decisive class war of the world**।[৮] চু তে তাঁর জীবনী লেখিকা শ্রীমতী স্মেড্‌লেকে পরে বলেছিলেন, 'মাও এবং আমি দুজনেই জানতাম, এ পরিকল্পনা ভ্রান্ত—কিন্তু তখন আমাদের যুক্তি কে শুনত? আমরা আদেশ পালন করেছিলাম মাত্র'[৯]। অথচ আশ্চর্য! ঐ সময়ে লেখা মাও ৎসে-তুঙের কবিতায় কিন্তু সে আশঙ্কার প্রতিচ্ছবি নেই :

জ্যৈষ্ঠ : অতুলনীয় সৈন্যদল ঝাঁপিয়ে পড়ে
ঐ জোচ্চোর শয়তানগুলোর উপর,
যোজন বিস্তৃত শেকলের পাকে পাকে
দৈত্যটিকে বেঁধে ফেলতে।
কাং-নদীর ওপারে একমুঠো সবুজ জমি
লালে-লাল হয়ে উঠল।
সাবাস! হোয়াঙ কাং-লিউ!
তোমার সৈন্যদলকে সাবাস!
লক্ষ বিস্ফোরিত মজদুর আর কৃষক
গোটা কিয়াংশিটাকে গুটিয়ে নিল
মাদুরের মত—
ছুটে চলল বিদ্যুদ্‌বেগে
লিয়াং হু-র দিকে॥[১০]

নেতৃত্ব বদল : সে যুদ্ধে হার হলো গণফৌজের। পেং তে-হুয়ির পঞ্চম-বাহিনী চাংশা দখল করেছিল বটে কিন্তু সে অধিকার স্থায়ী হয় নি। পরাজিত বাহিনীর

অবশিষ্টাংশ নিয়ে মাও এবং চু তে আশ্রয় নিয়েছিলেন পর্বত কন্দরে।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে ভ্রান্তির ক্ষমা নেই। লি লি-সানকে সরে দাঁড়াতে হলো নেতৃত্ব পদ থেকে। ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে। এবার পার্টির কর্ণধার হলেন মস্কো প্রত্যাগত ছাত্রদল, যাঁদের বলা হয় 'অষ্টবিংশতি বল্‌শেভিক্'। এই দলের ভিতর ছিলেন তিনজন চীনা বিপ্লবী, যাঁদের ছদ্মনাম হচ্ছে ওয়াং মিং, পে কু এবং লো ফু। ওয়াং মিং ছিলেন বস্তুত দল নেতা। কিন্তু তাঁর নীতিতে কোনো কিছুই কার্যকরী হলো না। হতাশা নেমে এলো পার্টির ভিতরে।

শহরাঞ্চলের কেন্দ্রীয় দপ্তরে হতাশা নেমে এলেও আশার দীপবর্তিকা লোকচক্ষুর অন্তরালে তখনও জ্বলছিল কিন্তু। চিঙ্খানশান পার্বত্য-ভূখণ্ডের গভীরে। যেখানে হাত মিলিয়েছিলেন তিন বন্ধু—মাও ৎসে-তুঙ, চু তে আর পেন্ তে-হুয়ি। সেই চিঙ্খানশানের জঙ্গলের ভিতরে এবার আমাদের ঢুকতে হবে।

চিঙ্খানশানের কিয়াংশি সোভিয়েত : হুনান আর কিয়াংশি প্রদেশের সীমান্তে চিঙ্খানশান একটা অরণ্য-পর্বত—পরিধিতে প্রায় দেড়শ' মাইল। পাইন আর বাঁশঝাড়ের জঙ্গল—নেকড়ে, বুনোশুয়োরের আর চিতাবাঘের আড্ডা। আমাদের চম্বল অরণ্যের মতো এখানেও যুগে যুগে আশ্রয় নিয়েছে ডাকাতের দল। ১৯২৭ সালের সেই দুর্বৎসরের শেষাশেষি পরাজিত সৈন্যদলের ভগ্নহৃদয়-ভগ্নাংশ নিয়ে মাও ৎসে-তুঙ ঐ জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিলেন। তখন তাঁর সৈন্য-সংখ্যা মাত্র এক হাজার। হুনান-এর কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। নানচাঙ-এর পতন ও ক্যান্টনে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে—মাও পার্টি থেকে বহিষ্কৃত ; ফলে হতাশা ছাড়া আর কিই বা সঙ্গে করে এনেছেন উনি। তবু অদম্য তাঁর মনোবল। ঐ অরণ্যেই একটা নতুন সোভিয়েত গড়বার স্বপ্ন দেখছেন। সর্বপ্রথমেই তিনি এমন একটা কাজ করতে নাকি বাধ্য হলেন, যা মার্ক্সিস্ট-এর করা মানা। তিনি ঐ অরণ্যের দস্যু সর্দারের সঙ্গে ভাব করলেন। উপায় ছিল না। ডাকাত দলে আছে ছয় শ' জন যোদ্ধা। ঐ অরণ্যে নূতন স্বপ্ন দেখতে হলে তাদের সঙ্গে ভাব করেই থাকতে হবে। এজন্য পরে তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটি ভৎর্সনা পর্যন্ত করেছিল।

মাস ছয়েক পরে ১৯২৮ এর বসন্তকালে ঐ জঙ্গলে এসে উপস্থিত হলেন চু তে। সঙ্গে তাঁর নয় শত সৈনিক এবং সহকারী দুজন—চেন য়ি এবং লিন পিয়াও। সেই বছরেই হুনান-এর আর একজন কৃষক নেতা পেন তে-হুয়ি এসে মিলিত হলেন ওঁদের সঙ্গে। সঙ্গে তাঁর নিজস্ব হাজার খানেক সৈন্য। তিনজনের মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ডাকাত দল এবং স্থানীয় কৃষকেরা যোগ দেওয়ায় মোটামুটি একটা সৈন্যদল গঠন করা গেল। এই সময়েই মাও তাঁর নয়া যুদ্ধনীতি প্রবর্তন করেন। যে নীতির মূল কথা

হচ্ছে শক্তিশালী বিপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে সম্মুখ-যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে হবে। সংক্ষেপে:

● শত্রু যখন এগিয়ে আসবে—আমরা পিছিয়ে যাব।

● শত্রু যদি থেমে পড়ে, শিবির গাড়ে—আমরা ওদের উত্যক্ত করব।

● শত্রু যখন যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাইবে—আমরা ওদের আক্রমণ করব।

● শত্রু যখন পশ্চাদপসরণ করবে—আমরা পশ্চাদ্ধাবন করব।

একটা কথা। এই মাত্র যে চারটি পঙক্তি লিখলাম তা ডিক্ উইলসানের ১৯৭১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ[১১] থেকে অনুবাদ। উনি লিখছেন:

"As for its tactics against the vastly superior and better armed enemy, they were summed up in the quatrain that was to become the most famous expression of the principles of guerrilla warfare from Cuba to Vietnam, Angola to Bengal."

কিউবা, ভিয়েৎনাম, এ্যাঙ্গোলা বুঝতে পারি; কিন্তু 'বেঙ্গল' কেন?

সে যাই হোক, এই হলো মাও-এর নূতন রণনীতি। এই সঙ্গে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন 'নিয়মানুবর্তিতার তিন সূত্র' (আদেশ পালন কর, মজদুর বা কৃষকের কাছ থেকে বিনা প্রতিদানে কিছু নিও না, স্থানীয় ভদ্রলোক এবং বড়লোকদের কাছ থেকে যা নেবে তা ফেরৎ দিও)। বেশ বোঝা যায়, মাওয়ের আশঙ্কা ছিল—তাঁর সাধারণ সৈন্য হাতে রাইফেল থাকলে মজদুর বা কৃষকদের কাছ থেকে নজরানা আদায়ের চেষ্টা করতে পারে, তাতে বিপ্লবের আয়োজনটা জনসমর্থন হারাবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে ভদ্রলোক বা বড়লোকদের অত্যাচার করবে। তাই এ ব্যবস্থা। এই আইন যদি ডাকাতদল মেনে চলে তবে তাদের অপাংক্তেয় করে রাখার যুক্তি কোথায়? তখন তো রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি!

কিয়াংশির জঙ্গলে যখন এইসব ব্যাপার ঘটছে বহিঃচীনে তখন লেখা হচ্ছে অন্য ইতিহাস। জাপান ইতিমধ্যে মাঞ্চুরিয়া দখল করেছে। চীনের সাধারণ মানুষ জাপ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে নানাভাবে; অথচ চিয়াঙ জাপানের বিরুদ্ধে কোনোও ব্যবস্থা নিলেন না। উল্টে জাপ-বিরোধী আন্দোলন দমন করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

চিয়াঙ কাই-শেক অতঃপর ঐ কিয়াংশি সোভিয়েতকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পর পর কয়েকটি অভিযান চালান। প্রথমবার ১৯৩০ এর ডিসেম্বর। সেটা একবারেই ফলপ্রসূ হলো না। দ্বিতীয় বার ১৯৩১ এর বসন্তকাল। এবার গণফৌজ ওদের বিশ হাজার সৈন্যকে বন্দী করে এবং তাদের সব রাইফেল কেড়ে নেয়। ফলে তৃতীয় অভিযান

পরিচালনা করতে জেনারালেসিমো চিয়াঙ কাই-শেক স্বয়ং এসে থানা গাড়লেন—গণফৌজের দশগুণ সৈন্যসমাবেশ করে।[১২] কিন্তু এবারেও চিয়াঙ সুবিধা করতে পারলেন না। মাও এবং চু-র গেরিলা রণনীতিতে চিয়াঙ-এর তুটি ব্রিগেড আত্মসমর্পণ করল। বন্দী হলো বিশ হাজার সৈন্য। তাদের সঙ্গে বিশ হাজার রাইফেল এবং কয়েক শত মেশিনগান। গণফৌজের সৈন্য সংখ্যা তখন তুই লক্ষ; তাদের আছে প্রায় দেড় লক্ষ রাইফেল। ১৯৩২-এ চিয়াঙ চতুর্থবার অভিযানে এসেও ওদের কাবু করতে পারলেন না। তার একটা কারণ এই যে, ইতিমধ্যে তিনি জাপানীদের সঙ্গে আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে ওয়াং মিং অবসর নিয়ে রাশিয়ায় ফিরে গেছেন (১৯৩২), সেক্রেটারী জেনারেল হয়েছেন পো কু—তাঁর সহকারী হচ্ছেন চৌ এন-লাই এবং একজন জার্মান, অটো ব্রন, যিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'লি তে'। চিয়াঙ-এর চতুর্থ অভিযানও ব্যর্থ হতে বসেছে দেখে ওদের সাহস গেল বেড়ে। ওঁরা হুকুম-জারী করলেন—একলক্ষ গণফৌজ নিয়ে এবার আশেপাশের শহরাঞ্চলগুলি দখল করতে হবে। মাও ৎসে-তুঙ এই নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ফলে মাওয়ের অনুচর দলের অনেককেই ঐ সময় বহিষ্কার করা হয়।

কিন্তু পো কু, লি তে প্রভৃতির আশা পূর্ণ হলো না। ইতিহাস অন্যদিকে মোড় নিল। চিয়াঙ এতদিন তুটো পথের কোন্‌টাকে বেছে নেবেন স্থির করতে পারছিলেন না। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বহিঃশত্রু জাপানকে তাড়াবেন, না কি জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আগে গৃহশত্রুকে বধ করবেন। এতদিনে সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটাই নিলেন তিনি। বোধহয় ভেবে দেখলেন যে, জাপানের সঙ্গে হাত মেলালে তাঁর গদী হারাবার সম্ভাবনা নেই—জাপান চীনকে শোষণ করবে মাত্র; আর কম্যুনিস্টদের সবংশে নিধন করতে না পারলে তাঁর রাজাগিরি খতম হয়ে যাবে। তাই চিয়াঙ জাপানী-দের সঙ্গে জোড়াতালি দেওয়া একটা সন্ধি করে পঞ্চম এবং শেষ অভিযান চালাতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন ঐ কিয়াংশি সোভিয়েতের বহিঃদ্বারে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাঁকে গণফৌজ নিধন যজ্ঞে যথারীতি সানন্দে মদৎ দিল। পাঁচ কোটি ডলার মূল্যের গম, আগ্নেয়াস্ত্র এবং শ' চারেক এয়ারোপ্লেন আর দশ লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এবার এসে উপস্থিত হলেন তিনি। রণনীতিও এবার বদলে ফেললেন চিয়াঙ। চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন লাল-এলাকা। তিল তিল করে অবরুদ্ধ মানুষগুলো মরুক এবার। মাসের পর মাস যায়, অবরোধ ভেদ করা যায় না। খাদ্য নেই, কেরোসিন নেই, ঔষধপত্র নেই, জামা জুতো নেই—কী নিয়ে লড়বে ওরা? মাও ৎসে-তুঙ তখন প্রবল ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন। তাঁর একজন অনুগত ভক্ত ছদ্মবেশে সাংহাই থেকে কুইনিন আনতে গিয়েছিল। বেচারী ধরা পড়ে। ওরা তার মাথা কেটে ফেলে!

চিয়াঙ সম্মুখ যুদ্ধ করবেন না এবার। সমস্তটা এলাকা ঘিরে পাকা সড়ক বানালো ওরা রাতারাতি। সেখানে সাঁজোয়া গাড়ি সাজিয়ে বসিয়ে রাখল মেশিনগানধারী। হুকুম হলো যে-কেউ ঐ জঙ্গল ছেড়ে বার হবার চেষ্টা করবে—ছেলে-বুড়ো বাচ্ছা-মেয়ে যেই হোক, দর্শনমাত্র গুলি করবে। তারপর ওরা শুরু করল পরিখা বানাতে, আর কাঁটা তারের বেড়া। কেউ যেন এপারে না আসতে পারে। এক গ্রেন কুইনিন যেন না ঢুকতে পারে ঐ ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত পার্বত্য অরণ্যে।

মাও এবং চু পরামর্শ দিয়েছিলেন এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ ছোট ছোট ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা। কিন্তু জার্মান সেনাপতি লি তে তাতে সম্মত নন। একবার নাকি তিনি চটে উঠে বলেছিলেন, 'মাও যুদ্ধনীতির কী বোঝে? আমার কথা তাকে মেনে চলতেই হবে···আমার পিছনে সারা বিশ্বের কম্যুনিজমের সমর্থন রয়েছে।[১৩]

মাওয়ের গেরিলা রণনীতি অগ্রাহ্য করে লি তে সম্মুখ যুদ্ধ দেখার জন্য এগিয়ে গেলেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিলে। ফুকিয়েন-কিয়াংশি সীমান্তে কোয়াংচাঙ এর রণক্ষেত্রে মর্মান্তিক হার হলো গণফৌজের। চার হাজার সৈন্য মারা গেল, আরও হাজার বিশেক আহত হলো। বাধ্য হয়ে অবরুদ্ধ এলাকায় ফিরে এলো ওরা।

এতদিনে পলিটব্যুরো মাওয়ের মত মেনে নিলেন। সোভিয়েত ছেড়ে সদলবলে পালাতে হবে। পালিয়ে যাবে কোথায়? সে কথা পরে—আপাতত এই চক্রব্যূহের বাইরে, যেখানে দাম দিলে বাজারে ওষুধ পাওয়া যায়, খাদ্য পাওয়া যায়, নুন-তেল-কেরাসিন পাওয়া যায়।

জুন মাসে প্রথম চেষ্টা করলেন ফ্যাং চিহ্-মিন। ছোট্ট একটা দল নিয়ে। উত্তর দিকে। আনহোয়াই অঞ্চলে। পারলেন না। ধরা পড়ে গেলেন। কুয়োমিনতাং বাহিনীর সেনাপতি ওঁকে হত্যা করল না। একটা খাঁচায় ঢুকিয়ে গাড়িতে চাপিয়ে সমস্ত অবরুদ্ধ এলাকাটা পরিক্রমা করালো—গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে নিয়ে এলো। তার পর পরিক্রমা-অন্তে তাঁর মাথাটা কেটে ফেলে ধর আর মুণ্ডুটাকে আবার পরিক্রমা করালো। যাতে সবাই বুঝে নিতে পারে এ কাজের পরিণাম!

মাস দুয়েক পরের কথা। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয় একটি দল—এবার সংখ্যায় কিছু বেশী এবং তারা রাইফেল নিয়ে গেল—হাজার দশেকের একটি বাহিনী রওনা দিল ব্যূহ ভেদ করতে। ওয়াং চেন-এর নেতৃত্বে। তারা সাফল্য লাভ করেছিল। কুয়োমিনতাঙ বাহিনী ভেদ করে ওরা হো লাঙ-এর সোভিয়েতে গিয়ে পৌছায়।

তৃতীয় একটি বাহিনী—এবার দলটা আরও বড়—চেং ৎসি হুয়ার নেতৃত্বে পঞ্চ-

বিংশতি বাহিনীর অভিধা নিয়ে চলে গেল সেংসি অঞ্চলে। এবারও উত্তর দিকে পর পর তিনটি অভিযানই হয়েছে উত্তরমুখী। ফলে চিয়াং উত্তরদিকের বেষ্টনী দৃঢ়-তর করে ফেললেন। চিয়াঙ বুঝেছিলেন—যেহেতু দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে আছে হো-লাঙ-এর সাংচি-সোভিয়েত (হুনান-এর উত্তরে) তাই বন্দীদল উত্তর দিকেই যেতে চাইবে।

আসলে এটা একটা কৌশল। ২রা অক্টোবরের গোপন সভায় গণ-ফৌজের নেতারা স্থির করেছিলেন ওঁরা দক্ষিণ দিক দিয়েই পালাবার চেষ্টা করবেন। সেজন্যই পর পর তিনটি অভিযাত্রী দলকে পাঠানো হয়েছিল উত্তর দিকে।

স্থির হলো সেনাবাহিনীর মধ্যে যাদের বয়স বেশী তাদের ওখানেই রেখে যাওয়া হবে চেন ঈ-র নেতৃত্বে। মাও ৎসে-তুঙ তখনও অত্যন্ত অসুস্থ—১০৫° জর। যুতুতে তিনি তখন ডাক্তার নেলসন ফুর চিকিৎসাধীন। মাওয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর অনু-গামীদেরই বিশেষ করে পিছনে ফেলে রেখে যাবার ব্যবস্থা হলো। চু তেকে সরিয়ে যাত্রামুহূর্তে বাহিনীর নেতৃত্বপদ দেওয়া হলো চৌএন-লাইকে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—গণ-ফৌজ গোপনে সোভিয়েত ত্যাগ করার পর কয়েক সপ্তাহকাল চিয়াঙ-এর বাহিনী তা টের পায় নি। যখন বুঝল যে, অবরোধের ভিতরে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই তখন ওরা বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবশিষ্ট লোকজনের উপর। সুস্থ-সমর্থ যাকে হাতের কাছে পায় নির্বিচারে হত্যা করে। তার ভিতর ছিলেন মাওৎসে-তুঙ-এর ছোট ভাই মাও ৎসে-তান। দশ থেকে চল্লিশ বছরের মেয়েদের নিয়ে যায় লরী বোঝাই করে। মাথা পিছু গড়ে পাঁচ ডলারে[১৪] তাদের বিক্রয় করে দেওয়া হয়; ক্রেতা—কুয়োমিনতাঙের সৈনিক, অফিসার, এবং জমিদার অথবা ব্যবসায়ীর দল। এ-ছাড়াও ছিল বড় বড় বেশ্যালয়ের মালিক ও দালাল। হত্যা করা হলো না শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। তারা অনুশোচনায় দগ্ধ হোক!

প্রায় বিশ হাজার আহত সৈনিক লঙ মার্চ-এ যোগ দিতে পারে নি অসুস্থতার জন্য। তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে। প্রত্যেককে বার্ষিক পঞ্চাশ ডলার করে পেন্সন দেওয়া হয়, যতদিন ওদের ক্ষমতা ছিল[১৫]।

যাঁরা পিছনে পড়ে রইলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বৃদ্ধ চু চিউ-পাই। পাঠক নিশ্চয়ই তাঁকে ভুলে যান নি। চিয়াঙ-এর সাংহাই হত্যাকাণ্ডের পর যখন প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল চেন তু-সিউ পদত্যাগ করেন তখন এই চু-কেই সেক্রেটারী করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। বৎসর খানেকের মধ্যেই পদ-ত্যাগ করে মস্কো চলে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুন ইয়াৎ-সেনের সাক্ষাত-শিষ্য, নির্বিরোধী মানুষ। ইতিমধ্যে দেশে ফিরে আসায় তিনি হয়েছিলেন কিয়াংশি

সোভিয়েতের 'কমিশনার অব এডুকেশন'। ক্ষয়রোগে ভুগছিলেন তিনি। চিয়াঙ-এর বাহিনী কিয়াংশি সোভিয়েতে প্রবেশ করে তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল। পায় নি। কারণ ছদ্মবেশে বৃদ্ধ চলে গিয়েছিলেন সাংহাইতে। আটমাস পরে গুপ্তচর বাহিনী তাঁকে সনাক্ত করতে পারে। তৎক্ষণাৎ সেই পণ্ডিতটির শিরশ্ছেদ করে ফেলা হলো[১৬]।

১৬ই অক্টোবর ১৯৩৪ শুরু হলো এই মহাযাত্রা : লঙ মার্চ।

* * *

আপনারা আমাকে মাপ করবেন!

কথারম্ভে আমি বলেছিলাম—যতবার প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে উঁকি মেরেছি, ততবারই মনে হয়েছে নিজের বাড়ির প্রমাণ-সাইজ আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছি বুঝিবা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সমান্তরাল ছবি এতক্ষণ আঁকবার চেষ্টা করতে করতে আসছি। এইবার—এই ১৯৩৪-এর ১৬ই অক্টোবর থেকে সে চেষ্টা আর করব না। 'লঙ্ মার্চ'-এর তুলনা ভারতবর্ষে নেই। বস্তুত পৃথিবীর ইতিহাসেই নেই। একমাত্র কিয়াংশি-সোভিয়েত থেকেই রওনা হয়েছিল এক লক্ষ মানুষ। বেশ কিছুদিন পরে সাংচি-সোভিয়েত থেকে রওনা দিয়েছিল দ্বিতীয় বাহিনী হো-লাঙ-এর নেতৃত্বে। পাচাং-সোভিয়েত থেকে যাত্রা শুরু করেছিল চ্যাংকু-তাও-এর নেতৃত্বে চতুর্থ বাহিনী। সর্বসমেত প্রায় সওয়া দুই লক্ষ মানুষ ঘর-বাড়ি-সংসার ছেড়ে পথে নেমেছিল। তাদের আধাআধি মারা যায় পথপ্রান্তেই—গুলি খেয়ে, শীতে জমে, অসুখে ভুগে এবং শুধুমাত্র ক্লান্তিতে। বাকি অর্ধেক উপনীত হয় তাদের শেষ তীর্থ-প্রান্তে—শেংসি সোভিয়েতে। একমাত্র প্রথম বাহিনী পদব্রজে অতিক্রম করেছিল ছয় হাজার মাইল পথ। ইতিহাসে এর তুলনা কোথায়?

জারেক্সাস, সেকেন্দার, সীজার, হানিবলের বাহিনীর সঙ্গে লঙ্-মার্চের তুলনা চলে না। ওঁরা সবাই ছিলেন দিগ্বিজয়ী—দেশ ছেড়ে পররাজ্যে গিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায়। নেপোলিয়ন কিংবা হিটলারের রাশিয়া থেকে পশ্চাদপসরণের সঙ্গেও এর তুলনা চলে না—কারণ সেখানেও মূল প্রেরণাটা ছিল পররাজ্যগ্রাসের লোভ। সেখানে নেপোলিয়নের ফরাসী আর হিটলারের জার্মান সৈন্য প্রাণ দিয়েছে বিদেশে—পোল্যাণ্ডে, রাশিয়ায়। এই চীনারা পররাজ্যে যায় নি, পররাজ্য পদানত করার দুঃস্বপ্ন দেখে নি—এরা স্বদেশেরই পথে পথে ঘুরে মরেছে বিতাড়িত হয়ে, স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে। বাইবেল বর্ণিত এ্যাব্রাহাম কিংবা মোজেস্-এর দেশ-ত্যাগের সঙ্গে তবু কিছুটা তুলনা চলে। কিন্তু ও'রা দু'জন পুরোপুরি ঐতিহাসিক চরিত্র নন; ওঁদের এক পা ইতিহাসে, এক পা পুরাণে। মোজেস্-এর মতো মাও

ৎসে-তুঙ-এর আদেশ মাত্র সমুদ্র যদি দু-ফাঁক হয়ে যেত, পাথর কেটে জল বের হতো তাহলে লঙ্ মার্চের ইতিহাস হতো অন্যরকম। লঙ্ মার্চের একমাত্র আংশিক উপমান বোধকরি জেনোফেন-এর মহাযাত্রা। খ্রীষ্টজন্মের চারশ' বছর আগে তিনি টাইগ্রিস্-নদীর অববাহিকা ধরে নিজ বাহিনীকে উত্তরণ করেছিলেন কৃষ্ণ-সাগরের উপকূলে। কিন্তু সত্যিই কি তুলনা চলে? গ্রীক বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল দশ হাজার, লঙ্ মার্চে প্রায় দু'লক্ষ! গ্রীকদের পথপরিক্রমার সময়কাল ছিল পাঁচমাস, এদের এক বছরের উপর। সবচেয়ে বড় কথা, জেনোফেন-এর অন্তিম লক্ষ্য ছিল তাঁর বাহিনীর প্রাণরক্ষা করা, আর লঙ্ মার্চের কর্মকর্তার লক্ষ্য এই গ্রহের এক-পঞ্চমাংশ বাসিন্দার বন্ধন মুক্তি। তাই বলব—লঙ্ মার্চ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অতুলনীয়!

এত লক্ষ মানুষের এত হাজার মাইল ভ্রমণের ইতিকথা কয়েক ফর্মার ভিতর কেমন করে সীমায়িত করব? এর বিশালতা আর ব্যাপকতার ধারণাটা কেমন করে করি? প্রথমেই কিছু সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করি—হয়তো তাতে ব্যাপারটার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হবে:

প্রথম বাহিনী ২৩৫ দিন আর ১৮ রাত হেঁটেছে—গড়ে দৈনিক সতের মাইল। বিশ্রামের দিনগুলি ধরে। সেটা বাদ দিলে গড়ে ওরা দৈনিক ছাব্বিশ মাইল হেঁটেছে! কিছু ধারণা হলো? আমার কিন্তু একটু একটু হচ্ছে—তুলনামূলক বিচারে। কেদার-বদ্রীর পথে এগারো দিনে একবার একাদিক্রমে নিরানব্বই মাইল হেঁটেছিলুম সপরিবারে—অর্থাৎ গড়ে দৈনিক নয় মাইল হিসাবে! ফলে এক বছর ধরে গড়ে ছাব্বিশ-মাইল বস্তুটা যে কী, কিছুটা মালুম হচ্ছে! কিন্তু না, ওরা তো শুধু হাঁটেনি—ওরই মধ্যে দৈনিক গড়ে একটা করে ছোটখাটো লড়াই করেছে। পথে পড়েছিল চব্বিশটি নদী, আঠারোটি পর্বতমালা যার ভিতর পাঁচটি ছিল চিরতুষারাবৃত। হিসাব কষে দেখেছি—বিশ্রামের পূর্ব-দিবস ওদের এসেছিল গড়ে ১১৪ মাইল হাঁটার পর! লাঙ-এর বাহিনীকে একবার পশ্চাদ্ধাবনকারী বাহিনীর হাত এড়াতে বিশ্রাম না নিয়ে ক্রমাগত সাতাশ দিন-রাত্রি হাঁটতে হয়েছিল। একদিনে সর্বোচ্চ বাহান্নমাইল পথ অতিক্রম করে! আরও মনে রাখতে হবে, এই চলমান বাহিনীকে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হচ্ছিল খালি পায়ে নয় ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল—ভ্রাম্যমান হাসপাতাল, সরকারী ট্যাকশাল, দপ্তর, শত শত সেলাই-এর মেশিন-সহ দর্জি-বাহিনী, খাদ্য-ভাণ্ডার রসুইখানা, মল্লাগার। একটা চলমান রাজত্ব [illegible]মায় ছাপাখানা, কারখানার যন্ত্র ও চিমনি চলেছে সাথে—নাট-বল্টু খুলে ফেলে টুকরো-টুকরো অবস্থায়। যাত্রী-দলের অধিকাংশই অবশ্য অল্পবয়সী। সংখ্যাতত্ত্ব বলছে: ১৬ বছরের কম ১ শতাংশ,

১৬-২৩ হচ্ছে ৫৩%; ২৪-৪০ হচ্ছে ৪৪%; এবং চল্লিশোর্ধ্বে ২ শতাংশ। সবাই পুরুষ নয়, প্রথম বাহিনীতে ছিলেন ৩৫ জন মহিলা। তার ভিতর মাও ৎসে-তুঙ-এর পত্নী ছিলেন যাত্রামুহূর্তে সপ্তমমাসের গর্ভিণী। পথে তাঁর সন্তান হয়। হো-লাঙ-এর স্ত্রীও যাত্রাপথে সন্তানের জন্ম দেন।

জানি, সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে এমন একটা বিশাল ব্যাপারের ধারণা করা যায় না। আলোকবর্ষের হিসাবে কি তারার সত্যিকারের দূরত্বটা ধারণা করতে পারি? কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কী আছে বলুন? স্বাধীনতাকামী এত এত মানুষের এ বীরত্ব গাথার পরিমাপ আর কি ভাবেই বা কী করা যাবে?

অথচ কী আশ্চর্য দেখুন—আমরা আজও ভালভাবে জানি না 'লঙ্ মার্চ' বলতে কী বোঝায়। এ গ্রন্থ রচনা করতে আমার বেশ কয়েকমাস সময় লেগেছে; তার ভিতর বন্ধু-বান্ধবেরা যখনই প্রশ্ন করছে: এখন কী লিখছ হে? জবাবে বলেছি 'লঙ্ মার্চের উপর' এবং তখনই প্রতি প্রশ্ন করেছি—'তুমি লঙ্ মার্চ সম্বন্ধে কী জান বল দেখি?' রাজনীতির ধার ধারে না, অর্থাৎ 'নক্সালবাড়ি' এই ভৌগোলিক নাম শ্রবণমাত্র যারা কানে আঙুল দেয় এমন শিক্ষিত বন্ধুর দল আমাকে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে নি। 'যেন লঙ্ মার্চ' কোনো প্রাচীন ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়, যদিও আমার বন্ধু স্থানীয়দের জীবিতকালের ঘটনা এটা। যেন 'লঙ্ মার্চ' কোনোও অতি দূর বিদেশের কাহিনী, যদিও দূরত্বটা অকিঞ্চিৎকর। যে পথ ধরে নেতাজীর আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী ভারতবর্ষে আসছিল সেই পথরেখা থেকে 'লঙ্ মার্চের' পথের দূরত্ব একস্থানে—ম্যাপে মেপে দেখবেন, কলকাতা থেকে কাশীর দূরত্বও নয়। হ্যাঁ, মানছি, মাঝখানে আছে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা—দুরতিক্রম্য বাধা। কিন্তু মাপ করবেন, ঐ তুষারমৌলী পর্বতশ্রেণীর তুষারই কি মানব ইতিহাসের এত বড় গৌরবোজ্জ্বল বীরত্বগাথা আমাদের কাছ থেকে এতকাল চাপা দিয়ে রেখেছিল?

নবম পরিচ্ছেদ

চৈনিক মহা-নিষ্ক্রমণ

[অক্টোবর ১৯৩৪—জানুয়ারী ১৯৩৫]

"ওয়াঙ চি-চুর স্মৃতিচারণ"

প্রথমেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই 'মহানিষ্ক্রমণ' শব্দটা ব্যবহারের জন্যে। আমি বৌদ্ধ নই, কম্যুনিস্ট। জানি, 'মহানিষ্ক্রমণ' বলতে আপনাদের ভারতীয়দের চোখের সামনে একটি পবিত্র ছবি ফুটে ওঠে : আষাঢ়ী পূর্ণিমা রাত্রে রাজপুত্র তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করে সত্যান্বেষণের পথে অভিযাত্রা করছেন। তাঁর সঙ্গে নিজেদের তুলনা করব, এতবড় মূর্খ নই—তবু ভেবে দেখুন, আমরাও ত্যাগ করে গিয়েছিলাম লক্ষ যশোধরাকে, লক্ষ রাহুলকে। সে বিয়োগবেদনাও বড় কম ছিল না। তাঁর লক্ষ্য আর আমাদের লক্ষ্য পৃথক, কিন্তু তাঁর 'এক' আমাদের 'লক্ষ' হয়েছিল। তাই আমার এ স্মৃতিচারণের অভিধা : চৈনিক মহানিষ্ক্রমণ।

কিয়াংসি সোভিয়েত ত্যাগ করে আমরা প্রথমেই চলতে শুরু করেছিলাম দক্ষিণ-পশ্চিম মুখো। সোজা দক্ষিণে গেলে শ-দেড়েক মাইল পরেই পৌছে যেতাম সমুদ্রের ধারে। সোয়াতো আর হংকঙের মাঝামাঝি। যার ওপারে তাইওয়ান-দ্বীপ। তাই আমাদের গতিমুখ দক্ষিণ-পশ্চিম। ওটাই যে একমাত্র পথ ছিল তা বোঝা যাবে চিত্র-২১ এর দিকে তাকালে। আমাদের চারদিকেই বেড়াজাল—চিয়াঙের চার সেনাপতি চক্রব্যূহে আমাদের ঘিরে আছে। উত্তর দিকে কুয়ো চু-তাং, উত্তর-পশ্চিমে হো-চিন, পূর্ব দিকে চিয়াং-তিন এবং দক্ষিণে চেন-চি।[১] ওদের মিলিত সৈন্সংখ্যা আমাদের আট-দশ গুণ। তাছাড়া ওদের ছিল অতি-আধুনিক সমর-সম্ভার, এমন কি শকুনিদের কাছ থেকে পাওয়া শ'চারেক এয়ারোপ্লেন। যে পথে আমরা রওনা হলাম—ঐ চেন-চি আর হো-চিনের বাহিনীর ফাঁক দিয়ে সেটাও অরক্ষিত ছিল না। কিন্তু চিয়াঙ কাইশেক ঐ রন্ধ্রমুখে রেখেছিল একজন স্থানীয় জঙ্গী সর্দারকে। খাস্ কুয়োমিনতাঙ বাহিনীর নয়। তারা লড়তে এসেছে লুট-তরাজের লোভে। আমরা এমনিতেই সর্বহারা, তাই প্রাপ্তিযোগ এখানে কম। জঙ্গীসর্দার তাই খুব বেশী বাধা দেবে না।

পাঁচ দিন ক্রমাগত হেঁটে আমরা এসে পৌছলাম 'সিন্‌ফেন'-এ।

প্রথম দশ দিন আমরা শুধু রাত্রিবেলাতেই মার্চ করেছি। দিনের বেলা ঘন-

অরণ্যে আত্মগোপন করে থাকতে হতো। চিয়াঙ-এর বিমান-বাহিনীর নজর এড়িয়ে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, পুরো এক মাস ওরা টের পায় নি—লাখ-খানেক মানুষ ঐ চক্রব্যূহ ভেদ করে পালিয়েছে। ওরা সেটা টের পেতে পেতে আমরা তাংতাও-য়ের

চিত্র—২১
লঙ্‌ মার্চের যাত্রারম্ভ

কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, অর্থাৎ শিয়াং নদীর অপর পারে। সিনফেন-এর পরে আমরা কান-নদী অতিক্রম করেছিলাম অতি অনায়াসে। গ্রামের লোকেরা আমাদের সাহায্য করেছিল নৌকা দিয়ে। ঐ গ্রামবাসীরা জুইচেন-সোভিয়েতের কাছাকাছি থাকে, ওরা জানে আমাদের উদ্দেশ্য; বোঝে, আমরা ওদের বন্ধু। জমিদার, জোতদার আর ট্যাক্স-কলেক্টারদের উপর ওদের জাতক্রোধ, তাই ওরা বিপ্লবের বন্ধু।

সিনফেন থেকে টায়ুর দূরত্ব মাইল চল্লিশ। দু-রাত্রেই পার হলাম সে পথ। তার পরেই আদেশ এলো—ক্রমাগত বাহাত্তর ঘণ্টা নাগাড় হাঁটতে হবে, ঘণ্টায় সাড়ে-তিন মাইল গতিবেগে। আদেশটা প্রাঞ্জল—চার ঘণ্টা এক নাগাড়ে হাঁটা, তারপর চার ঘণ্টার বিশ্রাম। ঐ বিশ্রামকালে ইচ্ছা করলে রেঁধে খেতে পার, ঘুমাতে পার, কবিতাও লিখতে পার—কেউ বাধা দেবে না। তারপরেই বাজবে বিউগল্—তখনই নিজের নিজের পিঠু পিঠে ফেলে আবার শুরু হবে হাঁটা—নাগাড় চার ঘণ্টা। কোনো পণ্ডিত নাকি হিসাব কষে বলেছেন, এভাবে নাগাড় বাহাত্তর ঘণ্টা হাঁটলে আমরা

পৌঁছাবো শিয়াং নদীর কিনারে, অর্থাৎ হুনান-প্রদেশের সীমান্তে। প্রবেশ করব 'কোয়াংসি'তে। তাই করেছিলাম আমরা।[২]

ওরা, মানে চিয়াঙ কাই-শেক ভায়া যে আমাদের পলায়নপর্বটা আদৌ টের পায় নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। আমরা রওনা হওয়ার তিন সপ্তাহ পরে ৮ই নভেম্বর শত্রুপক্ষের সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল—"কিয়াংসি অবরোধের ভিতর কম্যুনিস্টরা মাটি কামড়ে পড়ে আছে। আশা করা যায়, আরও কয়েক মাস না গেলে ওরা অনাহারে আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে না।"[৩]

আমি ছিলাম প্রথম ব্যাটেলিয়ানের পলিটিক্যাল কমিশার। আমাদের ব্যাটেলিয়ানে ছিল পাঁচটি কোম্পানি। তার ভিতর তিন নম্বর কোম্পানি ছিল আমার এক্তিয়ারে—হেড কোয়ার্টার্স কোম্পানি। এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল প্রচারবিভাগ। আমাদের ব্যাটেলিয়ান কমাণ্ডার হচ্ছেন: মেজর সো-লিঙ; এবং গোটা রেজিমেন্টের কমাণ্ডার হচ্ছেন কর্নেল ইয়াং তে-চু। আমরা ছিলাম ফার্স্ট আর্মি কোরের অন্তর্ভুক্ত, যার সুপ্রীম কমাণ্ডার স্বয়ং লিন পিয়াও এবং আর্মি-পলিটিক্যাল কমিশার: নৈ জুন-চেন।

গোটা বাহিনীতে মাত্র একজন ছিলেন বিদেশী—লাখে একজন, তিনি লী-তে। আসল নাম—অটো ব্রন, জার্মান। তিনি বরাবর ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন, হাঁটতেন না আদৌ। একমাত্র তাঁর পায়েই ছিল চামড়ার জুতো—এগারো নম্বরের; যদিও যাত্রার শেষাশেষি তিনি জুতো না খুললেও গুনে বলে দেওয়া যেত তাঁর দু' পায়ে দশটা আঙুল। আর সবাই হাঁটত। অসুস্থরা ঘোড়ার পিঠে। থার্ড আর্মির কমাণ্ডার পেং তে-হুই তো প্রায় বরাবরই হেঁটেছেন। সর্বাধিনায়ক চু তেও অধিকাংশ সময় হাঁটতেন।[৪] কমরেড মাও-কে এ-সময় বরাবর ঘোড়ার পিঠে যেতে হয়েছে—কারণ তখনও তিনি ম্যালেরিয়ায় কাবু। মাওয়ের ঘোড়াটা ছিল ছাই রঙের চমৎকার একটা মাদি ঘোড়া—শুনেছি চাঙতিং যুদ্ধে কুয়োমিনতাঙ সেনাপতির বাহন ছিল সেটা। মাও ঐ সেনাপতিকে বধ করে রণ-অশ্বটি লাভ করেছিলেন।[৫] বছর ছয়েক আগে। আমাদের বাহিনীতে একজন, মাত্র একজন লোক আছেন যিনি পায়েও হাঁটেন না, ঘোড়াতেও চাপেন না—তাঁকে চতুর্দোলায় বসিয়ে বাহকেরা নিয়ে যায়। না, তিনি কোনো রাজা-মহারাজা নন, এ ব্যবস্থায় তাঁর প্রবল আপত্তিও ছিল। কিন্তু আপত্তি টেকে নি। সর্বাধিনায়কের সামরিক আদেশ। তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন ডাক্তার নেলসন ফু। এক লক্ষ লোকের জন্য একমাত্র একজন পাশ করা ডাক্তার! প্রতিদিন যাত্রাশেষে আমরা যখন বিশ্রাম নিতাম, ঘুমাতাম, তখন তিনি ওষুধ দিতেন, অপারেশন করতেন, চিকিৎসা করতেন! তাই তাঁর নিদ্রার

ব্যবস্থা চলার পথে, আমাদের বিশ্রামকালে নয়।

আমাদের দলে ছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ জন মহিলা। আমি সদ্য বিবাহিত, কিন্তু আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে আসতে পারেন নি। আমারই আদেশে! কী করব বলুন? আমি হচ্ছি পলিটিক্যাল কমিশার—অসংখ্য আবেদনকারীকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার স্ত্রীর বয়স একুশ—তার কোলে একটিমাত্র বাচ্ছা। ছয় মাস বয়স তার। না, এতদিনে সাত মাস হলো। নাম দেওয়া হয় নি। স্ত্রী ও কন্যাকে রেখে এসেছি জেচুয়ানে। মহানিষ্ক্রমণের সময় আমাদের স্ত্রী আর ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের আমরা কৃষক পরিবারে রেখে চলে এসেছিলাম। এমন হাজার পনের স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে পড়ে রইল ঐ জেচুয়ানের আশপাশের গ্রামে। তাদের নাম-ধাম, বয়স, পরিচয় সনাক্তকরণ চিহ্ন, টিপছাপ সব সযত্নে লেখা ছিল একটা রেজিস্টারে। এই সঙ্গে মর্মন্তুদ শেষ সংবাদটা জানিয়ে রাখি: স্বাধীনতার পরে মাও ৎসে-তুঙের নির্দেশে পিপ্‌লস্‌ লিবারেসন আর্মির লোকেরা সমস্ত এলাকাটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল। একজনকেও উদ্ধার করতে পারে নি। পনের হাজার মেয়ে কেমন করে হারিয়ে গেল? সবাইকেই কি ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল সাংহাই আর ক্যাণ্টনের বেশ্যালয়ে?

আমাদের বাহিনী ইচাং-এ এসে পৌছালো নভেম্বরের দশ তারিখ নাগাদ। এখানে আমরা চুপিসারে ক্যাণ্টন-চাংশা রেল-লাইনটা পার হয়ে গেলাম। রেলপথ-কে আমরা ডরাই। রেলগাড়ির কামরা থেকে কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে তাহলে সভ্যজগতে জানাজানি হয়ে যাবে খবরটা। চিয়াঙ-ভায়া টের পেয়ে যাবে তার স্যাঙাতরা ভেগেছে! তাই রেল-লাইনের দু-মুড়োয় আমরা বালখিল্য বাহিনীকে পাঠিয়ে দিলাম নজর রাখতে। কোনো ইঞ্জিন আসছেনা সঙ্কেত পেয়ে আমরা 'ঘাটের কোলে' লাখখানেক মানুষ ডেরা-ডাণ্ডা নিয়ে রেল-লাইনটা পার হলাম—লেভেল-ক্রসিং দিয়ে নয়, জঙ্গল ঠেঙিয়ে।

ইচাঙ পার হবার পর আমাদের বাহিনী দুটো বিকল্প পথ ধরল, মানে আমরা দু' দলে ভাগাভাগি হয়ে গেলাম—একদল চলল উত্তর ঘেঁষে—চিহাও, চুয়াঙসিয়াং-এর পথে; দ্বিতীয় দল চলল দক্ষিণ দিক ঘেঁষে—চিয়ানগুয়া হয়ে। (চিত্র—২১) দুটি দলই পৃথক পৃথক স্থানে পার হলো আর একদফা রেল-লাইন। অবশেষে দুটি দল মিলিত হলো টাঙটাওতে ১২ই ডিসেম্বর। গ্রামটা হুনান প্রদেশের সীমান্তে। এর পরেই আমরা প্রবেশ করব কোয়েইচাওয়ে। তাঙতাওতে নেতারা সমবেত হলেন পরবর্তী কার্য-প্রণালী স্থির করতে। অধিকাংশেরই মত এরপর সোজা উত্তর-মুখে যাবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ আমরা যেখানে এসে পৌছেছি এখান থেকে কমরেড হো-লাং-

এর বেস-এলাকা মাত্র দু'শ মাইল। কোনো মতে সেখানে পৌছাতে পারলে আমাদের বর্তমান সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা, সাধারণ মানুষ কতটুকু বুঝি? কর্তা-ব্যক্তিরা রাজী হলেন না। ওঁরা বিবেচনা করে দেখেছেন—শত্রুপক্ষ এটাই আমাদের কাছে আশা করবে আর সেজন্যই চিয়াঙতার বারো-আনা সৈন্য সাজিয়েছে উত্তর দিকে। আমাদের রণনীতি-নির্ধারকের মতে তাই আমাদের আরও পশ্চিম দিকে সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু কোথায়? ক্রমাগত পশ্চিমে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত কি তিব্বতে গিয়ে হাজির হব নাকি?

এই সিদ্ধান্তমতো পরদিন আবার আমরা রওনা হলাম—প্রথমে লিপিং (১৪.১২.৩৪); তারপর দু-ভাগে ভাগ হয়ে তুংসের পথে। একটা কৈফিয়ৎ এই সময় দিয়ে রাখি—কেন মাঝে মাঝে আমরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছিলাম। মা-ষষ্ঠীর কৃপায় দলে আমরা লোক তো বড় কম নই। ঐ যে বললাম ১৪ই আমরা লিপিং-এ পৌছলাম—তার মানে এ নয় যে, সবাই তাই পৌছালো। আমাদের দলের মুড়োটা কখনও কখনও লেজের চেয়ে পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে থাকত। যেন পঞ্চাশ মাইল লম্বা একটা ড্রাগন! এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকলে গ্রামে আমাদের স্থান সঙ্কুলান হতো না। দ্বিতীয়ত আকাশ-পথে যে সব স্যাঙাতরা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে আমাদের খুঁজছে তাদের নজরে পড়ে যাব—সবাই এক গ্রামে থাকলে। তাই আমাদের যাত্রাপথটা বারে বারে ম্যাপে উপনদী-শাখানদীর চেহারা নিয়েছে। মোট কথা, আমরা—এক নম্বর ব্যাটেলিয়ান—উ-নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। ক্রিস্টমাস ঈভে!

সেদিন সারাদিনে আমরা বাইশ মাইল হেঁটেছি। কারণটা জানি না, আমাদের ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ানের চারটি কোম্পানির উপরেই আদেশ হয়েছিল বিশ্রাম না নিয়ে একনাগাড়ে হেঁটে ঐ নদীতীরে উপস্থিত হতে। ফার্স্ট আর্মির সাড়ে পনের আনা লোক অনেক-অনেক পিছনে পড়ে রইল। কেন এ আদেশ সেটা আমাদের জানানো হয় নি। পথশ্রমে সেদিন সবাই আমরা ক্লান্ত। পিঠুটাকে পিঠ থেকে নামিয়ে রাইফেলটাকে পাশে শুইয়ে রেখে সবে একটা পিঙ্কাডো গাছের তলায় আরাম করে শুয়েছি এসে হাজির হলো ব্যাঘ্র-শাবক!

ব্যাঘ্রশাবক ওর নাম নয়, ওর পিতৃদত্ত নাম একটা আছে—লিয়াও শিং-ওয়েন; কিন্তু সেটা সবাই ভুলে গেছে। আমরা ওকে যে চীনা-ডাকনামে ডাকতাম তার ইংরাজী অনুবাদ 'Tiger-cub', বাঙলায় তাই ব্যাঘ্র-শাবক বলে উল্লেখ করেছি। বছর তের বয়স, চোখে-মুখে কথা। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। একটি জ্যান্ত বিচ্ছু।

: কী খবর ব্যাঘ্র-শাবক?

: কমরেড-কমিশার, আপনাকে ব্যাটেলিয়ান কমাণ্ডার খুঁজছেন। জরুরী তলপ!

: কোন্ চুলোয় আছে সে?

: চুলোয় নয় কমরেড, সামনের ঐ ছাপরাটায়।

আমার সর্বাঙ্গ তখন বিদ্রোহ করছে—একটু শুয়ে থাকতে চাইছে। মনকে চোখ ঠেরে করুণ কণ্ঠে বলি, কমরেড লিয়াও, এমনও তো হতে পারে যে, অন্ধকারে আমাকে খুঁজে বার করতে তোমার মিনিট পনের দেরি হয়ে গেছে?

একগাল হাসল লিয়াও। তের বছরের কিশোর। মুক্তোর মতো ঝক্‌ঝকে এক সার দাঁত মেলে বললে, পারে না কমরেড কমিশার! আমি তো আপনার মতো বাইশ মাইল পথ হেঁটে আসি নি!

যেন থাপ্পড় মারল একটা! অর্থাৎ সেও আমারই মতো ক্লান্ত। অথচ বিশ্রাম না নিয়ে ডিউটিতে লেগে গেছে। তের বছরের বাচ্চা যা পারে, ছাব্বিশ বছরের জোয়ানকে তা পারতে হয়। বললাম, ধন্যবাদ কমরেড লিয়াও! ভবিষ্যতে আমার ভুল হলে এভাবে মনে করিয়ে দিও, দৈনিক কে কতটা হাঁটছে।

অগত্যা উঠতে হলো। সামনেই গোলপাতায় ছাওয়া একটা ঘর। বাইরে রাই-ফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে একজন সৈনিক। স্থানীয় কোনো কৃষকের বাড়ি হবে হয়তো, অথবা মৎস্যজীবীর। উ—এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় নদী। এটা মৎস্যজীবীদের গ্রাম। ঘরটা ছোট, আসবাবপত্র কিছু নেই। সাত-আট জন ইতিমধ্যেই সমবেত হয়েছে। গোল হয়ে বসেছে মাদুর পেতে। আমিও একপ্রান্তে ঝুপ করে বসে পড়ি।

ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার সো-লিঙ প্রায় আমারই বয়সী। কম কথার মানুষ। মুখ দেখে বোঝা যায় না যে, খোশ-মেজাজে আছে, না তিতিবিরক্ত। টিপিক্যাল চীনাম্যান। ব্যাটালিয়ানের সবাই বলে—হাসলে এবং কাঁদলে সো-লিঙ-এর মুখের একই রকম অভিব্যক্তি হয়, বোঝা যায় না যে, সে হাসছে না কাঁদছে। অবশ্য এটা সকলের অনুমান। কেউ কখনও তাকে হাসতে অথবা কাঁদতে দেখে নি। তার কথার মাত্রা হচ্ছে : 'ঠিক আছে!'

বিপদ যতই গুরুতর হোক, সবকিছু যতই বেঠিক হোক—সো-লিঙ-এর অনিবার্য নিদান : ঠিক আছে! আমি বসতে না বসতেই সো-লিঙ একখণ্ড কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, কমরেড কমিশার, পড়ে দেখ। জরুরী আদেশ!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ঘরে একটা আংশি থেকে ঝুলছে একটা কাগজের ঠোঙার আলো, যাকে আপনারা বলেন 'চীনা-লণ্ঠন'। তারই স্তিমিত আলোয় মেলে ধরলাম কাগজখানা! কোথায় আদেশ? একখণ্ড ছাপানো ইস্তাহার। জেনারালিসিমো চিয়াঙ-এর স্বাক্ষরিত। বলা হয়েছে, জীবিত বা মৃত লালফৌজের

তাই বোধহয় ও চক্ষুলজ্জাটাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে; কিন্তু ওর কণ্ঠে একটা সেন্টিমেণ্টালিটির সুর লেগেছে। ওটাকে ডরাই। সৈন্যবাহিনীতে ভাবালুতার স্থান নেই। আমি পলিটিক্যাল কমিশার—এদের ভালমন্দ আমাকেই দেখতে হয়; কিন্তু প্রতিটি সৈনিকের সেন্টিমেণ্টের কথা শুনতে গেলে আমার পক্ষে কর্তব্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সন্দিগ্ধচিত্তে বলি, ব্যাপারটা কী বিষয়ে?

: তোমার মনে আছে কমরেড, ঠিক যাত্রা করার আগে আমি তোমার কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীকে লঙ্‌মার্চে অংশ নেবার—

বাধা দিয়ে বলি, কোম্পানি কমাণ্ডার মাও! আমি দুঃখিত, ও-বিষয়ে আমি আলোচনা করতে প্রস্তুত নই!

: কিন্তু কথাটা যে আমার না বললেই নয়!

: উপায় নেই! ও-প্রসঙ্গ আমি কোনোমতেই আলোচনা করব না!

ক্যাপ্টেন মাও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল। ব্যাঘ্রশাবক দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির। স্যালুট করে বললে, কমরেড কমিশার, রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার কর্নেল ইয়াং তে-চু এইমাত্র এসে পৌছেছেন! তিনি একটা জরুরী মিটিং-এ আপনাদের সবাইকে ডেকেছেন। এক্ষনি—

: কোথায় আছেন তিনি?

অন্ধকারের মধ্যে একদিকে আঙুল তুলে দেখালো ব্যাঘ্রশাবক। দূরে একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে। ব্যাঘ্রশাবক দাঁড়ালো না—তৎক্ষণাৎ এ্যাবাউট টার্ন করে ছুটে চলে গেল আর সবাইকে খবর দিতে।

রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার কর্নেল ইয়ান তে-চু একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ! পিকিং কলেজে পড়াতেন—দর্শন এবং ইতিহাস। ক্লাসিকাল সাহিত্য তাঁর কণ্ঠস্থ। কন্‌ফুশিয়াস, লাওৎসে আর বুদ্ধের বাণী ক্রমাগত শুনিয়ে যান সামরিক আদেশের ফাঁকে ফাঁকে। ওঁর মতে ঐ তিনজন হচ্ছেন খাঁটি সাম্যবাদী! মানব-সভ্যতায় আদিমতম কম্যুনিস্ট! আমরা জানি, সেটা ঠিক নয়, এবং এ-ও বুঝি যে, কথাটা কর্নেল ইয়াং নিজেও বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ঐ ঢঙ্‌ ধরে বসে আছেন তিনি। তর্ক করে যদি তাঁর মত বদলাবার চেষ্টা করতে যাও হেরে ফিরে আসতে হবে। কত লোকের কতরকম পাগলামিই না থাকে!

অন্ধকারে মাঠ ভেঙে আমি আর ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়া ঐ আলোটা লক্ষ্য করে চলতে থাকি। মাও তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আবার তুলতে চেয়েছিল; আমি রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করে থামিয়ে দিলাম ওকে: প্লীজ কমরেড, তোমার স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলো না!

ও চুপ করে যায়। আমরা নীরবে আগুপিছু মেঠো আলের পথ দিয়ে চলতে থাকি। ধানের ক্ষেত। আমি মনে মনে ভাবছিলাম—এরা কি আমার অবস্থাটা বোঝে না? আমি কী করতে পারতাম? আমি কী করতে পারি? আমার নিজের স্ত্রীকেও তো ত্যাগ করে এসেছি—জানি না জীবনে আবার তার দেখা পাব কি না। ক্যাপ্টেন মাও অবশ্য সদ্য বিয়ে করেছিল—মাস-চারেক আগে। হয়তো বউ-এর সঙ্গে ভালো করে ভাবই হয় নি। বিয়েতে আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। আমি যেতে পারি নি। শুনেছি, রীতিমতো ভালোবেসে প্রেম করা বিয়ে। ওর স্ত্রী নাকি শিক্ষিতা। মিশনারী স্কুলে পড়েছে। যারা বিয়েতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিল তাদের কাছে শুনেছি মাওয়ের বউ শুধু শিক্ষিতাই নয়, সুন্দরীও। বেচারি! আমারই জন্য সেই বউকে ও সঙ্গে আনতে পারে নি।

পরিত্যক্ত একটি কনফুশিয়ান মন্দির। মূর্তি বা বিগ্রহ নেই—তা অবশ্য কোনো কনফুশিয়ান মন্দিরেই থাকে না। আছে একটা ওক কাঠের ফলক, তাতে কার যেন পিতৃ-পুরুষদের নাম খোদাই করা। মন্দিরের সামনে একটা চাতাল। কাগজের ফানুসে একটা বাতি জ্বলছে সেখানে। রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের একটা 'কাং' জুটেছে, হাতে-বোনা মাদুর আর কি; তাতে আধশোয়া হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর বাঁ-পায়ের জুতোটা খোলা—ঠ্যাঙটা লম্বা করে দিয়েছেন। একটি মেয়ে বসে তাঁর পায়ে ওষুধ মালিশ করছে।

: কি হলো আপনার পায়ে?—প্রশ্ন করি আমি, মাদুরের একপ্রান্তে বসতে বসতে। ইতিমধ্যে আর সকলেও এসে জুটেছে। ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার সো-লিঙ এবং প্রথম, দ্বিতীয় আর পঞ্চম কোম্পানির কমাণ্ডার। সবাই গোল হয়ে ঘিরে বসেছে ওঁকে। চতুর্থ কোম্পানির কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মাও তো আমার সঙ্গেই এলো। সামরিক অভিবাদন করে বসে পড়ল একপাশে।

দর্শন-ইতিহাসের পণ্ডিত কর্নেল ইয়াং বলেন, ধোঁয়া দেখলে যে-যুক্তিতে আগুনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, আমার খোঁড়া-ঠ্যাঙ দেখে তেমনি সিদ্ধান্তে এস না যেন যে, আমি অতিরিক্ত মদ্যপান করে খানায় পড়েছিলাম। কারও বাড়ি মুরগীও চুরি করতে যাই নি। লী আমার সাক্ষী। লী, সাক্ষ্য দাও!

যে মেয়েটি পায়ে ওষুধ মালিশ করে দিচ্ছিল সে মুখ লুকিয়ে হাসল। জবাব দিল না।

কর্নেল ইয়াং ধমক দিয়ে ওঠেন, অমন মুখ লুকিয়ে হেসো না লী! এঁরা অন্য কোনোও সন্দেহ করবেন! এঁদের বল, আমার শ্রীল শ্রীযুক্ত বামচরণের এ-হাল হলো কেমন করে।

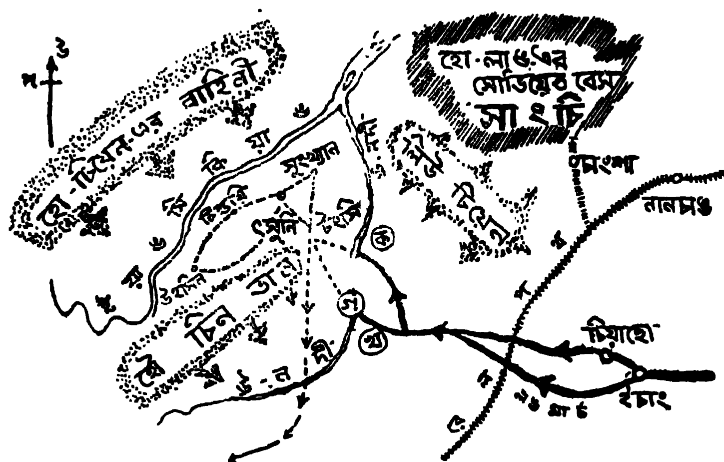
লী এবার মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখল। বললে, কমরেড কমাণ্ডার পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন। মচ্‌কে গেছে। এমন কিছু মারাত্মক আঘাত নয়। ডাক্তার নেলসন ফু বলেছেন ক্রমাগত এই মালিশটা লাগাতে।

লক্ষ্য করে দেখলাম লীকে। ইতিপূর্বে তাকে কখনও দেখি নি। বয়স কত হবে? বছর আঠারো উনিশ। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। চুলগুলো বব্‌ করে ছাঁটা। গাঁয়ের মেয়েদের মতো নয়। মনে মনে একটু শঙ্কিত হয়ে পড়ি—এ আগুনের ফুল্‌কিটাকে নিয়ে বিপর্যয় বাধবে না তো? এতদিন কোন্ রেজিমেণ্টে ছিল মেয়েটি?

কর্নেল ইয়াং বলেন, আমার ঠ্যাঙের প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই থাক। এখন কাজের কথায় আসা যাক। নদী পার হবার ব্যবস্থা কতদূর?

সো-লিং পরিস্থিতিটা পেশ করে। গম্ভীরভাবে সবটা শুনে কর্নেল বললেন, কমরেড্‌স্! সামরিক পরিস্থিতিটা আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলতে চাই। তাহলেই বুঝবে, আজ রাত্রেই উ-নদী পার হওয়া কেন এতটা জরুরী প্রয়োজন। কমাণ্ডার অফ দি ফার্স্ট আর্মি কমরেড লিন পিয়াও স্বয়ং তোমাদের একটি শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন। সেটা পড়ে শোনাবার আগে তোমাদের বর্তমান পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিতে চাই। নার্স লী! ঐ ম্যাপটা পেতে দাও তো?

লী তার তৈলাক্ত হাতটা মুছে নিয়ে একখানা ম্যাপ পেতে দেয়। (চিত্র-২২)



চিত্র—২২

[টীকা: আলোচনা হচ্ছে ২৩. ১২. ৩৪ তারিখে 'ক'-চিহ্নিত স্থানে। লালফৌজের মূল বাহিনী তখন 'খ'-চিহ্নিত স্থানে। হো-চিয়েন এবং লিউ-চিয়েন উত্তর দিকে শিবির গেড়েছে। ইয়াং-সিকিয়াঙের দক্ষিণ দিকে আছে দস্যু-সর্দার হো-চিনতানের বাহিনী। মোটা কালো দাগটা হচ্ছে যে-পথে লালফৌজ এসেছে; ফুটকি-চিহ্নিত পথ হচ্ছে যে পথে ওরা ভবিষ্যতে গিয়েছিল।]

কর্নেল ইয়াং বলেন, আমরা বর্তমানে আছি 'ক'-চিহ্নিত স্থানে। আমাদের মূল ফৌজ এখনও উ নদীর পাড়ে এসে পৌঁছায় নি—তারা আছে 'খ' চিহ্নিত স্থানে। তারা 'গ' চিহ্নিত স্থানে উ নদী পার হতে পারবে, যদি আমরা আজ-কালের মধ্যে 'ক'-তে নদীটা পার হয়ে শত্রুদের বিতাড়িত করতে পারি। উ এবং ইয়াং-সি নদীর মাঝখানে চিয়াঙ কাই-শেকের কোনো রেগুলার বাহিনী নেই। আছে স্থানীয় জঙ্গী সর্দার হো-চিন-তানের সৈন্য। সে চিয়াঙের দলে, আমাদের বাধা দেবে এবং চিয়াঙ কাই-শেকের যে বাহিনীটা জেনারেল হো-চিয়েনের অধীনে আছে তাদের ইয়াং সি নদীর দক্ষিণে নিয়ে আসায় সাহায্য করবে। আমরা কোনোক্রমেই সাংচি সোভিয়েতের দিকে যেতে পারব না। জেনারেল লিউ-চিয়েন সেখানে পরিখা খনন করে প্রতীক্ষা করছে। ফলে ৎসুনি দখল করার একমাত্র পথ—যদি আমরা এমন ব্যবস্থা করতে পারি যাতে জেনারেল হো চিয়েন ইয়াংসি নদী পার হতে না পারে। দস্যু-সর্দার হো-চিনতানের সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার, আর হো-চিয়েন দশ হাজার সৈন্য নিয়ে নদী পার হবার চেষ্টা করছে। তুলনায় আমরা আছি মাত্র এক হাজার। সুতরাং লড়াইটা নির্ভর করছে কারা ইয়াংসিকিয়াঙের দক্ষিণ তীরে আগে পৌঁছাচ্ছে তার উপর। আমরা, না হো চিয়েন। বুঝলে? কোনো প্রশ্ন আছে?

সো-লিঙ বললে, ঠিক আছে। সুতরাং আমাদের পরিকল্পনাটা কি?

কর্নেল ইয়াং বললে, পাঁচ দিন আগে লিপিং-এ পলিটব্যুরোর একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হয়েছে। কমরেড লিন পিয়াও এবং কমরেড নৈ জুং-চেন বলেছেন, আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ঝড়ের বেগে উ নদী অতিক্রম করে ৎসুনি আর টুংসি দখল করা[৬]। এবার আমি তোমাদের একটি অত্যন্ত গোপন সামরিক পরিকল্পনার কথা বলব। কী ভাবে ঐ আদেশ পালন করব আমরা:

হঠাৎ আমার নজর হলো—নার্স লীর হাতদুটি মালিশ করা বন্ধ করেছে। সাগ্রহে সে ঝুঁকে পড়ে দেখছে ম্যাপটাকে। আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হলো। হাজার হোক, লী স্ত্রীলোক—যুবতী, চঞ্চলা; তার সামনে এসব গোপন সামরিক আলোচনা হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? লক্ষ্য করে দেখলাম, ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়ারও বোধহয় কথাটা খেয়াল হয়েছে। কর্নেল ইয়াংকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ক্যাপ্টেন মাও বলে ওঠে, লী, তুমি বরং এবার বিশ্রাম করগে যাও।

লী চমকে ওঠে। লজ্জিত হয়ে সে কর্নেল ইয়াং-এর আহত পা-টা ফের টেনে নেয়। আমারও খারাপ লাগে। যা আশঙ্কা করছিলাম! এতগুলি উঠতি জোয়ানের মাঝখানে ঐ বহ্নিশিখা না বিপর্যয় বাধায়! ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়া ওকে 'কমরেড লী' বলে নি, 'নার্স লী' বলে নি! যেন ওর কতদিনের বান্ধবী! সোজা 'তুমি' সম্বোধন!

কর্নেল ইয়াং বোধ করি এই সম্বোধনের তারতম্যটা খেয়াল করেন নি; তিনি বলে ওঠেন, ঠিক কথা। তুমিও পরিশ্রান্ত। যাও, বিশ্রাম করগে যাও। আর মালিশ করতে হবে না!

লী তার ঝাঁকড়া-চুলে-ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, আমি মোটেই ক্লান্ত নই; তাছাড়া ডাক্তার ফু বলেছেন—

: না! তুমি বিশ্রাম কর'গে যাও!—প্রায় আদেশের সুরে বললে ক্যাপ্টেন মাও!

লী তার চোখ দুটো ওর মুখের উপর মেলে বললে, হুকুম?

ক্যাপ্টেন মাওকে জবাব দিতে হলো না। কর্নেল ইয়াংই বলে ওঠেন, হ্যাঁ হুকুম!

অভিমান-ক্ষুব্ধ লী তার সাজসরঞ্জাম গুটিয়ে উঠে চলে যায়। মাও চু-হুয়া ওর গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। যা আশঙ্কা করেছি! ওর চোখে আমি স্পষ্ট লালসার দৃষ্টি দেখলাম। লী চলে যাবার পর কর্নেলের দিকে ফিরে বললে, এসব গোপন সামরিক পরামর্শ নার্স-টার্সদের সামনে না হওয়াই ভালো!

সো-লিঙ বললে, ঠিক আছে। নার্স-লী তো চলেই গেছে—

হঠাৎ চমকে ওঠেন কর্নেল ইয়াং। বলেন, ক্যাপ্টেন মাও! সেই জন্যই কি তুমি ওকে বিশ্রাম নিতে বলছিলে!

: নিশ্চয়!

: লী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বলে নয়?

সো-লিঙ পুনরুক্তি করে, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে! নার্স-লী তো চলেই গেছে—

কর্নেল ইয়াং একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। কী যেন ভাবছেন তিনি। তারপর মনস্থির করে ডাকলেন, নার্স-লী! একবার শোন তো?

লী নতনয়নে এসে দাঁড়াল। অভিমানক্ষুব্ধা সে।

: ঐ ঝোলার ভিতর চায়ের প্যাকেট আছে। বার কর। আমাদের জন্য কয়েক মগ চা বানাও। এখানে বসেই বানাতে পার। তাহলে আমাদের পরিকল্পনাটাও শুনতে পাবে—

আমি স্তম্ভিত। কর্নেল ইয়াংও মজেছেন নাকি? লী এক গাল হাসল। বিজয়িনীর দৃষ্টিতে একবার চোরা চাহনি হানল ক্যাপ্টেন মাওয়ের দিকে। মাওয়ের মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। ঘরের এক প্রান্তে একটা কাংড়িতে কাঠকয়লার আগুন জ্বলছিল। এতক্ষণ সেটা ছিল ডিসেম্বরের শীতের বিরুদ্ধে অভিযান। এবার তাতেই বসল চায়ের পাত্র। লী বললে, চিনি নেই কিন্তু—

কর্নেল ইয়াং চোখ বুজে কী চিন্তা করছিলেন, বললেন, তোমার মিষ্টি হাতের

চা, বিনা-চিনিতেই বানাও।

সো-লিঙ বললে, ঠিক আছে, এক চিমটে লবণ মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

কর্নেল যেন এই সমাধানের কথাই এতক্ষণ ভাবছিলেন। একেবারে লাফিয়ে ওঠেন : ঠিক কথা! কনফুশিয়াসও তাই বলেছেন, 'সাধু-সজ্জনের কাছ থেকেও কোনো বদ-অভ্যাস অনুকরণ কর না, বরং অসাধু-অসজ্জনের কাছ থেকে সু-অভ্যাস গ্রহণ কর।'

হঠাৎ এ ঋষিবাক্যের ধরতাইটা আমরা কেউ ধরতে পারি না। কর্নেল নিজেই অতঃপর শঙ্করভাষ্য দাখিল করেন: জাপানীরা আমাদের জাত শত্রু, বজ্জাতের ধাড়ি। কিন্তু ব্যাটারা নুন দিয়ে চা খায়। তাকে বলে 'ওছা'। অভ্যাসটা ভালো, বিশেষ যখন লীর মতো মিষ্টি মেয়েও বিনা-চিনিতে চায়ে মিষ্টত্ব আনতে পারে না!

লী চা করতে বসে। কর্নেল আবার ম্যাপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন। বলেন, আমাদের পরিকল্পনাটা এই রকম :

"● আজ রাতেই অন্তত একটি কোম্পানি উ-নদী অতিক্রম করবে।

● কালকের মধ্যে সেই কোম্পানি ৎসুনি দখল করবে।

● পরশুর মধ্যে অন্যান্য তিনটি কোম্পানি ৎসুনিতে পৌছাবে এবং 'গ' চিহ্নিত স্থানে উ-নদীর উত্তর-পারে উপস্থিত হয়ে আমাদের লালফৌজের মূল-বাহিনীকে নদী পার হতে সাহায্য করবে।

● এক-সপ্তাহের মধ্যে ৎসুনি, তুংসে—বস্তুত সুংখান্ থেকে ওয়েসিং পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটা আমরা দখলে নেব।

● সম্ভবত দক্ষিণ দিক থেকে তাড়া খেয়ে হো চিটান ইয়াংসি পার হয়ে তার উত্তর-পারে চলে যাবে।

অর্থাৎ, সমস্ত কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য—কোনোক্রমেই যেন হো-চিয়েন বাহিনী ইয়াংসির দক্ষিণ দিকে না আসতে পারে! বুঝলে? কোনো প্রশ্ন আছে?" সো-লিঙ বলে, ঠিক আছে! বুঝেছি।

কর্নেল বলেন, এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করি : চিয়াঙ কাই-শেক আমাদের লঙ্-মার্চ-এর খবর পেয়েছে দেড় মাস পরে। ফলে আমরা দেড়-মাস সময় আগিয়ে আছি। কিন্তু আমরা চলেছি পায়ে হেঁটে, ওরা আসছে আর্মাড্-কারে, সাঁজোয়া-বাহিনী নিয়ে। চিয়াঙ-এর সেই মূল বাহিনী, যা এই দেড়মাস কিয়াংসি সোভিয়েত ঘিরে বসেছিল, তার সৈন্য সংখ্যা আমাদের দশগুণ। আমাদের সামরিক উপদেষ্টার মতে সেই সৈন্য নিয়ে চিয়াঙ-এর অকুস্থলে এসে পৌছাতে আরও দশদিন লাগবে। এখন আমরা যদি প্রথম পর্যায়ে সাফল্যমণ্ডিত হই তাহলে হো-চিয়েন কি

করবে? নিশ্চয়ই সে কালক্ষেপ করতে চাইবে। অর্থাৎ স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে। নিজেরাও ইয়াংসির দক্ষিণে আসবার চেষ্টা করবে না, আমাদেরও নদী পার হয়ে উত্তরপারে যেতে দেবে না। দশ দিন এভাবেই কাটিয়ে দেবে, যতক্ষণ না চিয়াঙ-এর মূল বাহিনীটা এসে পৌঁছায়। তাই নয়?

আমরা সকলেই স্বীকার করি, এটাই স্বাভাবিক।

: ফলে আমাদের যা করবার তা ঐ দশ দিনের মধ্যেই করে ফেলতে হবে।

: কী করতে চাই আপাতত?

: আমাদের আপাতত লক্ষ্য হচ্ছে—যে কোনো আর একটি রুট আর্মির সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যতদিন তা না পারছি ততদিন রুখে দাঁড়াতে পারব না। সবচেয়ে কাছে আছে কমরেড হো-লাঙ-এর সেকেণ্ড আর্মি, দেড়শ মাইল দূরে। কিন্তু সে দিকে কিছুতেই যেতে পারব না আমরা। সুতরাং চেষ্টা করে দেখা হচ্ছে কমরেড চ্যাঙ কু-তাওয়ের ফোর্থ আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না—

: কমরেড চ্যাঙ-এর ফোর্থ আর্মি তো ওয়ুয়ানে?

: ছিল। বর্তমানে নেই।[৭] চিয়াঙ একযোগে আমাদের সব কয়টি সোভিয়েত আক্রমণ করেছে। কমরেড চ্যাঙ কু-তাও ঠিক আমাদেরই মতো তাঁর সোভিয়েত ত্যাগ করে পথে পথে ঘুরছেন। তাঁর বাহিনী বর্তমানে কোথায় আছে তা আমরা এখনও খবর পাই নি। সেছুয়ান প্রদেশের পাচুং-এ একটি লালঘাঁটি গড়ে উঠেছে। আশা করছি, চ্যাঙ ঐ দিকেই রওনা হয়েছেন। ফলে আমাদের লক্ষ্যমুখ—সেছুয়ান, সেনসি কিংবা কাংশু প্রদেশের দিকে—

আমি বলি, অর্থাৎ আমরা এখান থেকে যাব উত্তর-মুখে, যেহেতু ঐ তিনটি প্রদেশই আমাদের বর্তমান অবস্থিতির উত্তর দিকে।

কর্নেল বলেন, না! আমরা যাব দক্ষিণে!

: দক্ষিণে!—আঁৎকে ওঠে সো-লিঙ। এবার আর 'ঠিক আছে' ঠিকে দিতে ভুল হয়ে যায় তার। বলে, দক্ষিণে কেন? সেছুয়ান, সেনসি, কাংশু সবই তো উত্তর দিকে—ইয়াংসি নদীর উত্তর পারে।

: ঐ জন্যই। আমাদের ইয়াংসি পার হতে হবে। ইয়াংসি, তোমরা সবাই জান, চীনের সবচেয়ে বড় নদী, এখানে সেটা পার হওয়ার চেষ্টা করা নিষ্ফল। তাই আমরা আরও দক্ষিণে অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে গিয়ে কোনোও অজ্ঞাত উৎসমুখে ইয়াংসি পার হব।

আমরা নীরবে ব্যাপারটাকে হজম করবার চেষ্টা করি। যেতে চাই উত্তুরে, তাই রওনা দিচ্ছি দক্ষিণ-পানে। রওনা হয়েছিলাম এক লক্ষ লোক, ইতিমধ্যেই তার

হাজার পঁচিশ মারা গেছে! এসেছি সাত-আটশ' মাইল। এ-ভাবে কতদিন চলতে হবে?

চিন্তায় ছেদ পড়ল কর্নেলের কণ্ঠস্বরে, শোন। ৎস্নুনিতে পলিটব্যুরোর একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হবার কথা, অবশ্য যদি আমরা আদৌ ৎস্নুনি দখল করতে পারি। যে পরিকল্পনার কথা এতক্ষণ বলছিলাম সেটা ঐ ৎস্নুনি অধিবেশনেই বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে। এ পরিকল্পনা বার হয়েছে সর্বাধিনায়ক চুতে এবং কমরেড মাও ৎসে-তুঙ-এর মাথা থেকে; কিন্তু এখনও সেটা পলিটব্যুরোর সামরিক উপদেষ্টাদের অনুমোদন সাপেক্ষ।

প্রশ্ন করলাম,আপনি বলছিলেন, আমরা দশ-দিন সময় পেতে পারি—যা করবার তা ঐ দশদিনের ভিতর করতে হবে। সে পরিকল্পনাটা কি?

কর্নেল বলেন, সেটাই হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা। তার রূপরেখাটা এই রকম:

● ৎস্নুনি দখল করে একটি মাত্র কোম্পানিকে ইয়াংসি-নদীর দক্ষিণ পারে রেখে আমরা মূল-বাহিনীকে নিয়ে দক্ষিণের কোইচাও প্রদেশের দিকে চলে যাব।

● ঐ ফেলে-যাওয়া ছোট্ট কোম্পানিটা ক্রমাগত ইয়াংসি পার হবার ভান করবে কিন্তু পার হবে না। যাতে উত্তর-পারে বসে হো-চিয়েনের সেনাপতিরা মনে করে—আমরা সদলবলে নদী পার হবার চেষ্টা করছি।

● যেহেতু হো-চিয়েন স্থিতাবস্থা বজায় রাখায় আগ্রহী তাই সেও নদী পার হবে না। ফলে আমাদের মূল বাহিনী অলক্ষিতে অনেক দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে গিয়ে ইয়াংসি পার হবার সময় পাবে।

কোনোও প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন একটিই ছিল। সেটা পেশ করল আমাদের ব্যাটালিয়ান-কমাণ্ডার গম্ভীর প্রকৃতির সো-লিঙ। বললে, কিন্তু দশ পনের দিন পরে চিয়াঙ কাই-শেকের মূল বাহিনী যখন এসে পৌছাবে তখন তো ওরা নদী পার হয়ে আসবে। তখন আমাদের ঐ পরিত্যক্ত কোম্পানিটির কী হবে?

কমাণ্ডার ইয়াং মুখ তুলে চাইলেন। একে একে আমাদের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, সে জবাবটাও আমাকে দিতে হবে?

আমাদের চোখ নিচু হলো। সত্যই—এ প্রশ্ন তো বাহুল্য! ঐ হতভাগ্য কোম্পানির মুষ্টিমেয় মানুষগুলোর পরিণামটা কি বুঝিয়ে বলার? ওরা লাল ফৌজের মূল বাহিনীকে বাঁচিয়ে দিল—এটুকুই শুধু লেখা থাকবে ইতিহাসে। তাদের সৈন্যসংখ্যার দশ হাজার গুণ সৈন্য যখন তাদের চালাকিটা বুঝে ফেলবে তখন তাদের পরিণামটা

কী হবে সে কথা উহ্যই থাক না।

নীরবতা ভঙ্গ করে কমাণ্ডার আবার নিজেই বলেন, কোনো আদেশ সেই কোম্পানি কমাণ্ডারকে আমি দিয়ে যাব না। তারা শেষ-সৈনিক পর্যন্ত যুদ্ধ করতে পারে, আত্ম-হত্যা করতে পারে, সদলবলে আত্মসমর্পণ করতে পারে। কোম্পানি কমাণ্ডারের যা ইচ্ছা।

সো-লিঙ সংক্ষেপে শুধু বললে, ঠিক আছে! তিনটে বিকল্প বস্তুত একই!

আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। লী কিন্তু চুপ করে থাকতে পারল না, অস্ফুটে বললে, সেটা কোন্ কোম্পানি?

চতুর্থ কোম্পানির কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মাও বলে ওঠে, তুমি দয়া করে চুপ করবে?

লী ম্লান হয়ে যায়। বুঝতে পারে, তার এখানে কথা বলার এক্তিয়ার নেই। নীরবে কয়েক মগ চা পরিবেশন করে যায়।

চা-টা বিস্বাদ। একেবারে 'ওছা'! হয়তো দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাটা শোনার আগে পরিবেশিত হলে এ চা এত বিস্বাদ লাগত না।

অধিবেশন শেষ হলো রাত দশটায়। ব্যাঘ্রশাবক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিয়ে গেল—ভেলা প্রস্তুত। ও-পারে রওনা দেবার জন্য সবাই তৈরি। আমরা সদলবলে বার হয়ে এলাম মন্দির থেকে। বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। ইতমধ্যে টিপি টিপি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কর্নেল ইয়াংকে বলি, আপনি এখানেই বিশ্রাম নিন। আমরা খবর পাঠাব।

উনি রাজী হলেন না। বললেন, না, আমি স্বচক্ষে একবার নদীপারের অবস্থাটা দেখতে চাই। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব—

: কিন্তু আপনার এই সব ম্যাপ যে বৃষ্টিতে ভিজে যাবে—

: না, কাগজপত্র এখানেই থাকবে। লীর হেফাজতে।

: লী এখানে একা থাকবে? এই পরিত্যক্ত মন্দিরে?

: একা নয়। ওর একজন পাহারাদারও থাকবে—

তারপর সামরিক আদেশ দেবার ভঙ্গিতে গম্ভীর হয়ে বললেন, কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়া। আমরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত কমরেড লী তোমার হেপাজতে রইল।

ক্যাপ্টেন মাও এ্যাটেনশান হলো। যার ভাবার্থ : যো হুকুম সাব্!

আমি মনে মনে ভাবি—পাহারাদারটি ভালই বেছে নিয়েছেন কর্নেল-সাহেব!

আমরা সদলবলে মন্দিরের বাইরে চলে এসেছি, হঠাৎ কর্নেল ইয়াং ঘুরে দাঁড়ালেন। নিতান্ত খেয়ালী মানুষ এই প্রাক্তন-অধ্যাপকটি। ক্যাপ্টেন মাওয়ের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন : ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়া, তুমি ইয়াং কাই-হুইয়ের নাম শুনেছ?

মাও মাথা নেড়ে বললে, না স্যার।

: তুমি শুনেছ, নার্স লী?

লী বললে, শুনেছি। তিনি ছিলেন কমরেড মাও ৎসে-তুঙের প্রথমা স্ত্রী। ধরা পড়ার পরে সামরিক তথ্য চিয়াঙ কাই-শেকের সেনাপতিকে জানাতে রাজী হন নি! তাই তাঁর মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল।

: ঠিক তাই! কিন্তু কমরেড মাও ৎসে-তুঙ একটি কবিতায় সেই ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন, তাঁর বন্ধু লিউ-এর মৃত্যুতে—লিউ-এর বিধবা পত্নীকে যে কবিতাটা লিখেছিলেন তাতে। সেটা পড়েছ?

: না স্যার!

: 'লিউ' মানে হচ্ছে উইলো গাছ, আর 'ইয়াং' মানে পপলার গাছ—সে তো তোমরা জানই। বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মাও ৎসে-তুঙ তাঁর বিধবা বন্ধুপত্নীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন :

> "আমার বাগানে গরবী 'ইয়াং' লুটালো ভূমির পরে
> কালবৈশাখী হেনেছে আঘাত তোমার 'লিউ'-এর মূলে ;
> ইয়াং ও লিউ স্মৃতির রাজ্যে আছে নবকলেবরে—
> আত্মদানেতে অমর সে গাছ ভরে গেছে ফুলে ফুলে॥"[৮]

হঠাৎ এ উদ্ধৃতির ধরতাইটা আমরা ধরতে পারি না। সেটা অধ্যাপক মশাই নিজেই ধরিয়ে দেন। বললেন, নার্স লী, তুমি ততক্ষণ ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়াকে ঐ ইয়াং কাই হুইর আত্মদানের কাহিনীটা শোনাও। ও তাহলে বুঝতে পারবে— স্ত্রীলোক মানেই বিশ্বাসঘাতক নয়! স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করতে শিখুক, তাহলে কালে নিজের স্ত্রীকেও বিশ্বাস করতে পারবে।

পরক্ষণেই আমরা পথে নামলাম। আড়চোখে পিছনে ফিরে দেখি, আধো অন্ধকারে মন্দির-চাতালে দাঁড়িয়ে আছে মাও আর লী! দার্শনিক কর্নেল ইয়াং-এর অভিধানে যাদের বলা হয়েছে 'য়াঙ' এবং য়িন'। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি!

রাত এগারোটা। টিপিটিপি বৃষ্টি সমানে লেগে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। নদীর ধারে এক আঘাটায় এসে হাজির হলাম আমরা। মানুষ-ভর গভীর খাড়া খাদ এপারে, ওপারে বালিয়াড়ি আছে, দিনের বেলা দেখেছি। এখন অদৃশ্য। আকাশ, জল আর মেঘ হারিয়েছে তাদের পৃথক সত্তা। যেমন খরস্রোতা নদীর আওয়াজ নিঃশেষে হারিয়ে গেছে বৃষ্টিপাতের শব্দে। আর কী ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাস—ঐ যাকে আপনারা বাঙলাদেশে বলেন 'হাড় কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া।'

জনা দশেক লোক সেই ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে দাঁড়িয়ে আছে খালি গায়ে। পরনে শুধু হাফ-প্যান্ট। মাজায় বাঁধা অটোমেটিক মজার-পিস্তল জল-নিরোধ থলিতে বাঁধা। বাঁশের ভেলাটা বাঁধা আছে নদীর কিনারে। আমরা উপস্থিত হতেই ওরা এ্যাটেনশান হলো। কমাণ্ডার কর্নেল ইয়াং সেনাপতি লিন-পিয়াও-এর শুভেচ্ছাবাণী পড়ে শোনালেন। ভেলার দলপতি ফার্স্ট কোম্পানির কমাণ্ডার শিয়ান-শান-লিঙ আদেশ জারী করল। দশজন দক্ষ সাঁতারু নিঃশব্দে নেমে গেল বরফ-গলা উ-নদীর জলে। শিয়ান এক হাতে টর্চ অপর হাতে অটোমেটিকটা নিয়ে উঠে পড়ল বাঁশের ভেলায়। একই সঙ্গে রওনা হলো ওরা। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পরমুহূর্তে।

কথা ছিল—ওপারে পৌঁছেই শিয়ান টর্চ জেলে আমাদের সঙ্কেত জানাবে। তখনই দ্বিতীয় ভেলাটা রওনা হবে। কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই ওপারে সারি সারি মশাল জলে উঠল। আবছা আলোয় দেখলাম ভেলাটা মাঝ নদীতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। গর্জে উঠল ওপারের কামান—এক, দুই, তিন! আগুনের ঝলকানিতে দেখলাম ভেলাটা কাত হয়ে গেছে।

দশ মিনিট গেল, বিশ মিনিট গেল, তারপর কামান গর্জন থেমে গেল। ওপার থেকে টর্চের কোনো সঙ্কেত এলো না। দ্বিতীয় ভেলাটা আদৌ রওনা হলো না। রাত দুটো নাগাদ সংবাদবহ চেন্‌তু এসে খবর দিয়ে গেল ভেলাটা ওপারে পৌঁছাতে পারে নি। মাইল তিনেক ভাঁটিতে এপারেই এসে ভিড়েছে। অল্প কিছুক্ষণ পরে শিয়াং তার সৈন্যদলকে নিয়ে ফিরে এলো। দশজন সাঁতারুর ভিতর সাতজন ওপারে পৌঁছেছিল, কিন্তু ভেলাটা নদী পার হতে না পারায় আবার ওরা সাঁতরে ফিরে এসেছে। হিসাব করে দেখা গেল একজন সাঁতারু নিরুদ্দেশ। সম্ভবত শীতে কিংবা পরিশ্রমে, অথবা গুলি খেয়ে সে ডুবে মারা গেছে।

সকলেরই মন ভেঙে গেছে। নয় জন সাঁতারুকে জামা পরিয়ে আগুনের ধারে বসানো হলো। আবার সংক্ষিপ্ত অধিবেশন বসল আমাদের। এখন কী করা যায়? গোটা বাহিনীর ভালোমন্দ নির্ভর করছে আজ রাত্রে আমাদের কয়জনের উপর!

কমাণ্ডার ইয়াং প্রশ্ন করেন, কটা ভেলা তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে?

: চারটে স্যার।

: তাহলে এবার একসঙ্গে চারটে ভেলাই রওনা হোক। সাঁতরে কেউ যাবে না, সবাই যাবে ভেলায়। প্রত্যেকটি ভেলায় এক-একটা মেশিনগান তুলে নাও। তিনটে ভেলা রওনা হবে আঘাটা থেকে আর চতুর্থটায় শিয়ান রওনা হবে পারানি ঘাট থেকে। ও ফায়ার করতে করতে যাবে। প্রত্যেক দলেই থাকবে টর্চ। ওপারে পৌঁছেই আলোয় সঙ্কেত পাঠাবে। কোনো প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন কিছুই নেই। বেশ বুঝতে পারছি, শিয়ানকে শিখণ্ডী খাড়া করে উনি বাকি তিনটে ভেলাকে গোপনে পার করাতে চান। আমাদের কোনো জিজ্ঞাস্য নেই শুনে কর্নেলইয়াং বলেন, প্রশ্ন তোমাদের থাকা উচিত ছিল। শিয়াং-এর লক্ষ্যস্থল কোন্‌টা? সেটা ওপার নয়, এই পার। তাকে মাঝ-নদী থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে। যাতে ওরা ভাবে—আমাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

ব্যাটেলিয়ান কমাণ্ডার সো-লিঙ্‌ তৎক্ষণাৎ সেই মতো ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। চারটি ভেলায় যাবে চারটি কোম্পানি কিন্তু ফোর্থ-কোম্পানির কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়া কোথায়? ও হো! তাকে তো আমরা ফেলে রেখে এসেছি সেই মন্দির চত্বরে—নার্স-লীকে পাহারা দিতে। একজন সংবাদবহকে পাঠানো হচ্ছিল, আমি বাধা দিলাম। পলিটিক্যাল কমিশার হিসাবে আমাকে বুঝে নিতে হবে, অধ্যাপক-মশাইয়ের খামখেয়ালিপনায় কতটা ক্ষতি হয়েছে!

কর্নেল ইয়াং আমার হাতে একটা টর্চ দিয়ে বললেন, বৃষ্টি থেমে গেছে, নার্স-লীকেও সঙ্গে করে নিয়ে এস। ম্যাপগুলো দরকার।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে সেই কন্‌ফুশিয়ান মন্দিরে চলে আসি। দৌড়ানোতে ভালোই হলো—শরীরটা গরম হয়ে উঠল। একটা কথা জানা হয় নি। যে ছেলেটা ডুবে মারা গেল সে কে? আশ্চর্য! কাউকেই সে প্রশ্ন করতে শুনলাম না। সবাই সংখ্যাতত্ত্বটা জেনেই মেনে নিল সবকিছু জানা হয়ে গেছে—দশজন গিয়েছিল, ন'জন ফিরেছে। ব্যস্‌! যেন যে ছেলেটা ফেরে নি সে কারও ভাই নয়, কারও সন্তান নয়, কারও ভালবাসার পাত্র নয়। একটা নম্বর মাত্র!

মন্দিরের কাছাকাছি এসে দেখি—একি! কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না! ঘন অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটা। ব্যাপার কি? ওরা গেল কোথায়? না, দরজাটা হাট করে খোলা। আমি সন্তর্পণে ঢুকে হাতের টর্চটা জ্বালি—আর তৎক্ষণাৎ যেন আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বিষাক্ত সাপ নেমে গেল।...

এক মিনিট অপেক্ষা করে আবার জ্বাললাম আলোটা। লী ততক্ষণে প্যান্টটা পরেছে। আমার দিকে পিছন ফিরে তার সার্টের বোতামগুলো আঁটছে। মাও চু-হুয়া উঠে এলো খড়ের বিছানা ছেড়ে। বেল্ট কষতে-কষতে নির্লজ্জের মতো এক গাল হেসে বললে, আচমকা অমন আলো জ্বালার আগে একটা গলা-খাঁকারি তো দেবে! কী ব্যাপার?

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বলি, আমার পিছন পিছন এস—

: কোন্‌ চুলোয়?

আর সহ্য হলো না আমার। তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলি, আমি দুঃখিত ক্যাপ্টেন মাও। এমন শীতের রাতে নারীদেহের উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে তোমাকে বঞ্চিত করলাম। কমাণ্ডার ইয়াং তোমাকে ডাকছেন—

: চল যাই। তবে তোমার দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই। আমিই বরং দুঃখিত কমরেড। তোমার হিংসে হওয়া স্বাভাবিক!

হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল যেন! পশুটা কী ভাবে? দুনিয়ার সবাই ওর মতো? দু-মাসও হয় নি বিবাহিত স্ত্রীকে ছেড়ে এসেছে। আর এর মধ্যেই তার কথা ভুলে বসে আছে! প্রথম সুযোগেই ভাব জমিয়েছে একটা পথ-কুক্কুরীর সঙ্গে। জৈবিক তাড়নায়—

আমি অস্ফুট গর্জন করে উঠি: ফোর্থ-কোম্পানি-কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মাও! তোমার স্পর্ধা সীমাহীন! তোমাকে হিংসা করব আমি? ঐ নষ্ট মেয়েমানুষটার জন্মে?

মাও চু-হুয়া থপ্ করে আমার হাতখানা চেপে ধরে। চাপা গর্জন করে ওঠে, সংযত ভাষায় কথা বল কমিশার ওয়াং। নার্স লী ফেং-ইয়াচ আমার স্ত্রী!

আমি অট্টহাস্য করে উঠি: বটে! বিনা মন্ত্রে, বিনা পুরোহিতে! আমি একশ' বার বলব—ঐ মেয়েটা বেশ্যা!

মাও আচমকা তার কোমরবন্ধ থেকে পিস্তলটা টেনে বার করে; কিন্তু বিদ্যুদ্-বেগে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লী। বললে, ছি ছি ছি! তোমরা একটা মেয়েমানুষকে উপলক্ষ্য করে এভাবে ঝগড়া করছ! তোমরা না রেড-আর্মির সৈনিক!

মাও কোমরবন্ধে তার পিস্তলটা পুরে ফেলে। আমারদি কে ফিরে বললে, ঠিক আছে! কমাণ্ডার ডেকেছেন! চল যাই। কিন্তু তোমার সঙ্গে ব্যাপারটার ফয়শালা বাকি থাকল কমিশার ওয়াং!

আমি বললাম, আলবাৎ! তোমার বিচারটা বাকি থাকল বৈকি! কমরেডদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে যে ব্যভিচারে মাতে—

লী এবার ওকে ছেড়ে আমাকে ধরে: কমরেড ওয়াং! আপনি বিশ্বাস করছেন না, ও আমার মরদ!

হেসে বলি, কেন করব না লী? সেটা তো স্বচক্ষেই দেখলাম! ও তোমার আজ রাতের মরদ!

·

রাত তিনটের সময় আবার রওনা হলো চারটে ভেলা। ঘন অন্ধকারে। পুব-

আকাশটা তখনও ফর্সা হতে শুরু করে নি। প্রথম কোম্পানির কমাণ্ডার শিয়ান শুরু থেকেই মেশিনগান চালালো। ওপার থেকে জবাবও পেল সে। বাকি তিনটি ভেলা নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওপারের দিকে। আধ ঘণ্টা বাদে পরিকল্পনা মতো শিয়ান ফিরে এলো বটে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সফল হলো না। বাকি দুটো ভেলাও ফিরে এলো সূর্যোদয় নাগাদ। ওপারে মাইলের পর মাইল অতন্দ্র প্রহরা। কোথাও নৌকা ভেড়াতে পারেনি কেউ। একমাত্র ফোর্থ কোম্পানির ভেলাটার কোনোও খবর নেই। ওপারে কোথাও নৌকা ভেড়াতে পারলে তারা নিশ্চয়ই আলোর সঙ্কেত পাঠাতো, এপারে ফিরে এলেও খবর পেতাম। দুটোর কোনোটাই হলো না। রক্তমাখা সূর্য সাদা হয়ে গেল। কলনাদিনী উ-নদীর কোন্ অতল গর্ভে অকথিত রয়ে গেল গোটা ফোর্থ-কোম্পানির শেষ ইতিহাস!

সারাটা দিনমান আমাদের প্রতীক্ষায় কাটল। চেন্‌তু আর ব্যাঘ্রশাবকের দল উজান-ভাঁটির আট-দশ মাইল ঘুরে এসেছে। ফোর্থ-কোম্পানির কোনো চিহ্ন নেই। না ভাঙা ভেলাটা, না কোনো সৈনিকের মৃতদেহ। শুধু একজন নিয়ে এলো লাল তারা আঁকা একটা টুপি। রেড-আর্মির। ঐটুকুই ফোর্থ-কোম্পানির শেষ চিহ্ন! বোঝা গেল ভেলা আর মৃতদেহ স্রোতের টানে ভেসে গেছে মোহনার দিকে।

শিবিরে নেমে এলো শোকের ছায়া। সো-লিঙ আর 'ঠিক আছে' বলছে না। কর্নেল ইয়াং কন্‌ফুশিয়াসের কোনো বাণী শোনাচ্ছেন না, সবচেয়ে করুণ অবস্থা নার্স-লীর। কাল রাতের মরদ আজ মুর্দা! সারাদিন মেয়েটা পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ালো। আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেছে। কাল মেয়েটাকে অনেকগুলো কটু কথা বলেছি। মেয়েটার কী দোষ? ঘর ছেড়ে পথে না নামলে অমন বর্ষণমুখর রাত্রে তো তার যৌবনকে উপভোগ করারই কথা। মাও চু-হুয়াকেই বা কেমন করে দোষী বলি? সে সৈনিক, তাই ক্ষণিকবাদী। কাল ছিল তার তাজা যৌবন। আজ পড়ে আছে তার নামের পাশে একটা ঢেড়া চিহ্ন! এই তো সৈনিকের জীবন! সে কী পারে তার ফেলে আসা স্ত্রীর স্মৃতি নিয়ে জীবনকে, যৌবনকে অস্বীকার করতে? বার বার মনে হচ্ছিল—লীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই। কিন্তু এসব ভাবালুতার সময়ই বা কোথায়? মাও চু-হুয়ার লড়াই শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কাজটা তো শেষ হয় নি। ওপারে যে যেতেই হবে। আজই!

সমস্ত দিনে আবার গোটা দুয়েক ভেলা তৈরি করলাম। আমাদের মূল বাহিনী আজ সারাদিনে নিশ্চয় আরও মাইল বিশ-ত্রিশ এগিয়ে এসেছে। আগামীকালই তারা পৌছাবে উ-নদীর ধারে—ম্যাপে-চিহ্নিত সেই 'গ'-পয়েন্টে! ফলে আজই ওপারে যেতে হবে আমাদের। অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠামাত্র আবার আমরা উপস্থিত

হলাম নদীতীরে। আবার রওনা হয়ে গেল তিনটি ভেলা—অটোমেটিক আর মৃত্যু মুঠোয় করে!

রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করছি। ভেলা তিনটে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গুঁড়ি মেরে বসে আছে ওরা রাইফেল্স উঁচিয়ে। ওপার নিস্তব্ধ। ভেলাটা মাঝ-গাঙ পর্যন্ত পৌঁছেছে কি পৌঁছায় নি ঠিক কালকের মতই ওপারে শত শত মশাল জ্বলে উঠল—এখানে-ওখানে। হঠাৎ ওপারের জঙ্গল ভেদ করে বার হয়ে এলো জনা-বিশেক রাইফেলধারী। শুয়ে পড়ল তারা বালিয়াড়ির উপর। জনা-চারেক সৈনিকের একটা স্কোয়াড উঁচু-টিলার উপর একটা কামান বসাতে শুরু করে।

তারপরেই মেশিনগানে একটা একটানা ক্রটাক্রট্‌ক্রট্‌!

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, ওপারে বালিয়াড়ির উপর শুয়ে রাইফেল-উঁচিয়ে শত্রুপক্ষীয় যারা অপেক্ষা করে দেখছিল ভেলাটা কতক্ষণে রেঞ্জের ভিতর আসে, তারা বালির উপর লুটোপুটি খাচ্ছে! এমন কি উঁচু টিলার উপর যারা কামানটাকে বসাচ্ছিল তারাও হতাহত হয়ে ছত্রভঙ্গ হলো। কী ব্যাপার! লোকগুলো কার নিশানা হয়েছে? ভেলা-তিনটে থেকে তো ফায়ারিং শুরুই হয় নি এখনও! কে মেশিনগান চালাচ্ছে? কোথা থেকে?

হঠাৎ দেখি দু-হাত শূন্যে তুলে কর্নেল ইয়াং চিৎকার করে ওঠেন: সাবাস! সাবাস, ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়া!

অনেক পরে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম আমরা। মাও চু-হুয়া কাল রাত্রেই ওপারে পৌঁছেছিল, কিন্তু আলোর সঙ্কেত জানাবার সুযোগ পায় নি। সারাটা দিন লুকিয়ে বসেছিল জঙ্গলে। সে জানত, আজ সন্ধ্যায় আমরা নিশ্চয় আবার নদী পার হবার চেষ্টা করব। সে বুঝেছিল, কোনো নাটকীয় মুহূর্তে সে যদি আজ সন্ধ্যায় ওপার থেকেই আক্রমণ চালায় তবে শত্রুপক্ষ ঘাবড়ে যাবে। সেই নাটকীয় মুহূর্তটি এসেছে এতক্ষণে। মর্মান্তিক মুহূর্তেই গর্জন করে উঠেছিল তার মেশিনগান, ওপার থেকেই। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। আর তাতেই কাজ হলো। শত্রুরা নদীতীরের অবরোধ ফেলে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো। ঠিক সেই সময়েই আমাদের ভেলাগুলো ভিড়ল ওপারে।

আমরা সদলবলে এপারে এসে দেখি ইতিমধ্যে জনা-পনের কুয়োমিনতাঙ সৈন্য বন্দী হয়েছে। তাদের পরিধানে হো চিন-তান-বাহিনীর পোশাক। তাদের রাইফেল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দীরা—সামনে আমাদের মেশিনগানধারী। কমাণ্ডার সো-লিঙ ছিল আমার পাশে। একেবারে জড়িয়ে ধরল মাও চু-হুয়াকে। আমার কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল। তবু শুধু সৌজন্যের খাতিরে

আন্তরিকতার সঙ্গে তার করমর্দন করলাম। লক্ষ্য করে দেখি, ওর ডান-কনুই-এর কাছে অনেকটা কেটে গেছে। রক্তের ছোপ লেগেছে জামায়। বললাম, লেগেছে নাকি?

হেসে বললে, ও কিছু নয়। লী কোথায়?

হয়তো নেহাৎ মামুলী প্রশ্ন, অথবা হয়ত তার আহত হাতটা ড্রেস করাতে চায়। তবু আমার মনে হলো সে ইচ্ছা করেই এত লোক থাকতে আমাকেই প্রশ্নটা করল! মনে পড়ে গেল, তার গতরাত্রের উক্তি: তোমার হিংসে হওয়া স্বাভাবিক!

ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল আমার—কাল শেষ রাত্রে লীকে স্বপ্ন দেখেছি! নার্স-লীকে নয়, নিরাবরণা-লীকে—ঠিক যেমনভাবে কাল টর্চের চকিত আলোয়—

আমার জবাব দিতে দেরি হয়ে গেল। সো-লিঙ বললে, আসছে পরের নৌকায়।

ইতিমধ্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার এসে হাজির। প্রথমেই জড়িয়ে ধরলেন মাওকে। তারপর বন্দীদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কমাণ্ডিং অফিসার কে?

সার-বাঁধা বন্দীদল থেকে একটা লোক এক-পা এগিয়ে এলো। বললে, আমি। হোয়াং-চু-কুয়াং।

: হোয়াঙ? তুমি তো তাহলে হুনানের লোক। বাড়ি কোন্ গাঁয়ে?

: ৎসুনিতেই আমার বাড়ি।

: কুয়োমিনতাঙে নাম লিখিয়েছিলে কেন? চীন দেশটাকে রসাতলে পাঠাতে?

: আমি জেনারালাসিমোর বাহিনীর লোক নই। আমি এই ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডার, আমাদের জেনারেল হচ্ছেন হো চি-তান!

: বুঝলাম! কিন্তু হো চি-তান তো দস্যু-সর্দার। তার বাহিনীতেই বা নাম লিখিয়েছিলে কেন?

: না হলে খাব কি?

কর্নেল ইয়াং-এর অসীম ধৈর্য। ধীরে ধীরে তিনি বুঝিয়ে দিলেন—আমরা কী চাই, কেন লড়ছি। লোকটা স্বীকার করল—জাপানকে সে শত্রু মনে করে, দেশকে সে ভালোবাসে আর জমিদার-জোতদার-ট্যাক্স কলেক্টারগুলোর উচ্ছেদ হলে সে খুশী হবে। আরও দশ মিনিট অধ্যাপক মশায়ের সঙ্গে পলিটিক্যাল-ফিলজফি আলোচনা-অন্তে লোকটা স্বীকার করল যে, আমরা যদি ওদের প্রাণে না মারি তাহলে ওরা আমাদের দলে যোগ দেবে।

কর্নেল বললেন, আমরা কিন্তু মাইনে দেব না, খেতে দেব। আমরা গ্রামও লুট করি না, ফলে লুটের ভাগও পাবে না। কী? রাজী আছ?

লোকটা বললে, প্রাণে তো বাঁচব ?

: তা বাঁচবে। শুধু তাই নয়, আমাদের লড়াই ক'তে হলে—চাষ করার জমি পাবে, ঘর পাবে, স্বাধীন হয়ে বাঁচবার অধিকার পাবে।

ওরা এক কথায় রাজী।

ওদের রাইফেল তা বলে ফেরত দেওয়া হলো না। এখনও আমরা ওদের ঠিক মতো বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। আমরা ওদের সঙ্গে পোশাক বদল করলাম। একমাত্র ওদের ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার হোয়াঙ থাকল তার নিজের ইউনিফর্মে। তাকে দলপতি করে আমাদের সৈন্যরা তখনই ছুটল ৎসুনির দিকে। রাত তখন প্রায় দশটা। আবার টিপি টিপি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পথ কর্দমাক্ত। হাঁটু পর্যন্ত কাদায় বসে যাচ্ছে কখনও কখনও। হোয়াঙকে সামনে রেখে আমরা জনা-পঞ্চাশ ডবল মার্চ করে এগিয়ে যেতে থাকি। প্রায় পাঁচশ গজ পিছনে মেশিনগান আর ভারী মর্টার নিয়ে বাকি সৈন্য আসছে।

ঘণ্টা-দুয়েক জলকাদা ভেঙে আমরা এসে পৌছলাম একটা বড় মাঠের প্রান্তে। মাঠের ও-প্রান্তে এতক্ষণে সারি সারি আলো জ্বলতে দেখা গেল। বন্দী সর্দার হোয়াঙ বললে, ওটাই ৎসুনি। শহরের উত্তর দিকে পরিখা কাটা আছে। তারপর পাঁচিল। তাতে প্রকাণ্ড গেট। গোটা শহরটা ঐ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কয়েক শ' বছরের পুরানো দেওয়াল। ঐ পাঁচিল-ঘেরা শহরের কেন্দ্রস্থলে হো চি-তান-এর দুর্গ।

পরিকল্পনা মতো আমরা হঠাৎ মাঠের এ প্রান্ত থেকে ঐ ফটকটা লক্ষ্য করে ছুটতে থাকি। সামনে হোয়াঙ। নিরস্ত্র সে। পিছনে পিছনে আমাদের সব বাছা বাছা সৈন্য। সকলেরই পোশাক বন্দী সৈন্যদলের। ফটকটার কাছাকাছি আসতেই ফটকের উপর থেকে প্রহরী হাঁক পাড়ে : খবর্দার ! কে যায় ?

রাইফেল ক্লিক্ করার শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল।

হোয়াঙ চিৎকার করে ওঠে : ফ্রেণ্ডস্ ! ফার্স্ট ব্যাটালিয়ান ! উ-ইউনিট।

উপর থেকে যেন দৈববাণী হলো—হল্ট! আর এক-পা এগিয়ে এলে ফায়ার করব।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি তৎক্ষণাৎ। লোহার গজাল-আঁটা প্রকাণ্ড রুদ্ধ-সিংহদ্বার থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত তফাতে।

: কোন্ কোম্পানি ?—প্রশ্ন হলো অন্ধকারের মধ্যে।

: দু-নম্বর কোম্পানি—

: তোমাদের কোম্পানি-লীডার কে ? কী নাম ?

: কোম্পানি-লীডার মারা পড়েছে। আমি গোটা ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ডার হোয়াঙ

চু-হুয়াঙ! লালফৌজের একটা কোম্পানি নদী পার হচ্ছে। আরও ফোর্স চাই—শিগ্‌গির দরজা খুলে দাও—জেনারেল লিঙকে খবর দিতে হবে।

মনে হলো উপরের প্রহরী কার সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলছে। কিন্তু সময় দিতে চাই না আমরা—তাই পূর্বনির্দেশ মতো সবাই একসঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিই—দরজা খুলে দাও! ডাকাতগুলো এখনই এসে পড়বে!

: চুপ কর্! কাপুরুষ! ভেড়ুয়ার দল!—এবার ভারী গলায় কে যেন ধমক দিয়ে ওঠে। মনে হলো কোনো অফিসার। একটা মশাল জ্বলে উঠল সিং-দরজার উপরে। অফিসার বললে, কাছে এগিয়ে আয় ভেড়ার দল! মাথার উপর হাত তুলে।

আমরা জনা-বিশেক লোক এগিয়ে গেলাম হোয়াঙকে সামনে নিয়ে। মশালের আলোয় আমাদের ইউনিফর্ম দেখে নিয়ে লোকটা বললে : দরজা খুলে দাও!

অর্গল-মোচনের শব্দ হলো। মুখব্যাদান করল বিশালকায় সিংহদ্বার। হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লাম আমরা। অফিসার মশাল হাতে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। বললে, শেয়ালের মতো চেঁচাচ্ছিলি কেন? যুদ্ধ করে মরতে পারলি না?

সবার সামনে ছিল আমাদের সেকেণ্ড কোম্পানির কমাণ্ডার লিয়াও তা-চু। বললে, কী করব স্যার? ওরা যে ভেলায় করে এ পারে চলে এলো!

লোকটা মশাল হাতে এতক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সমতলে। মুখ ভেংচে বলে ওঠে—লজ্জা করে না! বে-জন্মা, ভেড়ুয়ার দল! সব কটার কোর্ট-মার্শাল হবে!

লিয়াও আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সিং-দরজার উপর থেকে প্রহরীটা হেঁকে ওঠে : খবর্দার! তোমরা কে?

এতক্ষণে মাঠ ভেঙে পিল পিল করে আমাদের বাকি লোকজন ছুটে আসছে।

অফিসার, হোয়াঙকে বলেন, ওরা কারা? তোমার ব্যাটেলিয়ান?

সো-লিঙ পিস্তলের নলটা ওর তলপেটে চেপে ধরে বলে, না! সব আমার ব্যাটেলিয়ান! অস্ত্র সমর্পণ কর! আমরা পিপ্‌লস্ লিবারেশন আর্মি!

উপরের প্রহরী তার রাইফেলটা তাক্ করবার উপক্রম করতেই লিয়াও-এর বন্দুক একটা প্রতিবাদ জানালো। পাকা ন্যাসপাতির মতো প্রহরীটা টুপ করে ঝরে পড়ল।

সিং-দরজায় ছিল ছয় জন প্রহরী। একজন প্রাণ দিল, বাকি আত্মসমর্পণ করল বিনা যুদ্ধে। ততক্ষণে খোলা দরজা দিয়ে আমাদের গোটা ব্যাটালিয়ান শহরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এখানে ওখানে কামান সাজাচ্ছে। শুনিতে হো চিন-তান-এর মাত্র শ-পাঁচেক সৈন্য ছিল। আর সব ছিল বিভিন্ন রণক্ষেত্রে। এমন সুরক্ষিত শহরে সৈন্য রাখার প্রয়োজনই নেই—এই কথাই বোধহয় ভেবেছিল দস্যু-সর্দার। ঐ পাঁচশ' সৈন্যের শতখানেক পালিয়ে গেল কোনোও চোরা পথে; বাকি চারশ' গ্রেপ্তার

হলো। হাতে এলো তিন চারশ' রাইফেল। দস্যু-সর্দার হো চিন-তানকে আমরা ধরতে পারি নি। শহরের গলিঘুঁজি আমরা চিনতাম না, না হলে তাড়া করে তাকে ধরা যেত। ওরা বস্তুত কোনো যুদ্ধই দিতে পারে নি। বেচারিরা নিশ্চিন্ত নিদ্রা ভেঙে তৈরি হবার আগেই আমাদের হাতে বন্দী হলো। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি নিতান্ত সামান্য। দুজন মাত্র আহত হয়েছে। ওদের জনা দশেক আহত আর তিনজন প্রতিরোধে প্রাণ দিয়েছে। রাত বারোটার সময় শহর আমাদের সম্পূর্ণ দখলে এলো।[৯]

শহরের কেন্দ্রস্থলে হো চিন-তানের প্রাসাদ। সামনে প্রকাণ্ড ময়দান। সেই প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে সেনাপতি শহরবাসীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ঘোষণা করলেন: আমি রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার কর্নেল ইয়াং তে চু, কম্যুনিস্ট-পার্টির পিপলস্ লিবারেশান আর্মির কমাণ্ডার-ইন-চীফের তরফে ঘোষণা করছি এই শহর এই মুহূর্তে মুক্ত হলো! শহরবাসী নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আমার বাহিনীর লোকেরা শহরবাসীকে কোনো ভাবেই উৎপীড়ন করবে না। কেউ কোনোভাবে উৎপীড়িত হলে আমার কাছে সরাসরি দরবার করবেন। রাত পোহালে দোকান-পাট খুলতে কোনো অসুবিধা নেই। আমার সৈন্য-বাহিনী শান্তি রক্ষা করবে। আমার সৈন্যদলের কেউ কিছু খরিদ করলে সে ন্যায্য দাম দেবে।

সে ঘোষণা কেউ শুনল কি না জানি না। কোথাও কোনো সাড়া জাগল না। তা না জাগুক, ওরা অজান্তেই মুক্ত হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদে আমরা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি সবাই। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আমাদের সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় বসেছে। আমাদের কারও খাওয়া জোটে নি সারা দিনে। কিছু লোক গেল বাজারের সন্ধানে। ঘুম থেকে তুলে ওদের দিয়ে দোকান খোলাতে। ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা বাজে। ভীষণ খিদে পেয়েছিল আমার। কর্নেল ইয়াং রাজপ্রাসাদের একটা ডিভানে চিৎ হয়ে পড়লেন। আহত ঠ্যাঙটা থেকে জুতোটা খুলে হাত বুলোতে থাকেন। আমি এসে বসলাম তাঁর পাশে। উনি বলেন, ওয়াং, আমি বরং একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল সকাল ছয়টায় এখানে একটি জরুরী মিটিং বসবে। সবাইকে খবরটা দিয়ে দিও।

আমি জবাব দেবার আগেই ওপাশ থেকে কে যেন বলে ওঠে, ঘুমাবেন কি? এখন যে আপনার পায়ে ওষুধ মালিশ করতে হবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি কখন নিঃশব্দে লী এসে দাঁড়িয়েছে।

কর্নেল বলেন, প্লীজ! আজ রাত্রের জন্য আমাকে রেহাই দাও। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার। মাও চু-হুয়া কোথায়?

লী বললে, কী জানি।

ব্যাঘ্রশাবক ছিল কাছেই। বললে, এখনই ডেকে আনছি কমরেড-স্যার।

পাঁচমিনিটের ভিতরেই চতুর্থ কোম্পানির কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়াকে বন্দী করে এনে হাজির করল।

কর্নেল ইয়াং বলেন, তুমি আমার একটা উপকার করবে ক্যাপ্টেন মাও?

: বলুন স্যার?—ঝুঁকে পড়ে মাও!

: নার্স লীর কাছে আত্মসমর্পণ কর। আমার পরিবর্তে!—তারপর লীর দিকে ফিরে বলেন, অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি ওর বাঁ কনুই থেকে রক্তপাত হচ্ছে।

লী এগিয়ে এসে ওর হাতটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল। আঘাত মারাত্মক নয়। কর্নেল ইয়াং-এর দিকে ফিরে বলল, বেশ, আজ রাতের মতো ছেড়ে দিলাম। কাল সকালে কিন্তু লক্ষ্মী ছেলের মতো একঘণ্টা আমাকে মালিশ করতে দিতে হবে।

কর্নেল ইয়াং হেসে ওঠেন, বলেন, কী পাগল মেয়ে গো তুমি! কনফুশিয়াস্ কি বলেছেন জান? বলেছেন, 'যে নারী স্বামী-সেবায় অবহেলা করে পরপুরুষের…'

কথাটা শেষ হয় না। তার আগেই আমি বলে উঠি, মানে? কে ওর স্বামী?

কর্নেল অবাক হয়ে বলেন, যার ভাঙা হাতে ওকে সমর্পণ করে অব্যাহতি পেলাম। মাও চু-হুয়া! কেন? তুমি জানতে না ওরা স্বামী-স্ত্রী!

আমি বজ্রাহত! বলি…কিন্তু ক্যাপ্টেন মাওয়ের স্ত্রী তো লঙ্ মার্চে যোগদানের অনুমতি পান নি, মানে…

কর্নেল হেসে বলেন, জানি! তুমিই অনুমতি দাও নি! লী তোমার অনুমতি-সাপেক্ষে ক্যাপ্টেন মাও-য়ের স্ত্রী হিসাবে আসে নি। এসেছে নিজের অধিকারে। নার্স হিসাবে। ডাক্তার নেলসন ফু ওকে নির্বাচন করেছেন। আশ্চর্য! তুমি পলিটিক্যাল কমিশার, এতবড় খবরটা রাখ না?

মাও চু-হুয়া বললে, আমার কিন্তু দোষ নেই স্যার, আমি বারে বারে ওঁকে বলতে চেয়েছি—উনি আমার স্ত্রীর বিষয়ে কোনো আলোচনা করতে রাজী হন নি।

আমি উঠে দাঁড়াই! মাও চু-হুয়ার হাতখানা টেনে নিয়ে বলি, কমরেড! আমাদের একটা বোঝাপড়া হওয়া বাকি ছিল। সেটা এখনই শেষ হওয়া ভালো। আমি আমার অশোভন আচরণের জন্য তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি অনুতপ্ত!

মাও চু-হুয়া চিৎকার করে ওঠে। উঃ! ছাড় ছাড়! ঐ হাতটাতেই আমার ব্যথা!

আমি হাতটা ঝাঁকিয়ে বলি—বল, আমাকে ক্ষমা করেছ?

হঠাৎ অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন কর্নেল ইয়াং। বলেন, তুমি যে জেনারালাসিমো চিয়াং স্ত সেকেণ্ড হয়ে উঠলে ওয়াং! এ্যাঁ! হাত মুচড়ে দিয়ে বন্ধুত্ব আদায়?

আমি সলজ্জে ওর হাতটা ছেড়ে দিই।

লী খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে।

দশম পরিচ্ছেদ

লোলোদের দেশে

[জানুয়ারী-১৯৩৫—মে-১৯৩৫]

"ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়ার স্মৃতিচারণ"

এপ্রিল মাসে আমরা মহাচীনের বৃহত্তম নদী 'ইয়াংসি' অতিক্রম করলাম।

চীনা ভাষায় 'কিয়াং' মানে নদী, 'হো' মানেও নদী। তাই এদেশের বৃহত্তম দুটি নদীর নাম 'ইয়াংসি' এবং 'হোয়াং' হলেও আপনারা ছেলেবয়সে ভূগোল বইতে পড়েছেন 'ইয়াংসি কিয়াং' নদী এবং 'হোয়াং হো' নদী। সেটা এ. সি. কারেন্ট বা ডি. সি. কারেন্টের মতো পুনরুক্তি দোষ-দুষ্ট। এপ্রিল মাসে চৌপিং ফোর্ট-এর কাছাকাছি আমাদের ফার্স্ট আর্মি যখন ইয়াংসি নদী অতিক্রম করল তখন আমাদের বাহিনীর ইতিহাসকার—ৎসু সেন-চিন তার দিন পঞ্জিকায় লিখেছিলেন—"আজ লঙ্ মার্চের সবচেয়ে বড় বাধা আমরা অতিক্রম করলাম।" ৎসু সেন-চিন পরে আমাকে বলেছিলেন—"ভুল লিখেছিলাম সেদিন। বিশাল ইয়াংসি কিয়াং দুরতিক্রম্যতায় তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল ছোট পাহাড়ে নদী তাতুর কাছে। বস্তুত মানুষ শুধু বর্তমান নিয়েই বাঁচে—তাই প্রতি পদক্ষেপে মনে হয় সামনের পদক্ষেপটাই বুঝি সবচেয়ে বড় বাধা। সত্যিকথা বলতে কি—লোলোদের দেশে তাতু নদীর তীরে, লুটিন সাঁকোতে, তারপরে তুষারাবৃত পর্বতে কিংবা সেচুয়ান সীমান্তের জলাভূমিতে যে সব বিপদের সম্মুখীন হয়েছি চীনের বৃহত্তম নদী ইয়াংসির বাধা তার তুলনায়—নস্যি!"

ৎসুনি শহরের পতন থেকে ইয়াংসি নদী অতিক্রম—কালের মাপে চারমাস, ভূগোলের মাপে আটশ' মাইল, মৃত্যুর মাপে বিশ হাজার প্রাণ! কত ঘটনা ঘটে গেল এই চার মাসে—সব কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলার অবকাশ কোথায়? তবু কালানুক্রমিকভাবে গল্পটার ধরতাই যাতে আপনারা ধরতে পারেন তাই উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার কথা সংক্ষেপে প্রথমে বলে নিই—প্রথমত ৎসুনিতে পলিটব্যুরোর ঐতিহাসিক অধিবেশন—ঐতিহাসিক এ জন্য যে, এই অধিবেশনেই মাও ৎসে-তুঙ চীনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা বলে স্বীকৃত হলেন, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই চল্লিশ বছর তিনি ঐ পদেই অধিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত কমরেড চ্যাঙ সাঙ-চির আত্মদান, তারপর আমাদের ইয়াংসি অতিক্রম এবং লোলো-রাজ্যে আমার স্ত্রী নার্স লী ফেঙ

লিয়েনের অপহরণ। লোলোরাজ্যে আদিবাসী ঈ-দের বাস। তারা হানদের, অর্থাৎ চীনাদের চিরকাল শত্রু মনে করে এসেছে। ওরাও চীনা, কিন্তু ওরা নিজেদের তা মনে করত না। আপনাদের ভারতবর্ষে যেমন নাগারা আছে আর কি! ঐ আদিবাসী রাজ্যের ভিতর দিয়ে যখন লালফৌজ যেতে থাকে তখন একদল লোলো রাত্রের অন্ধকারে আমার স্ত্রী লীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেই কাহিনীই শোনাব আপনাদের :

আমরা ৎস্যুনি দখল করেছিলাম জানুয়ারীর প্রথম দিকে। সে-গল্প আপনারা কমরেড ওয়াং চি-চুর মুখে শুনেছেন। ওয়াং ছিল আমাদের পলিটিক্যাল কমিশার। বেচারি জানত না যে, লী হচ্ছে আমারই স্ত্রী। অহেতুক কতকগুলো অপমানকর কটু কথা সে একদিন বলেছিল আমাকে, এবং আমার স্ত্রীকে। একরাত্রে সে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পেয়ে ক্ষেপে উঠেছিল। সে যাই হোক, ব্যাপারটা জানতে পেয়ে সে আমাদের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করে—আমরাও ঝগড়া বিবাদ ভুলে বন্ধুত্ব পাতাই। শুধু তাই নয়, এরপর থেকে পলিটিক্যাল কমিশার আমাদের দুজনকে একঘরে রাত্রিবাস করার সুযোগ করে দেবার নানান ফন্দি-ফিকির বার করেছেন, এ-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব! এটা তাঁর বদান্যতা, কারণ আইন-মোতাবেক দু-জনের দু-জায়গায় রাত্রিবাস করার কথা।

আমরা ৎস্যুনি দখল করার এক সপ্তাহের মধ্যেই মূলবাহিনী ওখানে এসে উপস্থিত হয়। সেখানেই বসেছিল পলিটব্যুরোর ঐতিহাসিক অধিবেশন। পলিটব্যুরোর কয়েকজন ক্ষমতাশালী সদস্য অবশ্য এ অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি। তাঁরা ছিলেন বহু দূর দূর দেশে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ওয়াং মিং ছিলেন মস্কোতে, শিয়াং ইন ছিলেন কিয়াংসিতে, আর লিউ সাও-চি কুয়োমিনতাঙের ভিতর গোপন প্রচার কার্যে নিরত। ওঁরা লঙ্-মার্চে অংশ গ্রহণ করেন নি। ৎস্যুনি অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন : লো ফু (আসল নাম চ্যাঙ ওয়েন-তিয়েন), চৌ এন-লাই, সর্বাধিনায়ক চু-তে, লিয়াং পো-তাই, সেক্রেটারি-জেনারেল পো কু (আসল নাম চিঙ প্যাঙ-সিয়েঙ), লী তে এবং মাও ৎসে-তুঙ। মাও ৎসে-তুঙ ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন ; এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে আত্মসমীক্ষা করতে বসে অন্যান্য সদস্যরা নিজ নিজ ভুলত্রুটি স্বীকার করলেন। মাও ৎসে-তুঙ-এর নেতৃত্ব স্বীকৃত হলো।

জানুয়ারী মাসে ইয়াংসি-নদীর দক্ষিণ পারে আমাদের সেনাবাহিনী কয়েকটি রণাঙ্গণে জয়ী হলো। চিয়াঙের সৈন্যদল নদী পার হয়ে উত্তর তীরে চলে গেল। উইসিন থেকে সুংখান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাটা আমাদের দখলে এলো। কিন্তু তবু কিছুতেই

আমরা সেখানে ইয়াংসি-নদী অতিক্রম করতে পারলাম'না। অগত্যা স্থির হলো, মূল লালফৌজ-বাহিনী প্রথমে যাবে দক্ষিণ মুখো, পরে পশ্চিমে—অর্থাৎ অনেকটা উজানে গিয়ে পার্বত্য-অঞ্চলে পার হবে ইয়াংসি-নদী। কিন্তু যে মুহূর্তে চিয়াঙ-এর সেনাপতি টের পাবে আমরা পশ্চাদপসরণ করছি অমনি ওরা দলে দলে নদী পার হয়ে আবার চলে আসবে এ পারে, তাড়া করবে আমাদের পিছন থেকে। তাই এখানে একটি মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হলো লালফৌজের নেতাকে। একটিমাত্র কোম্পানিকে পিছনে ফেলে আমরা স্থানত্যাগ করব। সেই পরিত্যক্ত কোম্পানির কাজ হবে ভান করে যাওয়া—তারা দিবারাত্র বারে বারে উইমিন থেকে স্যুংখ্যান পর্যন্ত নদী-কিনার ধরে মার্চ করবে। যাতে ওপারে যারা দূরবীনে চোখ লাগিয়ে বসে আছে তারা যেন ভাবে আমরা এ-পারেই আছি। এ চালাকিটা যে বেশিদিন চালানো যাবে না, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। চিয়াঙের বিমান বাহিনী নিশ্চয় কিছু দিনের মধ্যে ধরে ফেলবে সে চালাকি—বুঝে ফেলবে, নদীর এপারে মূল বাহিনী নেই। জনাকতক ফন্দিবাজ শুধু নদীপারে কুমিরের এক ছানাকেই দশখানা করে দেখাচ্ছে! সেদিন ওরা সদল-বলে নদী পার হবে! ঐ একটি মাত্র কোম্পানিকে প্রাণ দিয়ে এ প্রতারণার মূল্য দিতে হবে! কোন্ কোম্পানি এ-কাজের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে তা স্থির হবার আগেই তার নামকরণ হয়েছিল : সুইসাইড স্কোয়াড!

সেই আত্মঘাতী কোম্পানিটি চিহ্নিত কববার উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারীর প্রথমে এক-দিন রেজিমেন্টাল কমাণ্ডার কর্নেল ইয়াং তে-চু আমাদের ডেকে পাঠালেন। সেই সংক্ষিপ্ত অধিবেশনটির কথা আমি জীবনে ভুলব না। ঐদিন অধিবেশনে যোগ দিতে যাবার আগে লী একেবারে ভেঙে পড়েছিল। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে বলেছিল, শেষ পর্যন্ত যদি—

কথাটা সে শেষ করতে পারে নি। আমি ওর মুখখানা দু-হাতে তুলে ধরে বলে-ছিলাম, সেজন্য কাঁদছ কেন লী? সে তো আমার পরম সৌভাগ্য! যদি পার্টির নির্দেশে আমিই নির্বাচিত হই তবে আমিই থেকে যাব পিছনে।

ও চোখের জল মুছে বলেছিল, না, কাঁদব না—কিন্তু ডক্টর ফু-র কাছে আমি দরবার করব, সে-ক্ষেত্রে আমাকেও যেন তোমার কোম্পানির সঙ্গে ছেড়ে যাওয়া হয়। আমি শুধু এই কোম্পানির নার্সিং করব।

হেসে বলেছিলাম, সেন্টিমেন্টের স্থান যুদ্ধক্ষেত্র নয়, লী! যে দেড়-দু'শ সৈনিক এই 'সুইসাইড-কোম্পানি'তে নির্বাচিত হবে, তাদের জীবনের মেয়াদ আর কদিন? বড় জোর তিন সপ্তাহ! তাদের শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে রাখার কোনো অর্থ হয়? এদের মধ্যে যে কজনকে তুমি নার্সিং করে বাঁচিয়ে তুলবে তারা তো খাড়া হয়ে দাঁড়াবে

শুধু ওদের ফায়ারিং-স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে। তার চেয়ে তোমাকে মূল বাহিনীর অনেক বেশি প্রয়োজন। তুমি কেন থেকে যাবে আমার সঙ্গে?

: কিন্তু—

: কোনোও 'কিন্তু' নেই লী! আর তাছাড়া এখনই ধরে নিচ্ছ কেন যে, আমার এই চতুর্থ কোম্পানিই নির্বাচিত হবে?

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করছেন ফার্স্ট-আর্মির পলিটিক্যাল-কমিশর স্বয়ং কমরেড নৈ জুং-চ্যাঙ। তাঁর পাশেই বসে আছেন ফার্স্ট-আর্মির কমাণ্ডার-ইন-চীফ লিন পিয়াও। দু-জনে প্রায় সমবয়সী। উপস্থিত ছিলেন আমাদের রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার কর্নেল ইয়াং তে-চু। কথায় কথায় তিনি রসিকতা করেন, আর চীনা ক্লাসিকাল-সাহিত্যের উদ্ধৃতি শোনান। সেদিন কিন্তু তাঁর কথায় রসিকতার বাষ্পমাত্র ছিল না। উপস্থিত আছেন আমাদের ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার সো-লিঙ। তিনিও নীরব।

সভাপতির নির্দেশে সামরিক পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন কর্নেল ইয়াং। বললেন, কমরেডস্! তোমরা জান, কেন এখানে আমরা সমবেত হয়েছি। একটি কোম্পানিকে শহীদ হবার সুযোগ দিয়ে গোটা ফার্স্ট রুট-আর্মি কাল থেকে দক্ষিণে সরে যেতে শুরু করবে। পলিটব্যুরো এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং পলিটিক্যাল কমিশার কমরেড নৈ জুং-চ্যাঙ জানিয়েছেন যে, আমাদের রেজিমেণ্ট থেকেই একটি কোম্পানিকে নির্বাচন করা হবে। আমার অধীনে যে-কয়টি ব্যাটালিয়ান আছে তার ভিতর আমি কমরেড সো-লিঙ-এর ব্যাটালিয়ান থেকেই একটি কোম্পানিকে বেছে নিতে চাই। আমি মেজর সো-লিঙকে অনুরোধ করছি, সে নির্বাচন করে বলে দিক: কোন্ কোম্পানিকে সে এই দায়িত্ব দিতে চায়।

ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার সো-লিঙ উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের পাঁচটি কোম্পানির কমাণ্ডারের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমরা পাঁচজনেই বসে আছি পাশাপাশি—শিয়ান, লিয়াও, আমি, চ্যাঙ এবং ক্যাপ্টেন তান্। দাঁতে দাঁত চেপে আমরা প্রহর গুনছি। মেজর সো-লিঙ মনস্থির করতে পারলেন না। ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্নেল ইয়াংকে বললেন, আমি মনে করি এ-ক্ষেত্রে লটারি করাই সমীচীন।

সভাপতি কমরেড নৈ জুঙ-চ্যাঙ বলেন, অগত্যা! আশা করি লটারির ব্যবস্থায় কারও কোনোও আপত্তি নেই?

কি জানি কেন, হঠাৎ আমি দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, কমরেড কমিশার, আপনি যখন প্রশ্ন তুলেছেন, তখন জানাচ্ছি—এ ব্যবস্থায় আমার আপত্তি আছে।

: আপত্তি আছে? লটারি করায়? কেন?

: লটারি করে যদি নির্বাচন করা হয়, তবে ইতিহাস সেই কোম্পানিকে 'শহীদ' বলে স্বীকার করবে না! বলবে—ওরা আদেশ তামিল করেছিল মাত্র! আমি আমার কোম্পানির পক্ষ থেকে বলছি : লটারি করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা এ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছি।

ফার্স্ট আর্মির কমাণ্ডার-ইন চীফ লিন পিয়াও একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন : শাবাস!

মেজর সো-লিঙ বললেন, ঠিক আছে। তাহলে সেই সিদ্ধান্তই হলো। ফোর্থ কোম্পানির কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়া…

হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল চ্যাঙ সাও চি—তৃতীয় কোম্পানির কমাণ্ডার। বছর চব্বিশ বয়স তার। জেনারেল চু-তের সঙ্গে আছে কৈশোর থেকে। দুর্দান্ত বেপরোয়া—কিন্তু কথা বলে কম। আজ সে কথা বলল। বলল—মাপ করবেন, আমার একটা কথা বলার আছে—

: বল?—সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন কর্নেল ইয়াং।

: আমার কোম্পানির তরফ থেকে বলছি, আমরাও এ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।

কর্নেল কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হলো না—একই সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো আরও তিন জন : শিয়ান শান-লিঙ, লিয়াও তা-চু এবং ক্যাপ্টেন শিয়াও। অবশিষ্ট তিনটি কোম্পানির তিনজন অধিনায়ক। একই বক্তব্য তাদের—তারাও এ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত : রেড-আর্মিকে প্রাণদানের পরিবর্তে তারা স্বেচ্ছায় আত্মবল দিতে চায়।

পলিটিক্যাল কমিশার ওয়াং বলেন, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম অগত্যা সেখানেই ফিরে এসেছি আমরা। বাধ্য হয়ে তাহলে লটারিই করতে হচ্ছে—

টেবিলের উপর প্রচণ্ড এক মুষ্টাঘাত করেন রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার কর্নেল ইয়াং। বলেন না! কী বকছ পাগলের মতো! আমরা মোটেই একস্থানে ফিরে আসিনি!

: আসিনি? সেই লটারিই তো করতে হচ্ছে?—ওয়াং প্রশ্ন করেন বিস্মিত হয়ে।

: তা হচ্ছে—বললেন দর্শনের অধ্যাপক কর্নেল ইয়াং—কিন্তু দক্ষিণ মেরুর পরিবর্তে আমরা বর্তমানে উত্তর-মেরুতে এসে পৌঁছেছি! থার্মোমিটারে শীতাঙ্কের তাপমাত্রা একই হতে পারে, কিন্তু এটা পৃথিবীর অপর প্রান্ত! সেবার যে-কারণে লটারি হচ্ছিল ঠিক তার বিপরীত কারণে এবার লটারি করতে হচ্ছে। সেটা নজরে পড়ল না তোমার?

ফার্স্ট আর্মির কমাণ্ডার-ইন-চীফ, কমরেড লিন পিয়াও সংক্ষেপে বললেন : ঠিক কথা।

অগত্যা লটারিই করতে হলো। চোখ বুজে আমরা তুললাম টুপির ভিতর থেকে ভাঁজ করা কাগজ। আমরা পাঁচজনেই। নির্বাচিত হলো—তৃতীয় কোম্পানির কমাণ্ডার চ্যাঙ লাও-চি! চব্বিশ বছরের প্রাণবন্ত সৈনিক। আমরা তাকে অভিনন্দন জানালাম। ম্লান হাসলে চ্যাঙ। এক এক আমাদের সঙ্গে করমর্দন করল। ফার্স্ট-আর্মির সুপ্রীম কমাণ্ডার লিন পিয়াও ওকে বুকে টেনে বললেন, সমস্ত বাহিনীর হয়ে তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ফার্স্ট-আর্মির পলিটিক্যাল কমিশার নৈ জুং-চ্যাঙ ওকে নানান উপদেশ দিলেন। কী কী তার করণীয়। কী-ভাবে সে ওপারের শত্রু-বাহিনীকে প্রতারিত করবে। আমাদের পশ্চাদপসরণ শুরু হবে আজ ভোর রাত থেকেই। ওকে ক্রমাগত নদীর এপারে ভেলা বাঁধার আয়োজন করতে হবে। নদীর ধার বরাবর দশ-বারো মাইল দৈর্ঘ্যে ওকে সাজিয়ে রাখতে হবে কাঠের চিতা। সন্ধ্যার পর ওর সৈন্যেরা ক্রমাগত সেই চিতা জ্বালাবে আর নেভাবে—যাতে ওপার থেকে মনে হবে হাজার হাজার সৈন্য এপারে ক্যাম্প ফায়ার করছে। উপসংহারে উনি বললেন, শেষ নির্দেশ অবশ্য আমি দিয়ে যাব না। একদিন না একদিন ওরা তোমার চালাকি বুঝে ফেলবেই। সেদিন ওরা দলে দলে নদী পার হয়ে এপারে চলে আসবে। তখন তুমি কী করবে তা আমি বলে যাব না। তুমি আত্মসমর্পণ করতে পার। শেষ সৈনিক পর্যন্ত যুদ্ধও করে যেতে পার। কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

চ্যাঙ কথা বলে কম। এ্যাটেনশান হয়ে এতক্ষণ সে শুধু নির্বাক শুনে যাচ্ছিল। এতক্ষণে বললে, না কমরেড কমিশার জিজ্ঞাস্য কিছু নেই। একটা অনুরোধ আছে।

: বল! আমরা নিশ্চয় সেটা রাখবার চেষ্টা করব।

: আমি যখন শেষ সিদ্ধান্ত নেব, তখন আপনারা থাকবেন তিন-চারশ মাইল তফাতে। তাই আমার শেষ সিদ্ধান্তটার কথা আপনারা জানতে পারবেন না। এজন্য আমার একমাত্র অনুরোধ—লঙ মার্চের ইতিহাসকার কমরেড হু-সেন চিনকে এখনই জানিয়ে দেবেন আমার শেষ সিদ্ধান্তটা : আমরা শেষ সৈনিক পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব। একজনও জীবন্তে ধরা দেব না। এটা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকা ভালো, যাতে সর্বহারার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমাদের আত্মীয়-বন্ধু কিংবা পার্টির তরফে যেন আমাদের জন্য বৃথা অনুসন্ধান না করা হয়।

লিন পিয়াও পুনরায় ওকে বুকে টেনে নিলেন।

পরদিন ভোর রাতে আমরা রওনা হলাম দক্ষিণ দিকে।

হুনি অধিবেশনে নেতৃত্বে যে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে এটা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। সামরিক ছকটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম :

কমাণ্ডার-ইন চীফ…চু তে

চীফ-অফ-স্টাফ…লিউ পো-চেঙ

ফার্স্ট আর্মি : কমাণ্ডার…লিন পিয়াও

পলিটিক্যাল-কমিশার…নৈ জুং-চেন

থার্ড আর্মি : কমাণ্ডার…পেং তে-হুই

পলিটিক্যাল-কমিশার…য়াং শাং-কুন

পঞ্চম আর্মি : কমাণ্ডার…তুং চেন-ত্যাং

নবম আর্মি : কমাণ্ডার…লো পিং-হুয়ি।

আর মাও ৎসে-তুঙ হলেন পলিটব্যুরোর চেয়ারম্যান।

ইতিপূর্বে 'চেয়ারম্যান' বলে কেউ ছিলেন না। সেক্রেটারী-জেনারেল এতদিন ছিলেন পো কু, এবার হলেন লো ফু। লি তে প্রভৃতি সরে গেলেন নেপথ্যে।

কিয়াংসি থেকে আমরা রওনা হয়েছিলাম এক লক্ষ মানুষ। ইতিমধ্যে তার অর্ধেক খোয়া গেছে। অঙ্কশাস্ত্র মতে আমাদের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হওয়া উচিত; কিন্তু তা হয় নি—কারণ কুইচাও, সেচুয়ান এবং য়ুনান প্রদেশ থেকে হাজার বিশেক লোক লঙ্ মার্চে যোগ দিয়েছে। ফলে ইয়াংসি অতিক্রম করার সময়ে আমাদের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর হাজার।[১]

ৎসুনি ত্যাগ করার পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ইয়াংসি নদী অতিক্রম। যদিও 'মাওতাই' অধিকারের রোমাঞ্চকর ঘটনাটা উল্লেখ না করে যাওয়া অন্যায় হবে। চীনার কাছে মাওতাই নামটা অতি আদরের। ইংরাজের কাছে 'স্কচ' বা ফরাসীর কাছে 'শ্যাম্পেন' যেমন পেয়ারের। মাওতাই গ্রামটা হচ্ছে মদের ডিপো। নামটাই শুনে এসেছি—চাক্ষুষ কেউই জায়গাটা দেখি নি। ফার্স্ট রুট আর্মি যখন ঐ 'মাওতাই' শহরে প্রবেশ করল তার আগেই শহরবাসী প্রাণভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। জার্মান সেনাপতি লি তে—যিনি ছিলেন লঙ্ মার্চে একমাত্র বিদেশী, সদলবলে শহরের উপকণ্ঠে একটি কারখানায় ঢুকে পড়েন। দেখেন, জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। কারখানার একান্তে একটি সুইমিং পুল! পরিষ্কার টলটলে জল—ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তার গায়ে চীনা ভাষায় সাইন-বোর্ডে কি যেন লেখা। জার্মান লি তে চীনা ভাষা বোঝেন না। জামা জুতো খুলে ঘর্মাক্ত মানুষটি সোজা নেমে গেলেন ঐ বিরাট সুইমিং পুলে। পরমুহূর্তেই এক ঢোক গিলে তিনি বুঝতে পারেন ওটা জল নয়—অমৃত![২]

উল্লেখ করা বোধহয় বাহুল্য হবে যে, পিপল্‌স্ লিবারেশান আর্মি যেদিন মাওতাই ত্যাগ করে যায় সেদিন ঐ সুইমিং-পুলের মেঝের পাথর দীর্ঘদিন পরে সূর্যালোক

দেখেছিল। জানি—এক সুইমিং-পুল ভর্তি পানীয় 'গবলেট'-এ মাপা যায় না; কিন্তু আমরাও ছিলাম ঘাটের-কোলে সত্তর হাজার তৃষ্ণার্ত পথিক।

ইয়াংসি নদী অতিক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দিতে আমি বরং 'চেন চ্যাঙ-ফেন'-এর দিনপঞ্জীর[৩] কয়েকটি পৃষ্ঠা অনুবাদ করে যাই। চ্যাঙ-এর বয়স তখন আঠারো—সে ছিল চেয়ারম্যান মাও ৎসে-তুঙ-এর একান্ত সেবক। চ্যাঙ বছর দুই আগে থেকেই—ষোলো বছর বয়স থেকেই—চেয়ারম্যানের আর্দালি হিসাবে কাজ করছে। এই দীর্ঘ পদ যাত্রায় সে একটি দিনপঞ্জিকা রেখে গিয়েছিল। তারই একটি পরিচ্ছেদ "সোনাবালি নদীর তীরে" পড়লে সেই কিশোর লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার মনিবকে দেখতে পাব আমরা। ইয়াংসি নদীর বালি সোনার মতো চিকচিক করে বলে তার ঐ নাম।

"১৯৩৫ সালের সেটা এপ্রিল মাস। আমরা সোনাবালি নদীর দক্ষিণ পারে এসে পৌঁছলাম। আমরা বলতে—এক-নম্বর লালফৌজের তিনটি আর্মি কোর, প্রথম পঞ্চম এবং নবম। উ নদীর পর এইটেই সবচেয়ে বড় নদী যা আমাদের সামনে মূর্তিমান বাধার মতো দাঁড়িয়েছে।

"সোনাবালি নদী রুদ্ধ আক্রোশে কেন জানি ফুঁসছে। লক্ষ লক্ষ ড্রাগনের মাথা ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমাদের দেখছে। কী করে পার হওয়া যাবে এই চিন্তায় নেতৃস্থানীয় সবাই চিন্তামগ্ন। আমার সাহেব—চেয়ারম্যান মাও দিবারাত্র শুধু আলোচনাই করে যাচ্ছেন।

"কি করে কি হলো জানি না, একদিন ভোর রাত্রে আমরা একটা নৌকা করে নদী পার হলাম। এপারের মাটিতে সবে পা দিয়েছি কমরেড লিউ পো-চেঙ—আমাদের চীফ-অফ-স্টাফ, চেয়ারম্যান সাহেবকে পাকড়াও করে কোথায় যেন নিয়ে গেলেন। তা যান, আমার প্রথম কাজ হচ্ছে সাহেবের জন্য একটা আস্তানা জোগাড় করে ফেলা।

"খোলা নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কোথাও কোনোও আশা নেই। বেলা-ভূমির পরেই কতকগুলি টিলার মতো। ছোট ছোট গর্ত আছে, গুহা নয়—তাতে ঢোকা যাবে না। টেবিল-চেয়ার-ক্যাম্প কিছুমাত্র এখনও এসে পৌঁছায় নি। গাছ-তলায় একটা অয়েল ক্লথ বিছিয়ে দিলাম। তার উপর পেতে দিলাম একখানা কম্বল। আর কিছু না হোক, চেয়ারম্যান তো লম্বা হতে পারবেন। চাই কি কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েও নিতে পারেন। সারা রাত উনি চোখের পাতা দুটি এক করেন নি। আর ঘুমের কথাই যখন উঠল তখন বলি—গত তিন চার রাত্রিই তিনি জেগে কাটাচ্ছেন।

"আমার উপর হুকুম ছিল, নূতন বাসস্থানে সর্বপ্রথমেই ম্যাপগুলোকে দেওয়ালে

টাঙিয়ে দিতে হবে, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু গাছতলায় ম্যাপ কি করে টাঙাই ? পাহাড়ের গায়ে পেরেক আঁটবার চেষ্টা করলাম—পেরেক লাগল না। এসব কাজে সচরাচর আমাকে সাহায্য করেন কমরেড হোয়াঙ, চেয়ারম্যানের একান্ত সচীব ; তিনি তখনও নদীর ওপারে। একা হাতে আমি কি করব ? ভাবলাম—ছত্তোর ম্যাপ ! আগে গরম জল বসাই, কিছু খাবার বানাই। চেয়ারম্যান নৈশ আহারের সময় পান নি। প্রাতরাশটা সময়মত না পেলে ওঁর কষ্ট হবে।

"চেয়ারম্যান যখন ফিরে এলেন তখন ভোরের আলো ফুটেছে। আমার গরম জল তৈরি। খাবারও হয়ে গেছে। চেয়ারম্যান ফিরেছেন দেখে আমি কাছে এসে বলি, আপনি এসে গেছেন ?

": হুঁ ! ···এদিকে সব তৈরি ?

": যতটা একা হাতে সম্ভব। আপনি একটু গড়িয়ে নিন, আমি গরম জলটা নিয়ে আসি।

"আমি গরম জলটা আনতে যাচ্ছিলাম ; উনি আমাকে ফিরে ডাকলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি লিখব কোথায় বসে ? ম্যাপগুলো কোথায় টাঙিয়েছ ?

"আমি বলতে গেলাম যে, কমরেড হোয়াঙ এখনও এসে পৌছান নি ; তাই ওসব এখনও হয়ে ওঠে নি। ইতিমধ্যে চেয়ারম্যান-সাহেব দুটি খেয়ে নিয়ে তৈরি হতে পারেন কিন্তু সে কথা বলা হলো না। উনি তার আগেই বললেন, চ্যাঙ, তুমি ভুলে গেছ বিশ-ত্রিশ হাজার কমরেড এখন নদী পার হচ্ছে। তাদের কোন্ দল এপারে পৌছে কী করবে তা এখনই স্থির করতে হবে আমাকে। সেসব কথা ভুলে গিয়ে তুমি শুধু আমার খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থাটুকুই করেছ ?

"কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না। উনিই আবার বলেন, যাও, যেখান থেকে পার একটা বোর্ড জোগাড় করে নিয়ে এস। অনেকগুলো অর্ডার এখনই আমাকে লিখতে হবে।—এই কথা বলেই তিনি হেড-ফোনটা তুলে নিয়ে কানে লাগালেন।

"খুব লজ্জা পেয়েছিলাম আমি। ছুটে বেরিয়ে গেলাম সেখান থেকে। একটা কাঠের বোর্ড জোগাড় করে নিয়ে এলাম। কোনোও গ্রাম্য কুটিরের ভাঙা একটা দরজা। চেয়ারম্যান আমার সঙ্গে হাতে-হাত লাগিয়ে সেটাকে পেতে ফেললেন। ম্যাপগুলো বিছিয়ে নিলেন। কাগজপত্র ছড়িয়ে ফের আমার দিকে ফিরে ডাকলেন : চেন্ চ্যাঙ-ফেঙ !

": আজ্ঞে ?

": এখানে এসে বস।

"আমি নিঃশব্দে ওঁর সামনে এসে বসে পড়ি। উনি বললেন, তোমার একটা শাস্তি পাওনা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছ?

"ওঁর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য ছিল না। তবু আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। মাথা নেড়ে বললাম যে, ওঁর কথা আমি বুঝতে পেরেছি। চেয়ারম্যান সংক্ষেপে বললেন, 'তোমার শাস্তি হচ্ছে এই : আমি যতক্ষণ কাজ করব ততক্ষণ তোমাকে ওখানে চুপ করে বসে থাকতে হবে।'

"ঠিক তখনই বুঝতে পারি নি শাস্তির গুরুত্বটা। বুঝলাম একটু পরেই। উনি কাজের মধ্যে বুঁদ হয়ে গেলেন। আমি নিশ্চুপ বসে আছি তো বসেই আছি। সমস্ত দিন ধরে ওপার থেকে এপারে লোক আসছে, আর ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ওঁর কাছে আসছে নানান সামরিক বার্তা, নিয়ে যাচ্ছে আদেশ। আমি কাঠের পুতুলের মতো বসে আছি তো বসেই আছি।

"শেষ পর্যন্ত পড়ন্ত বেলায় উনি উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'অনেক দিন তো হয়ে গেল আমার সঙ্গে, এখনও তুমি আমাকে চিনতে পারলে না চেন চ্যাঙ ফেঙ! নতুন কোনোও আস্তানায় এসে পৌছালেই তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে আমার কাজ করার ব্যবস্থা করে দেওয়া—খাবার কিংবা গরম জল পরের কথা। মনে থাকবে!

"আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। উনি থপ করে আমার মাথাটা ধরে চুলগুলো সব উস্‌কো-খুস্‌কো করে দিলেন। তার পর বললেন, তোর চোখ দুটো বুজে আসছে, পাগলা কোথাকার! যা শো গে যা!

"আমার চোখে জল ভরে এলো। দুঃখে, আনন্দে একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে। কেমন যেন? মনে কর ছেলেবেলায় তুমি যখন দুষ্টামি করতে আর তোমার বাবা কিংবা মা ধমক দিয়ে বলতেন: খবদ্দার ওসব দুষ্টামি আর করবি না, যা খেলগে যা!

"এর পর তিন-দিন তিন-রাত আরও ত্রিশ হাজার লোক সোনাবালি নদীর ওপার থেকে এপারে এলো, আর ঐ বাহাত্তর ঘণ্টা চেয়ারম্যান মাও একের পর এক কী সব অর্ডার লিখে গেলেন তাঁর সেই বিচিত্র ডেস্‌কে বসে!"*

* * *

---

* চেয়ারম্যান মাও ৎসে-তুঙের একান্ত-সেবক চেন চ্যাঙ-ফেঙ লঙ্‌ মার্চের উপর বইখানি লেখেন ১৯৫৯ সালে, ১৯৭২ সালে তার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। প্রকাশক 'ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস', পিকিং। দুর্ভাগ্যবশত এর কোনো কপি আমাদের কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে নেই। মাত্র ১২৪ পাতার চটি বই। অনেকগুলি চমৎকার ছবি আছে, তার একটি এঁকে পাঠককে উপহার দিলাম। বিষয়বস্তুটা হচ্ছে এই রকম : ষোলো বছরের চেন যখন প্রথম চাকরি করতে আসে তখন সে নিরক্ষর ছিল। একদিন মাও তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে চিঠি দিয়েছিস? চেন মাথা নেড়ে জানালো—

যে কথা বলছিলাম। লোলোদের দেশে লালফৌজের কীর্তিকাহিনী। ইয়াংসি নদী পার হবার পরেই আমরা আদিবাসী লোলোদের রাজ্যে ঢুকে পড়ি। আমাদের দেশে ভূগোলে লেখা আছে—লোলো উপজাতিদের রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে একশ দশ লি (ধরুন পঁয়ত্রিশ মাইল) কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে সেটা কতটা লম্বা তা কেউ জানে না। কারণ ওভাবে কেউ রাজ্যটা হেঁটে দেখে নি।[৪] লোলোরা চীনাদের শত্রু হিসাবে গণ্য করে, তাদের রাজ্যের ভিতর দিয়ে কখনও কোনো চীনা-বাহিনীকে যেতে দেয় নি। অথচ এ পথটুকু আমাদের পার হতেই হবে; কারণ, আমাদের লক্ষ্য মুখ তখন উত্তরদিকে। এই পথটুকু অতিক্রম



চিত্র—২৩
: বল, বাবাকে কী লিখতে চাস? 'আমি' লোকটা কেমন?

করতে আমাদের গোটা ফার্স্ট রুট্ আর্মির দিন-তিনেক লাগবে; কিন্তু ওরা পাহাড়ের মাথায় মাথায় সার দিয়ে দাঁড়ালো: আমাদের যেতে দেবে না!

ৎসুনি অধিবেশন কমরেড মাও ৎসে-তুঙ-এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল; ঠিক তেমনিভাবে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল ঐ লোলো-রাজ্যে। তিন-তিনটে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল আমার জীবনে—ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনেই। প্রথমত এই রাজ্যে আমার স্ত্রী নার্স লী অপহৃতা হলো, দ্বিতীয়ত এখানেই আমি আমার সেনাপতির আদেশ জীবনে প্রথম অগ্রাহ্য করলাম এবং তৃতীয়ত আমার সামরিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ছিলাম কোম্পানি-কমাণ্ডার, হয়ে গেলাম ব্যাটালিয়ান-কমাণ্ডার! তিনটি ঘটনাই পরস্পর যুক্ত—যদিও আমি সেটা জানতাম না। গোড়া থেকেই বলি:[৫]

'না'। বললে, সে নিরক্ষর—চিঠি লিখতে জানে না। তখন চেয়ারম্যান একখণ্ড কাগজ টেনে নিয়ে বললেন,'বল, কি লিখবি বাবাকে, আমি তোর হয়ে লিখে দিচ্ছি।' এর পর কমরেড মাও চেন চ্যাঙকেনকে লেখাপড়া শিখতে বাধ্য করেন। চেন শেষ পর্যন্ত লেখক হয়েছিলেন। তাঁর বইয়ের সংস্করণ হয়েছিল। ছবিটি দেখলে মনে হয় প্রথম থেকেই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা ছিল পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো!

১৯৩৫ সালের ১৩ই মে। আমরা লোলোদের রাজ্যের ভিতরে মাইল দশেক ঢুকেছি। 'আমরা' বলতে এখানে এক নম্বর রেজিমেণ্টের তিন-তিনটি কোম্পানি। প্রচণ্ড গরম, দরদর করে ঘাম হচ্ছে। পথে একটি লোলোর সাক্ষাৎ পাই নি। গোটা বাহিনীটা পিছনে আছে, আমরাই অগ্রগামী দল। কথা আছে আমরা 'পীচ-দুর্গে' পৌছে খবর পাঠাব। 'পীচ-কাস্‌ল্‌' লোলোদের দুর্গ। দু-দিকে খাড়া পাহাড়—উপত্যকায় নদীর কিনারা ঘেঁষে আমাদের পথ। দুর্গের কাছাকাছি যাবার আগেই পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে পাথর। পাথর পাথর আর পাথর। আমরা প্রস্তুত ছিলাম। কোনোমতে আত্মরক্ষা করে এক জায়গায় ঘাঁটি গাড়লাম। পীচ-দুর্গ ওখান থেকে এক লি-ও হবে না। সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বড় একটা পার্চিং-স্টোনের আড়ালে আত্মরক্ষা করে আমরা মেশিনগান সাজাই। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। ব্যাঘ্র-শাবক এসে খবর দিলেন সেকেণ্ড কোম্পানি ইতিমধ্যেই টিলার মাথাটা দখল নিয়েছে। লোলোরা ওদিকের ঢালু পাহাড় বেয়ে পালিয়েছে।

সদলবলে মেজর সো-লিঙের নেতৃত্বে আমরা টিলার মাথায় উঠে আসি। সেখানে বেশ বড় একটা বাড়ি। স্থানীয় জোতদারের। আগেই সে ভয়ে পালিয়েছে। ঐ বাড়ির বারান্দা থেকে পীচ-কাস্‌ল্‌ দেখা যায়। আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলাম। সেকেণ্ড কোম্পানির কমাণ্ডার লিয়াও জানালো পথে সেও কোনোও আক্রমণের মুখোমুখি হয় নি—কিন্তু পাহাড়ের মাথায় সে দু-চারশ লোলোকে দেখেছে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঢাকের বাদ্যি শোনা গেল আর অদ্ভুত-নিনাদী শিঙা। বোঝা গেল সাংকেতিক ভাষায় লোলোরা খবর আদান-প্রদান করছে। ঠিক তাই। মিনিট পনের হয়েছে কি হয় নি দু-দ্দাড়িয়ে পাথর পড়তে থাকে আমাদের মাথা লক্ষ্য করে। সো-লিঙ ফায়ারিং-এর হুকুম দিলেন। আমাদের রাই-ফেলম্যান এগিয়ে গিয়ে দশ রাউণ্ড ফায়ার করল। কী আশ্চর্য! ওপাশ থেকেও ফায়ারিং শুরু হলো! তাহলে লোলোরা আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করে!

তা করে। একটু পরেই দেখা গেল টিলার মাথায় মাথায় সমবেত হয়েছে ওরা। তীর-ধনুক-বল্লম, আর হ্যাঁ রাইফেলধারীরা। মেজর সো-লিঙ আমাদের পজিসন নিতে বললেন। ওরা ঢাকের বাদ্যির তালে তালে এগিয়ে আসছে। আমরাও নিশান তাক্‌ করে অপেক্ষা করছি। মেশিনগানধারীরাও বসেছে পাথরের আড়াল বেছে নিয়ে। মিনিট পনেরর মধ্যেই লড়াই শুরু হয়ে যাবে। প্রতিটি মুহূর্ত পার হচ্ছে প্রতিটি সৈনিকের হৃৎপিণ্ডের তালে তালে।

ঠিক সেই সময়েই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো চেন তু। ফার্স্ট কোম্পানির সংবাদবহ। দৌড়তে দৌড়তে এসে সে মেজর সো-লিঙ-এর হাতে ধরিয়ে দিল

একটা সামরিক আদেশ। আমি ছিলাম পাশেই। দেখলাম, মেজর সো-লিঙ-এর মুখটা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে! কাগজখানা আমাকে দিয়ে তিনি হুকুম জারী করলেন: কমরেডস্! আক্রান্ত হলে ফায়ার কর; কিন্তু দেখ, যেন কোনোও লোলো আহত না হয়!

সবাই অবাক! আমি সামরিক আদেশখানার মধ্যে ততক্ষণে ডুবে গেছি। সেটা আসছে রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার কর্নেল ইয়াং-এর কাছ থেকে। জানাচ্ছেন: পার্টি মনে করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোলো উপজাতি বিপ্লবের বন্ধু! কোনো ক্রমেই যেন সে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না হয়। আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। ফায়ারিং অনিবার্য হলে তা যেন আকাশে করা হয়। এ-যুদ্ধে পারতপক্ষে যেন কোনো লোলো হতাহত না হয়, সেটা দেখা দরকার।

সো-লিঙ কম কথার মানুষ। আমার দিকে ফিরে বললেন, এমন অদ্ভুত সামরিক আদেশ আমি জীবনে শুনি নি! শত্রুকে আঘাত না করে কি-ভাবে যুদ্ধ করতে হয় সেটা আমি জানি না!

পরমুহূর্তেই লোলোরা চিৎকার করে আক্রমণ শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যদল কয়েক রাউণ্ড গুলি চালালো। শূন্যেই। তাতেই অবশ্য কাজ হলো। ওরা বন্দুকের শব্দে পশ্চাদপসরণ করল। হতাহত কত হয়েছে সেটা খেয়াল না করেই।

এরপর শুরু হলো ঐ একই নাটকের পুনরাভিনয়। বার বার তিনবার। যেন দু-দল বাচ্ছা ছেলে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা করছে। ওরা বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসে, আমরা আকাশে ফায়ার করি আর ওরা "উ-লু, হোয়া-হোয়া-হোয়া…" চিৎকার করতে করতে পশ্চাদপসরণ করে। মেজর সো-লিঙ দাঁতে দাঁত দিয়ে বলেন, এভাবে আর কিছুক্ষণ চল্লে আমি পাগল হয়ে যাব!

আমি বলি, কেন? এত বিরক্ত হচ্ছেন কেন? খেলাটা তো বেশ জমেছে!

সো-লিঙ আমার দিকে বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, খেলা! টোটাগুলো এভাবে অপচয় করার কোনো মানে হয়?

এমন সময় এসে হাজির হলো আমার স্ত্রী—নার্স লী ফেং-লিয়েন। আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। মেজর সো-লিঙকে সামরিক অভিবাদন করে বললে, কমরেড কমাণ্ডাণ্ট! ডাক্তার ফু জানতে চাইছেন, বাঁ-দিকের উপত্যকার রাস্তাটা সাফা করে দিতে আপনার আর কত দেরি হবে? আমরা আহত সৈন্যদের নিয়ে ওখানে প্রায় একঘণ্টা চুপচাপ বসে আছি!

মেজর সো-লিঙ লীকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে গভীরভাবে বললেন, আরও অপেক্ষা করতে হবে।

: কিন্তু কতক্ষণ ?

: যতক্ষণ না ঐ লোলো জানোয়ারগুলো নিজে থেকে সরে যায় !

: ওরা যদি বছরখানেক ওখানে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে ?

: তবে বছর খানেকই তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে !

লী হঠাৎ ক্ষেপে গেল। উত্তেজিত হয়ে বললে, কমরেড কমাণ্ডান্ট ! আমি আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে আসি নি।

মেজর সো-লিঙও সমান উত্তাপ নিয়ে বললেন, আমিও রসিকতা করছি না ! তোমরা বরং ও-পথ ছেড়ে পাহাড়টা ঘুরে ডান দিক দিয়ে অগ্রসর হও !

লী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, বলা সোজা ! কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে আরও পাঁচ-সি বাড়তি হাঁটতে হবে—ওদিকের পথটাও খারাপ। আমার বাহিনীর অধিকাংশই আহত। জনা পঞ্চাশকে স্ট্রেচারে নিয়ে যেতে হচ্ছে ! আপনি ঐ লোলোদের তাড়িয়ে পথ করে দিচ্ছেন না কেন ?

সো-লিঙ এক কথায় বলেন, সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেব না !

লী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিলেন পলিটিক্যাল কমিশার ওয়াং। বললেন : কমরেড লী। পার্টি নির্দেশ দিয়েছে, আমরা যেন লোলোদের হতাহত না করি ! ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করুন। ইতিমধ্যেই কোনো ব্যবস্থা হবে।

লী গম্ভীর ভাবে বললে, এক ঘণ্টা পরে আমি আবার আসব কিন্তু !

লী চলে গেল এবং তখনই স্ট্রেচারে করে জনা তিনেক আহত সৈনিককে নিয়ে স্ট্রেচার বাহকেরা প্রবেশ করল। লোলোদের তীর বিদ্ধ হয়েছে তারা।

সো-লিঙ হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন। আহত সৈনিকদের দেখে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, অসম্ভব ! এভাবে চলতে পারে না ! যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ !

তারপরেই উনি আদেশ দিলেন গানারদের। মেশিনগানারদের। আমাদের বললেন আক্রমণ করতে। শূন্যে নয়, প্রয়োজন হলে লোলোদের লক্ষ্য করেই গুলি চালাবে। শিয়ান, লিয়াও এবং আমি—তিন কোম্পানি তিন দিকে এগিয়ে গেলাম।

আধঘণ্টা পরে আমি যখন ফিরে এলাম তখন ঘরের অবস্থাটা অন্য রকম। দেখি, ঘরের মাঝখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে একজন লোলো সর্দার। তাকে তল্লাস করা হচ্ছে। আমাকে ফিরে আসতে দেখেই মেজর সো-লিঙ বললেন, খবর বল ?

বললাম, খবর ভালো নয়। ওরা বুঝে ফেলেছে যে আমরা ব্ল্যাঙ্ক-ফায়ার করছি। গুলির শব্দে ওরা আর ভয় পাচ্ছে না।

সো-লিঙ চিৎকার করে ওঠেন, তাহলে ব্ল্যাঙ্ক-ফায়ার করছ কেন ? তোমাকে

আমি বলিনি গুলি চালাবার আদেশ দিতে ?

: কিন্তু পার্টির নির্দেশ—

: পার্টির নির্দেশের কথা আমি বুঝব ! তুমি আমার আদেশ পালন করবে শুধু ! এই হচ্ছে সামরিক আইন । যাও ! বাঁ-দিকের টিলাটা দশ মিনিটের মধ্যে দখল করা চাই ! মেশিনগান চালাও ! যত ইচ্ছে লোলোকে শুইয়ে দাও মাটিতে !

আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে । বলি : মেজর । তার আগে হেড-কোয়ার্টার্সে খবর পাঠানো উচিত নয় কি ? পার্টির নির্দেশ…

: চুপ কর ! অপদার্থ কোথাকার !

আমাকে থামিয়ে দিয়ে উনি বন্দী লোলো-দলপতির দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, চীনা ভাষা জান ?

লোকটা দুর্বোধ্য ভাষায় ওঁয়াও-ওঁয়াও করে !

ইতিমধ্যে ওর হাতের রাইফেলটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে ।

সো-লিঙ ডেপুটি কমাণ্ডান্টকে হুকুম দিলেন, মেশিনগানারদের তৈরি হতে বল । আমি নিজে ফোর্থ কোম্পানিকে লীড করব ।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলেন, এই বন্ধুটির সঙ্গে তুমি ততক্ষণ বন্ধুত্ব কর । পার্টির আদেশ পালন কর ততক্ষণ !

আমাকে এবং ঐ বন্দী লোলোকে ফেলে রেখে উনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তখনও আমি জানতাম না মেজর সো-লিঙ কেন এত ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন । খবরটা আমাকে কেউ তখনও বলে নি। সংবাদবহ ইতিপূর্বেই এসে মেজর সো-লিঙকে বলে গেছে লোলোরা নার্স লীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। সে যখন এখান থেকে ফিরে যাচ্ছিল তখন । ঘটনাটা ওদের চোখের সামনেই ঘটেছে, ওরা ব্ল্যাঙ্ক-ফায়ারও করেছিল ; ফল হয় নি। লোলোরা বুঝে ফেলেছিল, আমাদের বন্দুকে শুধু শব্দই হয়, মানুষ মরে না ! নার্স লী ওদের চোখের সামনে এভাবে অপহৃতা হওয়ায় মাথার ঠিক ছিল না ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারের ।

আমি বস্তুত সাস্পেণ্ডেড হয়েছি । আমার কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব আমার 'বস' স্বয়ং গ্রহণ করেছেন । ঐ লোলো সর্দার যেমন এ ঘরে বন্দী, আমিও প্রায় তাই। দরজায় সামনে বন্দুকধারী প্রহরী। তাকিয়ে দেখলাম লোলোটার দিকে। ওর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে । হাত পিঠ-মোড়া করে বাঁধা । পকেট থেকে রুমাল বার করে ওর ক্ষতস্থানটা মুছে দিলাম । হাত নেড়ে ওকে বসতে বললাম । দুজনেই বসি আমরা । লোকটা আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল । হঠাৎ সে বলে ওঠে— পরিষ্কার চীনা ভাষায়, সেছুয়ানি টানে : ঐ মেয়েছেলেটা তোমাদের কমাণ্ডান্ট-এর

কে হয় ?

চমকে উঠি। বলি, তুমি চীনা ভাষা জান ?

আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাহুল্য মনে করল লোকটা। পুনরায় একই প্রশ্ন করে—ঐ মেয়েটা কি তোমাদের কমাণ্ডারের প্রেমিকা ?

প্রতি প্রশ্ন করি, কোন্ মেয়েটা ? কার কথা বলছ ?

: ঐ যাকে আমার লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে ?

: আমি জানি না—কাকে তোমার লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে।

: আরে ঐ যে-মেয়েটা আধঘণ্টা আগে এ ঘরে এসেছিল। বছর আঠারো-কুড়ি বয়েস। সাদা টুপি মাথায়।

: লী ? তাকে তোমাদের লোকেরা অপহরণ করেছে ?

: হ্যাঁ ! তোমরা যেমন আমাকে ধরে এনেছ !

অনুভূতিটা আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। সব কিছু যেন অন্ধকার হয়ে গেল ! এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম, এই লঙ্ মার্চ, এই লোলো-সমস্যা ! এখানে পার্টির আদেশে আমি ঐ লোলোটার ঠোঁটের রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছি আর পাহাড়ের ওপারে হয়তো এতক্ষণে একদল অসভ্য লোলো-জানোয়ার আমার স্ত্রীকে—

কতক্ষণ এভাবে স্থাণুর মতো বসেছিলাম জানি না। ঐ লোলোটা কী-যেন বক্-বক্ করে যাচ্ছিল, আমার কানেই যায় নি সে সব কথা। বাস্তবে যখন ফিরে এলাম তখন দেখি ঘরে অনেক লোক। সংবিৎ পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরে সো-লিঙ ছাড়া কমিশার ওয়াং এবং রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার কর্নেল ইয়াংও আছেন।

কর্নেল ইয়াং বলছেন, আমি তোমার বক্তব্যটাই আগে শুনতে চাই মেজর সো-লিঙ।

সো-লিঙ এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, আমার কোনোও কৈফিয়ৎ নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে উপরওয়ালার আদেশ সামরিক অর্থে সব সময় পালন করা যায় না!

: যুদ্ধ তো থেমে গেছে মেজর! এখন আমরা আত্মসমীক্ষা করছি। অত সংক্ষেপে বলছ কেন ? আজকের যুদ্ধ সাময়িক-ভাবে থামলেও স্বাধীনতা সংগ্রাম তো দীর্ঘদিন ধরে চালাতে হবে, না কি ? ফলে আমাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে নিতে হবে প্রতি পদে। বুঝিয়ে বল—কেন পার্টির নির্দেশ তুমি অগ্রাহ্য করলে ?

উদ্ধত ভঙ্গিতে মেজর সো-লিঙ বলেন, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করবে আর তাদের হতাহত না করে সে আক্রমণ কী-ভাবে প্রতিহত করতে হয় তা আমি শিখি নি—

: পার্টির নির্দেশ কি তাই ছিল ?

সো-লিঙ জবাব দেন না। পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ নীরবে বাড়িয়ে ধরেন।

এবার কর্নেল একটু চটেছেন মনে হলো। গম্ভীরভাবে বলেন, আমাকে দেখাবার দরকার নেই। তুমিই ওটা আমাদের পড়ে শোনাও, আর শেষ লাইনের ঐ 'পারত-পক্ষে' শব্দটার কী অর্থ তা আমাদের বুঝিয়ে দাও।

মেজর সো-লিঙ উত্তর দেন না।

কর্নেল পুনরায় বলেন, এই লোলোরা হচ্ছে চীনের এক অনুন্নত সম্প্রদায়। হানেরা শত শত বছর ধরে এদের শোষণ করে এসেছে। ফলে ওরা আমাদের শত্রু বলে মনে করে। সেটা অস্বাভাবিক নয়। আমরা ওদের বন্ধুত্ব চাই। ওদের নেতার নাম শিয়াও ইয়ে-তান। তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ কমরেড লিন পিয়াও আলোচনা করছিলেন; এজন্যই পার্টির নির্দেশ ছিল যেন সে বন্ধুত্ব কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়। আমি যদি ঠিক সময়ে এসে না পড়তাম, তুমি সে বন্ধুত্বটাকে ধুলায় লুটিয়ে দিতে মেজর! কয়েক সহস্র লোলো বিপ্লবের বন্ধু হতো না, হয়ে যেত বিপ্লবের শত্রু! চিয়াঙের বন্ধু! তোমাদের সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি—লোলো-নেতা শিয়াও আর লাল-ফৌজের কমরেড লিন পিয়াও আজ পরস্পরের বন্ধুত্ব স্বীকার করে 'মিতা' হয়েছেন!

কেউ কোনোও কথা বলে না।

কর্নেল আমার দিকে ফিরে বলেন, এবার তোমার বক্তব্য শুনতে চাই কমরেড মাও চু-হুয়া?

বললাম, আমি দুঃখিত! কমাণ্ডারের আদেশ আমি মানি নি। যুদ্ধক্ষেত্রে সেটা অপরাধ! অবশ্য আমার মুশকিল ছিল এই যে, সামরিক আদেশটা ছিল পার্টির নির্দেশের বিপরীত!

: তুমি জানতে যে তোমার স্ত্রীকে ওরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে?

: না। সেটা পরে জেনেছি!

কর্নেল একটু চুপ করে কি যেন ভেবে নেন। তারপর আমাকে বলেন, তা সত্ত্বেও তুমি ঐ লোলোদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে?

জবাব দিতে আমার কয়েক সেকেণ্ড বিলম্ব হলো। তারপর মন স্থির করে বললাম, পার্টির আদেশ বিনা-বিচারে শিরোধার্য! ব্যক্তিগত স্বার্থে এক-একজন এক-একরকম ব্যবহার করলে সর্বহারার রাজত্ব কোনো দিনই প্রতিষ্ঠিত হবে না।

: ঠিক কথা! তুমি তাহলে স্বহস্তে ঐ লোলোবন্ধুকে বন্ধনমুক্ত কর!

লোলোটার বাঁধন খুলে দিতেই লোকটা এগিয়ে এসে বললে, কমাণ্ডান্ট। আমি কি আমার দলে ফিরে যেতে পারি?

: তুমি চীনা ভাষা জান দেখছি?

: হাঁ জানি। তাই বুঝতে পেরেছি তোমরা আন্তরিকভাবেই লোলোদের বন্ধুত্ব

চাও। লোলো-নেতা শিয়াও হচ্ছেন আমার কাকা। তোমার অনুমতি পেলে আমি আমার দলে ফিরে গিয়ে সব কথা জানাতে পারি, আর ঐ মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনতে পারি।

: ধন্যবাদ! তুমি মুক্ত! দাঁড়াও, তোমার রাইফেলটা নিয়ে যাও।

ওর কাছ থেকে যে রাইফেলটা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেটা ফেরত দিতে গিয়ে কর্নেল বললেন, এতে একটাও টোটা নেই দেখছি!

লোলো-নেতা হেসে বললে, টোটা অবশিষ্ট থাকলে কি জীবন্তে ধরা দিই?

: তাহলে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ওটা ভরে দেওয়া আমারই কর্তব্য।

কর্নেলের আদেশে ওর রাইফেলটা 'লোড' করে দেওয়া হলো। দুজনে করমর্দন করলেন।

লোলো-নেতা আমার দিকে ফিরে বললে, কমরেড! তোমার স্ত্রী যদি জীবিতা থাকে তবে আধঘণ্টার মধ্যে সে ফিরে আসবে।

কর্নেল বলেন, ধন্যবাদ! তার প্রয়োজন নেই। নার্স-লী বহাল-তবিয়তে ফিরে এসেছে। তাকে তোমার লোকেরা গ্রেপ্তার করেছিল আমাদেরই ভুলের জন্য— যেহেতু আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করেছিলাম। নার্স-লীর উপর ওরা কোনো অত্যাচার করে নি।

লোলোরা লালফৌজকে আর বাধা দেয় নি। সে-রাত্রেই সামরিক আদেশে আমাকে ব্যাটেলিয়ান-কমাণ্ডার করে দেওয়া হলো। আমার খারাপ লেগেছিল— হাজার হোক, সো-লিঙ আমার চেয়ে বয়সে বড়! কিন্তু মেজর সো-লিঙ স্পোর্টস-ম্যানের মতো এ আদেশ গ্রহণ করলেন। বললেন, কমরেড মাও, ভুল আমারই হয়েছিল। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও!

কমিশার ওয়াঙ সে-রাত্রে নার্স-লীকে আমার 'বিভক'-এ রাত্রিবাস করতে পাঠিয়ে দিলেন। সামরিক আদেশ জারি করার ভঙ্গিতে বললেন, কাল সকালেই আমরা মার্চ শুরু করব; কিন্তু ইতিমধ্যে নার্স-লীর কাছ থেকে ওর অভিজ্ঞতার কথাটা তোমার বিস্তারিতভাবে শোনার দরকার। তাহলে ঐ আদিবাসী জাতটার সম্বন্ধে অনেক তথ্য তুমি জানতে পারবে। ব্যাটেলিয়ান-কমাণ্ডার হিসাবে লোলোদের রীতিনীতি সম্বন্ধে তোমার ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

উপায় নেই। সামরিক আদেশ! সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও বিশ্রাম নেই। নার্সলীর অভিজ্ঞতা আমাকে শুনতে হবে রাত জেগে। নির্জন ক্যাম্পে! কানে-কানে-বলা নিভৃত-কূজনে! তামাম রাত!

কমিশার ওয়াঙ-এর বিবেচনা আছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

তাতু নদীর তীরে : আনশুংচান

মে ১৯৩৫

"কর্নেল ইয়াং তে-চির স্মৃতিচারণ"

লঙ্-মার্চের ইতিহাসকার বলছেন : লঙ্-মার্চের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল তাতু নদী অতিক্রম! কথাটা অতিরঞ্জন নয়। সেই কাহিনীই শোনাতে বসেছি—কিন্তু তার আগে কিছু ভূগোল আর কিছু ইতিহাসের কথা শোনাতে হবে। না হলে স্থান-কাল-পাত্রের সম্পর্কটা আপনারা বুঝে উঠতে পারবেন না। প্রথমে ভূগোল :

তাতু নদী বিস্তারে ইয়াংসি অথবা উ-নদীর তুলনায় শিশু ; কিন্তু দুরন্তপনায় ওদের তুলনাই চ'লে না। তাতু কলনাদিনী, ভীষণা—দু-পাশে খাড়া পাহাড় মেঘ-লোক পর্যন্ত উঠে গেছে, তার মাঝখান দিয়ে ফেনিল উচ্ছ্বাসে বহে চলেছে পাহাড়ে পাগলা-ঝোরা। সে নদীতে নৌকা তো ছাড়্, মাছ কেমন করে সাঁতার কাটে ভেবে অবাক্ হতে হয়! 'তাফিন' আর 'সিরাওফিন' নামে দুটি পার্বত্য ঝরোকা তুষার-মৌলী পাহাড়ের উপর থেকে নাচতে নাচতে এসে মিশেছে টংপায়—তাদের মিলিত জলধারার নামই হচ্ছে তাতু। কিছুটা দক্ষিণে এসে আনশুংচাঙের কাছে পূর্বদিকে বাঁক নিয়েছে। তারপর মিং নদীর সঙ্গে মিলে-মিশে একসাথে গিয়ে পড়েছে সেই সোনাবালি নদীতে—চীনের বৃহত্তম ইয়াংসি নদীতে। (চিত্র-২৪)

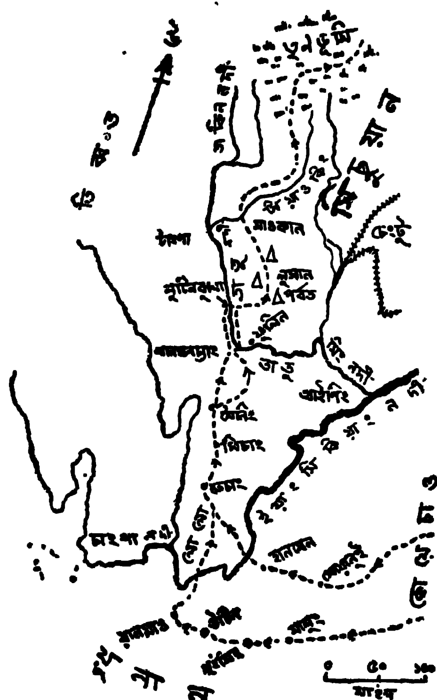
এ নদী অতিক্রম করতেই হবে। কারণ আমাদের লক্ষ্যমুখ এখন সিধে উত্তর দিকে! ইতিমধ্যে আমরা সংবাদ পেয়েছি ফোর্থ আর্মি-কোর কমরেড চ্যান কু-তাও-এর নেতৃত্বে রওনা হয়েছে পশ্চিমদিকে ঃ মাসখানেকের মধ্যে তাদের মৌকাং-এ উপস্থিত হবার কথা। আমরা যদি একই সময়ে অকুস্থলে পৌছাতে পারি, তবে আমাদের মিলিত শক্তি রুখে দাঁড়াবার একটা সুযোগ পাবে। ইতিমধ্যে এ খবরও এসেছে যে, সাংচি থেকে কমরেড হো-লাঙ তাঁর সেকেণ্ড আর্মি-কোর নিয়ে রওনা হয়েছেন—কিন্তু তিনি যে বর্তমানে কোথায় সে খবর আমরা পাই নি। আরও সংবাদ এসেছে—শেনসিতে পঞ্চবিংশতি রুট আর্মি পৌছেছে, সেখানে একটি নূতন সোভিয়েতের জ্রূণ দানা বেঁধে উঠছে। আমরা যদি শেনসিতে উপনীত হতে পারি তবে লঙ্ মার্চ সার্থক হবে।

নদী তো অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু কোথায় সেটা সম্ভব? সংবাদ-বহরা এসে

খবর দিল তাতু পার হবার তিনটি বিকল্প পথ আছে। এক নম্বর আনশুনচাংয়ের ফেরিঘাট ; দু নম্বর ফুলিনের ফেরিঘাট ; এবং তিন নম্বর লুটিন ব্রীজ।

এর ভিতর শত্রুপক্ষ আমাদের প্রত্যাশা করছে প্রথম দুটি ফেরিঘাটে। তিন নম্বর বিকল্প পথ লুটিন-ব্রীজে আমাদের পার হওয়া, ওদের মতে অসম্ভব। কারণ লুটিন-ব্রীজের কাঠের পাটাতন ওরা সরিয়ে নিয়েছে আগেই।

সবকিছু বিবেচনা করে সামরিক উপদেষ্টা বললেন—পার হতে হবে ঐ এক নম্বর ঘাট দিয়ে। আনশুনচাং ফেরি ঘাটে। শুনেই আমার মনটা ছাঁৎ করে উঠল। দোষ আমার নয়। আমার ইতিহাসের মাস্টারমশাইয়ের। আমি প্রাক্-সৈনিক



চিত্র—২৪

জীবনে ছিলাম দর্শনের অধ্যাপক, তবে ইতিহাসও কিছু কিছু পড়েছি। জানি—ঐ আনশুনচাং ঘাটে নদী পার হতে গিয়েই প্রাণ দেন তাইপিং বিদ্রোহের মহান নায়ক প্রিন্স শিহ্‌ তা-কাই। আমি সে কাহিনী জানতাম, জানত না আমার বাহিনীর আর সবাই। তারা সে গল্প শুনল কমরেড চু তে-র মুখে। জেনারেল চু তে বললেন, 'আমি যখন নেহাৎ বাচ্চা তখন শিহ্‌ তা-কাইয়ের গল্প আমাকে শুনিয়েছিল আমা-

দের গ্রামের বুড়ো তাঁতি। লোকটার বয়স আশির উপর। সে যোগ দিয়েছিল তাইপিং বিদ্রোহে। আমাদের মতো বাচ্চাদের জড়ো করে সন্ধ্যাবেলা সে গল্প শোনাতো। এই তাতু নদীর তীরে প্রিন্স শিহ্ তা-কাইয়ের বিদ্রোহী-বাহিনীর শেষ পরিণতি—

তাইপিং বিদ্রোহের নেতা শিহ্ তা-কাই তাঁর বিদ্রোহী-বাহিনীকে নিয়ে ঠিক এই পথেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাতু নদীর তীরে। নদী পার হতে পারেন নি। মাঞ্চু সম্রাট শেষ পর্যন্ত ঐ অসভ্য লোলোদের লেলিয়ে দিয়েছিল তাঁর পিছনে। প্রিন্স শিহ্ তা-কাইয়ের ছিল শুধু তীর আর ধনুক, আর মাঞ্চুরাজ লোলোদের হাতে তুলে দিয়েছিল গাদা বন্দুক। তাড়া খেয়ে প্রিন্স কাই এসে পৌঁছলেন এই আনশুন-চাং ফেরি-ঘাটে। হাজার হাজার বাঁশ কেটে ভেলা বানালেন। পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি পার হবার চেষ্টা করেছিলেন এই ফেরিঘাটেই। প্রতিটি সৈনিকের হাতে ছিল চামড়ার ঢাল আর বল্লম। কিন্তু এপারে তাদের ভেলা ভিড়তে পারে নি। মাঞ্চু সেনাপতি এপারে পাথরের আড়ালে বিলাতী কামান সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল। সহজ শিকার। ভেলাগুলো যখন মাঝ নদীতে প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তখন তারা উন্মত্ত উল্লাসে একটার পর একটা ভেলা কামান দেগে ডুবিয়ে দিতে থাকে! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিহ্ তা-কাইয়ের বিদ্রোহী-বাহিনী নিঃশেষ হয়ে গেল! তাদের হাতের বল্লম হাতেই রয়ে গেল! শেষ পর্যন্ত প্রিন্স শিহ্ তা-কাই তাঁর চার বছরের পুত্র ও স্ত্রীর হাত ধরে মাঞ্চু সেনাপতির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি আত্মসমর্পণ করছি! বন্ধ করুন এ ধ্বংসলীলা!

সেনাপতি মহানন্দে তাঁকে সপরিবারে গ্রেপ্তার করল; কিন্তু তার ধ্বংসলীলা বন্ধ হলো না। শেষ বিদ্রোহী সৈনিকটি পর্যন্ত যতক্ষণ না নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ততক্ষণ তার বিলাতী কামান গর্জন করে গেল।

প্রিন্স শিহ্ তা-কাইকে অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্রের শিরশ্ছেদ করা হলো প্রথমে, তারপর তাঁর হাত পা কেটে ফেলে তাঁকে রক্ত-ক্ষরণে তিল তিল করে মরতে দেওয়া হলো!

আনশুনচাং-এর গাঁও বুড়োকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলবে তাইপিং বিদ্রোহীদের আত্মা ঐ ফেরিঘাটের কাছেপিঠেই লুকিয়ে থাকে। তারা ঐ জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারে নি। ঝড়ের রাত্রে জলের মধ্যে থেকে তাদের গোঙানি আজও নাকি শোনা যায়! যতদিন না তাদের রক্তের ঋণ শোধ হচ্ছে ততদিন সেই বন্দী আত্মাদের মুক্তি নেই।

জেনারেল চু তে আমাদের বলেছিলেন, কমরেডস্। আমি শৈশবে সেই তাঁতি

বুড়োকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—বন্দী-আত্মাদের আমি মুক্ত করব। তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম—কী বলেছি তা বুঝতাম না! অথচ কী আশ্চর্য দেখ, সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে আজ আমি এসে দাঁড়িয়েছি সেই আনশুনচাং ফেরিঘাটে।[৩]

মজা হচ্ছে এই যে, ইতিহাস তো শুধু আমরাই পড়িনি—ঐ ইতিহাস জানা ছিল জেনারালিসিমো চিয়াঙ কাই-সেকেরও। লালফৌজ আনশুনচাঙের ফেরিঘাটে পৌঁচেছে এ সংবাদ পেয়ে চিয়াং টেলিগ্রাফ করল তার সেনাপতি লিউ শিয়াঙকে[৪] : "তাইপিং বিদ্রোহের নেতা শিহ্ তা কাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিদ্রোহী মাও ৎসে-তুঙ এখন তাতু নদীর তীরে পৌঁচেছে। ব্যবস্থা কর—যাতে মাও ৎসে-তুঙ ইতিহাসের সেই অনিবার্য পরিণামে পৌঁছাতে পারে!"

আনশুনচাং ফেরিঘাট থেকে মাইল ত্রিশ পুবদিকে ফুলিন পারানিঘাট। সেটা সমতল এলাকা। ওদের প্রতিরোধ তীব্রতর হবে সেখানে। তৃতীয় বিকল্প পথটা হচ্ছে আনশুনচাং থেকে আশি মাইল উত্তরে লুটিন-ব্রীজ। আড়াইশ বছর বয়স সেই ব্রীজের। ১৭০১ সালে মাঞ্চু সম্রাট কাংশী সেটি তৈরি করিয়েছিলেন। আপনাদের ভারতবর্ষে হৃষিকেশে যেমন লছমন-ঝুলা আছে সেই রকম ঝুলন্ত সেতু। পাহাড়ের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় বাঁধা আছে তেরটা চেন। তার চারটে রেলিং হিসাবে আছে, বাকি নয়টা সড়কের সমতলে। গত দুশ বছর ধরে এ-পথেই চীন-ভারতের যাতায়াত ছিল। ঐ সাঁকো পার হয়ে যাত্রীরা চীন থেকে গিয়েছে লাসা, কাশ্মীর, সমরকন্দ অথবা পারস্য। চিয়াঙ গণ-ফৌজের আতঙ্কে ঐ সাঁকোটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল—স্থানীয় জঙ্গীশাসক লিউ ওয়েন রাজী হয়নি। সে পাটাতনের কাঠগুলো খুলে নিয়েছিল শুধু। ফলে বর্তমানে তেরটা লোহার-চেনের কঙ্কাল শুধু আঁকড়ে ধরে আছে দুই পাহাড়ের দুই মাথা। সে পথে লক্ষ লোকের পক্ষে নদী পার হওয়া অসম্ভব। বিশেষ, ওপারে তা-সত্ত্বেও নিশ্চয় আছে প্রতিরোধ ব্যবস্থা!

ফলে স্থির হলো আনশুনচাং ঘাটেই আমরা পার হব। কিন্তু তার আগে একটি কোম্পানিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ফুলিন ফেরিঘাটের দিকে—যাতে শত্রুপক্ষ তার সৈন্যদলকে সেদিকেই টেনে নিয়ে যায়। আমাদের গুপ্তচর-বাহিনী খবর এনেছিল, এই এলাকায় চিয়াঙ-এর সর্বমোট তিনটি রেজিমেন্ট আছে ; তার একটি পাহারা দিচ্ছে লুটিন ব্রীজ, একটি আছে আনশুনচাঙে এবং দুটি আছে ফুলিন-এ। অর্থাৎ শত্রুপক্ষও আশা করে আছে যে, আমরা ফুলিন দিয়েই পার হবার চেষ্টা করব।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিলেন ফার্স্ট আর্মি কোরের সেনাপতি লিন পিয়াও। ২৩ তারিখ রাত্রে। আমার উপরে আদেশ হলো যতশীঘ্র সম্ভব আনশুনচাং ফেরিঘাট

দখলে নিতে হবে। রাত তখন নয়টা। গোটা ফার্স্ট আর্মি তখন আছে মৈনিং-এ, অর্থাৎ ফেরিঘাট থেকে মাইল পঞ্চাশ দক্ষিণে! তৎক্ষণাৎ আদেশ জারী করলাম: মার্চ।

পাঁচটি কোম্পানিকে নিয়ে আমরা মৈনিং থেকে রওনা হলাম রাত দশটায়। সমস্ত দিন ও রাত্রি মার্চ করে চব্বিশ ঘণ্টায় আমরা অতিক্রম করলাম একশ' চল্লিশ লি, প্রায় সাতচল্লিশ মাইল। পথে দুটো ছোট নদী পড়েছিল, তাছাড়া পথ দুর্গম। তাই বলব—চব্বিশ ঘণ্টায় সাতচল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করা সেখানে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয়। ফেরিঘাট থেকে মাইল চারেক দূরে পাহাড়ে জঙ্গলে আমরা লুকিয়ে পড়লাম। আমাদের বাঁ-দিকে খাড়া পাহাড়, ডাইনে খরস্রোতা তাতু নদী। পাহাড়ের মাথায় কোন্‌টা কুঁড়ে ঘরের আলো আর কোন্‌টা আকাশের তারা তা আর আলাদা করে চেনা যায় না। এখানেই রাত্রিবাস করবার ব্যবস্থা করলাম। সকলেই পথশ্রমে ক্লান্ত। কাল ভোর রাত্রে ফেরিঘাট আক্রমণ করা যাবে।

রেডিও-যোগে কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করল আমাদের বেতার প্রেরক। তৎক্ষণাৎ অর্ডার এলো: আজ সন্ধ্যারাত্রেই ফেরিঘাট আক্রমণ কর, যে কয়খানা নৌকা এপারে আছে ছিনিয়ে নাও!

সামরিক আদেশ হচ্ছে সামরিক আদেশ! অগত্যা সে আদেশ তামিল করবার জন্য হুকুম দিলাম। যারা শুয়ে পড়েছিল তারা উঠে দাঁড়াল ফের। স্বীকার করব—সে-রাত্রে আমার রাগই হয়েছিল হেড-কোয়ার্টার্সের ঐ আদেশে। কী এমন ক্ষতি হতো কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করলে। ভেবেছিলাম—ক্ষতি নয়, লাভ হতো একটা রাত অপেক্ষা করলে—আমার পথশ্রান্ত সৈনিকেরা একটা রাত ঘুমিয়ে নিলে অনেক ভালো লড়তে পারত। তখন বুঝিনি—আজ বুঝতে পারি, কেন অমন অদ্ভুত একটা আদেশ জারী করেছিলেন মৈনিং থেকে কমরেড লিন পিয়াও। যে-খবর আমি পাইনি সে-খবর গুপ্তচর মারফৎ তিনি জোগাড় করেছিলেন অত দূরে বসে। সেই জন্যই বলি, লিন পিয়াও আর চু তে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রণকুশলী! ব্যাপারটা আপনারাও বুঝবেন যদি এডগার স্নোর কয়েকটা লাইন অনুবাদ করে শোনাই:[৫]

> "নদীর অপর পারে ছিল জেনারেল লিউ ওয়েন-হুইয়ের একটি পুরো রেজিমেণ্ট। ...একটি স্কোয়াডই অবশ্য যথেষ্ট হতো; কারণ ফেরিঘাটের সব নৌকাই সূর্যাস্তের আগে ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়। কড়া সামরিক আদেশ। কিন্তু ওদের রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার স্থানীয় লোক—তার শ্বশুরবাড়ি নদীর এপারে—আনশুনচাং গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল সে। তাই প্রায় প্রতি রাত্রেই সেই কমাণ্ডার এপারে আসে নৌকা নিয়ে—ক্যাম্পের চেয়ে শ্বশুর-

বাড়িটাই রাত কাটাবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে। ঘটনার রাত্রে সে যে এপারে আসবে তা জানতে পেরে লালফৌজ অতর্কিত আক্রমণে ঐ কমাণ্ডারকে বন্দী করে। তার নৌকা কেড়ে নিয়ে পার হয় দুরতিক্রম্য তাতু নদী।"

উদ্ধৃতি শোনাতে গিয়ে আমার গল্পের সাস্‌পেন্সটাই নষ্ট করে ফেললাম! তা হোক—ইনিয়ে-বিনিয়ে বললেও ঐ একই কথা বলতে হতো আমাকে। আধঘণ্টার মধ্যে আমরা ফেরিঘাট দখলে নিলাম। ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার বন্দী! নগদ লাভ তার রিভলভারটা, আর নৌকাখানা! নদী তীরে সমবেত হলাম আমরা। নদীটা ওখানে প্রায় হাজার ফুট চওড়া। জলের গতিবেগ সেকেণ্ডে তের ফুট। সবচেয়ে মুশ্‌কিল হলো নৌকার মাঝিটা ভেগেছে!

তা হোক, আমাদের দলেই আছে দক্ষ মাঝি। তারা নৌকা পার করবার দায়িত্ব নিল। আমি নেতৃত্বে বরণ করলাম আমার একনম্বর ব্যাটালিয়ান-কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়াকে। ছোকরার বয়স অল্প। সম্প্রতি প্রমোশন পেয়েছে। যেমন নির্ভীক, তেমন দক্ষ অফিসার। মাও তৎক্ষণাৎ ওর ব্যাটালিয়ান থেকে বাছা-বাছা আঠারো জন সৈন্যকে হাজির করল। স্থির হলো,প্রথম দলে যাবে আটজন, পরের ব্যাচে দশ জন। নৌকায় একসঙ্গে আট-দশ জনের বেশি চড়া নিরাপদ নয়। এপারে গাছের আড়ালে, পাথরের খাঁজে লুকিয়ে বসে থাকল শার্প-শ্যুটার আর মেশিনগানারের দল। পাহাড়ের মাথায় বসানো হলো কামান।

প্রথম দশজনের নেতা হচ্ছে শিউং শাং-লিন। সাতজন কমরেডের সঙ্গে সে নৌকায় উঠল। আমি ঘাটের কিনারায় দাঁড়িয়ে ওদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে শুধু বললাম, কমরেডস্‌! লালফৌজের এক লক্ষ লোক তোমাদের সাফল্য কামনা করছে! ঐ লক্ষ লোকের ভাগ্য আজ তোমাদের হাতে তুলে দিলাম।

ওরা নিঃশব্দে মাথা নত করল শুধু। রাইফেলের মুঠটা আরও দৃঢ়হস্তে চেপে ধরল। নৌকা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে ফায়ারিং-এর শব্দ হলো। দুর্ভাগ্য আমাদের! ওরা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে—এ নৌকায় ওদের কমাণ্ডার শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছে না।

ক্যাপ্টেন মাও চিৎকার করে ওঠে : ফায়ার!

আমাদের আর্টিলারি জবাব দিল। দু-পক্ষেই গুলি বিনিময় হচ্ছে। তিল তিল করে নৌকাটা এগিয়ে যাচ্ছে মসীকৃষ্ণ নদীর বুক চিরে। ঝাঁকে ঝাঁকে ছর্‌রা পড়ছে নৌকার আশেপাশে। ও-পক্ষে কামান গর্জন করল; কিন্তু আমাদের কামান প্রত্যুত্তর করল না। এটা ক্যাপ্টেন মাওয়ের বুদ্ধি! সে তার পূর্ণ শক্তি প্রথম থেকেই দেখায়

নি। ভালোই করেছিল—কারণ নৌকাটা যখন ওপারের কাছাকাছি পৌঁছালো তখন শত্রু সৈন্য উৎসাহে ছুটে বেরিয়ে এলো তাদের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে। নৌকায় মাত্র সাতজন, একজন আহত হয়েছে ইতিমধ্যেই—আর নদীর পারে ওরা না হোক শ'দুই লোক। আমাদের কামান-গর্জন না হওয়ায়, অথবা মেশিনগানের শব্দ না হওয়ায় ওরা ধরে নিয়েছিল রাইফেল ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। ঠিক যে মুহূর্তে নদীর ওপারে নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে ওরা হুড়মুড় করে ছুটে এলো নদীর তীরে অমনি ক্যাপ্টেন হুয়া আদেশ জারী করল মেশিনগানারদের : ফায়ার!

ফাঁকা নদীর ধারে ভীড় করে দাঁড়ানো সৈন্যদলের চেয়ে লোভনীয় খাদ্য নেই মেশিনগানের। আমাদের তিনটি মেশিনগানার তাদের তিনজোড়া হাত পুব থেকে পশ্চিমে ঘোরালো আর নদীর তীর ভরে উঠল মৃতদেহে। ওরা রুদ্ধশ্বাসে ছুটল ফাঁকা নদীর তীর ছেড়ে পাথরের আড়ালে।

আমাদের ছয়জন দুঃসাহসী নামলো ওপারে। এক এক জন পজিসান নিল এক এক পাথরের খাঁজে। দুর্লভ দৃশ্য! মাত্র ছয়জন মহড়া নিয়েছে কয়েক শ' শত্রুর। ওরা সাহস করে বেরিয়ে আসতে পারছে না। সপ্তম কমরেড তার আহত বন্ধুকে নিয়ে ফিরে এলো এপারে। এবার ক্যাপ্টেন মাও নিজেই লাফ দিয়ে উঠল সেই নৌকায়। সঙ্গে আরও জনা আষ্টেক কমরেড। আধঘণ্টার মধ্যে একই ভাবে পার হলো ওরা।

এবার ওরা সংখ্যায় জনা পনের। দুর্জয় সাহস ওদের! গুলি বর্ষণের মধ্যেই ওপারের ঘাট থেকে উদ্ধার করল আরও তিনটি নৌকা। তৃতীয়বার চারটি নৌকায় যখন আমরা শতখানেক লোক পার হলাম ততক্ষণে ওদের প্রতিরোধ একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর গুলির শব্দ হচ্ছে না। ওরা প্রাণভয়ে নিশ্চয় আরও উত্তরে ছুটে পালিয়েছে।

রাত দুটো নাগাদ আনশুনচাঙে ফেরিঘাটের দু-পারই আমাদের দখলে এলো। এরপর তিন দিন তিন রাত—মে মাসের ২৬শে থেকে ২৮শে ঐ চারটি নৌকা দিবারাত্র শুধু পারাপার করেছে। প্রতিটি নৌকা দিনে বিশবার পারাপার করেও ঐ তিন দিনে আমরা মাত্র তিন-চার হাজার সৈন্য ওপারে নিয়ে যেতে সক্ষম হলাম। এভাবে একলক্ষ লোক পার করতে হয়তো মাস ছয়েক লেগে যেত। হয়তো ইতি-মধ্যে কিছু নৌকাও বানিয়ে ফেলতে পারতাম। কিন্তু দুটি কারণে ঐ তিন দিন পরেই এ পারানি-ঘাটের কারবার গুটিয়ে ফেলতে হলো। প্রথমত ভাগ্য আমাদের প্রতিকূল—ইতিমধ্যে পাহাড়ে ঢল নামলো! বন্যা! তাতু নদী এমন ভীষণ হয়ে উঠল যে, নৌকা আর চলে না। স্থানীয় লোকেরা বলল—জল নেমে না গেলে নৌকা চলবে না।

জল সরতে পাঁচ সাত দিনও লেগে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত চিয়াঙ-এর হেড-কোয়ার্টার্সে ওদের দুঃসংবাদটা পৌছে যেতেই এসে হাজির হলো বিদেশীদের দান—এয়ারোপ্লেন! ফাঁকা নদীর তীরে বম্বিঙে ভারি মজা—বিশেষ আমাদের এ্যাক্-এ্যাক্ গান্ নেই!

ফলে এত কষ্টে জয় করা আনশুনচাং ফেরিঘাট দিয়ে লালফৌজ তাতু নদী অতিক্রম করতে পারল না! তাহলে কি লালফৌজের কবর রচিত হবে এই তাতু নদীর তীরেই! যেমন হয়েছিল তাইপিং বিদ্রোহের নেতা শিহ্‌ তা-কাইয়ের? তাইপিং বিদ্রোহের বিদেহী আত্মা কি তৃপ্ত হবে না?

না! লালফৌজ হার মানে নি তাতু নদীর তীরে!
প্রিন্স শিহ্‌ তা-কাইয়ের অতৃপ্ত আত্মা এতদিনে শান্তি পেল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাঘ্র-শাবকের স্মৃতিকথা

'ব্যাঘ্রশাবক !'—কথাটার মানে কি রে বাবা ? কমরেড চাও কাংকে প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত শুনলাম সাদামাটা পাই-হুয়া ভাষায় তার মানে : 'বাঘের বাচ্ছা' !

বাচ্ছা ! আমি বাচ্ছা ? তের বছর এগারো মাস বয়স হলো আমার। যুবক না বলো, তরুণ তো বলবে ? আর 'বাঘ'ই বা আসে কোত্থেকে ? আমি নিতান্ত চাষী ঘরের ছেলে। তবে হ্যাঁ, বাপের পরিচয়ে আমাকে ওরা 'বাঘের-বাচ্ছা' বলতে পারে বটে। আমার বাবা ছিল সত্যই বাঘ। দৈহিক ক্ষমতায় আর সাহসে ! বলছি তার কথা। তার আগে নিজের পরিচয়টা দিই :

আমার নাম : লিয়াও শিং-ওয়েন। নিজের বলতে আমার কেউ নেই। তবে আমারও সব কিছু ছিল, জানেন? বাপ্-মা-দিদি, দিদা-দাদু আর ছোট্ট একটা ভাই চেন-তু। ভাইটা অবশ্য মাত্র তিন মাস বয়সেই মারা যায়, কিন্তু আর সবাইকে জড়িয়েই কেটেছে আমার ছেলেবেলা। একে একে সকলকেই খুইয়েছি—সে-কথাই বলব। এখন আমি লালফৌজের নিশান-বাহী। প্রথম যখন ঢুকেছিলাম তখন ছিলাম সংবাদবহ। তখনই ঐ ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ডার কর্নেল ইয়াং তে-চি আমার নাম-করণ করেছিলেন : ব্যাঘ্রশাবক। উনি পণ্ডিত মানুষ কিনা, তাই চল্‌তি পাই-হুয়া-ভাষায় 'বাঘের বাচ্ছা' না বলে একটা গালভারী নাম দিলেন। এতদিনে আমার পদোন্নতি হয়েছে—এখন আমি স্ট্যাণ্ডার্ড-বিয়ারার : পতাকাবাহী। দলে আমরা জনা-কুড়ি। তার উনিশজনই 'টীন-এজার'—অর্থাৎ উনিশের কম। আমাদের দল-পতি চাও কাং ঐ 'টীন'-শব্দটা এ-জন্মের মতো পার হয়েছে। তার বয়েস কুড়ি। আমাদের দলের সবচেয়ে ছোট ছিল হাও তাং-নান—তার বয়স বারো। তাকে পিতৃদত্ত নামে আমরা কেউ ডাকতাম না। আমরা সবাই ওকে ডাকতাম 'ঠাকুরঝি' বলে। ভারি চটে যেত সে। ঐ নামেই তাকে ক্ষ্যাপাতাম আমরা। কারণটা করুণ এবং মজার। বেচারির হাফ-প্যাণ্ট আছে একখানা, কিন্তু গায়ের কুর্তাটার এক-এক অংশ রয়ে গেছে এই লঙ্-মার্চের ক-হাজার লি পথের বাঁকে-বাঁকে। বেচারীকে শীতে কাঁপতে দেখে একটি চাষীর বউ তার একটি ফ্ল্যানেলের ব্লাউজ পরতে দিয়েছে। বুঝুন কাণ্ড ! গাঢ় লাল রঙের ব্লাউজ, হলুদ ফুলকাটা। আমাদের ঠাট্টা-তামাশায় বেচারির চোখে জল আসে, তবু শীত যেদিন খুব বেশী পড়ে 'ঠাকুরঝি' ঐ ব্লাউজটা বাধ্য হয়ে

গায়ে দেয়।

ঐ যে চাষীর বউটা ওকে ব্লাউজ দিয়েছিল না?—তাকে দেখতে, বিশ্বাস করুন, ঠিক আমার মায়ের মতো। মুখটা অন্য রকম, কিন্তু একই বয়স, একই ঢঙের ছেঁড়া কুর্তা গায়ে, আর কাছে যেতে একটা গন্ধ পেয়েছিলাম—ঠিক মায়ের গায়ের গন্ধ।

তাহলে গোড়া থেকেই বলি ব্যাপারটা।

আমার দেশ হচ্ছে সিচুয়ান-প্রদেশের তায়ী জেলার একটা নগণ্য গ্রামে। বাড়িতে ছিলাম আমরা আটজন। বাবা-মা-দিদি, দাদু-দিদা, দুটি বলদ আর একটি কুকুর। বাবাকে অবশ্য আমি খুব কম দেখেছি। ছুটি-ছাটায় যখন সে গাঁয়ে আসত। আমার বাপের যেমন ছিল স্বাস্থ্য তেমনি সাহস—তাই তাকে জোর করে সৈন্যদলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীতে। আমাদের এলাকায় জমিদার ছিল লিউ ওয়েন-ছাই। মূর্তিমান শয়তান! যুদ্ধবাজ, অত্যাচারী, তার উপর কুওমিনতাঙ-দলে গুপ্ত সমিতির সর্দার। তার বংশের দখলে ছিল দু'লক্ষাধিক মু (প্রায় এক লক্ষ বিঘা) জমি। শুধু ওর নিজের খাস-দখলেই ছিল বারো হাজার মু চাষের জমি। বছরে খাজনা হিসাবে তার খামারে জমা পড়ত সত্তর হাজার মণ শস্য! তাতেও তার পেট ভরতো না; সে খেত পুরুষমানুষের বুকের রক্ত, আর সন্ত প্রসূতি মায়েদের বুকের···

ঐ লিউ ওয়েন-ছাই শয়তানটাই আমার বাবাকে জোর করে লড়াইয়ে পাঠিয়েছিল। বলদ জোড়া নিয়ে বুড়ো-বয়সে দাদুকেই চাষে নামতে হতো। দিদা ছিল দুব্‌লা মানুষ—ঘরে বসে পাহারা দিত। অগত্যা আমার মাকেই যেতে হতো মাঠে, দাদুর সঙ্গে মাটি কোপাতে, ঝাড়াই-মাড়াই করতে। দিদিও যেত মাঝে মাঝে সাহায্য করতে। আমি আর কী করব? আমার বয়স তখন ছয়-সাত। দিদার কাছে বসে বসে পুরানো দিনের গল্প শুনতাম।

প্রতি বছর খাজনা আদায়ের সময় হলে, অর্থাৎ ফসল-কাটা শেষ হলে খাজনা দেওয়ার দিন ধার্য করে দিত লিউ। খবরের কাগজে সেটা ছাপিয়ে দেওয়া হতো। তা—খবরের কাগজ আর আমাদের গাঁয়ে কে পড়ে? তাই ঢেঁড়িদার এসে সেটা ঘোষণা করে যেত। তারপরেই শরৎকালীন ফসল তোলার কদিনের মধ্যে দেখা যেত সারি সারি মানুষ চলেছে লিউ ওয়েন-ছাই-এর খামার বাড়ির দিকে। তাদের কাঁধে, পিঠে, ঠেলা গাড়িতে শস্য বোঝাই। ওরা সারা বছর দু-বেলা খেতে পাক আর না পাক, সবার আগে মিটিয়ে দেয় জমিদারের পাওনা। ফসলের বেশী পরিমাণটাই খাজনা দিতে হয়। আল-পথের উপর দিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো পিল্ পিল্ করে চলতো মানুষ।

আজও চোখ বুজলে দেখতে পাই দৃশ্যটা (চিত্র—২৫)। লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে দিদা চলেছে, তার পিঠে মস্ত বোঝা। দি'দি বেচারি পিছন থেকে ঠেকো দিতে চাইছে। তার চোখ দুটো জল জল করছে। মায়ের পিঠেও বোঝা—তবু অসুস্থ দিদাকে হাত বাড়িয়ে সামাল দিচ্ছে। আর সবার চেয়ে কাহিল অবস্থা দাদুর। বেচারির পিঠে একটা প্রকাণ্ড ধানের বস্তা। রীতিমতো কুঁজো হয়ে গেছে বুড়ো মানুষটা!

বছরের পর বছর এ দৃশ্য দেখতাম, মানে বুঝতে পারতাম না। কেন এমন হয়? আমরা খিদের জ্বালায় ছটফট করি। তবু সব ধান দাদু-দিদা-মা ঐ জমিদার বাড়িতে দিয়ে আসে কেন? দিদিকে শুধাই ; সে বলে—তুই বুঝবি না।

সত্যিই বুঝতে পারতাম না। ছোট ছিলাম কিনা। হিসাবটাও বড় শক্ত। আমাদের জমি ছিল যাকে বলে সোনা-ফলানো। দাদু আর মা খাটতো জান দিয়ে। ফসলকাটার পরে আমাদের উঠান ভরে যেত ধানে—ধানের পাহাড়। বেশ মনে পড়ে—বড় বড় বেতের ধামাতে যখন ধান ভর্তি করা হতো তখন দিদি আর মা সেটা টেনে তুলতেই পারত না (চিত্র—২৬)। তাহলে মায়ের জামা কেন অমন ছেঁড়া? কেন খিদে পেলে মা আমাদের খেতে দেয় না? বাবাকেই বা কেন তাহলে বিদেশে চাকরি করতে হয়?

ক্রমে সেটা বুঝতে শিখলাম। ইতিমধ্যে দাদু আরও বুড়ো হয়ে গেছে। তার চোখে কী যে হলো, ক্রমশ অন্ধ হয়ে গেল বেচারি। আমাদের গাঁয়ে ডাক্তার ছিল না এমন নয়, কিন্তু তাকে দিয়ে চোখটা দেখাবার মতো পয়সা ছিল না দাদুর। বাবা তো তখনও বিদেশে। নিজে নিজেই চিকিৎসা করল দাদু—কী-সব শিকড়-বাকড়ের রস দিল চোখে। একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তা বলে তো খাজনা দেওয়া বন্ধ হতে পারে না? অগত্যা মা একাই যায় মাঠে—বলদ-জোড়াকে নিয়ে। দিদির বয়স তখন এগারো বারো। সে আর কতটুকু সাহায্য করতে পারে? তবু মায়ের পিছু পিছু মাঠে যেত। এত করেও সে বছর যথেষ্ট ফসল ফলানো গেল না। বৃষ্টিও সে বছর কম হলো। আমাদের সংবৎসরের খাবারের সংস্থান তো দূরের কথা, খাজনা দেবার মতো ধানও জন্মালো না। মাথায় হাত দিয়ে বসল দাদু। বেচারী চোখে একেবারেই দেখে না। না হলে হয়তো নিজেই দরবার করতে যেত জমিদারের কাছে। শেষ পর্যন্ত চোখের জল মুছতে মুছতে আমাদের ভাই বোনকে সঙ্গে নিয়ে মা একাই গেল কাছারি বাড়িতে। বুদ্ধিটা দাদুরই। বললে, ওদের দুজনকেও সঙ্গে নিয়ে যা ; দুধের বাচ্ছা দুটোকে চোখে দেখলে হয়তো দয়া হবে জমিদার মশাইয়ের। হয়তো কিছুটা ছাড় দেবে।

সেই প্রথম দেখলাম লিউ ওয়েন-ছাইয়ের কাছারী বাড়ি। চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মস্ত ফটকের ভিতর ঢুকতে আমার রীতিমতো গা-ছমছম করছিল। দিদি আমার কানে কানে বলে, কিরে বাচ্ছা-লিয়াও, ভয় করছে?

আমি শুধু বললাম, হুঁ!

: দূর বোকা ছেলে! ভয় কি! এখনই তো খাজনা জমা দিয়ে ফিরে আসব।

প্রকাণ্ড বড় সিং-দরজা। তার ভিতরে নানান আয়োজন—আফিং-পান-কক্ষ, কাছারী, গুদামঘর, জলসা-ঘর, খাজাঞ্চীখানা, হলফী 'ভাইদে'র অভ্যর্থনা-কক্ষ, বৌদ্ধ মন্দির—কিন্তু ওটা কী? একটা ঘর থেকে আর্তনাদ ভেসে আসছে। দিদি আমার কানে কানে বললে, ওটা কয়েদখানা! যারা খাজনা দিতে পারে না, তাদের ওখানে কয়েদ করে রাখে। চাবুক মারে!

সব কিছু মনে নেই—এটুকু মনে আছে, মাপ করে দেখা গেল আমরা যে শস্য এনেছি তা খাজনার দেয় পরিমাণের কম। সে-কথা জানাই ছিল মায়ের। সে অনেক কাকুতি-মিনতি করল। আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলল বারে বারে। খাজাঞ্চীখানার বড়বাবু তাতে কর্ণপাতও করল না। যমদূতের মতো দু-জন লোক এসে মাকে ধরে নিয়ে কোন্ দিকে চলতে থাকে। দিদি আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল সঙ্গে।

এটাই তাহলে কয়েদখানা! ওরা মাকে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল কয়েদখানার ভিতরে।

সে-দৃশ্যটাও আমি ভুলিনি (চিত্র—২৭)। ফাটকের ভেতরে মা, আর বাইরে আমরা দুজন। যে টুকরিটাতে করে আমরা খাজনা এনেছিলাম সেটা আঁকড়ে আমরা ভাই-বোন কয়েদখানার বাইরে বসে আছি—আর মা দু-হাতে কাঠের গরাদ চেপে ধরে তার ফাঁকে মাথাটা রেখে শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। দিদি কাঁদছিল, কিন্তু মায়ের চোখে জল ছিল না, ছিল আগুন!

সারাটি দিন এভাবেই কাটল। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছিল—কিন্তু সে-কথা মাকে বলতে পারছিলাম না। ছোট হলেও এটুকু বুদ্ধি হয়েছে যে, মাকে ওরা আটক করে রেখেছে—ইচ্ছে থাকলেও মা আমাকে এখন খেতে দিতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে ওখানে বসিয়ে রেখে দিদি বাড়ি গেল। দাদুকে ডেকে আনতে। কিছু একটা করতে হবে তো? দাদু অসুস্থ, অন্ধ মানুষ। তবু লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ করতে করতে দিদির হাত ধরে সে এলো 'খাজনা আদায়ের কাছারি'তে। কী যে হলো তখন বুঝিনি। শুধু দেখলাম—অন্ধ বুড়ো মানুষটা একটা কাগজ হাতে এগিয়ে এলো (চিত্র—২৮)। দিদিই তাকে হাত ধরে নিয়ে এলো কয়েদখানায়। মা

ছাড়া পেল। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। দাদু, মা আর আমি। না, দিদি নয়। দিদি সেখানেই রয়ে গেল! মাকে বললাম, দিদি? দিদি আসবে না?

মা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল!

তখন বুঝিনি, আজ বুঝতে পারি—দাদু বাধ্য হয়ে দিদিকে বেচে দিয়ে এসেছিল। মাকে উদ্ধার করতে! দাদুর হাতের ঐ টিরকুটটা সেই বিক্রয়-পত্রের দলিল। খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় নির্ব্যূঢ়-সর্তে সে নাতনীকে 'দাসী' হিসাবে বেচে দিয়েছে! 'দাসী!' তার মানে কি? তার মানে, সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না আমাদের বাড়ি। ঐ কাছারিখানায় গতর দিয়ে খাটবে। ঝাঁট দেবে, মাল বইবে, কাপড়-জামা কাচবে, যতদিন না…যতদিন না ওর ঐ বারো বছরের দেহে যৌবন-চিহ্ন ফুটে ওঠে। আর তারপর…দিদিরে! তোকে আমি ভুলিনি! কোনোদিন ভুলব না…

•

দাদু এরপর আর বেশী দিন বাঁচে নি। অন্ধ মানুষটা নিষ্কৃতি পেল। দিদা তখনও বেঁচে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না।

সংসারে রইলাম মাত্র আমরা তিনজন—মা দিদা আর আমি। বলদজোড়া ইতিপূর্বেই মা বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কুকুরটাও মারা গেছে। জমি-জেরাত যা ছিল পরের বছর খাজনা দিতে না পারায় তাও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। থাকার মধ্যে তখন ছিল ঐ মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু। সেটাও গেল বাকি খাজনার দায়ে।

পথে বার হলাম আমরা তিনজন। দিদা, মা আর আমি। এবার গাছতলা। ভিক্ষা চাইতাম বুদ্ধ মন্দিরের সামনে। ঐ সময়েই ফিরে এলো বাবা। বজ্রাহত হয়ে গেল সে। প্রথমেই গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। সেটা বেহাত হয়ে গেছে। এমন ভর-ভরন্ত সংসারের একটি প্রাণীকেও খুঁজে পায় নি—দাদু-দিদা-মা-দিদি-আমি, কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। অনেক খুঁজে খুঁজে সে শেষ পর্যন্ত এসে বুদ্ধমন্দিরের সামনে খুজে পেল আমাদের। সে দৃশ্যটাও আমি ভুলব না। বাপির বুকে মুখ লুকিয়ে মায়ের সে কী ফুলে ফুলে কান্না! বাপির চোখে কিন্তু সেদিন জল দেখি নি, দেখেছি আগুন! ঠিক যেমন কয়েদখানায় দিদি কাঁদছিল, আর মায়ের চোখে জ্বলছিল আগুন! এই বোধহয় নিয়ম—একজন যখন কাঁদে, আর একজন তখন আগুন জ্বালিয়ে রাখে চোখের কোণায়! তাই তো এখন আর আমি কাঁদি না। ওদের সকলের হয়ে আমি ঐ আগুনটুকু জিইয়ে রেখেছি আমার চোখের কোণায়।

বাপি তখনই ছুটতে চায় খাজাঞ্চীখানায়! দাদু ফিরবে না, কিন্তু দিদি? মা আর দিদা অনেক করে বোঝালো—আইন-কানুনের হিসাব। গায়ের জোরে দিদিকে

ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার একমাত্র উপায় বাকি-খাজনা শোধ করা। তবু বাপি গিয়েছিল কাছারী-বাড়ি—দিদিকে একবার চোখের দেখা দেখতে। ওরা সে সুযোগ তাকে দিল না। বললে, বাকি খাজনা জমা দিয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার। রসিকতা করে বললে, তোমার মেয়ে এখনও বড্ড কচি আছে, তাকে আমরা এখনও হারেমে পুরি নি। মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার শখ যদি থাকে তবে একটু তাড়াতাড়ি কর বাপু! আর দু-তিন বছরের মধ্যেই নেকড়েগুলো তোমার মেয়েকে খুবলে খেয়ে ফেলবে! তখন এলে মাংস পাবে না, হাড় ক-খানা ফেরত পেতে পার!

বাপি ফিরে এলো। আগেই বলেছি—বাপি ছিল 'বাঘ!' যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি সাহস, তেমনই খাটবার ক্ষমতা। একা হাতেই একটা ছাপরা তুলে ফেলল। বর্গাদারের কাছ থেকে জমি নিল। বলদ নেই, নিজেই জোয়ালে কাঁধ দিয়ে লাঙ্গল দিল জমিতে। দিদিকে ফিরিয়ে আনতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মায়ের উৎসাহও কম নয়। সারাদিন সেও বাপির সঙ্গে মাঠে কাজ করে। বাপি লাঙ্গল টানে, আর মা লাঙ্গলের ফলাটা চেপে ধরে ভিজা মাটির উপর। দিদিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমিও খাটতে চাই—কিন্তু কী করতে পারি আমি? কতটুকু ক্ষমতা আমার? একটি মাত্র সাহায্য করার ক্ষমতা ছিল আমার, তাই করতুম: খিদে পেলে খেতে চাইতুম না। দিদি ফিরে আসুক আগে!

এত করেও কিন্তু কিছু হলো না।

কোথায় বুঝি যুদ্ধ বাধল আবার। তখন বুঝিনি, আজ বুঝতে পারি—গণফৌজের সঙ্গে কুওমিনতাঙের আবার লড়াই বেধে গেল। গণফৌজে স্বতঃপ্রণোদিত সর্বহারা সৈনিক, কুওমিনতাঙের তা নয়, তাদের ভাড়াটে সৈনিক সব। যুদ্ধ বাধলেই জঙ্গী-সর্দারকে প্রতিশ্রুতি মতো সৈন্য সরবরাহ করতে হয়। অগত্যা আমাদের জমিদার বাপিকে তলপ করে পাঠালো—যুদ্ধে যেতে হবে আবার। বাপি রাজী তো হলোই না, বরং যারা ওকে ডাকতে এসেছিল তাদের মেরে-ধরে হাঁকিয়ে দিল।

বলতে ভুলেছি, ইতিমধ্যে আমার একটি ভাই হয়েছে: চেন-তু! বাপি যেদিন জমিদারের লোককে মেরে ভাগালো, মা তখনও আঁতুড়ে। না হলে নিশ্চয় বাধা দিত। দিদা তার রোগশয্যা থেকে উঠে এসেছিল। বললে, এ তুই কী করলি বাপ! গায়ে হাত দিলি?

: দেব না?—রুখে উঠেছিল বাপি। বলেছিল, আমি তো বলেইছিলাম—আমার মেয়েকে ফেরত দাও তাহলেই আমি আবার যুদ্ধে যাব। তাতে রাজী হলো?

দিদা বললে, এ যে তোর অন্যায় কথা বাবা! ওরা খুকিকে 'দাসী' করেছে বাকি খাজনার দায়ে। ধান দিয়ে তো ধার শোধ করতে হবে।

: ধান কেন ? আমি তো রক্ত দিয়ে শোধ করতে চাইলাম। যুদ্ধে গিয়ে তো আমি মারাও যেতে পারি ! পারি না ? তাতে শোধ হয় না ঋণ ?

: এই যে দেশের কানুন বাবা !

: ঝাঁটা মারি অমন কানুনের মাথায় !

তিন দিনের মাথায় জমিদারের লোকজন সদলবলে ফিরে এলো। বাপির গায়ে অসীম ক্ষমতা, কিন্তু এবারে এসেছে বন্দুকধারী !

না ! সে-দৃশ্যটাও আমি জীবনে ভুলব না !

বাপিকে ওরা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল, জাহাজ-বাঁধা মোটা কাছি দিয়ে। চোখে বেঁধে দিল ন্যাকড়ার ফেট্টা ! চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল আমার চোখের সামনে দিয়ে। আমি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিলাম বাপির বাঁ-হাঁটুটা (চিত্র—২৯)। মা আমার সেই ছোট্ট এক ফোঁটা ভাইটাকে তার বুকে জড়িয়ে হামা দিয়ে এগিয়ে এলো। কত কাতর অনুনয়-বিনয় করল। গাঁয়ের মোড়ল—সেই পেটমোটা জমিদারের পেয়ারের লোকটা মাকে এমন লাথি মারল যে, মা অজ্ঞান হয়ে গেল। তখনও আমি বাপির পা ছাড়ি নি। ঠিক তখনই আমার পিঠে পড়ল চাবুকটা ! যেন জ্বলন্ত একটা লোহার ডাণ্ডা ! আমার গায়ে তো জামা ছিল না, আর শরীরও খুব দুর্বল। একটা চাবুক খেয়েই আমি জ্ঞান হারালাম ! তারপর কী হয়েছিল আর জানি না !

কত কাণ্ডই না হয়ে গেল আমার এই তের বছরের ছোট্ট জীবনে। বাপিকে সেই যে ধরে নিয়ে গেল আর তাকে দেখি নি। দিদিকেও নয়। দিদা মারা গেল মায়ের শোকে। মা ? সে-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না ! তা আমি মুখ ফুটে বলতে পারব না ! তবে সে দৃশ্যটাও আমি ভুলি নি।। সেদিন আমি বুঝতে পারি নি —কেন ওরা চেন-ভুকে ফেলে রেখে ও-ভাবে মাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মা তখনও খুব দুর্বল। সন্তান হওয়ার মাস খানেক পরের কথা। মা তো এখন ওদের ঘরে কোনোও কাজ করতে পারবে না—ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, কাপড় কাচা—দিদি যে সব কাজ করত। তাহলে মাকে কেন অমন করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল জমিদারের লোকেরা ? তখন জানতাম না, আজ জানি শুধু পুরুষমানুষের বুকের রক্ত খেয়েই পেট ভরত না ঐ জমিদারের, সে সদ্য-প্রসূতি মায়েদের…না ! কিছুতেই না ! সে সব কথা আমি বলতে পারব না (চিত্র—৩০) !

মা !…মা গো !—জানি না, তুই আজও বেঁচে আছিস্ কিনা ! তবে ঐ যে চাষীবউটা, যে ঐ ঠাকুরঝিকে ফ্ল্যানেলের ব্লাউজটা দিল, ওকে দেখে অনেক—অনেক দিন পরে আজ তোর কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে ! চাষীবউটা আমাকে কোলে

টেনে নিয়েছিল! বিশ্বাস কর—ওর গায়ে ঠিক তোর গন্ধ! সেই সোঁদা-সোঁদা, মা-মা গন্ধ! আমার ভারী ইচ্ছা করছিল ওকে 'মা' বলে ডাকি! লজ্জায় ডাকতে পারি নি।

তুই জানিস্ না, কিন্তু তোকে ধরে নিয়ে যাবার পরেই চেন-তু মরে গেল। দিদাও বাঁচল না। আমিও হয়তো না খেয়ে মরে যেতুম—কিন্তু মরি নি। কমরেড চাও কাং আমাকে বাঁচিয়েছে। সেই আমাকে নিয়ে এসেছিল এই গণফৌজে। ঘুরতে ঘুরতে এতদিনে 'তাতু' নদীর কিনারায় এসে পৌঁছেছি। এ নদীর ওপারেই তো আমার দেশ: সিচুয়ান। তারী জেলাও বেশী দূরে নয়! লালফৌজের সঙ্গে নিশ্চয় যাব আমাদের গাঁয়ে। তুই বেঁচে আছিস্ কি না, দিদি বেঁচে আছে কি না জানি না—তবে শুনেছি সেই নররাক্ষসটা বেঁচে আছে: লিউ ওয়েন-ছাই! পুরুষ-মানুষের বুকের রক্ত খেয়েও যার তৃষ্ণা মেটে না! বিশ্বাস কর মা! প্রতিশোধ আমি নেবই! তোদের সবার হয়ে—দাদুর, দিদার, বাপির, দিদির, তোর—আর হ্যাঁ, আমার সেই ছোট ভাই চেন-তুর হয়ে! যে বেচারী মায়ের বুকের দুধ না পেয়ে তিন মাস বয়সে মারা গেল। তাই তো আমি কাঁদি না—চোখের কোণে আগুন জিইয়ে রেখেছি। সেই আগুন—যা দেখেছি তোর চোখে, বাপির চোখে! লিউ ওয়েন-ছাই! দুনিয়ায় কোনো শক্তি নেই যে এই তের বছরের বাঘের-বাচ্চার হাত থেকে তোকে রক্ষা করতে পারে।[১]

বস্তুত আমার দলের সবাই ওস্তাদ লড়নেবালা—তাই তো এ গুরুদায়িত্ব বর্তেছে আমাদের উপর।

সমস্ত দিন আমরা পথ চলেছি। চার ঘণ্টা অন্তর দশ-মিনিটের বিশ্রাম। এভাবে সারাটা দিনে আমরা ৪৬ মাইল পথ অতিক্রম করেছি।[৪] জঙ্গলের ভিতর সবাই গাছতলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লাম। শুকনো-খাবার কিছু ছিল সঙ্গে; রান্নার হাঙ্গামা করতে হলো না। এক এক মুঠো ঐ শুকনো খাবার চিবিয়ে আঁজলা ভরে তাতুর জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

শেষ রাত্রে কমাণ্ডার ওয়াং আমাকে ডেকে তুলল। বলল, এইমাত্র আমাদের রেডিও মনিটর একটি সামরিক আদেশ পেয়েছে হেড কোয়ার্টার্স থেকে। মেসেজটা ডি-কোড করে অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছে আমাকে দেখাতে চাইল। একটা দেশ-লাই কাঠি জ্বেলে সেটা পড়ে ফেললাম। সংক্ষিপ্ত আদেশ। লেখা ছিল :

"পঁচিশ তারিখের ভিতর লুটিন ঝুলা সাঁকো দখলে নিতেই হবে! তোমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ বীরত্বের রেকর্ড বলছে, এ কাজ তোমরা নিশ্চয় পারবে। তোমাদের অভিনন্দন জানাতে গোটা লাল-ফৌজ তোমাদের অনুসরণ করে আসছে—

—জেনারেল লিন পিয়াও।"

ওয়াং শুধু বললে, পঁচিশে! অর্থাৎ আগামীকাল!

আমি বলি, জানি, আর এও জানি, লুটিন-ঝুলা এখনও আশি মাইল। আমার মনে হচ্ছে দুই অভিনন্দনের মধ্যে আমরা স্যাণ্ডুইচ হয়ে পড়েছি!

ওয়াং বলে, মানে?

: আমাদের অভিনন্দন জানাতে লালফৌজ আসছে পিছন-পিছন, আর সামনে শত্রু সৈন্য আমাদের উদ্দেশ্যে তোপধ্বনি করতে কামান সাজিয়ে রেখেছে!

আধ ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হলাম আমরা। ভোরের আলো তখনও ফোটে নি ভালো করে। পথে দু-দুবার পাহাড়ের উপর থেকে আক্রমণ হলো। কিন্তু যারা আক্রমণ করছিল তারা পালাতে শুরু করল আমরা মেশিনগান চালানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিপ্রহরে আমরা মোসিমিন এসে পৌছলাম। পাহাড়ের গায়ে ছোট গ্রাম। গ্রামবাসীরা আমাদের কোনো বাধা দিল না। দোকান-পত্রে যা খাবার পাওয়া গেল তাই কিনে খাওয়া হলো। দাম দিলাম নগদে—নোট নেবে না; রূপার ডলারে। দোকানদারগুলো অবাক হলো—সৈন্যদল খেয়ে দাম দেয় এটা নাকি ওরা আগে কখনও দেখে নি। আমরা ঐ সুযোগে বুঝিয়ে দিলাম আর পাঁচটা ফৌজের সঙ্গে পিপল্‌স্ লিবারেশন আর্মির কী পার্থক্য।

মোসিমিন ত্যাগ করার পরেই তাতু নদীর একটি উপনদী। তার উপরের

সাঁকোটা শত্রুপক্ষ ভেঙে দিয়ে গেছে। সেটা মেরামত করতে ঘণ্টা দুই লাগল। এক-পক্ষে ভালই হলো—এঞ্জিনিয়ারিং স্কোয়াড বাদে আর সবাই কিছু বিশ্রাম পেল। ওপারে আবার একটা পাহাড়ে-গ্রাম—মাত্র দশ বারোটি কুঁড়ে ঘর। সেটাকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলি আমরা। লুটিন-ঝুলা এখনও চল্লিশ মাইল।

বিপদ আর ভেড়ার পাল কখনও একা আসে না। শুরু হয়ে গেল পাহাড়ে বৃষ্টি। বৃষ্টি নয়, শিলা বৃষ্টি। যেন পাহাড়ের মাথায় বসে কেউ মেশিনগান চালাচ্ছে। এত অন্ধকার হয়ে গেল যে,সামনের পথ দেখা যাচ্ছে না। দিনের আলো তখনও থাকার কথা, ঘড়ির হিসাবে। আমরা সামনের লোকের বেল্ট ধরে সাবধানে পথ চলতে থাকি। বাঁয়ে খাড়া পাহাড়, ডাইনে কয়েক শত ফুট নিচে তাতু গজরাচ্ছে।

ঘনিয়ে এলো রাতের অন্ধকার। হঠাৎ নজর হলো নদীর ওপারে—আমাদেরই সমতলে পাকদণ্ডী পথ বেয়ে চলেছে আর একটি সৈন্য বাহিনী, একই দিকে। উত্তর-মুখো। তাদের হাতে মশাল জ্বলে উঠতেই নজর হলো ওটা। স্পষ্ট বোঝা গেল ওরা শত্রুসৈন্য—লিউ ওয়েনের কোনোও ব্যাটালিয়ান। ওদের মশাল জ্বালা দেখে আমা-দেরও বুদ্ধি খুলে গেল। আমরাও মশাল জ্বাললাম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। তাতু নদীর দুই পারে দুই দল সৈন্য চলেছে। পাশাপাশি মশাল জ্বেলে। ওপক্ষ থেকে বিউগল্ ধ্বনি হলো। আমরাও জবাব দিলাম। আমরা চেয়েছিলাম ওদের ধোঁকা দিতে—যাতে ওরা মনে করে আমরা ওদেরই দলের। কী বুঝল ওরা তা ওরাই জানে!

কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল: নদীর পুব-পারের ঐ শত্রু-বাহিনী লুটিনঝুলায় উপনীত হবার আগেই আমাদের লড়াই ফতে করতে হবে। না হলে আমাদের কোনোও আশা নেই কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? আমরা চলেছি সমান্তরাল পথে, প্রায় একই গতিতে।

ঘটনাচক্রে পথের একটি বাঁকে দুদিকেই পাহাড়টা খাড়া—অর্থাৎ দুপাশের দুই পাকদণ্ডী পথ এসে গেল বেশ কাছাকাছি। মশালের আলোয় এখন বলে দেওয়া যাচ্ছে কোন লোকটা বেঁটে, কে লম্বা! দু-পারের দূরত্ব একশ গজও হবে না। ওপার থেকে সেচুয়ানি দেহাতি ভাষায় ওরা চিৎকার করে প্রশ্ন করে: তোমরা কারা?

আমাদের সেকেণ্ড কোম্পানির লিয়াও তা-চু হচ্ছে খাস সেচুয়ানি চাষী। একে-বারে দেহাতি খিস্তি ঝাড়ল সে: মাও ৎসে তুঙের যম! তোমরা?

ও পাশের লোকটা চিৎকার করে ওঠে: তবে তোমাদের স্যাঙাৎ।

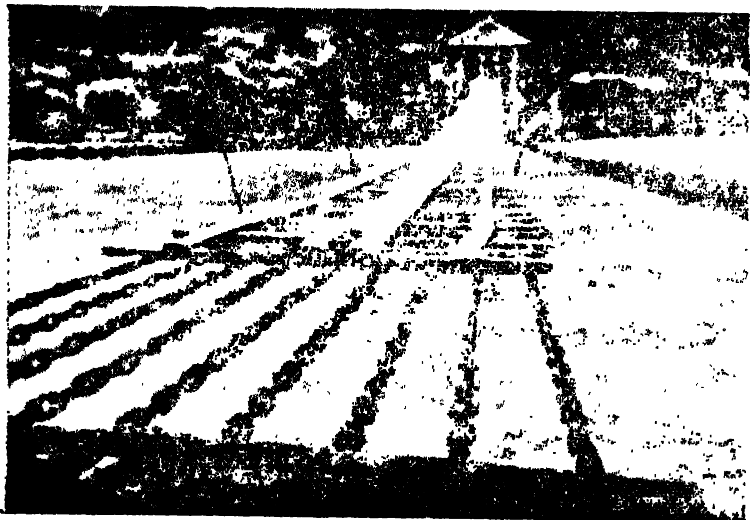
লিয়াও জবাব দেয়, লুটিন-ঝুলায় মোলাকাৎ হবে।

আর নিম্নকণ্ঠে জুড়ে দেয়, সেখানেই তোমাদের যমের বাড়ি পাঠাব, স্যাঙাৎ।

আমাদের বাহিনী সমস্বরে অট্টহাস্য করে ওঠে। হাসি সংক্রামক। ওরাও সমস্বরে হৈ-হৈ করে ওঠে। আবার পাকদণ্ডীর বাঁকে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

এর পরেই নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। ওপারের সৈন্যদল মশাল নিভিয়ে ফেলল। বোঝা গেল, এই বৃষ্টিতে ওরা আর পথ চলবে না। ওরা রাত্রিবাসের জন্য প্রস্তুত হলো। এই আমাদের সুযোগ। ওদের আগে যদি আমাদের লুটিন-ঝুলায় পৌঁছাতে হয় তবে আজ সারারাত আমাদের হাঁটতে হবে। তাই করলাম আমরা। নীরন্ধ্র অন্ধকার। শুধু বাহিনীর পুরোভাগে বৈদ্যুতিক টর্চ জেলে পথ খুঁজে খুঁজে এগিয়ে চলেছে অগ্রগামীর দল—তার পিছনে আমরা সবাই চলেছি পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে। সারা রাত। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ছে, ঢুলে পড়ছে—অমনি পিছনের লোক তাকে ধরে নাড়া দিচ্ছে!

এভাবে সারারাত পথ চলে আমরা সকাল ছয়টা নাগাদ উপস্থিত হলাম লুটিন-ঝুলার পশ্চিম পারে। সেখানে জনমানব নেই। মানুষ নেই, ঘর আছে। ফাঁকা। মানুষজন সব পূবপারে। সেখানেই লুটিন গ্রাম—কিছুটা নদীর কিনারে, বাকিটা পাহাড়ের ঢালুতে।



চিত্র—৩২
কঙ্কালসার লুটিন-ঝুলা [সমসাময়িক আলোকচিত্র]

আমি রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার ওয়াংকে নিয়ে সাঁকোটা দেখতে গেলাম। অপূর্ব সাঁকোটা। দুই পাহাড়ের মাথায় শেকলের দু-প্রান্ত বাঁধা। সর্বসমেত তেরটা শেকল।

দু-পাশে দুই-দুকুনে চারটে শেকল হচ্ছে রেলিং আর বাকি নয়টা পথের সমতলে। তার উপর এতদিন পাতা ছিল কাঠের তক্তা। এখন কঙ্কালসার। কাঠের তক্তা ওরা সরিয়ে নিয়ে গেছে ওপারে চলে যাওয়ার সময়। শেকলের এক একটা আংটা প্রমাণ-সাইজ থালার মতো বড়। বহু নিচে ফেনিল উচ্ছ্বাসে বয়ে যাচ্ছে তাতু নদী। (চিত্র—৩২)। বিনা পাটাতনে ঐ সেতু পার হতে পারে একমাত্র সেই লোক যে, সার্কাসে ট্রাপিজের খেলায় অভ্যস্ত! সাঁকোর প্রান্তে একটা পাথরের ফলক; তাতে কবিতার দুটি চরণ উৎকীর্ণ করা:

লুটিন ঝুলারে দোল দেয় দুই আকাশচুম্বী গিরি।
সাবধানে চল পথিক! এ নয় স্বর্গে যাবার সিঁড়ি॥

প্রাঞ্জল সাবধানবাণী! দুঃখ এই যে, যে-কবি ঐ কবিতাটি রচনা করেছিলেন তিনি পাটাতন-সমেত লুটিনঝুলাকেই দেখেছিলেন—ঝুলার এ কঙ্কাল নয়।

ফিল্ড-গ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখলাম—ওপারে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে মেশিনগান বসানো আছে। ওরা প্রস্তুত হয়েই আমাদের প্রতীক্ষা করছে। সাঁকোর এপারে আমাদের দেখতে পেয়েই ওপার থেকে ওরা চিৎকার করে উঠল: আসুন! আসুন! আমরা আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত!

সকালবেলাটা গেল এলাকাটা ঘুরে দেখতে: ইতিমধ্যে রান্না হয়ে গেছে। সবাই কিছু খেয়ে নিল। কাল সকলেরই প্রায় উপবাস গেছে। বেলা এগারোটা নাগাদ একটা জরুরী মিটিং ডাকলাম। তার আগেই একটি কোম্পানিকে পাঠিয়ে দিলাম মাইল পাঁচেক দক্ষিণে—যে পথে আমরা এসেছি। ওখানে নদীর বিস্তারটা কম। ওরা ওখানে রুখবে সেই সৈন্যদলকে—যারা কালরাত্রে আমাদের সমান্তরালে আসছিল নদীর পুবপার দিয়ে। পথের মাঝখানেই তাদের রুখতে না পারলে আমাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠবে।

আমরা লুটিন-ঝুলার সামনে একটা প'ড়ো বাড়িতে জরুরী অধিবেশনে বসলাম। আক্রমণের পরিকল্পনা করতে। কিন্তু মিটিং শুরু হতেই ওপার থেকে আমাদের ঘরটা লক্ষ্য করে ওরা কামান দাগতে শুরু করল। আমি সকলকে সম্বোধন করে বললাম, কমরেডস্! ওপার থেকে ওরা তাগাদা দিচ্ছে। মিটিং আমাদের সংক্ষিপ্ত করতে হবে। একটিই বিবেচ্য বিষয়: কোন্ কোম্পানি সবার আগে যাবে—

আমার কথা শেষ হবার আগেই উঠে দাঁড়াল সেকেণ্ড কোম্পানির কমাণ্ডার লিয়াও তা-চু। বললে, আমার কোম্পানিকে এ সুযোগ দেওয়া হোক। উ নদীর তীরে ফার্স্ট কোম্পানিকে সেই গৌরব দেওয়া হয়েছিল। এবার আমাদের দাবী মানতে হবে।

প্রথম কোম্পানির লীডার তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমরা কিন্তু চাই ও সুযোগ আমাদেরই দেওয়া হোক। উ-নদীতে আমাদের যে কজন শহীদ প্রাণ দিয়েছে তারা রক্তের বিনিময়ে আমাকে এই দাবী পেশ করতে উদ্বুদ্ধ করছে।

তিন নম্বর কোম্পানির দলপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, সুযোগ প্রতিবারই দেওয়া হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় কোম্পানিকে। এবার যদি আমাদের এ সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে আমি আমার কোম্পানির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না!

কমাণ্ডার ওয়াং আমার পরামর্শ চাইলেন। কী বলব? ওদের আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন কোনো বোনাস্ চাইছে। সবাই বলছে, 'আমাদের দাবী মানতে হবে!' আগে মরার দাবী! বেশ বোঝা যায়—ওরা লুটিন-ঝুলার সামনে প্রস্তরে উৎকীর্ণ সাবধানবাণীটার মর্মোদ্ধার করে নি আদৌ।

'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি!'

আমি গভীর কণ্ঠে বললাম, কমরেডস্! মরবার সুযোগ তোমরা চাইছ! তা পাবে! আগে-পিছে কোনো কথা নয়! ঐ লুটিন-ঝুলার প্রত্যেকটি শিকলের এক দাম—কে আগে আছে, কে পরে আছে সেটা গৌণ। যে কোনো একটি চেন ছিঁড়ে গেলেই লুটিন-ঝুলার মৃত্যু! তোমরাও এই লালফৌজের এক একটি শেকল—তা আগেই থাক' আর পরেই থাক'। আমার নির্দেশ মেনে নাও: পুরোভাগে থাকবে বাইশজন সৈনিক—দুই নম্বর কোম্পানি থেকে। তাদের নেতৃত্ব দেবে কমাণ্ডার লিয়াও! কিন্তু ঠিক তার পিছনে থাকবে এক এবং তিন নম্বর! তাদের কাজটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুই-নম্বর কোম্পানির দেহের আড়ালে তারা দ্রুত-হাতে পেতে দেবে পাটাতন—যাতে আমরা সদলবলে সাঁকোটা পার হতে পারি।

আদেশ হচ্ছে আদেশ। কেউ কোনো কথা বলল না!

তৎক্ষণাৎ তৈরি হলো দুই-নম্বর কোম্পানির বাইশ জন নির্ভীক সৈনিক। ওদের পিঠে বেঁধে দেওয়া হলো তরোয়াল, ওরা মুখে ঝুলিয়ে নিল টোটা ভরা রাই-ফেল, ওদের মাজায় বাঁধা থাকল হ্যাণ্ড-গ্রেনেড। বিউগ্ল্-এর তূর্যনিনাদ হতেই ওরা ছুটে বেরিয়ে গেল সাঁকোটা লক্ষ্য করে। তখন পড়ন্ত বেলা। ঠিক সাড়ে চারটে। ওরা বাইশ জন ছুটে বেরিয়ে গেল ঝোলা সেতুটা লক্ষ্য করে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একের পর এক। যেন ট্র্যাপিজের খেলোয়াড়। এদিকে এগারোজন ওদিকে এগারো-জন। অনেক অনেকদিন পরে মানুষের পদস্পর্শে শিউরে উঠল লুটিন-ঝুলা। দুলতে লাগল গোটা সাঁকোটা। ওরা গুটি গুটি এগিয়ে যাচ্ছে—শম্বুক গতিতে—হাঁটি-হাঁটি-পা-পা নয়; হাতে-হাতে হেঁটে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে রাইফেল।

গর্জন করে উঠল ওপারের বন্দুক। জবাব দিল এপারের গানাররা। ওরা তাক

করছে আমাদের ঝুলন্ত মানুষগুলোকে, আর আমাদের লক্ষ্য ওদের বন্দুকধারী!

: ফায়ার! ফায়ার!—চিৎকার ডুবে যাচ্ছে বন্দুকের শব্দে! মেশিনগানের ক্রটা-ক্রটে!



চিত্র—৩৩

লুটিন ঝুলা সাঁকো

[সমসাময়িক চৈনিক চিত্রকরের স্কেচ অবলম্বনে। বাঁ-দিক থেকে সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে।]

ওদের দেহের আড়ালে টপাটপ্ পাটাতন ফেলে যাচ্ছে দুই আর তিন নম্বরের সৈনিক! ধপাধপ্! ধপাধপ্! সদলবলে এগিয়ে যাচ্ছে পিছনের লোক। যেমন যেমন পাটাতন বসছে তেমন তেমন এগিয়ে যাচ্ছে মেশিনগানধারীরা!

আমরা, যারা যুদ্ধে অংশ নিচ্ছি না, শুধু ঘড়ি দেখছি—কখন শেষ পাটাতনখানা খুলে দেবে এই সাঁকোর পথ—দুর্বার স্রোতে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো প্রবেশ করব—তারা এ দৃশ্য দেখছে নির্বাক বিস্ময়ে!

প্রথম শহীদ হলো মাও তা-চিউ! বেচারির কিছুই করণীয় ছিল না। দু হাতে শিকল ধরে ঝুলছিল। গুলিটা কোথায় লাগল বুঝতে পারলাম না। প্রথমে মুখটা আলগা হয়ে গেল। বহু নিচে নদী-গর্ভে পড়ে গেল তার বন্দুকটা। হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেল মা তা-চিউ-এর। তাতু নদীর দিকে ছুটে গেল তার রক্ত-ঝরা দেহটা!

মাও তা-চিউ ছিল সারির প্রথমে। দ্বিতীয় জন এবার প্রথম হলো। সে কে? চিনতে পারলাম না। প্রশ্ন করতে গেলাম পার্শ্ববর্তীকে, কিন্তু তার আগেই ঝরে পড়ল সে। তৃতীয় জন ততক্ষণে প্রথম। ইতিমধ্যে আরও পাঁচ-সাত শেকল এগিয়ে গেছে ওরা। তিন-নম্বর ছোকরা খসে পড়ল! চার-নম্বর! এ-দৃশ্য আর চোখ মেলে দেখা যায় না! কিন্তু ওরা তবু থামছে না। ঝুলতে ঝুলতে চলেছে! শেষ শিকল

পার হলো এবার! সাবাস! আমাদের সেনা ওপারে পৌছেছে। ঠিক ওপারে নয়—এখনও তারা সাঁকোর উপরেই। ওপ্রান্তে শেষ পনের-কুড়ি ফুট দূরত্বে পাটাতন পাতাই ছিল। তারই উপর ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে নামল ওরা; কিন্তু তার আগেই তীরে দাঁড়ানো কয়েকজন শত্রু সৈনিক সেই কাঠের পাটাতনের উপর ঢেলে দিল পেট্রোল। প্রহরী দল সাঁকোর প্রতিরোধ ভেঙে পালাবার আগে জ্বেলে দিল দেশলাই কাঠি! দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ঐ ক'খানা পাটাতন। এই জন্যই ওরা শেষ ক'খানা কাঠের পাটাতন সরায় নি।

কিন্তু তাতেও বাধা মানল না আমাদের ছেলেরা। জ্বলন্ত আগুন ভেদ করে ছুটে বেরিয়ে গেল ওপারে। ওরা পৌছেছে! ওপারে পৌছেছে! ওরা বড় বড় পাথরের আড়ালে পজিশন নিচ্ছে! ফায়ারিং শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে দুই আর তিন নম্বর কোম্পানি পেতে দিয়েছে কাঠের গুঁড়ি।

সাঁকো আর কঙ্কাল নয়! লুটিনঝুলা নবকলেবর লাভ করেছে। দুর্বার স্রোতে আমাদের ছেলেরা ছুটে গেল ওপারে। শত্রুপক্ষ পালাচ্ছে! প্রাণ ভয়ে ছুটছে! এবার আমরা শোধ নেব। কড়ায় গণ্ডায়! দাঁতের বিনিময়ে দাঁত নয়, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ!

সন্ধ্যার আগেই লুটিন গ্রাম আমাদের দখলে এলো।

আমাদের সাফল্যের তুলনায় ক্ষতি খুবই অল্প—সতের জন শহীদ হয়েছে লুটিন-ঝুলার যুদ্ধে। জনা ত্রিশেক আহত—তার ভিতর জনা দশেক আগুনে পুড়ে গেছে ভীষণ ভাবে। আহতদের নিয়েই আমাদের চিন্তা। মৃতদেহ সৎকার করার প্রশ্ন ওঠে নি—কলোন্মাদিনী তাতু নদী তাদের নিয়ে গেছে সমুদ্রের দিকে।

শিবিরে ক্লান্ত হয়ে সবাই বসে আছি—হঠাৎ সংবাদ এলো নদীর পূর্বপারে দক্ষিণ দিক থেকে একটি বাহিনী আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না—গতকাল রাত্রে এদেরই দেখেছিলাম আমরা নদীর ওপার থেকে। তারা বৃষ্টি শুরু হবার পর রাত্রে পথ চলে নি, তাই আমাদের চেয়ে প্রায় একদিন পরে এসে পৌছেছে। এজন্য আমরা তৈরিই ছিলাম। তৎক্ষণাৎ পজিশান নিল বিভিন্ন য়ুনিট।

শত্রুপক্ষ টের পেয়ে গেছে লুটিন গ্রাম ওদের শত্রুপক্ষের অধিকারে চলে গেছে। ওরা অনায়াস ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো না। ওরাও পজিশন নিল পথের খাঁজে খাঁজে। শুরু হলো গুলি-বিনিময়। দু-পক্ষেই!

এমন অদ্ভুত যুদ্ধ লালফৌজ কোনোদিন লড়ে নি। আগেও নয়, পরেও নয়। কারণ কিছু পরেই বোঝা গেল আমরা যাদের সঙ্গে লড়ছি তারা হচ্ছে লালফৌজেরই ফার্স্ট আর্মি! কর্নেল ইয়াং তে-চুর রেজিমেন্ট!

ভাগ্যের অসীম কৃপা—কোনো পক্ষেই হতাহত হয় নি। বস্তুতপক্ষে ঘটনাটা হয়েছিল হাস্যকর! গতকাল রাত্রে আমরা নদীর ওপারে যাদের দেখেছিলাম তারা সত্যই শত্রুপক্ষের—লিউ ওয়েনের বাহিনী। কিন্তু তাদের পিছন থেকে তাড়া করে আসছিল আবার লালফৌজই—যারা আনশুনচ্যাং-এর ফেরিঘাটে নদী পার হয়েছে। তাদের কথা আমরা জানতামই না! শত্রু সেনাপতি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে বা খবর পেয়েছে যে, ইতিমধ্যে লুটিন-সেতুও বেহাত হয়ে গেছে। তাই কখন তারা পাহাড় ডিঙিয়ে কোন্ পথে পালিয়েছে! পশ্চাদ্ধাবনকারী ইয়াং-এর রেজিমেন্টই এতক্ষণে এসে হাজির হয়েছে লুটিনে। যুদ্ধ করছে আমাদের সঙ্গে!



চিত্র—৩৪
কমরেড চু তে
[সমসাময়িক চৈনিক চিত্রকরের স্কেচ অবলম্বনে]

রাত দুটোর সময় নেতৃবৃন্দ সরেজমিনে লুটিনঝুলা দেখতে এলেন। ইতিমধ্যে সবাই এসে পৌচেছেন। যে পথে আমরা এসেছি সেই পথ ধরে ব্রীজ পার হয়ে এসেছেন লিন পিয়াও, চু তে, চৌ এন লাই এবং কর্নেল ইয়াং-এর পথরেখা ধরে খেয়াঘাটে পেরিয়ে এসে হাজির হলেন লিউ পো-চেঙ আর জেনারেল নৈ জুং-চেন! অষ্টবজ্র সম্মেলন!

এ্যাগ্নেস্ স্মেডলে চু তের জীবনীতে লিখেছেন রাত দুটোর সময় ঝুলন্ত সেতুটা প্রথম দেখে

"Chu made no sound, no sign, but stood like a man turned to stone. He knew that the fate of the Red Army was being decided at that very moment."[৫]

মাও ৎসে তুঙ-এর একান্ত ভৃত্য বর্ণনা দিচ্ছেন চেয়ারম্যানের সেতু অতিক্রম করার:

"পাটাতনগুলো আগুনে পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গেছে। পা ফেলতে আমার ভয় হলো। 'ভয় করছে?' চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন। আমি সলজ্জে বলি 'আজ্ঞে না।'...উনি নিঃশব্দে আমার হাতখানা চেপে ধরলেন। ওপারের মাটিতে পা দিয়েই আমি বলি 'চেয়ারম্যান! আমরা একটা স্কোয়াড নিয়ে এমন একটা সাঁকো চিরকাল রক্ষা করতে পারি; অথচ পুরো এক ডিভিসন সৈন্য নিয়ে ওরা...

"আমার কথা শেষ হলো না। চেয়ারম্যান হেসে ওঠেন। বলেন, ওরা তো সর্বহারার দল নয়, তাই সব কিছু হারাবার ভয়েই ওরা সব কিছু হারায়।"[৬]

ডিক্সান লিখছেন, "চীফ-অফ-স্টাফ জেনারেল লিউ পো-চেঙ ব্রীজটা পার হলেন দীর্ঘ সময় ধরে। উনি যেন সাঁকোর প্রতিটি শিকলের ছবি মনের ক্যানভাসে স্কেচ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সাঁকোর মাঝামাঝি এসে উনি থামলেন। দু-হাত দিয়ে রেলিংটা চেপে ধরে আবেগকম্পিত-কণ্ঠে বলে ওঠেন 'লুটিং ব্রীজ, অনেক অনেক রক্ত দিয়ে তোমাকে জয় করেছি আমরা। আজ থেকে তুমি সর্বহারার। ভুলো না!'[৭]

একটা কথা বলা বাকি আছে। লুটিং গ্রাম জয় করে ওদের সামরিক দপ্তর ঘেঁটে আমরা যে সব কাগজ পত্র পেয়েছিলাম তার ভিতর ছিল একখানা দলিল—চিয়াঙের স্যাঙাৎ জেনারেল লিউ ওয়েন-হুই লিখছেন স্থানীয় সেনাপতিকে: **'Chu Teh and Mao Tse-tung are going to become the second Shih Ta-kai. Ahead of them is the Tatu River, behind is the Golden Sand River. They're caught like fish in a bottle! Now is the time to annihilate the Red bandits.'**[৮]

[চু তে আর মাও ৎসে-তুঙ দ্বিতীয় শিহ্ তা-কাই হতে চলেছে। ওদের সামনে তাতু নদী আর পিছনে সোনাবালি নদী। ওরা বোতলের ভিতর মাছের মতো বন্দী! লাল ডাকাতদের নিশ্চিহ্ন করার এই হচ্ছে চরম সুযোগ]।

বেচারি লিউ ওয়েন-হুই!

লুটিন-ব্রুসা অতিক্রমণের পরেই লালফৌজের সামনে সার দিয়ে দাঁড়ালো কুনলুন পর্বতমালা—তাদের মাথা চিরতুষারের রাজ্য: চিয়াংচিনশান, পাওতুঙকাং, চুঙলাই ইত্যাদি। ইতিপূর্বেও লালফৌজ পর্বত অতিক্রম করেছে; কিন্তু পাইন-রাজ্যের মাথা পার হওয়া তুষার রাজ্যে ইতিপূর্বে এভাবে প্রবেশ করতে হয় নি। এই পর্বত-

মালা অতিক্রম করতে ওদের দিন-দশেক সময় লেগেছিল ; দশ দিনের র‍্যাশন পিঠে বেঁধে নিয়ে চলতে হয়েছিল ওদের, কারণ ওপথে আর গ্রাম নেই, হাট-বাজার নেই। এই দশ দিনে পথশ্রমে এবং তীব্র শীতের আক্রমণে অসংখ্য সৈন্য মারা যায়। ওর মধ্যে পাওতুঙ পাহাড়ের মাথায় ওঠার কোনো পাকদণ্ডী পথই ছিল না ; সম্মুখগামী দল বাঁশ কেটে, জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করতে করতে যায়। মাও ৎসে-তুঙ পরে এডগার স্নোকে বলেছিলেন, "একটি আর্মি কোর তাদের দুই-তৃতীয়াংশ মালবাহী জানোয়ারকে এই পর্বতারোহণের সময় হারায়। শত শত কমরেড পথের ধারে শুয়ে পড়েছিল। তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারে নি।"[৯]

এখানেই লঙ্‌মার্চ-এর সরকারী ইতিহাসকার স্যু মেন-চুর দুটি পায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় একরাত্রে, শীতের প্রকোপে। তাঁর দুটি পা-ই হাঁটু থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়।[১০]

ভাবতে অবাক লাগে, শীতবস্ত্র ছাড়াই সামান্য সুতীর জামা গায়ে কেমন করে হাজার হাজার মানুষ ঐ চিরতুষারাবৃত রাজ্য পার হলো। ওদের যে পশমের জামা ছিল না একথা একাধিক অভিযাত্রীর স্মৃতিচারণে জানতে পারি। ওরা সর্বোচ্চ ষোলো হাজার ফুট উপরে উঠেছিল। ষোলো হাজার ফুট! উচ্চতাটার ধারণা হয়? দার্জিলিঙ থেকে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে গিয়েছেন কখনও? সেই পাহাড়ের চূড়া সমুদ্র-তল থেকে আট হাজার ফুট। অর্থাৎ তার ডবল উচ্চতা ওরা অতিক্রম করেছিল সুতীর জামা গায়ে!

কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর স্মৃতিচারণের অনুবাদ করে যাই বরং। চাং কুয়ো-হুয়া ছিলেন থার্ড আর্মি কোরের সরবরাহ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। তাতু নদী পার হওয়ার সময়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে যখন পৌঁছালো তাঁর বাহিনী তখন তিনি রক্ত-আমাশায় ভুগছেন। ডাক্তারে পরামর্শ দিলেন তাঁর পক্ষে পিছনে পড়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু চাং কিছুতেই রাজী হন নি। এতটা পথ এসে একেবারে শেষ পর্যায়ে তিনি হার মানতে রাজী নন। যাত্রার আগে তিন দিন ধরে তিনি শুধু তরল খাদ্য খেয়ে আছেন। ঐ শরীর নিয়েই দলের সঙ্গে যাত্রা কর-লেন তিনি। বলছেন :[১১]

"পরদিন ভোরবেলা বিউগ্‌ল্ বেজে উঠতেই আমরা সদলবলে পাহাড়টাকে আক্রমণ করতে চললাম। এ আক্রমণে তাড়াহুড়া করাটা ভুল। লড়তে হবে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ছন্দে—প্রথমবাল্যে শেখা পদ্ধতিতে। লাঠিতে ভর দিয়ে অপ্রশস্ত পথ ধরে ধীরে ধীরে বিসর্পিল পথে চলেছে একসার মানুষ। মানুষ, মানুষ আর মানুষ—যেন পাকদণ্ডী পথে পাহাড়টাকে জড়িয়ে ধরেছে একটা অজগর সাপ। পাহাড় বনাম

মানুষ। প্রথম থেকেই আমার খুব দুর্বল লাগছিল। পথেই বার কতক দাস্ত হওয়ায় আরও কাহিল হয়ে পড়লাম। শীতও বাড়ছে, যতই ক্রমশ উপরে উঠছি। পা দুটো কাঁপছে। এর ভিতর হঠাৎ একবার বমি হয়ে গেল। খুবই কাহিল বোধ করলাম। আর চলতে পারছি না; বাধ্য হয়ে বসে পড়ি পথের ধারে একটা পাথরে হেলান দিয়ে।

"আমার পাশ দিয়ে হাঁটি-হাঁটি পা পা-র দল উঠে যাচ্ছে। ওরা আড়চোখে দেখছে আমাকে। করুণার দৃষ্টি। সহানুভূতির। মুখে কিছু বলছে না। কথা বলা বারণ। অক্সিজেনের অভাব—মুখ হাঁ করলেই বুকের খাঁচা ছেড়ে ফুসফুসটা বেরিয়ে পালাবে। আর বলার আছেই বা কি? বলার যা ছিল তা তো কালরাত্রে পই পই করে বলে গেছে পলিটিক্যাল ইন্সট্রাকটার: খবর্দার বসে পড় না। তাহলে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। জমে বরফ হয়ে যাবে!

"হঠাৎ দেখি লি চিউ-শেঙ উঠে আসছে তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে। তার কাঁধে একটা বাঁক—দু প্রান্তে দুটি মোট। চিউ-শেঙ-এর বয়স ষোলো-সতের। সে ছিল আমাদের মালবাহী স্কোয়াডে। ছোকরার চোখে মুখে কথা। সব সময়ে তার হাসি-মশ্‌করা লেগেই আছে। পথের ধারে আমাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে চিউ-শেঙ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, 'কী খবর দাদা? একেবারে বসে পড়েছেন যে?'

"জবাব দেবার ক্ষমতা ছিল না। করুণ চোখে তাকালাম একবার।

: 'আরে তাই কি হয়! হার মানবেন কেন? আসুন একটা বাজি ধরি। আপনার শরীর বেজুত, আমার কাঁধে বোঝা! দেখা যাক, কে পাহাড়ের মাথায় আগে ওঠে!'

"আমার হাত ধরে টেনে তুলে দিল সে! লাঠিতে ভর দিয়ে আবার খাড়া হলাম। চিউ-শেঙ কাঁধে তুলে নিল তার বোঝাটা। বললে, 'ওয়ান-টু থ্রি! আমি রওনা দিলাম কিন্তু—'

"বাঁকের দুই প্রান্তে ভারী বোঝা। সবল সতেজ চিউ-শেঙ হুঁই-হুঁই করতে করতে এগিয়ে গেল। লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে আমিও চলি তার পিছু পিছু। পথের বাঁকে সে একবার দাঁড়াল, পিছন ফিরে দেখল আমি আসছি কিনা। হাসল। বললে, 'হার মানবেন না কিছুতেই! আসুন পিছু পিছু।' পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল সে। কিন্তু সে যেন একমুঠো উৎসাহ ছড়িয়ে দিয়ে গেল আমার শরীরে। আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করি।

"চিয়াচিংশান পাহাড়টা একটা সাদা শাল জড়িয়েছে গায়ে। শীতকাতুরে। কিন্তু ওর শালে পাড় নেই, আঁচল নেই—আদ্যন্ত সাদা আর সাদা। না গাছ, না পাখি, না

পোকা-মাকড়—শুধু বরফ আর বরফ; আর আছি আমরা। লালফৌজের ভগ্নাংশ, যারা আজও হাতছানি দিচ্ছে: হার মানবেন না কিছুতেই!

"চেয়ারম্যান মাওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্ট্রেচারে। আবার নাকি প্রবল জ্বর এসেছে তাঁর। সেই কাল ম্যালেরিয়া।[১২]

"দিন শেষ হয়ে এলো। রাত্রিবাস করতে হলো প্রায় পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে, খোলা আকাশের তলায়, শীতে কাঁপতে কাঁপতে। আগুন জ্বালানো হলো, এখানে-ওখানে। একটু পরে দেখি জেনারেল চু তে এসেছেন শিবির পরিদর্শনে। এটা ওঁর নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। আহার-নিদ্রাও এক কালে তাই ছিল, ইদানিং প্রায়ই সেগুলো বাদ যাচ্ছে—কিন্তু দিনান্তে একবার সাধারণ সৈনিকদের শিবিরে তাদের তত্ত্বতালাশ নেওয়া তাঁর চাইই। জেনারেল চুর একটি ঘোড়া আছে; কিন্তু তিনি এ পাহাড় অতিক্রম করছেন পায়ে হেঁটে। ঘোড়াটা তিনি দান করেছেন মেডিক্যাল ইউনিটকে। আহতদের অথবা অসুস্থদের বয়ে নিয়ে যেতে।

"শেষরাতে আকাশে এয়ারোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ আগুন নিবিয়ে ফেলতে হলো। বিনা আগুনে, বিনা ছাউনিতে এভাবে বসে থাকলে শীতে জমে সবাই মিলে একসঙ্গে মারা যাব। তাই হুকুম হলো—আর বিশ্রাম নয়। এগিয়ে চল। শুরু হলো মার্চ।

"সকাল থেকেই নামল বৃষ্টি। তারপর তুষারপাত, শেষ পর্যন্ত তুষার ঝড়। সে ঝড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব। আধঘণ্টা পরে ঝড় থামল। আবার শুরু হলো পদ যাত্রা। পথের দু-ধারে পড়ে আছে রণক্লান্ত মানুষের মৃতদেহ। শীতে জমে মারা গেছে ওরা।

"বেলা এগারোটা আন্দাজ। বুড়ো-ওয়াঙ তখন যাচ্ছে আমার পাশে। বয়সে সত্যিই বুড়ো নয়, তবে ঐ ওর নাম। হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ হলো। দুজনে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি, একজন মালবাহী টাল সামলাতে না পেরে খাদের দিকে গড়িয়ে পড়েছে। ওয়াঙ একছুটে নেমে গেল খাদে। টেনে তুলতে গেল ছেলেটাকে। বুঝল বৃথাই। ছেলেটা মারা গেছে। পতনমাত্র। ওর শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। কাঁধে ছিল বাঁক—তাতে ভারী মাল। তারই চাপে। খাদের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি! এ কি! এ যে লি চিউ-শেঙ! কাল যে আমাকে আহ্বান করেছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ষোলো বছরের তারুণ্যে ভরপুর চিউ-শেঙ, যার ছিল চোখে-মুখে কথা। তার লড়াই শেষ হয়ে গেল আজ!

"ওয়াঙ ওর বাঁকটাকে বার করে আনল দেহের তলা থেকে। মাল দুটো ঝুলিয়ে নিল দু-পাশে। আমাকে বললে, 'পিছনে তাকিয়ে লাভ নেই! চল।'

"আমরা এগিয়ে চলি, যদিও চিউ-শেঙ আমাকে ওয়াক-ওভার দিয়েছে।"

মাও ৎসে-তুঙ এই অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন একটি কবিতায়। সেটি মাস কতক পরে লেখা :[১৩]

"পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছ তুমি
মহিমময় কুনলুন পর্বতশৃঙ্গ।
এই দুনিয়ায় যা কিছু সুন্দর তা প্রত্যক্ষ করেছ তুমি…
নিদাঘ দিনে তোমার দ্রবীভূত করুণায় পূর্ণ হয়ে যায় নদীনালা,
কূল ছাপিয়ে তারা মানুষকে রূপান্তরিত করে মাছে আর কাছিমে ;
হাজার-হাজার শরৎব্যাপী এ তোমার আশীর্বাদ না অভিশাপ
সে কথা কে বুঝতে পেরেছে ?
কিন্তু আজ ?
কুনলুন, তুমি শোন !
তোমার উচ্চতা আর তুষারসম্ভার আজ অকিঞ্চন।
যদি পারতাম আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে
তবে আমার তরোয়াল টেনে নিয়ে তিন টুকরো করতাম তোমাকে।
একটি খণ্ড পাঠিয়ে দিতাম ইউরোপ খণ্ডে
একটি মার্কিন মুলুকে—
একটি রেখে দিতাম আমাদের এই চীন দেশেই।
মহান শান্তি তাহলে নেমে আসত সারা পৃথিবী জুড়ে ;
সমস্ত দুনিয়া সমান ভাগে ভাগ করে নিত
তোমার উত্তাপ আর তোমার শৈত্য।"

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মৌকাং-ত্রিকূটে ভরত-মিলাপ

শ্রীরামচন্দ্র আর ভরত ছিলেন বৈমাত্রেয় ভাই। মাও ৎসে-তুঙ আর চ্যাঙ কু-তাও-য়ের মধ্যে কোনোও রক্তের সম্পর্ক ছিল না। তুলনাটা অনেক দিক থেকেই মেলে না। তবে একটা মিল আছে। অরণ্যবাসে কণ্টকগুল্মাবৃত পথে পাদুকা অপরিহার্য। ভরত ভালবেসে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাটি নিয়ে গিয়েছিলেন। বোধ করি নগ্নপদে শ্রীরামচন্দ্রের পায়ে বারে বারে কাঁটা ফুটেছিল—বাল্মীকি সে কথা লিখতে ভুলেছেন। লঙ্-মার্চের ইতিহাসকার কিন্তু লিপিবদ্ধ করে গেছেন কী প্রচণ্ড অসুবিধা ভোগ করেছিলেন চেয়ারম্যান মাও যখন তাঁর কমরেড-ভাই চ্যাঙ ভালবেসে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন মাওয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্রটা—জেনারেল চু তেকে!

আমরা এ-যাবৎকাল লালফৌজের মূল বাহিনীর পদচিহ্ন ধরেই চলে এসেছি কিয়াংসি সোভিয়েত থেকে লুটিন ঝুলা পর্যন্ত; লালফৌজের অন্যান্য শাখার কথা বিশেষ কিছু বলি নি। সংক্ষেপে এবার সে কথা বলে নিই:

মোটামুটি বলা যায়, চীনের বিভিন্ন প্রান্তে পাঁচটি অরণ্য প্রদেশে পাঁচটি সোভিয়েত গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। কিছু আগে-পরে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিকথা তালিকাকারে লিখলে দাঁড়াবে এই রকম:

অবস্থান (সোভিয়েত)	রাজনৈতিক নেতৃত্ব	সামরিক নেতৃত্ব	আর্মি কোর	মন্তব্য
(১) কিয়াংসি	মাও ৎসে-তুঙ	চু তে	I, III, V, VI, VIII, IX	
		লিন পিয়াও	I	মাওয়ের নেতৃত্বে লঙ্-মার্চে অংশ নেয়।
		পেং তে-হুই	III	মাওয়ের নেতৃত্বে লঙ্-মার্চে অংশ নেয়।
		তুং চেন-তান	V	মাওয়ের নেতৃত্বে লঙ্-মার্চে অংশ নেয়।
		লো পিং-হুই	IX	মাওয়ের নেতৃত্বে লঙ্-মার্চে অংশ নেয়।
		চৌ কুন	VIII	মাওয়ের নেতৃত্বে লঙ্-মার্চে অংশ নেয়।
		শিয়াও কে	VI	হো লাঙ-এর II আর্মির সঙ্গে যুক্ত হয় (অগাস্ট '৩৪)
(২) ওয়ুয়ান	চ্যাংকু-তাও	শ্যু শিয়াং-চেন	IV, XXV	প্রথমে পাচুং সোভিয়েতে যায়

অবস্থান (সোভিয়েত)	রাজনৈতিক নেতৃত্ব	সামরিক নেতৃত্ব	আর্মি কোর	মন্তব্য
		চ্যাং কু-তাও…	IX…	পরে মৌকান হয়ে কাংশু
	কাও টাং…	স্যু-শিয়াং চেন…	XXV…	শাংসি সোভিয়েতে যায়·
(৩) পাচুং…	চ্যাং কু-তাই…	…	… IV	…ওয়ুয়ান সোভিয়েত ত্যাগ করার পর গঠিত হয়
(৪) সাংচি.	.হো লাঙ …	…	… II	…কাংশুতে IV আর্মির সঙ্গে এবং পরে শানসিতে মূল-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়।
(৫) শাংসি…	…	…	…	…শেষ তীর্থ যেখানে একে একে বাহিনীগুলি মিলিত হয় (১৯৩৫) এবং অন্তিমে পিকিং অধিকার করে (১৯৪৯)

ম্যাপে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কমরেড হো-লাং-এর বাহিনী যে পথরেখা ধরে গিয়েছিল সেটা ফার্স্ট-আর্মির পথকে তিন-তিনবার ছেদ করেছে। উ-নদীর দক্ষিণে দু-বার এবং চৌপিন-দুর্গের দক্ষিণে একবার। কিন্তু সময়কালটা ভিন্ন হওয়ায় দুটি বাহিনীর সাক্ষাৎ ঘটে নি। হো-লাঙ-এর সেকেণ্ড-আর্মি চিংশা (অর্থাৎ ইয়াংসি—সেই সোনাবালি নদী) অতিক্রম করে আরও উজানে। ফার্স্ট-আর্মির সঙ্গে তাদের মিলন ঘটে সেই শেষ তীর্থে, শাংসিতে।

অপরপক্ষে লালফৌজের মূল বাহিনী মৌকাং-এ মিলিত হয়েছিল চ্যাং কু-তাও পরিচালিত ফোর্থ আর্মির সঙ্গে। ফোর্থ আর্মির আদি ঘাঁটি ছিল হুপেই-আনহোয়েই সীমান্তে—ওয়ুয়ান সোভিয়েত বেস-এ। চিয়াঙ কাই-সেকের তাড়া খেয়ে একই ভাবে তারা পশ্চিমের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। 'পাচুং'-এ তারা একটি সোভিয়েত কিছু দিন শাসনে রাখে তারপর সেখান থেকেও বাধ্য হয়ে বেরিয়ে পড়ে পশ্চিমমুখো। মাও ৎসে-তুঙের বাহিনী মৌকাং-এ উপনীত হবার কয়েক সপ্তাহ আগেই তারা সেখানে পৌছায়।

চ্যাং কু-তাও একেবারে আদি যুগ থেকেই আছেন চীনা কম্যুনিস্ট পার্টিতে। ১৯২১শে সাংহাইতে পার্টির প্রথম অধিবেশনে মাওয়ের মতো তিনিও অংশ নিয়েছিলেন, ১৯২৩শে ক্যাণ্টনে থার্ড পার্টি-কংগ্রেসেও হাজির ছিলেন। এই সময় থেকেই মাওয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য দেখা দেয়। কৃষকদের বিদ্রোহে সামিল করবার যে পরিকল্পনা মাওয়ের ছিল তাতে বিশ্বাস ছিল না চ্যাঙের—তিনি মজদুরদের

ভিতর কর্মক্ষেত্র খুঁজে ফেরেন। পিকিং-উহান রেল শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ধর্মঘটে সামিল করেন। ১৯২৭-এ তিনি মস্কো চলে যান এবং ফিরে আসেন বছর চারেক পরে। এর পরেই শু শিয়ান-চিয়েঙের সাহচর্যে তিনি ওয়ুয়ান বেস গড়ে তোলেন—সেখানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল চ্যাঙের আর সামরিক নেতৃত্ব ছিল শুর। ঠিক যেমন মাও এবং চু-তে কর্মক্ষেত্র ভাগ করে নিয়েছিলেন কাংসিতে। ১৯৩২-এর শেষাশেষি ওঁরা ঐ সোভিয়েত ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলেন এবং পরের বছর পাচুং-এ নূতন ঘাঁটি গড়ে তোলেন। রওনা হওয়ার সময় চ্যাঙের দলে ছিল প্রায় এক লক্ষ লোক অথচ সিচুয়ান প্রদেশের পাচুং-এ যখন ওঁরা পৌছান তখন মাত্র হাজার দশেক বেঁচে আছে! বছর দুই ওখানে ওঁরা সাম্যবাদের স্বপ্ন সফল করার চেষ্টা করেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫-এ আবার সে ঘাঁটি ত্যাগ করে রওনা হতে বাধ্য হন। মৌকাং-এ ওঁরা এসে যখন পৌছালেন তখন চ্যাঙ-এর সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। জুন মাসের প্রথমেই ওঁরা সেখানে উপস্থিত হন, মাওয়ের বাহিনী উপনীত হবার কয়েক সপ্তাহ আগে।

দু-পক্ষের সাধারণ সৈনিক আশা করেছিল এই মিলন নিরাবিল আনন্দের উৎসমুখ খুলে দেবে—চ্যাং আর মাও দুজনেই ধন্য হয়ে যাবেন; যেমন হয়েছিলেন পরিব্রাজকদ্বয় স্ট্যানলি আর লিভিংস্টোন আফ্রিকার অরণ্যে। বাস্তবে তা কিন্তু হলো না। ইতিহাসকার বলছেন—এটাই লঙ্-মার্চের সবচেয়ে বড় রহস্য! সে রহস্যের উপর নানান গবেষক নানা ভাবে আলোকপাত করেছেন—কিন্তু মূল সমস্যাটা থেকেই গেছে: কেন এত বড় মিলন ঠিক মতো ফলপ্রসূ হলো না। মাও এবং তাঁর অনুচরেরা অর্থাৎ অফিশিয়াল কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসকার যে কথা লিখেছেন ঠিক তার উল্টো কথা বলে গেছেন চ্যাঙ কু-তাও।

মোট কথা মাওয়ের বাহিনীর লোক সংখ্যা তখন চ্যাং কু-তাওয়ের বাহিনীর চেয়ে কম। তাও আবার তাদের অধিকাংশই রুগ্ন, অসুস্থ। তাদের জামা-কাপড় ছেঁড়া, রসদ ফুরিয়ে এসেছে, অস্ত্র-সম্ভারও তুলনামূলক ভাবে কম। মাওয়ের একজন অনুগামী লিখছেন "মরুভূমিতে মরুদ্যানের সন্ধান পেয়ে পান্থ যে ভাবে ছুটে আসে, ঠিক সেই ভাবেই আমরা ছুটে গিয়েছিলাম মৌকাং-এ যখন শুনলাম কমরেড চ্যাং কু-তাও তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে আগেই পৌছেছেন। কিন্তু মনে হলো—আমাদের ছেঁড়া জামা-কাপড়, স্ট্রেচারে-বাহিত অসংখ্য রুগ্ন-সৈনিকদের দেখে চ্যাং বিরক্ত হলেন। কোনোও বড়লোক যে ভাবে তার গরীব আত্মীয়কে অভ্যর্থনা করতে বাধ্য হয়, সৌজন্যের খাতিরে, সে ভাবেই আমাদের আমন্ত্রণ করা হলো। প্রথম সাক্ষাত মুহূর্তের আমি প্রত্যক্ষদর্শী। মাও এবং চু দুজনেই তখন পদব্রজে এগিয়ে আসছিলেন।

অপরপক্ষে চ্যাং আসছিলেন মাঠের ওপ্রান্ত থেকে তাঁর ত্রিশজন অশ্বারোহী দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে। চ্যাঙকে দেখতে পেয়েই মাও এবং চু ছুটে গেলেন ; চ্যাং কিন্তু এগিয়ে এলেন না। ওখানেই অপেক্ষা করলেন। মাও এবং চু মাঠের ওপ্রান্তে উপস্থিত হলে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে ওঁদের সঙ্গে করমর্দন করলেন!...সেদিন বক্তৃতামঞ্চে চু তে যখন চ্যাং কু-তাওকে তাঁর বাহিনীর কাছে পরিচয় দিলেন তখন দীর্ঘ ভাষণে তিনি চ্যাঙের সমস্ত গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবী ইতিহাসের কথা বললেন, অথচ চ্যাং যখন চু তেকে তাঁর বাহিনীর কাছে পরিচিত করালেন তখন তিনি শোনালেন একটিমাত্র ছত্র : এই ভদ্রলোকও আমাদের মতো আট বছর যুদ্ধ করছেন।"[১]

এখানে পলিটব্যুরোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন মাও ৎসে-তুঙ এবং বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন—লিন পিয়াও, চু তে, চৌ এন-লাই, পো কু, চ্যাং ওয়েন-তিয়েন, লিউ পো-চেঙ এবং চ্যাং কু-তাও। মাওয়ের পরিকল্পনা ছিল, দুটি মিলিত বাহিনী নিয়ে ওঁরা উত্তরমুখো যাবেন, পথে পড়বে দুর্ভেদ্য তৃণভূমি বা 'স্টেপ্‌স্‌'। সেটা পার হতে পারলে চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে শেংসিতে ওঁরা নূতন ঘাঁটি গাড়বেন। চ্যাং কু-তাও এ মতের দৃঢ় প্রতিবাদ করলেন। তাঁর মতে ওঁদের বরং পশ্চিমে তিব্বতের সিংকিয়াং প্রদেশে যাওয়া উচিত—সেখানে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য পাওয়া সহজতর হবে। দীর্ঘ আলোচনা হলো, কিন্তু কোনো সুরাহা হলো না।

মাওয়ের অনুগামীদের ধারণা চ্যাং কু-তাও চেয়েছিলেন সিছুয়ানের কাছে পিঠে থাকতে। তার কারণ তাঁর সৈন্য-বাহিনীর শতকরা আশীভাগ ঐ অঞ্চলের লোক। ওখানে তিনি প্রতিষ্ঠিত নেতা—নূতন ভূখণ্ডে তাঁকে মাওয়ের তাঁবেদার হয়ে যেতে হতে পারে।

বাধ্য হয়ে একটা মাঝামাঝি রফা করা হলো। স্থির হলো, অতঃপর মিলিত বাহিনীকে দুটি ভাগে ভাগ করা হবে—পশ্চিমাংশ এবং পূর্বাংশ। পশ্চিমাংশে থাকবে চ্যাঙের ফোর্থ আর্মির অধিকাংশ সৈন্য এবং ফার্স্ট ফ্রন্ট আর্মির পঞ্চম ও নবম আর্মি কোর। সেই বাহিনীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকবে চ্যাং কু-তাওয়ের এবং সর্বাধিনায়ক হবেন চু তে। অপরপক্ষে পূর্বাংশে থাকবে চ্যাঙের অবশিষ্ট অংশ যেটা পরিচালিত করছিলেন শু শিয়াং-চিয়েন এবং ফার্স্ট ফ্রন্ট আর্মির প্রথম ও তৃতীয় আর্মি কোর। অর্থাৎ মাও হারালেন চু তেকে এবং পেলেন শু শিয়াং-চিয়েনকে। স্থির হলো দুটি বাহিনীই চলবে পলিটব্যুরোর মূল নির্দেশে, যার চেয়ারম্যান মাও ৎসে-তুঙ।[২] ক্ষমতার ভারসাম্য রাখতে আরও স্থির হলো যে, চ্যাং কু-তাও হবেন মিলিত-বাহিনীর চীফ পলিটিক্যাল কমিশার।[৩]

সবই তো হলো, কিন্তু কোন্ পথে মিলিত বাহিনী অগ্রসর হবে? সেটা স্থির করা হলো ভোটে। মাও ৎসে-তুঙ-এর দল সংখ্যা গরিষ্ঠ—তাঁরাই জিতলেন।[৪] স্থির হলো গোটা দলটা যাবে তৃণভূমি পার হয়ে উত্তরমুখো। চ্যাং কু-তাও বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন এ সিদ্ধান্ত।

মিলিত বাহিনী রওনা হলো একই সঙ্গে। সত্তর মাইল উত্তরমুখো এসে শিবির গাড়া হলো একটা তিব্বতী গ্রামে, তার নাম 'মাওথাই'। সামনেই দুর্লঙ্ঘ্য তৃণভূমি। ফলে প্রস্তুতির জন্য এখানে থামতে হলো। তৃণভূমি অতিক্রম করতে পাঁচ-সাত দিন লাগবে। পথে কিছুই পাওয়া যায় না, ফলে প্রস্তুতির প্রয়োজন।

এখানে বসল পলিটব্যুরোর আর একটি অধিবেশন, কিন্তু মাও ও চ্যাঙের মধ্যে কোনোও সমঝোতা হলো না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দুটি দল কিছু আগে-পিছে রওনা দিল উত্তরমুখে। আর তারপরে যে ঘটনা ঘটল সেটাও রহস্যজনক। এডগার স্নো সেটাকে সংক্ষেপে বলেছেন "...কিন্তু দুটি বাহিনী ভিন্ন পথে রওনা হয়েছিল কিছু আগে-পিছে। মাও ৎসে-তুঙের বাহিনী একটি নদী (পাইলুঙ?) অতিক্রম করার পর হঠাৎ সে নদীতে এত জলস্ফীতি হলো যে চ্যাঙের বাহিনী সেটা পার হতে পারল না![৫]

কিন্তু চু তের জীবনীকার স্মেডলে ঘটনাটি যেভাবে বিবৃত করেছেন তার আক্ষরিক অনুবাদ: "চ্যাং কু-তাও-এর মতে নদীটি একরাত্রে তিন ফুট বিস্তৃতি থেকে বেড়ে তিনশ ফুটে পরিণত হয়, মাও যখন পার হন তখন হাঁটু জলও ছিল না, অথচ চ্যাং নদীতে মেপে দেখেছিলেন গভীরতা দশ ফুটের কম নয়। চ্যাঙের মতে তিনি উপায়ান্তর-বিহীন হয়েই ফিরে আসেন এবং পশ্চিমে চলে যান—ঘটনাচক্রে পলিটব্যুরোতে তিনি ঐ পথের প্রস্তাবই রেখেছিলেন, যেটি প্রত্যাখ্যাত হয়। তিনি চু তে এবং লিউ পো-চেংকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেন। লিউ এবং চু দুজনেই হচ্ছেন সিচুয়ান প্রদেশের জননেতা। সারা পশ্চিম-চীনে তাঁরা দুজনেই বিখ্যাত। চ্যাং যখন ঐ সিচুয়ান প্রদেশকেই তাঁর কর্মস্থল হিসাবে বেছে নিলেন তখন তিনি কোনো মতেই চু এবং লিউকে ত্যাগ করতে পারেন না। তাছাড়া চুর কাছে ছিল বাহিনীর একমাত্র রেডিও-জেনারেটর যন্ত্র!"[৬]

স্মেডলের মতে চ্যাং বস্তুত চু তেকে বন্দী করেন। তিনি লিখছেন "**That same night Chang Kuo-tao brought up special troops of the Fourth Front Red Army, surrounded General H/Qs, and took Chu Teh and his staff prisoner.**

সেই রাত্রে চু তে এবং চ্যাং কু-তাও-এর যে কথোপকথন হয় শ্রীমতী স্মেডলে

তা প্রত্যক্ষ-ভাষণে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার আক্ষরিক অনুবাদটা এই রকম :[৭]

"চ্যাং তখন চু তেকে দুটি আদেশ করলেন। প্রথমত মাও ৎসে-তুঙ-এর সঙ্গে তাঁকে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। জেনারেল চু দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন 'মাওয়ের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করার চেয়ে আমাকে দু-টুকরো করে ফেলা আপনার পক্ষে সহজ।'

চ্যাঙের দ্বিতীয় আদেশটি ছিল : পার্টির যে নির্দেশে বলা হয়েছে জাপান-বিরোধী এবং চিয়াঙ-বিরোধী যুদ্ধে সামিল হতে সকলকে উত্তর দিকে যেতে হবে সেই নির্দেশটি চু-কে অগ্রাহ্য করতে হবে। জেনারেল চু জবাবে বললেন, ঐ সিদ্ধান্ত পার্টিকে নেওয়াতে আমি সেদিন সচেষ্ট ছিলাম। আজ আমার পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

চ্যাং কু-তাও তখন চুকে বললেন, আজ রাতটা ভেবে দেখুন। রাত্রিশেষেও যদি আপনার মতের একান্ত পরিবর্তন না হয় তাহলে আপনাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে কাল সকালে দাঁড়াতে হবে। এবারও চু তে বললেন, এটা তো আপনার ক্ষমতার মধ্যেই। আমি কেমন করে বাধা দেব? তবে এক রাত অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন—আমার জবাব অপরিবর্তিত থাকবে।

একাধিক কারণে চ্যাং তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সাহসী হন নি। প্রথমত নবম ও পঞ্চম বাহিনী চু তেকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। তারা ওঁর দলের সঙ্গেই আছে। এতে গৃহবিবাদ অনিবার্য হয়ে পড়ত।[৮]

দ্বিতীয় কারণটি উল্লেখ করেছেন ডিক্ উইল্‌সন তাঁর সুললিত ব্যাখ্যায় :

"After all, Chu Teh, as the most famous Szechuanese Red General alive, was presumably able to appeal above Chang's head to the native Szechuanese who formed three-quarters of the latter's Fourth Front Army."[৯]

মোটকথা ফল হলো এই—মাও ৎসে-তুঙ তাঁর পূর্বাঞ্চল বাহিনীকে নিয়ে চললেন তৃণভূমি পার হয়ে সিধে উত্তরমুখো, আর চ্যাং কু-তাও বস্তুত চু তেকে বন্দী করে সরে এলেন অনেকটা দক্ষিণে, তারপর চললেন পশ্চিমমুখো।

এই প্রসঙ্গেই বলে রাখি, অনেক পরে কাংসুতে চ্যাং কু-তাও-এর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিলেন হো-লাঙ তাঁর সেকেণ্ড আর্মি নিয়ে। ঐ দুজনের মিলিত বাহিনী শেষ পর্যন্ত তৃণভূমি পার হয়ে শেংসির দিকে রওনা দেয়। ততদিনে মাও ৎসে-তুঙ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। হো-লাঙ-এর উপস্থিতির পর চ্যাং বাধ্য হয়ে সুর নরম করেন। অনেক পরে ১৯৩৭-এর জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় কমিটি চ্যাং কু-তাও-এর বিচার করে

তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। চ্যাং পরের বছর বিশ্বাসঘাতক-দল কুয়োমিনতাঙ বাহিনীতে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কানাডায় পালিয়ে যান।



চিত্র—৩৫

কমরেড হো-লাঙ

[সমসাময়িক চৈনিক চিত্রকরের স্কেচ অবলম্বনে]

সুতরাং চ্যাং কু-তাও-এর কথা ছেড়ে আমরা বরং মাও ৎসে-তুঙের সঙ্গে ঐ জনমানব বর্জিত তৃণভূমিতে প্রবেশ করি এবার :

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তৃণভূমির তৃণখণ্ড

আধুনিক চীনের ইতিহাসকার চেন জেরমের মতে[১] "নিঃসন্দেহে লঙ্-মার্চের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল চিংঘাইয়ের তৃণভূমি উত্তরণ।

তৃণভূমি ব্যাপারটাই আমরা ঠিক মতো বুঝি না। চিংঘাইয়ের তৃণভূমি উত্তর-দক্ষিণে কয়েক শ' মাইল লম্বা—পূর্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্যটা বেশি। এটা একটা মালভূমি—সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ছয় থেকে নয় হাজার ফুট। গ্রীষ্মকালে এখানে সুন্দর সতেজ সবুজ ঘাস হয়—তিব্বতী চমরি গাই আর ঘোড়ার স্বর্গ! কিন্তু বছরে আট নয় মাস এর রূপ একেবারে অন্যরকম। তখন সর্বদাই হাঁটু জল। এ জল জমে বর্ষায় এবং পাহাড়ের বরফ গলে। নির্গমনের কোনো পথ নেই। সে জল সূর্য তাপে শুকিয়ে যায় ক্রমে।

লালফৌজের ত্রিশ হাজার সৈন্য ঐ জলাভূমি পার হতে সময় নিয়েছিলো পুরো একটি সপ্তাহ। আদিগন্ত বিস্তৃত সর্বত্রই হাঁটু জল—গাছ নেই, ঐ তৃণ ছাড়া; উঁচু-ডাঙা জমি কোথাও নেই। ডুব জলও নেই। একটা পাখি নেই, একটা জন্তু নেই—কিছু জলজ উদ্ভিদ আর জলের পোকা ছাড়া। বাঁ-দিকে মাঝে মাঝে পাহাড় পড়বে—কিন্তু সেটা হচ্ছে তিব্বতের রাজ্য। তিব্বতীরা সেখানে তীর-ধনুক আর বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছে; ওদের রাজ্যে লালফৌজকে ঢুকতে দেবে না। এ ছাড়া আর এক বিপদ হচ্ছে চোরাবালি! এক হাঁটু জলের নিচে সে যে কোথায় লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে না, যতক্ষণ না সেখানে পা দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ভয়াবহ পথের একাধিক বর্ণনা আছে লঙ্-মার্চের অংশগ্রহণকারীদের স্মৃতিচারণে। তার ভিতর দু-একটির অনুবাদ করে দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। প্রথম উদ্ধৃতিটি দিচ্ছি মেজর তান চিং-লিন-এর স্মৃতিচারণ থেকে।[২] লালফৌজের সঙ্গে তিনি যখন এই তৃণভূমি অতিক্রম করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো। তখন তিনি ছিলেন রেড-ফ্ল্যাগের বাহক—'স্ট্যাণ্ডার্ড-বিয়ারার' বা নিশানবাহী। তান চিন-লিং বলছেন:

> "কাংমাওজু থেকে চালিজু—অর্থাৎ তৃণভূমির এ-পার থেকে ও-পারে যেতে আমার সময় লেগেছিলো কুড়ি দিন। কারণ ছিল। আমাদের মাঝ পথ থেকে ফিরে আসতে হয়। আমার বয়স তখন ষোলো। আমি ছিলাম নিশানধারী।

"কাংমাওজু থেকে দেখতে পেলাম সমুদ্রের মতো আদিগন্ত এক জলাভূমি। শুধু মাঝে মাঝে ঘাস উঁচু হয়ে আছে, কখনও মানুষভর উঁচু—তার ভিতর ঢুকলে বাইরে থেকে দেখা যায় না। আকাশে সূর্য অথবা হাতে কম্পাস না থাকলে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব একাকার! মাঝে মাঝে আছে চোরা-বালির এলাকা। জল-বেশি নয়, কোথাও গোড়ালিতক, কোথাও হাঁটুভর। কিন্তু যেখানেই পা ফেল এক বিঘৎ ঢুকে যাবে—আবার পা তুলে নিলেই দলদলে কাদায় সে গর্ত ভরে যাবে। কেমন করে পথ চিনে যাব? তার ব্যবস্থা অগ্রগামী দল করেছে। বিশ-পঁচিশ ফুট তফাৎ তফাৎ ঐ জলায় বাঁশ পুঁতে একটা দড়ি টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। সেই হচ্ছে একমাত্র নিশানা। আমরা ঐ দড়িটায় হাত দিতাম না, যেন ইলেকৃট্রিক তার। নিষেধ ছিল। ওটাই হচ্ছে আমাদের প্রাণসূত্র। আমাদের পিছনেও আসছে বিশ-পঁচিশ হাজার লোক। তাদেরও ঐটাই নিশানা। কোনো কারণেই যেন ঐ প্রাণসূত্রটা ছিন্ন হয়ে না যায়! সমস্ত দিন পথ চলেছি, একের পিছে আর। সঙ্গে আছে জামা-কাপড়, খাবার আর জল। জল আমাদের চতুর্দিকে—কিন্তু তা খেলেই মৃত্যু! খাবার আছে সাতদিনের মাপা—হিসেব করে খেতে হবে। সন্ধ্যাবেলায় স্থির হলো যাত্রা স্থগিত রাখ। কিন্তু ঘুমাবো কি করে? বসারই উপায় নেই, তা শোয়া! একথাটা এতক্ষণ খেয়াল হয় নি আমার। খাদ্য আর পানীয়ের চিন্তাই করেছি—কিন্তু এই দুনিয়ায় শোবার জায়গার যে অভাব হতে পারে তা তো মনে ছিল না। আজ রাত না হয় জেগে কাটালাম। কাল? পরশু? সাত রাত যে সামনে? কি করে আমরা ঘুমাতাম জানেন? চারজন পিঠোপিঠি হয়ে দাঁড়াতাম। পঞ্চমজন আমাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত। চারজনের আটখানা ঠ্যাঙ হচ্ছে জলের উপর জেগে থাকার ব্যবস্থা। এবার পালা করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাও! হাসছেন? ঐভাবেই কিন্তু ত্রিশ হাজার লোক ঘুমিয়েছে সাত রাত!

"চতুর্থ দিন বিকাল থেকেই শুরু হলো ঝড় বৃষ্টি। আমরা তখন তৃণভূমির আধাআধি পার হয়েছি। সাধারণ বৃষ্টি নয়—তুষার ঝটিকা; জল নয়, বরফের ঝড়। দু-তিন ঘণ্টা আদিগন্ত সাদা অন্ধকার! সে রাত্রেও আমরা পিঠোপিঠি হয়ে ঘুমালাম, বরফজলে ভিজতে ভিজতে। নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই। সকাল হলো। ঘুম ভাঙল চেঁচামেচিতে! চরম সর্বনাশ হয়েছে! কাল রাত্রের তুষার ঝড়ে সামনের পথে বাঁশ-দড়ি ভেসে গেছে। সামনে কোন্ দিকে এগিয়ে যাব বোঝা গেল না। বাধ্য হয়ে ফেরার পথের দড়ি হাতড়ে আমরা তিন দিন পরে

ফিরে এলাম কাংমাওজুতে। সাতদিন আগে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করে-
ছিলাম সেই আমড়াতলার মোড়ে!

"দ্বিতীয়বার পথ প্রদর্শক পথের নিশানা না দেখালে আমরা যেতে পারব না!"

এই তৃণভূমি অতিক্রমণে 'ভ্যানগার্ড' ছিলেন কর্নেল ইয়ান-তে-চু। সেই দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক, যাঁকে আমরা প্রথম থেকেই চিনে রেখেছি। তিনিই যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। কে আগে যাবে, কে পরে, কে কতটা মাল বইবে—কতটা খাদ্য ও জল নিতে হবে।

যাত্রার পূর্বে মাও-ৎসে-তুঙ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পথ চিনবে কি করে?'

কর্নেল ইয়াং বলেছিলেন, 'পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন একজন স্থানীয় বৃদ্ধ। ষাট বছর বয়স তাঁর—এ তৃণভূমি তাঁর নখদর্পণে!'

মাও বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, ষাট বছরের বৃদ্ধ এতটা দৈহিক পরিশ্রম সহ্য করতে পারবেন?

ইয়াং জবাবে বলেন, আমার বাহিনীর আটজন বাহক তাঁকে বহন করে নিয়ে যাবে।[৩]

এইটুকু কথোপকথনই ডিক উইলসন লিপিবদ্ধ করেছেন; আমার বিশ্বাস ওর পরে কর্নেল ইয়াং নিশ্চয় যোগ করেছিলেন কনফুশিয়াসের সেই বিখ্যাত বাণীটি: 'তিনমাথা যার বুদ্ধি নেবে তার।' ডিক উইলসন সে কথা বলতে ভুলেছেন।

তান চিং-লিনের স্মৃতিচারণে ফিরে আসি আবার। বরফের ঝড় থেমে যাবার পর অগ্রগামী দল দ্বিতীয়বার নিশানা খাটিয়ে দিল। দ্বিতীয়বার কিছু রেশন নিয়ে লালঝাণ্ডা হাতে রওনা হলো ষোলো বছরের কিশোর ছেলেটি। সে লিখছে:

> "আমাদের খাবার ফুরিয়ে গেছে একেবারে। গতকাল থেকে অনাহারে আছি সবাই। খিদের জ্বালায় আমাদের এক কমরেড কিছু জলজ উদ্ভিদ তুলে খেতে শুরু করল। বললে, খেতে ভালোই। সুস্বাদু। কাঁটা নেই সে উদ্ভিদে। সে উদ্ভিদ কমই ছিল। সকলের ভাগে জুটল না। যে কটা গাছ ছিল চার-পাঁচ জন কাড়াকাড়ি করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। আমাদের ভাগে আর জুটল না! নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলতে হবে। আমাদের নয়—ঐ চার-পাঁচ জনের। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওদের বমি শুরু হলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগেই তারা মারা গেল! সব কয়জনই! উপায় নেই। তাদের জলের বোতলগুলো খুলে নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। মৃত্যুও যেন মামুলি হয়ে গেছে। দু-

ফোঁটা চোখের জল ফেলবারও অবকাশ নেই। আমরা শুধু এক লহমার জন্য দাঁড়িয়ে তাদের সাময়িক শেষ সম্মান জানালাম।...

ষষ্ঠ দিন। প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি হিসাব মতো। সে সময় আমি চলেছি দলের আগে আগে। আমার পিছনে, হাত দশেক দূরে আসছে আমাদের য়ুনিটের আর সবাই। হঠাৎ পা ফেলতেই দেখি ডান পাটা কে যেন নিচের থেকে টানছে। ভারসাম্য রক্ষা করতে বাঁ পাটা যেই সরিয়েছি অমনি বুঝতে পারি আমি পড়েছি চোরাবালির গর্তে। ভেবে চিন্তে কিছু করিনি—আতঙ্কে আপনিই চিৎকার করে উঠেছি। ঠিক পিছনেই ছিলেন চিউ—দশাসই জোয়ান —ছুটে এলেন আমাকে উদ্ধার করতে। ফলে তিনিও পড়লেন ফাঁদে। আমাদের কমাণ্ডাণ্ট ছিলেন তাঁর পিছনে; চিৎকার করে ওঠেন তিনি: খবর্দার কেউ ওদিকে যেও না।”

আমার মাজা পর্যন্ত ততক্ষণে ডুবে গেছে। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কমাণ্ডাণ্টের কথায় আমার চোখ ফেটে জল এলো—কিন্তু ওঁকেই বা দোষ দেব কেমন করে? মৃত্যু যে মামুলি হয়ে গেছে আমাদের কাছে! আমাদের দু-জনকে বাঁচাতে এলে ওরা মরবে! অনিবার্য মৃত্যুর অতলে তলিয়ে যাচ্ছি তিল তিল করে—আমি আর চিউ! চিউ-এর দৈহিক ক্ষমতা প্রচণ্ড। প্রাণ-পণ শক্তিতে সে নিজেকে উদ্ধার করতে চাইল—ফলে সে ডুবতে থাকে আমার চেয়েও দ্রুতহারে! এইটাই নাকি চোরাবালির মর্মান্তিক রসিকতা! যত জোরে তার আলিঙ্গনমুক্ত হতে চাইবে তত জোরে সে টানবে তোমাকে।

ভুল বুঝেছিলাম আমরা কমাণ্ডাণ্টকে। বিপদে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি মোটেই। উনি এগিয়ে এলেন কয়েক পা। চোরাবালির ভূখণ্ড যেখানে শুরু হয়েছে ঠিক তার বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন: শোন! চিউ আর তান! মন দিয়ে শোন! দাপাদাপি করো না! চোরাবালির উপর শুয়ে পড়ার চেষ্টা কর! দেহভার অনেকখানি জমিতে ছড়িয়ে দাও!

ঠিক কথা! আমরা দুজনেই শুয়ে পড়ি জলকাদায়! ফল হলো। মাটির টান কমে গেল যেন। কমাণ্ডাণ্ট তাঁর কম্বলের একটা প্রান্ত ছুঁড়ে দিলেন লিউকে। লিউ সেটা চেপে ধরলো। আমি ধরলাম লিউয়ের বেল্ট। তারপর শুরু হলো টাগ-অফ-ওয়ার। চোরা মাটি বনাম মানুষ। তিল তিল করে আমরা দুজন উঠে এলাম চোরাবালির গর্ত থেকে। অনিবার্য মৃত্যুর মুখগহ্বর থেকে! বুঝলাম মৃত্যুটা মামুলী নয় মোটেই।”

এবার বন্ধু শোনাই লিয়াও শিঙ-ওয়েন-এর দিনপঞ্জিকার কয়েকটা পাতা থেকে। লিয়াওকে নিশ্চয় ভুলে যাননি—ওর ডাক নাম: 'ব্যাঘ্রশাবক', অর্থাৎ পাইহ্‌য়া ভাষায়—'বাঘের বাচ্ছা'।

: আমাদের বাহিনীর নাম—বালখিল্য বাহিনী। দলে আমরা ছিলাম জনা-কুড়ি। পতাকাবাহী য়ুনিট। আমাদের দলপতি চাও কাং—সে আমাদের কুড়িজনের মধ্যে একমাত্র একাই 'টীন-এজ'কে পাড়ি দিয়েছে। চাও কাং বলত—তার জীবনের লক্ষ্য হলো সর্বহারার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। আমি বলতুম—আমারও তাই; তবে আমার আরও দুটি লক্ষ্য ছিল জীবনের। প্রথম লক্ষ্য—আমাদের জমিদারের রক্তে স্নান করে মা আর দিদিকে উদ্ধার করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য—বলতে লজ্জা হয়: একটা লাল টুপি! রেড আর্মি ক্যাপ! আমাদের বালখিল্য-বাহিনীর কারও মাথায় রেড-আর্মি ক্যাপ নেই। আমার পলিটিক্যাল কমিশার অবশ্য আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, একটা ক্যাপ তিনি আমাকে দেবেন। পরের বার সরবরাহ এলেই। আমাদের দলে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে বাচ্ছা-ওয়াঙ। তার বয়স এগারো; তারপর হাও তেং-নান, যার ডাকনাম—'ঠাকুরঝি'। তার বয়স বারো।

লঙ্-মার্চে অংশ নিয়ে আমরাও দলের সঙ্গে হাজার হাজার লি পাড়ি দিয়ে এতদিনে এসে পৌঁছেছি তৃণভূমির প্রান্তে। কত ঘটনাই ঘটে গেছে ইতিমধ্যে—ইয়াং-সি পার হওয়া লুটিন-ঝুলার যুদ্ধ, তুষার-পাহাড় ডিঙিয়ে আসা, তারপর মৌকাং পর্বতে ভরত-মিলাপ! তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের শুনিয়েছি। আজ শোনাতে বসেছি তৃণভূমি অতিক্রমণের গল্প; কিন্তু তার আগে আমার জীবনের সব-চেয়ে আনন্দের দিনটার বিষয়ে দু-একটা কথা বলতে দিন। আমার এই তেরো-বছরের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন হচ্ছে যেদিন লালফৌজ সিছুয়ান প্রদেশে, তায়ী জেলায় আমাদের গ্রামে পৌঁছালো! উঃ! সেদিনটা আমি জীবনেও ভুলব না।[৪]

অজানা কত গাঁয়েই তো ঢুকেছি লাল-ঝাণ্ডা কাঁধে! কিন্তু আজ? আজ বাঘের বাচ্ছা লিয়াও শিঙ-ওয়েন ঢুকছে তার নিজের গাঁয়ে! দশ-বিশ হাজার লাল-ফৌজের অগ্রগামী দূত হিসাবে লাল ঝাণ্ডা ঘাড়ে। ঐ তো চ্যাঙ-কাকার বাড়ি, ঐ সেই কবরখানা, যেখানে দাদু শুয়ে আছে। ঐ আমাদের বুদ্ধমন্দির, যেখানে বসে আমি আর মা ভিক্ষা করতাম! সদলবলে আমরা ছুটেছি সেই কাছারি-বাড়ির দিকে—যেখানে বন্দী হয়ে আছে আমার মা, আমার দিদি! আছে তো? দেখা পাব তাদের?

ঠাকুরঝি ছুটছিল আমার পাশে-পাশে ছোট্ট একটা ঝাণ্ডা ঘাড়ে। বললে, বাঘের

বাচ্ছা, তোর চোখে কি হয়েছে বল্‌তো? চোখটা লাল হয়ে গেছে!

কী বলবো? সেটা আমিও বুঝছি! যতই মনে মনে বলছি—'জল নয় আগুন!' ততই চোখ দুটো জলে ভরে আসছে! শুনতে পেলাম, দলপতি চাও কাং ঠাকুরঝিকে বললে—ওকে বিরক্ত করিস্ না! এটা ওর নিজের গাঁ! যে কাছারি-বাড়িটা আমরা দখল করতে যাচ্ছি সেখানে ওর মা আর দিদি—

বাকিটা শুনতে পেলাম না। হ্যাণ্ড-গ্রেনেডের বিস্ফোরণে!

লিউ ওয়েন-ছাই কোনো প্রতিরোধই দিতে পারে নি। ওর বেতনভুক দারোয়ানের দল সরাসরি আত্মসমর্পণ করলো। সেই সিংদরজা দিয়ে লালফৌজের জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রবেশ করলাম—জীবনে দ্বিতীয়বার! মনে পড়লো প্রথমবার দিদি ঠিক এইখানেই বলেছিল, কিরে বাচ্ছা লিয়াও? তোর ভয় করছে?—আর আমি বলেছিলুম—'হুঁ'!

কমরেড কমিশার নিজ-হাতে খুলে দিলেন বন্দিশালার কপাট। বহু-বহুদিন পর আলো-বাতাসের মুখ দেখলো আমার গাঁয়ের বন্দী মানুষেরা—বুড়ো-বাচ্ছা-যুবক-যুবতী! কিন্তু মা? দিদি?

আমি উন্মাদের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি। বন্দীদল আনন্দে লাফাচ্ছে, নাচছে! ওরা বুঝতে পেরেছে—ওরা মুক্ত। আমি জনে-জনে যাচাই করে যাচ্ছি; কাউকে চিনি না, কাউকে জানি না!

হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে জাপ্‌টে ধরল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঘুরেই দেখি: দিদি!

: বাচ্ছা-লিয়াও! তুই!!

ভেবেছিলাম কাঁদবো না; কিন্তু চোখ দুটো এমন বেইমান! দিদিকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেললাম!

: তুই কোত্থেকে রে?...তুই,...তুই তো আর বাচ্ছা নস্; মুক্তিবাহিনীতে আছিস্?

ঝাঁকড়া-মাথা নেড়ে বললুম, হুঁ! কিন্তু...মা?

দিদি আবার আমাকে জাপটে ধরলো। জবাব দেওয়া হলো না। তার আগেই কমরেড মাও চু হুয়া দিদিকে প্রশ্ন করলেন, জমিদার লিউ ওয়েন-ছাই কোন্ ঘরে থাকে তুমি জান?

আমি তখনও দিদির বুকে লেপ্‌টিয়ে আছি। ও বললে, জানি; কিন্তু শয়তানটা পালিয়েছে। কোন্ দিকে গিয়েছে তাও জানি—

প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। ক্যাপ্টেন মাও চু-হুয়াকে দলপতি করে আমাদের

একটি স্কোয়াড তখনই রওনা দিল বুড়োটাকে পাকড়াও করতে। আমিও চলেছি দিদির হাত ধরে, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে (চিত্র—৩৬)। দিদি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল। কাহিনী বিস্তৃত করে লাভ নেই। খামার-বাড়ির অদূরেই ধরা পড়লো শয়তানটা! ক্যাপ্টেন মাও আর কমরেড কমিশার চেপে ধরলেন ওর কাঁধের জামা! কমরেড মাও কোমরবন্ধ থেকে রিভলভারটা বার করে বললেন, ওয়েন-ছাই! এবার তোমার সারাজীবনের পাপের শাস্তি নিতে প্রস্তুত হও!

বাধা দিল দিদি। বললে, না! আপনি না, আমাকে এ সুযোগটা দিন! মায়ের কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ! তাঁকে মৃত্যুশয্যায় আমি বলেছিলাম—এর প্রতিশোধ আমি নেবো!

তাহলে…মা… ?

কমরেড মাও দিদির হাতে তুলে দিলেন রাইফেলটা। বললেন, ঠিক আছে বোন্! তুমি এ গাঁয়ের মেয়ে! তোমারই একাজে অগ্রাধিকার! নাও, শেষ কর তোমাদের গ্রামের কলঙ্ক!

আশ্চর্য! দিদি জীবনে কখনও বন্দুক ছোঁয় নি। তবু অবলীলাক্রমে বাগিয়ে ধরলো অস্ত্রটা! বৃদ্ধ লিউ ওয়েন-ছাই তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে (চিত্র—৩৭)।

গর্জে উঠলো দিদির হাতের বন্দুকটা! মাতৃতর্পণ শেষ করলাম আমরা ভাই-বোনে।

দিদি যোগ দিল আমাদের বাহিনীতে। সে আছে নার্সারীর স্কোয়াডে। নার্সিং শিখছে। মাঝে মাঝে দেখা হয়। পুরানো দিনের গল্প হয়। তবে ইদানীং ওদের য়ুনিটটা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। আজ সপ্তাহখানেক দিদির সঙ্গে দেখা হয় নি। হয়তো তৃণভূমির ও-পারে পৌছে তার দেখা পাব আবার।

তৃণভূমি![৫] আমরা যে-পথে গিয়েছিলাম তাতে জলাজমির মাঝে মাঝে ডাঙার দেখাও পেয়েছি। আমরা গিয়েছিলাম ঐ পশ্চিমের পাহাড়গুলোর কোল ঘেঁষে। একটু ঘুর পথ হয়েছিল, তা হোক—ঐ পথে আমরা শুকনো মাটির মুখ দেখেছি, যা দেখে নি আমাদের মূল বাহিনীর অনেকে গোটা সপ্তাহে। দিদিরা এ-পথে এলেই ভালো করবে। অবশ্য সব সময়েই বাঁ-দিকের পাহাড়গুলোর উপর নজর রাখতে হতো। ওটা তিব্বতীদের এলাকা। দেখতে পেলে আমাদের খুন করে সব কিছু কেড়ে নেবে।

সেদিন সমস্ত দিনমান জলাভূমি পার হয়ে এসে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা একটা পাহাড়ের ধারে এসে পৌছলাম। শক্ত পাথুরে জমি! ঠাকুরঝি কোথা থেকে কিছু ডালপালা জোগাড় করে আনলো। বড় বড় কচুর মতো পাতা। সেগুলো বিছিয়ে

দিয়ে বললে, আজ আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমানো নয়, লম্বা হয়ে পড় দিকিন সবাই! বিছানা পেতে দিয়েছি।

কমরেড চাও কাং বললে, ওহে, আজ তোমাদের ঠাকুরঝি ফুলশয্যা পেতে দিয়েছে!

চ্যাং ফেন বলে, ফুলশয্যা কি এমনি এমনি হয়? বউ পাব কোথায়?

চাও বলে, ব্লাউজ-গায়ে একটিমাত্র সুন্দরীকেই তো দেখছি!

ঠাকুরঝি চটে ব্যোম্: ভালো করলে মন্দ হয়! বিছানা পেতে দিলাম—আর আমারই পিছনে লাগছ তোমরা! ঠিক আছে—ছিঁড়েই ফেল্‌ছি!

আমরা সবাই হৈ-হৈ করে বাধা দিই। অমন ফ্ল্যানেলের ব্লাউজটা হয়তো রাগের মাথায় সত্যই ছিঁড়ে ফেলত ঠাকুরঝি!

ইতিমধ্যে বাচ্ছা-ওয়াং কিছু শুক্‌না ডালপালা নিয়ে এসেছে। বাচ্ছা-ওয়াং আমাদের দলে সবচেয়ে ছোট। চেন-ওয়াং-এর বয়স মাত্র এগারো। বললে, এসো ক্যাম্প-ফায়ার করি। হাত-পা গরম হবে তাতে।

কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না দলপতি চাও কাং। বললে, রাতের অন্ধকারে আগুন বহুদূর থেকে দেখা যায়। তিব্বতী-গুণ্ডাতেরা টের পেলেই সর্বনাশ!

অগত্যা আগুন জ্বালা গেল না। গেলে ভালো হতো—শীতটা প্রচণ্ড! খাবার ফুরিয়েছে অনেক আগেই। অগত্যা খালি পেটেই জড়াজড়ি হয়ে শুয়েপড়লাম, খোলা আকাশের নিচে।

সন্ধ্যারাত থেকেই শুরু হলো ঝড়-জল। একটু পরেই আরম্ভ হলো তুষারপাত। কোথাও কোনোও আশ্রয় নেই। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে রইলাম। এ-ওর গা থেকে উত্তাপ আহরণ করতে চায়। উত্তাপ কোথায়? সবাই যে বরফ-ঠাণ্ডা! ওরই মধ্যে নিদারুণ ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভাঙলো ভোর রাতে। আমার হাত-পা যেন আমার নয়। নড়তে পারছি না। চাও কাং উঠেছে আমার আগে। প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো আমাকে। দু-চারটে কীল-চড়-ঘুষিও মারলো। আমার হাত-পা রগড়ে দিল, ঘষে দিল জোরে জোরে। রক্ত চলাচল শুরু হলো আবার। হাত-পা ফিরে পেলাম। উঠে বসলাম। একই ভাবে একে একে সবাইকে তুলে দিতে গেলাম। কী কালঘুম ওদের। এত ঠেলা-ঠেলিতেও চোখ মেলছে না। চাও কাং দ্রুত হাতে আগুন জ্বেলে ফেলে। হাত গরম করে সেই গরম হাতটা বারে বারে ঘষতে থাকে ওদের হিম-শীতল অঙ্গে। ক্রমে ক্রমে সকলেই সুস্থ হলো। হলো না শুধু একজন। আমাদের ঠাকুরঝি! বেচারি শীতের প্রকোপে মারা গেছে আমার বুকের মধ্যে! তাকে জড়িয়ে সারারাত ঘুমিয়েছি,

অথচ আমিই টের পাই নি।

চাও কাং পাগলের মতো বারে বারে ওকে বুকে চেপে ধরলো, যদি তার বুকের উত্তাপে ঠাকুরঝির ঘুম ভাঙে। ভাঙলো না। চাওয়ের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আমার দিকে ফিরে শুধু বললে, হাও তেং-চান ওর মায়ের এক ছেলে!

'ঠাকুরঝি' বললো না কিন্তু!

সূর্য উঠলো। আমরা রওনা দিলাম। ঠাকুরঝির মৃতদেহ সৎকারের সময় নেই। যতদূর দেখা যায় আকাশে একটা শকুনও দেখছি না। জানি না, এ জঙ্গলে হায়না অথবা নেকড়ে আছে কি না। না থাকলে নিটোল একটি কঙ্কালকে কেউ হয়তো আবিষ্কার করবে কোনো একদিন। বারো-বছরের এক বালকের কঙ্কাল!

চলে আসছিলাম। হঠাৎ চাও কাং বললে, ওর ফ্লানেলের গরম জামাটা নষ্ট করে কী লাভ?

খুলে নিল সেটা। সত্যই তো, হাও তেং-চানের তো আর শীত লাগবে না কোনোদিন! সেই যে কৃষক রমণী ভালোবেসে তাকে ব্লাউজটা দিয়েছিল সেটা এভাবে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া বাচ্ছা-ওয়াং-এর জামাটাও শতচ্ছিন্ন! শীতের রাত তো আজও আসবে। তারপর কাল। পরশু। লঙ্-মার্চের যে এখনও অনেকটা বাকি! দলপতি চাও কাং ব্লাউজটা ওর মৃতদেহ থেকে খুলে নিয়ে বাচ্ছা-ওয়াংকে দিল। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো বাচ্ছা-ওয়াং, ঐ ব্লাউজে মুখ লুকিয়ে।

আবার জল-ঠেঙিয়ে চলতে থাকি সামনের দিকে। সন্ধ্যাবেলায় নজর হলো বাচ্ছা-ওয়াং ফ্লানেলের ব্লাউজটা গায়ে দিয়েছে। আবার কন্‌কনে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেই শীতের বিরুদ্ধে আজ লড়াই করছে বাচ্ছা-ওয়াং। তার গায়ে সেই ব্লাউজ—টকটকে লাল রঙ, হলুদের ফুলকাটা!

তা হোক্! এর পর কোনোদিন বাচ্চা-ওয়াংকে কেউ সেজন্য 'ঠাকুরঝি' বা 'বৌঠান' বলে ডাকে নি!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

লঙ্‌-মার্চের উত্তরাধিকার

তৃণভূমি অতিক্রমণের পরেও নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো ওদের—'লাৎজু-পাস'-এর ভিতর দিয়ে যাওয়া, পাইলুং নদী পার হওয়া এবং চিয়াং-এর বিভিন্ন বাহিনীর প্রতিরোধ। তার ভিতর 'লাৎজু-পাস' পার হওয়াটাই ছিল সব চেয়ে বড় বাধা। ঐ গিরিবর্ত্মের দেড় মাইল দীর্ঘ পথের একটিমাত্র প্রবেশদ্বার—তার দুদিকে একেবারে খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছিল বাঙ্কার, মেশিনগানধারীর দল। এখানেও লালফৌজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কর্নেল ইয়াং তে-চু। পরে তিনি পিপ্‌লস্‌ লিবারেশন আর্মির সামরিক কমাণ্ডার-ইন-চীফ পদে উন্নীত হন।[১]

'লাৎজু-পাস' পার হবার পরেও একটি পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করতে হয় ওদের—লিউপান পর্বত। চেয়ারম্যান মাওয়ের একান্ত সেবক চেন চ্যাং-ফেন এখানে একবার প্রায় মরতে বসেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর মুখ থেকেই শুনুন :[২]

"এবার আমাদের সামনে পড়লো লিউপান পর্বত।…

"তৃণভূমির আগে যে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করেছি লিউপান তার তুলনায় শিশু ; কিন্তু আমিও বোধহয় সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি।…আরও একটা কারণ ছিল, ইতিমধ্যে আমাকেও ধরেছে ম্যালেরিয়ায়।…পাহাড়ের চূড়ায় যখন পৌঁছেছি তখন হঠাৎ আমার ভীষণ কাঁপুনি ধরল, মনে হলো আমি আর এক পা-ও চলতে পারবো না।

"চেয়ারম্যান মাও ছিলেন ঠিক আমার পিছনেই। লক্ষ্য হয়েছে তাঁর—আমাকে প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার ? আমি বললাম, মনে হচ্ছে আমি আর চলতে পারবো না। কথা বলতে বলতেই পথের উপর আমি বসে পড়েছি। চেয়ারম্যান আমাকে জোর করে ধরে খাড়া করে দিলেন। উনি ভেবেছিলেন, আমার আবার ম্যালেরিয়ার জ্বর আসছে, তাই ওঁর দেহরক্ষীকে বললেন, মেডিকেল অর্ডালিকে ডেকে দিতে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, এ কাঁপুনি জ্বরের নয়, ক্লান্তিতে। আমি সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছি। বললাম, আপনি এগিয়ে যান, আমি একটু বিশ্রাম নিয়েই ফের রওনা হব।

"মাথা খারাপ!—চেয়ারম্যান প্রায় ধমক দিয়ে ওঠেন—এখানে বাতাস খুব

হাল্কা। তাছাড়া বৃষ্টিও পড়ছে। এই কি বিশ্রাম নেবার জায়গা? মনকে শক্ত কর চ্যাং-ফেন—চল, এগিয়ে যেতেই হবে।

"উনি আমার বগলের তলায় একটা হাত চালিয়ে দিয়ে আমাকে ধরতে চাই-লেন। আমি সসংকোচে প্রত্যাখ্যান করে বলি, ঠিক আছে চলুন, আমি নিজেই যেতে পারব।

"মুখে বললাম বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আমি বসে পড়লাম ফের।

"উনি বিস্মিত হয়ে ঝুঁকে পড়েন। বলেন, কী কষ্ট হচ্ছে তোমার ঠিক করে বলতো? শীত?

": হ্যাঁ! ভীষণ শীত করছে আমার!

": আমার ওভারকোটটা নিয়ে গায়ে দে দেখি—

"কথা বলতে বলতেই উনি কোটটা খুলতে থাকেন। আমি ওঁর হাত চেপে ধরি। ঐ কোটের নিচে আছে সুতির জামা—আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি। বলি, না, না—ও-কোট আমি কিছুতেই গায়ে দেবো না। এই দেখুন, আমি দাঁড়াতে পারছি—

"বলেই উঠে দাঁড়াতে গেলাম এবং তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম—

"যখন জ্ঞান ফিরে এলো দেখি শুয়ে আছি একটা কুঁড়ে ঘরে। আর আমার গায়ে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যানের সেই গরম ওভারকোটটা!...

"একটু পরেই চেয়ারম্যান এলেন। দেখলাম ওঁর সুতীর শার্টটা তুষারপাতে ভিজে গেছে।

": কি রে? এখন কেমন আছিস?—

মনে হলো চেয়ারম্যান নয়, আমার বাল্যকালে-হারানো বাবা কথা বলছেন!"

১৯৩৫ সালের অক্টোবরে এ মহাযাত্রা শেষ হলো একদিন। শেন্‌সি-সোভিয়েতের প্রবেশদ্বারের শেষ গ্রাম 'উচিবেন'-এ রাতটা কাটিয়ে পরদিন রওনা হলেন ওঁরা। শেন্‌সি-সোভিয়েতে আগেই খবর পৌঁছেছিল; তারা ওঁদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। সে কাহিনীও শোনাতে পারি প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণে:[৩]

> "আমরা যখন রওনা হলাম তখনও তুষারপাত হচ্ছে। আমাদের সকলের গায়েই সুতীর জামা; কিন্তু তাতে আমরা এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি—শীতে কেউ কাঁপছে না। আমরা যখন শিয়াশিওয়ানে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দূর থেকেই দুন্দুভি আর শিঙার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, আর বহু লোকের মিলিত কলরব। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছাতেই নজরে

পড়লো বিরাট এক জনতা আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে। চেয়ারম্যানকে ঘিরে সে কী চিৎকার আর হৈ চৈ।

- চেয়ারম্যান মাও : সুস্বাগতম্!
- লালফৌজ : সুস্বাগতম্!
- চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি : দীর্ঘজীবী হোক্!

"চেয়ারম্যান হাত তুলে ওদের প্রত্যাভিবাদন জানাচ্ছিলেন। তাঁর হাসিতে ফুটে উঠেছিল লঙ্-মার্চের সাফল্য; তাঁর ঝাঁজরা হয়ে যাওয়া ওভারকোটের হাতায় লঙ্-মার্চের ব্যর্থতা!"

অক্টোবরের শেষাশেষি শেষ হলো ঐ মহাযাত্রা। স্মেডলে[৪] এবং স্নোর[৫] মতে শেন্‌সিতে তখন লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা প্রায় হাজার বিশেক। কিন্তু ঐ হিসাবের মধ্যে শেন্‌সি-বেস্ এলাকার অনেক সৈন্য আগে থেকেই ছিল। চৌ-এন-লাইয়ের[৬] মতে তা হাজার দশেক হবে। তাই মনে হয়, চেয়ারম্যানের সঙ্গে সেদিন যারা ওখানে উপস্থিত হয়, তাদের সংখ্যা আন্দাজ সাত-আট হাজার মাত্র।[৭] যদি ধরে নিই, এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ পথেই সংগ্রহ করা তাহলে বলতে হবে—১৬ই অক্টোবর ১৯৩৪-এ যে এক লক্ষ লোক কিয়াংসি থেকে যাত্রা শুরু করে তাদের মধ্যে পাঁচ হাজার এসে পৌঁছাতে পেরেছিল এই শেষ তীর্থ প্রান্তে। অর্থাৎ শতকরা পাঁচজন। তার মানে এই নয় যে, শতকরা বাকি পঁচানব্বই জনই পথে মারা যায়; কারণ অনেককে ইচ্ছা করেই বিভিন্ন গ্রামে রেখে আসা হয়, সে অঞ্চলে বিপ্লবের বীজ বপন করতে।

চীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামে লঙ্-মার্চের অবদান অসামান্য। নবীন চীনের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন—ঐ অবিশ্রান্ত পদযাত্রার প্রভাব চীনা জনগণের অন্তরে প্রচণ্ডভাবে কাজ করেছিল। এই লঙ্-মার্চের মূল নিয়ামক চেয়ারম্যান মাও ৎসে-তুঙ স্বয়ং সেটা কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন সেটাকেই আমরা প্রামাণ্য বলে ধরে নিতে পারি। চেয়ারম্যান বলছেন :[৮]

"আমরা বলে থাকি—ইতিহাসে লঙ্-মার্চ অভূতপূর্ব; বলি—এটা একটা দলিল, একটা উদ্দীপনা-সঞ্চারী শক্তি, একটি বীজ-বপনের যন্ত্র···দ্বাদশ মাস-ব্যাপী পদক্ষেপে আমরা ক্রমাগত এগিয়েছি। শত শত বোমারু বিমানের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছি; লক্ষ লক্ষ সৈন্যের দ্বারা আমাদের অবরোধ করা হয়েছে, ঘিরে ফেলা হয়েছে, তাড়া করা হয়েছে এবং নানাভাবে বাধা

দেওয়া হয়েছে। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট আমাদের বরণ করতে হয়েছে; কিন্তু শুধুমাত্র দুটি পায়ের উপর নির্ভর করে আমরা বিশ-হাজার লী পথ অতিক্রম করেছি, এগারোটি প্রদেশ পার হয়েছি। বলুন, আমাদের সেই মহাযাত্রার তুলনা কোথাও আছে? না, নেই!

"লঙ্-মার্চ একটি সনদ। এই সনদ দুনিয়াকে ডেকে বলছে: লালফৌজে আছে শুধু বীরের অধিকার! ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের শৃগালসদৃশ তাঁবেদারের দল, ঐ চিয়াঙ কাই-শেক প্রমুখ লোকগুলোর কোনো মূল্যই নেই। এই সনদ ঘোষণা করেছে: চিয়াঙ কাই-শেক আর সাম্রাজ্যবাদীদের সব বাধা-বিপত্তি, অবরোধ আমরা ধূলিসাৎ করেছি!

"লঙ্-মার্চ একটি উদ্দীপনাসঞ্চারী শক্তি। এগারোটি প্রদেশের আনুমানিক বিশ কোটি মানুষকে ঐ লঙ্-মার্চ বুঝিয়ে দিয়েছে—চূড়ান্ত মুক্তির সন্ধান একমাত্র লালফৌজই দিতে পারবে। ঐ অভিযান ছাড়া অত তাড়াতাড়ি এই বিশাল জনসমষ্টিকে আমরা কেমন করে জানান দিতাম—দুনিয়ায় সাম্যবাদের নতুন এই ভাবধারার সংবাদ, যা নাকি লালফৌজ তুলে ধরতে চেয়েছিল।

"লঙ্-মার্চ এছাড়া একটি বীজ-বপনের যন্ত্র। এগারোটি প্রদেশে আমরা বিপ্লবের বীজ বপন করতে করতে অগ্রসর হয়েছি। সেগুলি কালে অঙ্কুরিত হবে, মাথা চাড়া দেবে, মুঞ্জরিত হবে এবং আগামী দিনের ফসল ফলাবে।

"এক কথায়: লঙ মার্চ শেষ হলো আমাদের জয়ে এবং শত্রুপক্ষের পরাজয়ে।"

আপনারা বলতে পারেন—সংখ্যাতত্ত্ব কিন্তু অন্য রকম ইঙ্গিত দিচ্ছে:

লঙ্-মার্চ শুরু হবার সময় সব কয়টি গণফৌজের মিলিত সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ।[৭] লঙ্ মার্চ শেষ হবার সময় সেই সংখ্যাটা নেমে এসেছে মাত্র তিন হাজারে—

শেনসি সোভিয়েত ...	মাও ৎসে-তুঙ-এর অধীনে		...	৮,০০০
(লঙ্-মার্চ অন্তে)	লিউ সাও-চির	ঐ	...	৫,০০০
	শু হাই-তুঙ-এর	ঐ	...	৩,০০০
				১৬,০০০
হো-লাঙ এবং চ্যাং-কু-তাও-এর অধীনে লঙ্-মার্চের পথে			...	১৪,০০০
				৩০,০০০

সংখ্যাতত্ত্ব যে ঐতিহাসিক সত্য সব সময়ে ঠিক মতো তুলে ধরতে পারে না

চীনের পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা মহাচীনের ইতিহাসে লঙ্-মার্চের অবদানটুকুর মূল্যায়ন করতে বসেছি। এই পদযাত্রা পরবর্তী বিপ্লবীদের অন্তরে কী অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটা বোঝাতে আর একটি কাহিনী শোনাই। এ কাহিনীটি যাঁর স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত করছি তাঁর নাম ওয়াং তে-চিং। তিনি আদৌ লঙ্-মার্চে অংশগ্রহণ করেন নি। লঙ্-মার্চের বিস্তারিত বিবরণ তিনি শুনেছিলেন তাঁর স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াও শিঙ-ওয়েনের মুখে। শুনেছিলেন ১৯৪৫ সালে, জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়। অর্থাৎ 'লঙ্-মার্চ' তখন নয় বছরের পুরাতন ইতিহাস। লেখক ওয়াং তখন ষোলো বছরের কিশোর, সবে মাত্র নাম লিখিয়েছেন লালফৌজে—না! ভুল হলো; ততদিনে লালফৌজ রূপান্তরিত হয়েছে এইট্থ্ রুট আর্মিতে। অর্থাৎ জাপানের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মাও ৎসে-তুঙ তখন বাধ্য হয়ে হাত মিলিয়েছেন চিয়াঙ কাই-শেকের সঙ্গে। যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছে আবার। লালফৌজ হয়েছে অষ্টম রুট আর্মি। সেই লড়াইয়ের অবকাশে কিশোর ওয়াং তাঁর স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াও-এর মুখে লঙ্-মার্চের কাহিনী শুনতেন। লিয়াও শিঙ-ওয়েন-এর বয়স তখন সাতাশ। ষোড়শবর্ষীয় ওয়াং তাঁর প্রথম দিনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কাহিনী শোনাচ্ছেন :[১০]

অক্টোবরের (১৯৪৫) শেষাশেষি আমরা পৌছলাম ওয়েৎস্থন-এর কাছাকাছি। ঐ ওয়েৎস্থনেই ছিল জাপানী বাহিনীর সরবরাহ কেন্দ্র, যেখান থেকে রসদ নিয়ে ওরা শিনকাও এবং অন্যান্য জেলায় আক্রমণ চালাচ্ছে। সেদিন রাত্রের ঘনান্ধকারে আমরা শহরতলীর দক্ষিণ দিকে গুটি গুটি এগুচ্ছি। বস্তুত জীবনে সেই রাত্রেই আমি প্রথম প্রত্যক্ষ লড়াই-এ অংশ নিচ্ছি। এতদিন ছিলাম সংবাদবহ। ফলে আমার মন ছিল উত্তেজনায় ভরা। কী পরিবেশে কী করতে হয় কিছুই জানি না। স্কোয়াড্রন-লীডার লিয়াও শিঙ-ওয়েন বলেছিলেন, ভয় পাসনে, তুই থাকবি আমার ঠিক পাশে। লিয়াও ছিলেন বহু লড়াইয়ের বিজয়ী যোদ্ধা—পোড়-খাওয়া সামরিক অফিসার ; লঙ্-মার্চের হাজার পরীক্ষায় পাস করা—সবাই তাঁর উপর খুব নির্ভর করত।

নীরন্ধ্র অন্ধকারে পথের বাঁকে আমরা দাঁড়ালাম। লিয়াও আমায় কানে কানে বললেন, ঠিক আমার পিছু পিছু গুড়ি মেরে এগিয়ে আয়!

র‍্যাট···র‍্যাট···র‍্যাট।···হঠাৎ রাস্তার মোড়ের ওপাশ থেকে মেশিনগান গর্জন করে উঠল আচমকা। কানের পাশ দিয়ে এক রাশ ছর্‌রা ছুটে গেল। কোথায় একটা বিস্ফোরণ হলো, চকিত আলোয় দেখলাম—সামনে একটা ভাঙা পাঁচিল। স্কোয়াড্

দাঁড়ায় ছিলেন সামনে—ওটার আড়ালে তাঁরই আগে আশ্রয় পাওয়ার কথা; কিন্তু তিনি এক হেঁচকা টানে আমাকে টেনে আনলেন পিছন থেকে। ঠেসে ধরলেন নির্মম হাতে পাঁচিলটার গায়ে। নিজেও সেঁটে গেলেন আমাকে আড়াল করে।

মেশিনগানধারীটাও বিস্ফোরণের আলোয় দেখে ফেলেছে আমাদের। র‍্যাট···র‍্যাট ···র‍্যাট—নিরবচ্ছিন্ন গুলি চালিয়ে যায় পাঁচিলটা লক্ষ্য করে। আমাদের জামার আস্তিন ঝাঁজরা হয়ে গেল। তবু বেঁচে আছি। দুজনেই।

একটু পরে মেশিনগানটার গর্জন বন্ধ হতেই স্কোয়াড-লীডার আমার কানে কানে বললেন, বেটা রি-লোড করছে। এই সুযোগ। বাচ্ছা ওয়াং! চার্জ!

আমি জবাব দেবার আগেই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে উল্কার বেগে ছুটে গেলেন উনি। আমি ছায়ার মতো ওঁর পিছু পিছু। একবার ওরই মাঝে বললেন, 'এবার ঝেড়ে দে!'

কি ঝাড়ব? কোথার ঝাড়ব? রুদ্ধশ্বাসে সামনের দিকে ছুটতে ছুটতেই ভাবছি। হঠাৎ লক্ষ্য হলো কী একটা জিনিস উনি ছুঁড়ে দিলেন মেশিনগানটার দিকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হওয়ায় মনে পড়ল—আমার কাছেও আছে হ্যাণ্ড-গ্রেনেড; কিন্তু ছোঁড়া হলো না। ততক্ষণে পৌঁছে গেছি আমরা। স্কোয়াড-লীডার রীতিমতো ডাইভ খেয়ে পড়লেন। ওরাও ছিল দুজন। একজন বোধহয় আহত হয়েছিল হ্যাণ্ড-গ্রেনেডে. দ্বিতীয় জন শেষ হয়ে গেল ওঁর আক্রমণে। মেশিনগানটা ছিনিয়ে নিলেন উনি। ঠিক তখনই বাঁ-দিক থেকে ফায়ারিং-এর শব্দ হলো। স্কোয়াড-লীডার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। তখনও মেশিনগানটা হাত-ছাড়া হয় নি তাঁর। ইতিমধ্যে আমাদের দলের অনেকেই ছুটে এসেছে। ওরা পালাচ্ছে। ঘাঁটিটা আমাদের দখলে।

দুরন্ত ভয়ে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ি ওঁর বুকের উপর। মুখটা তুলে ধরি দু হাতে। পাগলের মতো ডাকি: স্কোয়াড-লীডার! স্কোয়াড-লীডার!

গুলিটা লেগেছিল বুকে। স্কোয়াড-লীডারের তখনও জ্ঞান ছিল। বললেন, বাচ্ছা-ওয়াং, ভয় পাসনে। ওরা পালিয়েছে!

ভয় নিজের জন্য পাচ্ছি না। কিন্তু উনি যে—

কোথায় আবার বিস্ফোরণ হলো। তারই আলোয় দেখলাম স্কোয়াড-লীডারের ঠোঁটের কোণায় লেগে আছে এক চিলতে একটা ম্লান হাসি। দ্রুত রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। তারই মধ্যে সমস্ত শক্তিতে তিনি তাঁর ব্যাগ হাতড়ে বার করলেন অয়েল-পেপারে মোড়া একটা রেড আর্মি ক্যাপ! টুপিটা বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে। কী একটা কথা বলতে গেলেন। পারলেন না। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, শব্দ বার হলো না কিছু। চোখ দুটো ধীরে ধীরে বুজে এলো, মাথাটা কাত হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল সব।

শেষ কথাটা শেষ হলো না। না হোক। আমি সেটা বুঝতে পেরেছি।

না বোঝার কারণ নেই। সে গল্প যে আমার মুখস্থ। ঐ লালটুপির ইতিকথা। বহুবার শুনেছি ওঁর মুখে। সেটা ছিল ওঁর প্রিয় গল্প :

স্কোয়াড্রন-লীডার লিয়াও শিঙ-ওয়েন প্রথম যখন লঙ্-মার্চে যোগ দেন তখন ওঁর বয়স তের চৌদ্দ প্রায়—এই আজকের আমার বয়সী, আরও ছোট। জমিদারের অত্যাচারে ওঁর দাদু-দিদা-বাবা-মা সবাই মারা যায়। একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন তিনি। একটি মাত্র বাসনা ছিল অন্তরে। সেই নিষ্ঠুর জমিদারের রক্তে স্নান করে মা আর দিদিকে উদ্ধার করা। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াও—জমিদারের রক্তে স্নান করেছিলেন তিনি, দিদিকে উদ্ধার করেছিলেন। বহুবার সে কাহিনী শুনেছি তাঁর কাছে—সেই সিচুয়ান প্রদেশের তায়ী গ্রামের জমিদার সিউ ওয়েন-ছাইয়ের নিধন-কাহিনী।

ওঁদের স্কোয়াড্রনে কেউ ওঁকে লিয়াও শিঙ-ওয়েন নামে ডাকত না। ডাকত ওঁর ডাক নামে—'ব্যাঘ্রশাবক'! পাইহুয়া ভাষায় যার মানে—বাঘের বাচ্চা। জমিদারের কবল থেকে যেদিন উনি বেরিয়ে আসেন, প্রথম গণফৌজে নাম লেখান তখন ওঁর মাথায় জড়ানো ছিল একটা হলুদ রঙের গামছা। সেদিন থেকেই ওঁর লক্ষ্য ছিল লালফৌজের ঐ রেগুলার রেড আর্মি ক্যাপের দিকে। অভিজ্ঞ বয়োঃজ্যেষ্ঠদের অনেকের মাথাতেই দেখতেন লাল-তারা চিহ্নিত সেই ক্যাপ। জুল জুল চোখে উনি দেখতেন—মনে হতো ক্যাপের হুডগুলো ওঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সারা লঙ্-মার্চে তিনি ক্রমাগত তাঁর পলিটিক্যাল-ইন্সট্রাকটারকে তাগাদা দিয়ে গেছেন : ঐ রকম একটা রেড-ক্যাপ তাঁর চাইই!

পলিটিক্যাল-ইন্সট্রাকটার পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তিনি ঐ বাচ্চা ছেলেটার ঘ্যানঘ্যানানিতে রাগ করতেন না কিন্তু। ওর আব্দারে বিরক্ত না হয়ে তিনিও ক্রমাগত প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতেন : এবার তোকে নিশ্চিত একটা রেড-ক্যাপ দেব। সরবরাহ এলেই প্রথম টুপিটা তোর। এ একেবারে নির্ঘাৎ।

পলিটিক্যাল ইন্সট্রাকটর তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি; কিন্তু লিয়াও শিঙ-ওয়েনও পান নি তাঁর বাঞ্ছিত সম্পদ। কারণ ছিল। আর টুপির সাপ্লাই আসে নি আদৌ। আসবে কোথা থেকে? দর্জি বাহিনী চলেছে সঙ্গে, কিন্তু তারা জামা প্যান্ট মেরামত করেই সময় পায় না, তায় সৌখিন লালটুপি।

লালফৌজ এগিয়ে চলেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। সোনাবালি নদী পার হলো ওরা, লোলোদের দেশ, তারপর তাতু নদীর শিকল সেতু। এবার ওরা এসে পৌঁছালো এক সার পাহাড়ের সামনে। তাদের মাথায় চুনকাম করা। ঐ

চিরতুষারাবৃত রাজ্যেই 'লাল-টুপি' উপহার পেলেন লিয়াও। এতদিনের বাঞ্ছিত সম্পত্তি হাতে পেয়েও উল্লাসে লাফিয়ে ওঠেননি তিনি! ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে-ছিলেন!

বরফে ঢাকা পথ। তারই এক ধারে সেদিন বসে পড়েছে কিশোরটি। ওর দেহ আর সহ্য করতে পারছে না। প্রচণ্ড শীত, তার উপর দুদিন আছে অনাহারে। দুরন্ত খিদে পেয়েছে ওর। মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম করছে। ওর জুতোও গেছে ছিঁড়ে। জুতোর ফাঁক দিয়ে বার হয়ে এসেছে আঙুলগুলো। অসাড় হয়ে গেছে তা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই নিচে থেকে পথের বাঁকে আবির্ভূত হলো পলিটিক্যাল-ইন্সট্রাকটারের প্রৌঢ় চেহারাটা। এই শেষ ক-দিনে তিনি রীতিমতো বুড়িয়ে গেছেন। গাল দুটো তুবড়ে গেছে, একমুখ খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি গজিয়েছে। রক্তশূন্য সাদা চেহারা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছিলেন উনি, পা টেনে টেনে। লিয়াওকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন: আরে ব্যাঘ্র শাবক! তুই এখানে বসে আছিস? এ কিরে। কাঁদছিস কেন?

হঠাৎ স্নেহের ডাকে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললে বাঘের বাচ্চা। বললে: পলিটিক্যাল ইন্সট্রাক্টার। আমি···আমি আর পারব না, আমার···আমার···

: কী হয়েছে তোর? বল না? থামলি কেন?

দু হাতে মুখ ঢেকে কিশোরটি বলে ওঠে: মাথা ঘুরছে, সারা দেহ থর থর করে কাঁপছে।···আমার···আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

প্রৌঢ় মানুষটি বসে পড়লেন ওর পাশে। ওর পা ম্যাসেজ করে দিলেন। তারপর পিছনের হিপ পকেট থেকে বার করলেন এক টুকরো শুকনো মাংস। বললেন, নে খা, চিবিয়ে দেখ, গায়ে বল পাবি—

টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ল কিশোর ছেলেটির গাল বেয়ে। ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করল সে। ও জানত, গত দুদিন ধরে তিনি নিজেই অনাহারে আছেন—ঐ মাংসের টুকরোটাই ওঁর শেষ সম্বল। প্রৌঢ় মানুষটি বললেন, কেন রে? আমি নিজেই তো দিচ্ছি—

জবাব দিতে পারল না। দৃঢ়ভাবে মাথাটা নাড়ল আবার।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল প্রৌঢ়ের বিশুষ্ক ঠোঁটে। অর্ডার দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, কমরেড লিয়াও শেঙ-ওয়েন! তাহলে এটা তোমার পলিটিক্যাল ইন্সট্রাকটারের আদেশ। খাও তুমি।

আর পারল না। গো-গ্রাসে খেয়ে ফেলল মাংসের টুকরোটা।

: বিপ্লবের পথ কি অত সোজা হয় রে? অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণার ভিতর

দিয়ে আমাদের চলতে হবে। নে, ওঠ! উঠে দাঁড়া। বসবি না কিছুতেই। বসলেই শীতে জমে যাবি। অনিবার্য মৃত্যু। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিরিয়ে নিবি। আয়…

আবার টুক টুক করে এগিয়ে গেলেন প্রৌঢ় মানুষটি। সাদা বরফের পশ্চাদ্‌পটে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল তাঁর দুর্বল দেহটা। পা টেনে টেনে চলেছেন তিনি। লিয়াও এতক্ষণে অনেকটা সুস্থ হয়েছে। হাতের উল্টো পিঠে চোখটা মুছে নিয়ে সেও অনুসরণ করে তাঁকে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। তুষারপাত হচ্ছে এক নাগাড়ে। পা টেনে টেনে চলেছে খাড়া চড়াইয়ের পথে। প্রতি পদক্ষেপে বরফের মধ্যে পা ডুবে যাচ্ছে। নিশ্বাস নেওয়াও কষ্টকর। কালকের সেই এক টুকরো মাংসের পর আর কিছু জোটে নি। ভীষণ ইচ্ছে করছিল পথের ধারে কোনোও পাথরের খাঁজে বসে একটু জিরিয়ে নেয়। কিন্তু—না! দলপতির সাবধানবাণী তখনও বাজছে ওর কানে : বসবি না কিছুতেই …বসলেই অনিবার্য মৃত্যু।

হঠাৎ নজর হলো পথের ধারে কে একজন শুয়ে পড়েছে। বসে নয়, শুয়ে। দলপতির পরামর্শটা লোকটাকে শুনিয়ে যাওয়া দরকার, নয়? লিয়াও এগিয়ে এলো। চমকে উঠল সে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তবু চিনতে পারল ওঁকে। ওরই দলপতি —সেই পলিটিক্যাল-ইন্সট্রাক্‌টার। বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল ওর। ছুটে গেল ওঁর কাছে : মাস্টারমশাই। মাস্টারমশাই।

প্রৌঢ় মানুষটির জ্ঞান ছিল তখনও। শুয়েছেন অন্তিম শয়ানে। মৃত্যুর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তাঁর চোখে। তবু তিনি চিনতে পারলেন তাঁর ‘ব্যাঘ্রশাবক’কে। ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বললেন, আমার জন্য দুঃখ করিস না রে, এগিয়ে যা। বসবি না খবর্দার। বসলেই মৃত্যু।

কিশোর ছেলেটি ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল। আজ ছয় মাস ধরে তিনি যে ছিলেন ওর শৈশবে-হারানো বাপের মতো। তাঁর মাথাটা কোলে তুলে নিল।

মৃত্যুপথযাত্রী বললেন, বাঘের বাচ্ছা। তোকে না একটা রেড আর্মি ক্যাপ দেওয়ার কথা ছিল আমার?

ওর ইচ্ছা করছিল গগন-বিদারী একটা জান্তব আর্তনাদ করতে। সে প্রস্তর-মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইল।

: এই নে—

মাথা থেকে টুপিটা খুলে উনি বাড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমার জুতো জোড়া খুলে নে। তোর এখনও…অনেকটা পথ…যে বাকি…

একটু দম নিয়ে ফের বললেন, বাঘের বাচ্ছা! এগিয়ে যা···থামিস না কিছুতেই। লঙ্-মার্চ এখনও শেষ হয় নি।

শেষ কথাগুলো বিঁধল ছুরির মতো।

পলিটিক্যাল ইন্সট্রাক্টার চোখ বুজলেন।

কোল থেকে মাথাটা নামিয়ে দিল এবার। ফুল পাবে কোথায়? এক মুঠো তুষার ছড়িয়ে দিল ওঁর গায়ে। ওঁর শেষ দানটা সে না নিয়ে পারে নি।

সেই টুপি!

স্কোয়াড্ৰ-লীডার লিয়াও মৃত্যুশয্যায় আমার হাতে সেই রেড আর্মি ক্যাপটাই বাড়িয়ে ধরলেন। ক্যাপটা তাঁর মাথায় ছিল না, ছিল ঝোলায়—অয়েল পেপারে মোড়ানো। সব সময়েই সেটা সঙ্গে রাখতেন তিনি। কারণটা মর্মন্তুদ। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি যখন লালফৌজ ভেঙে দিয়ে এইট্থ্ রুট আর্মি গঠন করল তখন মিলিটারী আইনে ঐ রেড আর্মি ক্যাপ পরা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে আদেশ মানতে বাধ্য হয়েছিলেন কমরেড লিয়াও; টুপিটা তিনি আর মাথায় পরতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন, ঐ টুপি মাথায় দেবার দিন শীঘ্রই আসবে—তাই সর্বদা সেটা রাখতেন তাঁর পিঠুতে। আমি বহুবার সেটা দেখেছি; আর স্বীকার করব, ওটার উপর আমার লোভও ছিল। হয়তো কোনোদিন চেয়েই বসতাম 'লঙ্-মার্চ'-এর স্মৃতি বিজড়িত ঐ টুপিটা। চাই নি। কারণ—জানতাম ওটাই ওঁর প্রাণ!

তাই আমি বুঝতে পেরেছিলাম শেষ-নিশ্বাসের সঙ্গে কী-কথা বলতে চেয়েছিলেন আমার স্কোয়াড্রন-লীডার—কমরেড লিয়াও শেঙ-ওয়েন। লঙ্-মার্চে যাঁর নাম ছিল—বাঘের বাচ্ছা। উনি বলতে চেয়েছিলেন: বাচ্ছা-ওয়াং। এগিয়ে যা···থামিস্ না কিছুতেই। লঙ্-মার্চ এখনও শেষ হয় নি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সিয়ানে শেয়ানে-শেয়ানে

অবশেষে দুঃসংবাদটা এসে পৌঁছালো মহাচীনের মহানায়ক জেনারালিসিমো চিয়াঙ কাই-শেকের কানে। সব ক'টা ডাকাত নাকি জমায়েত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনসিতে। পাও-য়ান আর ইয়েনানে নতুন ঘাঁটি গেড়েছে বদমায়েশগুলো! কিয়াংসি সোভিয়েতের সেই পালের গোদা মাও ৎসে-তুঙ আর তার চ্যালা চু তে, সাংচি সোভিয়েতের সেই দুর্ধর্ষ ডাকাত-সর্দার হো-লাঙ, পাচুং সোভিয়েতের চ্যাং কু-তাও। আর আছে ডাকাত দলের নানান চ্যালা-চামুণ্ডা—লিন পিয়াও, চৌ এন-লাই, পেং তে-হুই, শ্যু কিয়োং-চেন, পো-কু প্রভৃতি। অথচ মাত্র এক বছর আগে প্রত্যেকটি সোভিয়েতে 'সাও দাং'[১] চালিয়ে সব কটা ডাকাতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছিল। আশ্চর্য! তাহলে কেমন করে সব ক'জন এক-কাট্টা হলো আবার?

এই এক বছরে চিয়াঙ-সাহেব ভেবেছিলেন তাঁর গদীটা বুঝি বেশ পোক্ত হয়েছে। নানান বিদেশী-শক্তির সঙ্গে জমাটি বন্ধুত্ব হয়েছে। একদিকে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স—অন্যদিকে জাপান-জার্মানী-ইটালি—সবাই, সবাই ওঁর বন্ধু। সকলেই এক-বাক্যে মেনে নিয়েছে লাল-ডাকাতগুলো সকলেরই শত্রু। তাই চিয়াঙ যেমন অকৃপণ হাতে বিদেশী শক্তিগুলোকে নানান জাতের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যাচ্ছেন—তারাও খাদ্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে তাঁকে মদৎ জোগাচ্ছে—সবাই বলছে, লাল-জুজুকে তাড়াও!

দক্ষিণ-চীনের সমৃদ্ধ অঞ্চলে চিয়াঙ-এর শুভার্থীর দলও বড় কম নয়। বড় বড় ব্যবসাদার, মিল-মালিক, খনি-মালিক, জমিদার, মহাজন এবং মৃতপ্রায় সামন্ততন্ত্রের শেষ উত্তর-সাধক জঙ্গী নেতারা সকলেই তাঁর দলে। সবাই একযোগে বলছেন—'চিয়াঙ কাই-শেক যুগ যুগ জিও!' কিন্তু চিয়াঙ যত্ন করে ইতিহাস পড়েছেন, জানেন—সাধারণ মানুষের সমর্থন না পেলে গদী ছাড়তে হতে পারে। তাই তিনি এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রী এক নূতন আন্দোলনের ধুয়ো তুললেন—'নবজীবন আন্দোলন।' "মাও ৎসে-তুঙ যখন তাঁর সর্বহারা অনুগামীদের পাহাড়ে-জঙ্গলে মরণপণ যুদ্ধ করে নূতন পৃথিবীর আগমনী সঙ্গীত রচনা করতে বলছেন ঠিক তখনই চিয়াঙ তাঁর স্বদেশবাসীকে বলতে শুরু করলেন—উঁহু, সামনের দিকে নয়, পিছনের দিকে ফিরে তাকাও, আর ধৈর্য ধরে সুদিনের প্রতীক্ষা কর"।[২]

'নব-জীবন' আন্দোলনের ধাপ্পাবাজিটা বোঝা যাবে মাদাম চিয়াঙ-এর একটি উদ্ধৃতি পড়লে। সুং-এর লেমা আন্দোলন সংক্রান্ত একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বসে মাদাম চিয়াঙ কাই-শেক বলছেন :

"কম্যুনিস্ট ডাকাতদলের অত্যাচারে পর্যুদস্ত জনগণকে নূতন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে মহান নেতা জেনারালিসিমো চিয়াঙ কাই-শেক এর 'নব-জীবন' আন্দোলনের ভগীরথরূপে আজ অবতীর্ণ। কিয়াংসি প্রদেশকে সাম্যবাদী ডাকাতগুলোর কবলমুক্ত করার পর তিনি অনুভব করলেন যে, ডাকাতদের অপপ্রচারের মোকাবিলা করা দরকার। একটা ভাবাদর্শ জনগণের সামনে রাখতে হবে। সাম্যবাদের আকাশ-কুসুম নয়—বাস্তব একটা আদর্শ। তাই এই 'নব-জীবন আন্দোলন'। প্রাচীন চীনের ভাব-চতুষ্টয় তিনি লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরেছেন। সেই চারিটি আদর্শ হচ্ছে : 'লি, আই, লিয়েন এবং চিহ্' !—আপনারা জানেন, ঐ চারটি স্তম্ভের উপরেই মহান চীনের প্রাচীন সভ্যতা সেই কন্‌ফুশিয়াসের যুগ থেকে সগর্বে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

" 'লি' মানে ভদ্রতাজ্ঞান, 'আই' মানে পারস্পরিক সহযোগিতা, 'লিয়েন' হচ্ছে অপরের অধিকার সবিনয়ে মেনে নেওয়া এবং 'চিহ্'-র অর্থ উদারতা, ক্ষমা!

"মাত্র এক বছর আগে এই আন্দোলনের সূত্রপাত—আজ দশটি প্রদেশে এর শাখা-অফিস খোলা হয়েছে। 'নব-জীবন আন্দোলন' গ্রাম-গ্রামান্তরে আশার আলোকবর্তিকা জ্বেলে চলেছে।...কিছুদিন আগে জেনারালিসিমো গিয়েছিলেন সিছুয়ান-অঞ্চলে, ঐ প্রদেশটা কম্যুনিস্ট-ডাকাতদের কব্জা থেকে মুক্ত করতে। ডাকাতেরা সিছুয়ান ছেড়ে পালিয়েছে; কিন্তু জেনারালিসিমো স্বচক্ষে দেখলেন—জনগণের কী অপরিসীম দুর্দশা। তিনি সিছুয়ানে নব-জীবনের বীজ বপন করে এলেন।"[৩]

এ জাতীয় নীতি-কথা অন্য সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষ সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে শুনেছে কি? ঠিক এই জাতের 'নব-জীবনে'র প্রতিশ্রুতি-প্রচার? সমান্তরাল-চিত্রের কথাটা আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন!

সে যাই হোক, এসব দেখে মনে হতে পারে চিয়াঙ-সাহেবের গদি বুঝি বেশ পাকা-পোক্ত—চিয়াঙ নিজেও তাই ভাবতেন; কিন্তু বাস্তবে তার বনিয়াদ ধ্বসে যেতে শুরু করেছে অলক্ষ্যে। তার প্রধান কারণ ঐ 'লঙ্-মার্চ'। শেষ পৃষ্ঠার ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়—ঐ বিশাল দেশের কী-পরিমাণ অংশ লালফৌজ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছে। ওরা যেখানে গেছে সাম্যবাদের প্রচার করেছে—যৌথ

সঙ্গীত শুনিয়েছে, নাটক অভিনয় করেছে, বক্তৃতা করেছে, আলোচনা করেছে—আর লড়াই-এর ময়দানে বীরের মতো মরে দেশটাকে মৃত্যুর পথে বাঁচতে শিখিয়েছে। যেসব জমিদার, জোতদার, মহাজন আর ট্যাক্স-কালেক্টার এতদিন 'লি-আই-সিয়েন-চিহ্'র বুলি কপচিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীর রক্ত-শোষণ করেছে তাদের ঐ লালফৌজ পিটিয়ে শায়েস্তা করেছে, ভূমিহীন কৃষকের হাতে চাষের জমি তুলে দিয়েছে। চিয়াঙ-এর আক্রমণে কম্যুনিস্টরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সরে গেছে বটে কিন্তু যাবার আগে গ্রামবাসীকে সেই নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদও দিয়েছে। ওরা বুঝতে শিখেছে 'লি-আই-লিয়েন-চি'র সুড়ঙ্গ পথে ওদের অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার সমাধান কোনো দিনই আসবে না বরং সেটা আসতে পারে রাইফেলের নল বেয়ে! তাই চিয়াঙের অজ্ঞাতে সমস্ত চীন তখন চাইছে লালফৌজ জয়যুক্ত হোক—সর্বহারার দল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুক, মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশী বেনে, স্বদেশী মুৎসুদ্দি-দালাল আর ধন-কুবের ছাড়া সবাই তাই চাইছে!

আরও একটা বড় জাতের কারণ ছিল। চিয়াঙ যে জাপানীদের আগ্রাসী নীতি মেনে নিয়ে কম্যুনিস্ট-নিধনে উঠে-পড়ে লেগেছেন, এটা কোনো সত্যিকারের দেশ-প্রেমী কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। চিয়াঙের অনেক বড় জাতের সামরিক নেতা এটা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তার মধ্যে দু-জন প্রধান হচ্ছেন—মার্শাল চ্যাঙ আর য়াং হু-চেং।'

মার্শাল চ্যাঙ ছিলেন তুংপেই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক—বস্তুত চিয়াঙের সামরিক শক্তির মূল স্তম্ভ। তিনি সে সময় ছিলেন সিয়ান-ফু'তে। সিয়ান হচ্ছে হোয়াঙ হো'র ধারে সেই প্রাচীন রাজধানী 'চাঙ্গান'-এর নবরূপ। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে, ঐ 'চাঙ্গান' হচ্ছে প্রাচীনতর রাজধানী 'হাওচিং'-এর সন্নিকটে, যেখানে হয়েছিল চীনের আদিমতম প্রজাবিপ্লব, খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে—যেখানে প্রজা-বিদ্রোহের আগুনে শ্যাঙ-সম্রাট শিন আত্মাহুতি দেন। মার্শাল চ্যাঙ একাধিকবার চিয়াঙকে পরামর্শ দিয়েছিলেন স্বজাতি-হত্যা বন্ধ করে জাপানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে; কিন্তু চোরা-না-শোনে ধর্মের কাহিনী! চিয়াঙ কিছুতেই সম্মত হন নি।

১৯৩৬ সালের অক্টোবরে জেনারালিসিমো স্বয়ং এলেন সিয়ান পরিদর্শনে। এসেই সব সেনাপতিকে ডেকে জানালেন—তিনি কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক শেষ অভিযান শুরু করবেন বলে মনস্থ করেছেন। মার্শাল চ্যাঙ এ সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি প্রস্তাব রাখলেন: 'আমাদের এখন কম্যুনিস্ট-নিধন কর্মসূচী বন্ধ রেখে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বহিঃশত্রু জাপানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। আমরা সে ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারি এবং গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে চীনকে রক্ষা

করতে পারি।'

চিয়াঙ তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, 'জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা আমি সেইদিন আলোচনা করবো যেদিন চীনের শেষ কম্যুনিস্টকে ফাঁসির দড়িতে লটকানো হবে।'[৪]

সপ্তাহখানেকের ভিতরেই চিয়াঙ তাঁর সামরিক ঘাঁটি লোয়াঙ-এ ফিরে গেলেন এবং পূর্ণ-উদ্যমে কম্যুনিস্ট-নিধনের শেষ ষষ্ঠ অভিযান রচনায় ব্যাপৃত হলেন। বিশ ডিভিসন সৈন্য, ট্যাঙ্ক, আর্মাডকার এবং পঞ্চাশখানি বোমারু বিমান পাঠিয়ে দেওয়া হলো সিয়ানের দিকে। ইতিমধ্যে কিন্তু জাপ-বিরোধী মনোভাবও সাধারণ চীনাদের মধ্যে বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। জাপানীদের অত্যাচার আর শোষণের প্রতিবাদে সাংহাইতে জাপানী কারখানায় শুরু হয়ে গেল ধর্মঘট। জাপানীরা ঐ অজুহাতে ইয়াংসি-মোহনায় এনে হাজির করতে থাকে একের পর এক যুদ্ধজাহাজ। অবস্থা বেগতিক বুঝে চিয়াঙ তড়িঘড়ি জাপ-বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন, ধর্মঘটীদের কয়েদ করলেন! ঐসব জাতীয় নেতা বা ধর্মঘটী কর্তাব্যক্তিরা কিন্তু কম্যুনিস্ট ছিলেন না আদৌ। ফলে অসন্তোষ আরও বেড়েই গেল। মার্শাল্ চ্যাঙ এক জনসমাবেশে বললেন: 'আমি পুনরায় জেনারালিসিমোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম ঐ সাতজন জাপ-বিরোধী জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিতে। ঐ সাতজন নেতা আমার আত্মীয়-বন্ধু, এমন কি পরিচিতও নন। তবু আমি সেই অনুরোধ করি—কারণ ওঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির কোনোও বিরোধ নেই। জেনারালিসিমো যখন আমার অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন তখন আমি তাঁকে বলি—'জাতীয়তাবাদীদের প্রতি আপনার এ নিষ্ঠুরতা একমাত্র য়ুয়ান শিহ্-কাইয়ের হৃদয়হীনতার সঙ্গে তুলনীয়।' তিনি জবাবে আমাকে বললেন, 'সেটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গির দোষ। আমিই সরকার! আমার সব কাজ বিপ্লবীর কাজ!'[৫]

বেশ বোঝা যায়, চিয়াঙের সঙ্গে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ঠিক সহযোগিতা করছে না। চিয়াঙ তাঁর ষষ্ঠ অভিযান শুরু করলেন। সব কটা কম্যুনিস্ট ডাকাতকে শেনসিতে খতম করতে হবে! তাঁর প্রথম-বাহিনীর প্রখ্যাত কমাণ্ডার-ইন-চীফ হু ৎসুন-নান এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ক্যাংসু প্রদেশে লাল-অধিকৃত এলাকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আশ্চর্য! লাল-ফৌজ কোনো প্রতিরোধ করলো না—ক্রমাগত তারা পিছু হটে যেতে থাকে। হু মহানন্দে গ্রামের পর গ্রাম দখল করে এগিয়ে চলেছেন। ওরা ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করছে। অথচ মজা হচ্ছে এই যে, স্থান ত্যাগের আগে ওরা পিছনে ফেলে যাচ্ছে অসংখ্য প্রচার-পত্রিকা—গাছের গায়ে, কুটিরের দেওয়ালে, মন্দিরে, সর্বত্র সাঁটা আছে পোস্টার—যে প্রচারপত্র ওদের পশ্চাদ্ধাবনকারীদের

উদ্দেশ্যে বলছে : "তোমরাও চীনা, আমরাও চীনা—তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না বলেই স্থান ত্যাগ করে যাচ্ছি। কমরেডস্! এস, হাত মেলাও—আমাদের সঙ্গে ঐ বিদেশী জাপানীগুলির সঙ্গে লড়াইয়ে সামিল হও!"

হু জিতছেন! কিন্তু মনে শান্তি নেই। গ্রামের পর গ্রাম দখল করছেন, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছেন—তাঁর সৈন্যদলের এক বৃহদংশ ইতিমধ্যে লালফৌজের প্রচারে বিভ্রান্ত।

তারপর হঠাৎ। এক সংকীর্ণ গিরিপথে হঠাৎ লালফৌজ ঘুরে দাঁড়ালো। ওরা আর পিছিয়ে যাবে না! ওরা সহসা স্থির করেছে হু-কে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এতদিন ওরা পশ্চাদপসরণ করেছে শক্তির অভাবে নয়—স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না বলেই। হু সেটা বুঝলেন। মর্মে মর্মে। অস্থিতে অস্থিতে। সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে তাঁর বাহিনী গেরিলা আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। গিরিপথের এদিক-ওদিক—দু'দিকই বন্ধ! এক যুদ্ধে তাঁর পুরো এক রেজিমেণ্ট সৈন্য বন্দী হলো, হাজার হাজার রাইফেল আর মেশিনগান লালফৌজের হস্তগত হলো—হু-র আর এক রেজিমেণ্ট হঠাৎ 'লাল' হয়ে গেল! পাঁচ সপ্তাহ ধরে হু যতটা জমি দখল করেছিলেন মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টায় সেটা হস্তান্তর করে ফিরে গেলেন।[৩]

সংবাদ পেয়ে জেনারালিসিমো ক্ষেপে আগুন। তৎক্ষণাৎ তিনি জেনারেল হু-কে পদচ্যুত করলেন এবং স্বয়ং সিয়ানে এসে সমরাঙ্গনের যাবতীয় দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নেবেন বলে স্থির করলেন।

চিয়াঙ তাঁর প্লেনে সিয়ানে আসছেন—সিয়ান বিমানঘাঁটির আবহাওয়াবিদ্ পাইলটকে রেডিও-যোগে জানালো : আবহাওয়া চমৎকার!

বেচারি আবহাওয়াবিদ্! লোকটা জানত না—সিয়ানের আকাশে কালবৈশাখী নেপথ্যে ঘনিয়ে উঠেছে। প্লেনটা নামলো। চিয়াঙ বেরিয়ে এলেন উড়োজাহাজের গর্ভ থেকে। তারিখটা ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৬।

চিয়াং আসছেন সংবাদ পেয়ে তুংপেই সমর-নেতারা মিলিত হলেন—জেনারেল য়াং-হু-চেঙ, মার্শাল চ্যাঙ প্রভৃতি। তাঁরা গোপন বৈঠকে স্থির করলেন এই সুযোগে তাঁরাও শেষ চেষ্টা করবেন—চিয়াঙকে বোঝাবেন, লাল-নিধন বন্ধ করে জাপ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। চিয়াঙও খবর পেয়েছিলেন যে, মার্শাল চ্যাঙ গোপনে লালফৌজের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন—তিনি চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। তাঁর পরিকল্পনাটা ছিল এই রকম : ১০ই ডিসেম্বর এক গোপন সম্মেলনে লাল-নিধন-যজ্ঞের চূড়ান্ত পরিকল্পনাটা পেশ করবেন। মার্শাল চ্যাঙ যদি সেই পরিকল্পনা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেন তো ভালো, নাহলে তাঁকে পদচ্যুত ও গ্রেপ্তার করা হবে।

সন্দেহভাজন সেনা-নায়কের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তিনি আগেভাগেই সিয়ানের পুলিশ-কমিশনারকে দিয়ে রেখেছিলেন—যাতে তাঁর ইঙ্গিতমাত্র সব ক'জনকে এক-সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইতিমধ্যে ঘটলো আর একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা। ৯ই ডিসেম্বর কয়েক হাজার স্কুলের ছাত্রছাত্রী এক ডেপুটেশান নিয়ে দেখা করতে এলো জেনারালিসিমোর সঙ্গে। তিনি তখন সিয়ান থেকে মাইল দশেক দূরেএকটি উষ্ণ প্রস্রবনের ধারে এক প্রমোদভবনে বাস করছেন। দশ মাইল শোভাযাত্রা করে ছাত্রদল সেখানে উপস্থিত হতেই পুলিশ তাদের রুখলো। ছাত্রনেতা বললে—'আমরা বে-আইনি কিছু করছি না, আমরা শুধু জেনারালিসিমোর হাতে একটি স্মারকপত্র দিতে চাই—তাতে আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছি জাপবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতে।'

পুলিশ কমিশনার ছাত্রদলকে ফিরে যেতে বললেন, তারা অস্বীকৃত হলো। ফলে গুলি চললো। যারা আহত হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল একজন পদস্থ তুংপেই অফিসারের দু'টি নাবালক শিশু। ফলে অবস্থা আরও খারাপ হলো।

১১ই মার্শাল চ্যাঙ সংবাদ পেলেন যে, তাঁকে এবং তাঁর দলের অনেককে রাতা-রাতি বন্দী করবার অর্ডারে জেনারালিসিমো ইতিমধ্যেই সই দিয়ে বসে আছেন! সেই রাত্রেই ওঁরা গোপন ষড়যন্ত্রে বসলেন। রাত ভোর হবার আগেই যা ঘটবার তা ঘটে গেল!

১২ই ডিসেম্বর। শেষ রাত্রি। গোপন অধিবেশন ভাঙলো। মার্শাল চ্যাঙের দেহরক্ষী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছাব্বিশ-বছরের তরুণ ক্যাপ্টেন সুন শ' দুই বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে সিয়ান থেকে রওনা হলেন লিনতুন উষ্ণ প্রস্রবনের দিকে। রাত তখন তিনটে। লিনতুনের প্রমোদ-ভবনে জনা-পঞ্চাশ দেহরক্ষীর হেপাজতে তখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন জেনারালিসিমো চিয়াঙ কাই-শেক।

অনুরূপভাবে অন্যান্য ছোট-বড় কর্তাকে গ্রেপ্তার করতে বার হয়ে গেল আরও কয়েকটি পার্টি। ট্যাঙ্ক আর আর্মাড কারে শহরটা ঘিরে ফেলা হলো রাতারাতি। কোথাও বড় জাতের কোনোও সংঘর্ষ হলো না—কারণ বড়কর্তাদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের দেহরক্ষী-বাহিনী ইতিপূর্বেই জাপ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছে। সূর্যো-দয়ের আগেই থানা এবং মিলিটারি-ক্যান্টনমেন্টের দখল নিল বিদ্রোহীরা। সিয়ানের গভর্নরকে বন্দী করলো তাঁরই এডিকং; পুলিশ কমিশনারকে গ্রেপ্তার করলো তাঁরই দেহরক্ষী! সবচেয়ে মজা হলো সিয়ান এয়ারোড্রামে। পাইলটদের মেস-এ বম্বার প্লেনের পাইলটদের ঘুম থেকে তুলে বিদ্রোহীরা বললে—'কিছু মনে করবেন না, আপনারা সবাই আমাদের হাতে বন্দী। কে কে বেড-টি খাবেন বলুন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আর, ও হ্যাঁ—ব্রেকফাস্ট টেবিলে আপনাদের একত্র হতে দেওয়া হবে না। ঘরে ঘরে আমরা প্রাতরাশ পৌঁছে দেবো।'

ঘুম ঘুম চোখে পাইলটরা বললে, নির্দেশটা প্রাঞ্জল, কিন্তু আপনারা কে? আমাদের এভাবে বন্দীই বা করা হচ্ছে কেন? আমাদের অপরাধ?

: এখন থেকে আর গৃহযুদ্ধ নয়, জাপানীদের উপর বোমাবর্ষণ করতে হবে আপনাদের!

ওরা সোৎসাহে বলে, দূর ঘোড়ার ডিম! আমরাও তো তাই চাই—কিন্তু ওদিকে যে আপনাদের জেনারালিসিমো— ?

: তাঁকেও ঘুম থেকে তুলে গ্রেপ্তার করতে আমাদের লোক গেছে!

: গ্রেপ্তার! ঘুম থেকে তুলে? জেনারালিসিমোকে!!—তারপরেই ওরা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। যৌথ নৃত্য জুড়ে দেয়! যারা বন্দী করতে গিয়েছিল তারা আর কী করে—বাধ্য হয়ে সে যৌথ্য নৃত্যে যোগ দিতে হয় তাদের!

ক্যাপ্টেন সুন-এর সাঁজোয়া-বাহিনী এসে থামলো উষ্ণ প্রস্রবনের ধারে—প্রমোদ ভবনের দ্বারদেশে। রাতের অন্ধকার তখনও কাটে নি। প্রবেশপথের প্রহরী বন্দুক উঁচিয়ে হাঁক পাড়ে: খবর্দার! কে যায়!

ক্যাপ্টেন সুনও হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: খবর্দার! অস্ত্র ফেলে দাও! আমরা সারা বাড়িটা ঘিরে ফেলেছি! আর্মাড-কার আর ট্যাঙ্ক দিয়ে! মার্শাল চ্যাঙের হুকুমে আমরা দখল নিতে এসেছি এই প্রমোদভবন!

দশ থেকে পনেরো মিনিট। দেহরক্ষী বাহিনী বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলো। সদলবলে সুন প্রবেশ করলেন সুসজ্জিত প্রমোদভবনে। প্রমোদ-কক্ষ—ব্যাঙ্কোয়ে হল—খানা-কামরা, দামী আসবাব আর বিলাসের উপকরণ। অবশেষে চিয়াঙের শয়নকক্ষ। দরজা খোলা। ঘরটা ফাঁকা। বিছানার চাদরটা কোঁচকানো—কাল রাত্রে তাতে কেউ শুয়েছিল। পালঙ্কের নিচে জেনারালিসিমোর একজোড়া ঘাসের চটি। ওপাশে তাঁর মিলিটারী টপ-বুট জোড়া। পালঙ্কের শিয়রের কাছে একটা সৌখিন বেড-সাইড টেব্‌ল। তাতে সুদৃশ্য একটা জেড-পাথরের পাত্রে মহামহিমের একজোড়া বাঁধানো দাঁত। এত উত্তেজনাতেও ক্যাপ্টেন সুন-এর মনে পড়লো ছেলে-বেলায় দেখা একটি ইংরাজী বইয়ের একটা ছবির কথা। অ্যালিস-ইন-ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে 'চেশায়ার ক্যাট'-এর ছবি। বেড়াল অন্তর্হিত, কিন্তু তার হাসিটি পড়ে আছে! এখানেও তাই—জেনারালিসিমো ভাগল-বা, কিন্তু তাঁর কৃত্রিম হাসিটা পড়ে আছে এ-ঘরে।

ওঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ইতিমধ্যে সারা বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। দাঁত-চটির

মালিকের আর কোনো চিহ্ন নেই। বাথরুমে নেই, খাটের নিচে নেই, সারা প্রমোদ ভবনের কোথাও নেই। তাহলে ?

একটু পরে একজন ধরে নিয়ে এলো মহামহিমের ব্যক্তিগত ভৃত্যটাকে। রাইফেলের নলের সামনে কাঁপতে কাঁপতে লোকটা স্বীকার করলো : কর্তামশাই মাঠপানে ছুট-ছেন ! খালি পায়, খালি গায়ে—

তৎক্ষণাৎ তিন-চারটে সার্চপার্টি বার হয়ে গেল তিন-চার দিকে। খালি পায়ে, খালি গায়ে বুড়ো মানুষটা আর কতদূর যেতে পারে ? ক্যাপ্টেন স্থন মিং-চিউ অনতি-বিলম্বেই তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন। অপূর্ব দৃশ্য ![৭]

প্রমোদভবনের পিছন দিকে ছিল একটা খাড়া টিলা। সেখানে দেখতে পাওয়া গেল জেনারালিসিমোকে। তাঁর নিম্নাঙ্গে একটি পায়জামা, উর্ধ্বাঙ্গে একটা ঝোলা জোব্বা। খালি পা, চুল উসকো-খুসকো। দাঁত নেই, ফোগলা। প্রাণভয়ে মহামহিম জেনারালিসিমো টিলার খাড়া পা'ড় বেয়ে টিকটিকির মতো উঠছেন—হামাগুড়ি দিয়ে, হাতে-পায়ে ভর দিয়ে। চতুষ্পদে রূপান্তরিত চীনের ভাগ্যবিধাতাকে পিছন থেকে চিৎকার করে ডাকলেন ক্যাপ্টেন স্থন। হামাগুড়ি দেওয়া বন্ধ হলো। চিয়াঙ একটা পাথরের উপর থাপন জুড়ে বসলেন। হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। পাহাড়ী ছাগলের মতো লাফাতে লাফাতে তাঁর সমতলে উঠে এলেন ছাব্বিশ বছরের তরুণ ক্যাপ্টেন।

জেনারালিসিমো তাকে আপাদমস্তক দেখে নিলেন একবার। তারপর নিদন্ত-ভাষণে ফক্‌-ফক্‌ করে যা বললেন তার নির্গলিতার্থ : তুমি কে আমি জানি না। শত্রু হও অথবা বন্ধু হও—আমার অনুরোধ : আমাকে গুলি কর ! শেষ হয়ে যাক এ প্রহসন !

ক্যাপ্টেন স্থন দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি আপনার শত্রুও নই, বন্ধুও নই—আমি খাটি চীনা! স্বদেশপ্রেমিক চীনা নাগরিক! আমি আপনাকে হত্যা করতে আসি নি। আপনাকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে আপনাকে নেতৃত্ব দিতে ডাকতে এসেছি ! আসবেন ?

চিয়াঙ হাঁপাচ্ছিলেন। একটু দম নিয়ে বললেন, তাহলে মার্শাল চ্যাঙকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আমি প্রথমে তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই—

: মার্শাল চ্যাঙ এ তল্লাটে নেই। কিন্তু তাঁর বাহিনীর দেড় লক্ষ সৈনিক আপ-নাকে হন্তে হয়ে খুঁজছে। তাদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতেই আমি এসেছি। আসুন—

ঢোক গিলে কর্তামশাই বললেন, তাহলে একটা ঘোড়া নিয়ে এস। এই পাথুরে রাস্তায় আমি খালি পায়ে হাঁটতে পারবো না—

: ঘোড়াই বা এখন পাব কোথায় ? ভুলে যাবেন না, প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান ! আপনি আমার পিঠে চড়ে বসুন। আমি আপনাকে পিঠে চড়িয়ে নেমে যেতে পারবো।

তাই হয়েছিল বাস্তবে। ক্যাপ্টেন সুন-এর পিঠে চড়ে নেমে এলেন উনি। পাহাড়ের নিচে অপেক্ষা করছিল একটা মোটর গাড়ি। কে একজন চিয়াঙ-এর জুতো-জোড়াও নিয়ে এসেছিল। বন্দীকে নিয়ে ফিরে এলেন ওরা—সিয়ানে।

যেখানে অপেক্ষা করছিলেন মার্শাল চ্যাঙ। তাঁর হাতে চিয়াঙের সই-করা আদেশনামা—পুলিশ-কমিশনারের বাড়ি সার্চ করার সময় পাওয়া গেছে সেটা। মার্শাল চ্যাঙকে গ্রেপ্তার করার অর্ডার ! যাকে বন্দী করার কথা তার কাছেই বন্দী হয়েছেন চিয়াঙ !

বন্দীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন ক্যাপ্টেন সুন। সাক্ষাত হলো সিয়ানে—শেয়ানে-শেয়ানে !

সেইদিনই সিয়ান থেকে প্রচারিত হলো একটি জরুরী-বার্তা :

"বাস্তব অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য জেনারালিসিমোকে 'অনুরোধ করা হয়েছে—তিনি যেন তাঁর যাবতীয় কর্মসূচী বাতিল করে আপাতত সিয়ান-ফুতেই কিছুদিন অবস্থান করেন। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এখানে প্রতিনিধি পাঠাতে অনুরোধ করছি—এখানে এসে আমাদের সর্তগুলি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করুন। আমাদের সর্তগুলি নিম্নরূপ :

(১) নানকিং সরকারকে ঢেলে সাজাতে হবে—সব দলের প্রতিনিধি নিতে হবে।

(২) গৃহযুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সর্বদলীয় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে—জাপানী আক্রমণ রুখতে।

(৩) সাংহাইতে যে সাতজন জাতীয় নেতাকে জাপ-বিরোধী প্রচারের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের অবিলম্বে মুক্ত করতে হবে।

(৪) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষমা করতে হবে।

(৫) সভাসমিতিতে মত প্রকাশের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিটি নাগরিকের আছে একথা অকুণ্ঠ ভাষায় সরকারকে স্বীকার করতে হবে।

(৬) ডাক্তার সুন ইয়াৎ-সেনের ঘোষিত নীতি বাস্তবায়িত করতে হবে।

(৭) সর্বদলের এক সমন্বয় অবিলম্বে আহ্বান করতে হবে !"

মার্শাল চ্যাঙ এই বার্তার একটি অনুলিপি তাঁর মহাসম্মানিত বন্দীর হাতে তুলে-দিলেন। চিয়াঙ তার উপর এক নজর চোখ বুলিয়ে বললেন, বটে! তা এই সর্তগুলি কে আরোপ করছেন? 'আমরা' বলতে কারা?

: জাপ-বিরোধী বাহিনীর নেতৃবৃন্দ।

: জাপ-বিরোধী বাহিনী! নাম শুনিনি। তাঁরা কারা?

মার্শাল চ্যাঙ গম্ভীরভাবে বললেন, আমার তুংপেই বাহিনীর এক লাখ ত্রিশ হাজার সৈন্য, জেনারেল ইয়াং-এর চল্লিশ হাজার এবং লালফৌজের লাখখানেক সৈনিক। এককথায় প্রাক্তন জেনারালিসিমোর সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে লালফৌজ।

: প্রাক্তন জেনারালিসিমো! প্রাক্তন!!

: সেটা সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করছে। আপনিই বলুন। প্রাক্তন?

: বলব! সবাইকে এখানে ডাক—সব সেনাপতিকে—

: এখনই তা সম্ভবপর নয়। আমাদের একদল শরিক এখানে উপস্থিত নেই। তাঁদের এখানে আনবার জন্য আমার ব্যক্তিগত প্লেন শেন্‌সিতে গেছে। তাঁরা কাল পরশুর মধ্যেই এসে পড়বেন!

: শেন্‌সিতে! সেখানে কে আছে?

: আমাদের সহযোগী লাল-ফৌজের কর্তারা!

জেনারালিসিমোর চোয়ালের নিম্নাংশ ঝুলে পড়লো। এতক্ষণে বোঝা গেল তিনি তাঁর কৃত্রিম দাঁতটা ফেরত পেয়েছেন! কৃত্রিম দাঁত কিড়মিড় করে উঠল আবার!

দিন দুই পরে। এ দুদিন চিয়াঙ-এর একদম ঘুম হয় নি। শেষ পর্যন্ত লালফৌজের নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে? তাঁকে! কী বলবেন? ওরাই বা কি বলবে? দু'দিন পরে মার্শাল চ্যাঙ বন্দীর কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, ওঁরা এসেছেন!

চিয়াঙ আমতা আমতা করে বলেন, ওঁরা মানে? কে কে? সেই—ইয়ে—মাও ৎসে-তুঙ নামের লোকটাও এসেছে?

মার্শাল জবাব দেওয়ার আগেই প্রকাণ্ড মেরুন রঙের পর্দাটা সরে গেল। লাল-ফৌজের ইউনিফর্ম-পরা তিনজন অফিসার প্রবেশ করলেন ঘরে। চিয়াঙ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছেন। চেনেন, ওঁদের সবাইকে চেনেন তিনি। ফটো দেখেছেন। ওঁদের প্রত্যেকের মাথায় জন্য লক্ষ লক্ষ ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করা আছে তাঁর স্বাক্ষরিত প্রচারপত্রে।

মার্শাল চ্যাঙ প্রথামাফিক পরিচয় করিয়ে দেন: ইনি হচ্ছেন কমরেড পো কু, উত্তর-পশ্চিম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান; উনি ইস্ট-ফ্রন্ট-আর্মির চীফ অফ স্টাফ ইয়ে চিয়েন-য়িং; আর এঁর পরিচয় হচ্ছে—ইনি রেড-আর্মির মিলিটারী কাউন্সিলের

ভাইস-চেয়ারম্যান কমরেড চৌ-এন-লাই !

ওঁরা তিনজনে একসঙ্গে বলে ওঠেন : সুপ্রভাত !

সুপ্রভাত ! ওরা কি রসিকতা করছে ? সৌজন্য-প্রকাশে বিলম্ব হয়ে গেল জেনারালিসিমোর। তিনি অবাক বিস্ময়ে দেখছিলেন ঐ শেষোক্ত মানুষটাকে। মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার কথা—সাংহাই বন্দরে লেবার ইউনিয়ন দখল করবার সময় ঐ ছোকরাই না পালিয়ে গিয়েছিল পুলিশের পায়ের ফাঁক দিয়ে ? আর ওকে জীবিত অথবা মৃত ধরে দিতে পারলে কত লক্ষ মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল যেন ? কী আশ্চর্য ! তিনি আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন চৌ-এন-লাইয়ের সামনে—তিনি নিরস্ত্র, বন্দী আর ও-লোকটার মাজায় বাঁধা রয়েছে রিভলভার। তবু মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন না তিনি। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন না ! তাজ্জব !

কেতা-দুরস্ত চৌ-এন-লাই আলোচনার সূত্রপাত করলেন। ফরাসী শিক্ষিত তিনি—'বিনয়' জিনিসটা ভালোমতই রপ্ত তাঁর ; একটি সামরিক অভিবাদন করে বললেন, আমাদের সর্বাধিনায়ক কমরেড মাও ৎসে-তুঙের নির্দেশে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—কারণ আমরা শুনেছি, আপনি আমাদের জাপ-বিরোধী সংযুক্ত বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন কমরেড চিয়াঙ কাই-শেক !

কমরেড চিয়াঙ ! কমরেড !!

এতক্ষণে স্বর ফুটল জেনারালিসিমোর কণ্ঠে। মার্শাল চ্যাঙের দিকে ফিরে বললেন ...ইয়ে, আমি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাব !

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শেষ শহীদ

সিয়ানে শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলিটা হয়েছিল ১৯৩৬-এ ; আর চীন ভূখণ্ডে সর্বহারার রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়টা হচ্ছে ১৯৪৯। অর্থাৎ এর মাঝে এই বুড়ি পৃথিবী তের বার সূর্য প্রদক্ষিণ করেছে। তের-চৌদ্দ বছর সময়টা বড় কম নয়—শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের পূর্ণ ব্যাপ্তি। এর মধ্যে যেসব কাণ্ড ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি না—চুম্বকসারটুকু উদ্ধৃত করে দিলাম মাত্র।

সিয়ানে চিয়াঙ বন্দী হলেন—এবং সেদিনই বুঝলেন ধাপ্পাবাজি দিয়ে চীনের মানুষকে আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না। অর্থাৎ সমগ্র চীন তখন চাইছে—অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে ঐ বহিঃশত্রু জাপানকে রুখতে হবে। যে মুহূর্তে চিয়াঙ বুঝলেন—বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করবে না, বিচার করবে না—তারা পূর্ব-ইতিহাস ভুলে গিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে সামগ্রিক সংগ্রামে তাঁকে অবতীর্ণ হতে ডাকছে সেই মুহূর্তেই তিনি অন্য মূর্তি ধরলেন। বললেন, সর্ত-সাপেক্ষে তিনি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী। সর্ত? কী সর্ত? চিয়াঙ বললেন, আপাতত আমাকে রাজধানী নানকিঙে ফিরে যেতে দাও। সেখানে গিয়ে যা বলার বলবো।

তাই হলো। বিদ্রোহীরা চিয়াঙকে বা তাঁকে প্রাণে বধ করবে না শুনে ধনকুবের দুহিতা সুন্দরী মাদাম চিয়াঙ কাই-শেক প্লেনে করে উড়ে এলেন সিয়ানে। মার্শাল চ্যাঙ ওঁদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। ফলে মার্শাল চ্যাঙের ব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত এবং শ্রীযুক্ত জেনারালিসিমো চিয়াঙ সিয়ান থেকে ফিরে গেলেন নানকিঙে। স্বয়ং মার্শাল চ্যাঙ ওঁদের সঙ্গে নানকিঙে এলেন তাঁর অপরাধের জন্য শাস্তি নিতে!

ভাবতে অবাক লাগে, হাতে পেয়েও কেন কম্যুনিস্টরা চিয়াঙকে ছেড়ে দিল। ১৯২৭ সালের সেই সাংহাই-বন্দরের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে শুরু করে এই নয় বছরে চিয়াঙ পাপ তো বড় কম করেন নি—কিন্তু তার বিচার ওরা করতে চাইলো না। বোধ করি মহাচীনের মহানায়কেরা মেনে নিয়েছিলেন মহাভারতের সেই নির্দেশ :

"সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত / তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তরশত॥"

চিয়াঙ যখন নেতা থাকছেন তখন তাঁর ভাবমূর্তিটি ক্ষুণ্ন হতে দেওয়া চলে না। তাই মহা সমারোহে মার্শাল চ্যাঙের অপরাধের জন্য বিচার হলো। রাষ্ট্রপতিকে

অতর্কিতে গ্রেপ্তার করার অপরাধে মার্শাল চ্যাঙকে দশ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো! পরের বছর অবশ্য রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ঔদার্যে বন্দীকে ক্ষমা করা হয়। তার মানে এ নয় যে, মার্শাল চ্যাঙ এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন—কারণ বিচারের রায় বার করা হয় ৩১.১২.৩৬ তারিখে এবং মহামহিম রাষ্ট্রপতি অপরাধীকে ক্ষমা করেন পরের বছর নববর্ষ উৎসবে। ঐ একটা রাত মার্শাল চ্যাঙ ছিলেন রাষ্ট্রপতির অতিথিশালায় মহাসম্মানিত অতিথি—আইনানুসারে অবশ্য বন্দী।

চিয়াঙ কাই-শেক অবশেষে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়তে স্বীকৃত হলেন চারটি সর্তে। সেই চারিটি সর্তের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে যে, চিয়াঙ নিশ্চিত ছিলেন মাও ৎসে-তুঙ এ সর্ত কোনোক্রমেই মেনে নেবেন না—অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট হবে না, হতে পারে না। চিয়াঙ-এর সর্ত চতুষ্টয় হচ্ছে :

(১) লালফৌজ ভেঙে দিয়ে গড়তে হবে এইটথ্ রুট-আর্মি এবং সে বাহিনীকে জেনারালিসিমো চিয়াঙ-এর অধীনে রাখতে হবে।

(২) ইয়েনানে কম্যুনিস্টরা যে সোভিয়েত ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছে তার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে সেটাকে 'প্রজাতন্ত্রী চীনের বিশেষ এলাকা' বলে ঘোষণা করতে হবে :

(২) কম্যুনিস্ট-ঢঙে ঐ সোভিয়েতে শাসন-ব্যবস্থা আর চলবে না; যেখানে 'পূর্ণ গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে হবে ; এবং

(৪) জোতদার-জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সমবণ্টনের যে কর্মসূচী কম্যুনিস্টরা নিয়েছে তা ত্যাগ করতে হবে।

চিয়াঙ নিশ্চয় মনে মনে হেসেছিলেন—নিজের তৈরি ঐ চারটি সর্ত দেখে! এমন সর্তে কিছুতেই রাজী হতে পারবেন না ধূর্ত শিরোমণি মাও ৎসে-তুঙ। লক্ষ শহীদের রক্তে গড়ে তোলা ঐ স্বপ্ন তারা কিছুতেই চূর্ণ হতে দেবে না যুক্তফ্রণ্টের খাতিরে। আর চিয়াঙের যুক্তফ্রন্ট যে কী চীজ তাও তো জানতে বাকি নেই কম্যুনিস্ট ডাকাতগুলোর! ফলে চিয়াঙ ভাবলেন—সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না। এখন আর কেউ বলতে পারবে না—চিয়াঙ যুক্তফ্রন্ট গড়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গররাজি।

কিন্তু এখানেও হার হলো তাঁর। ধূর্ত-শিরোমণি ঐ মাও ৎসে-তুঙ প্রত্যুত্তরে জানালেন, তিনি এককথায় ঐ সর্ত-চতুষ্টয় মেনে নিচ্ছেন !!

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়; কিন্তু মাও তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের যে ব্যাখ্যা কথাপ্রসঙ্গে এডগার স্নো-কে দিয়েছিলেন তা পড়লে বোঝা যায়—কেন তিনি এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। মাও বলছেন, "চীন স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ

পৃথিবীতে সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। আমাদের দেশটা যদি বিদেশীদের পদানত থাকে তবে আমাদের সব স্বপ্নই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সবার আগে চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। যে-দেশ স্বাধীনতাই লাভ করে নি সে-দেশে সাম্যবাদের কথা চিন্তা করা নিরর্থক।[২]

মাও ৎসে-তুঙ জানতেন চীন থেকে জাপানীদের বিতাড়ন করার পর চীনের জনগণের কাছে চিয়াঙ কাই-শেকের বিচারের দিন আসবেই। আর তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন সেদিন চিয়াঙকে ছেঁড়া জুতোর মতো সমুদ্রের দিকে ছুঁড়ে দেবে স্বাধীন চীন। তাঁর সেই বিশ্লেষণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। তিনি এও জানতেন যে, চিয়াঙ যুক্তফ্রন্ট বেশিদিন চলতে দেবেন না। কিন্তু ঐভাবে মাও কুয়োমিনতাঙের সৈন্যদলের ভিতর ঢুকে পড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর সে চেষ্টাও সফল হয়েছিল। এই শেষ যুগের ঐতিহাসিক ঘটনার চুম্বকসার এই রকম :

১৯৩৬ : সিয়ানে জেনারালাসিমো চিয়াঙ বন্দী।

১৯৩৭ : কুয়োমিনতাঙ-কম্যুনিস্ট আঁতাত। জাপান মার্কোপোলো ব্রীজ আক্রমণ করে।

১৯৩৮ : জাপান জিতছে। যুক্তফ্রন্টে ফাটল। চীনের রাজধানী পুব থেকে ক্রমে পশ্চিমে সরে আসছে—নানকিং থেকে হ্যাঙ্কাও, সেখান থেকে আরও পশ্চিমে চুনকিঙে।

১৯৩৯ : ইয়োরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। নানকিঙে জাপান একটি 'পুতুল-সরকার' প্রতিষ্ঠা করলো। চীনের সমস্ত উপকূলভাগ জাপানের দখলে।

১৯৪১ : জাপান পার্ল-হারবার আক্রমণ করে। আমেরিকা ও জাপানের যুদ্ধ শুরু।

১৯৪২ : বার্মা-রোড বন্ধ হয়ে গেল।

১৯৪৫ : ইয়ালটা-কনফারেন্স। চীনা কম্যুনিস্ট-পার্টির সপ্তম অধিবেশন। রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। হিরোসিমা-নাগাসাকি। জাপানের আত্মসমর্পণ। চীনে গৃহযুদ্ধ পুরোদমে শুরু হলো। আমেরিকা মার্শাল মিশন পাঠিয়ে দিল চীনে। কম্যুনিস্ট-দমনে আমেরিকা চিয়াঙকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়েই চলেছে।

১৯৪৬ : রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করে যায়। চীনা কম্যুনিস্টরা মাঞ্চুরিয়া দখল করে। ভূমি-বণ্টন ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। চীনে ঘোর গৃহযুদ্ধ।

১৯৪৭ : চিয়াঙ-এর উপর্যুপরি জয়। এমন কি কম্যুনিস্ট-ঘাঁটি ইয়েনান দখল। লালফৌজ মাঞ্চুরিয়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়। লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ। আমেরিকা চিয়াঙকে জানায়, তারা আর সাহায্য পাঠাবে না।

১৯৪৮ : লালফৌজ উত্তর থেকে এগিয়ে আসছে। চীনে মার্কিন-বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ। চিয়াঙ-এর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।

১৯৪৯ : পিকিঙ-এর পতন। চিয়াঙ-এর পদত্যাগ।

১৯৫০ : চিয়াঙ-এর ফরমোসায় পলায়ন, সপরিবারে। চীন লাল হয়ে গেল।

* * *

এক নিশ্বাসে চীনের দীর্ঘ-স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়টা শুনিয়ে দিয়েছি। সব কথা বিস্তারিত বলবার ঠাঁই কোথায় এখানে? স্বাধীনতার পর আরও তো শতাব্দীর একপাদ কেটে গেছে—কত কী ঘটনা ঘটেছে সেখানে—সে সব কথাও তো বলছি না। কিন্তু এ-গ্রন্থে একটি প্রসঙ্গ বোধহয় অপরিহার্য—যা চীনের ঐ শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত এবং ভারত-চীন মৈত্রীর নিরিখে অবিস্মরণীয়। কাশ্যপ-মাতঙ্গ, কুমারজীব, বজ্রবোধি, বোধিধর্ম, পরমার্থের দল দু-হাজার বছর ধরে যে সাধনা করে গেছেন তারই শেষ উত্তরসূরীদের কথা না বলে থামতে পারছি না।

১৯৩৮ সাল। চীনে তখন কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাঙ যুক্তভাবে জাপানী সাম্রাজ্য-বাদকে রুখছে। পরাধীন ভারত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে রাজী হলো না। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সে-বছর ভারতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি। প্রধানত জওহরলালের প্রচেষ্টায় ভারতীয় কংগ্রেস চীনে একটি মেডিক্যাল-মিশন পাঠানোর সঙ্কল্প নিল। চাঁদা তোলা হলো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত হলো বিনা-মূল্যে ঔষধ। স্থির হলো— পাঁচজন চিকিৎসকের একটি দল মহাচীন যাবে পরাধীন-ভারতের নৈতিক শুভেচ্ছাসহ আর্তের সেবায়। মেডিক্যাল-মিশনের দলপতি নির্বাচিত হলেন নাগপুরের খ্যাতনামা চিকিৎসক এম. অটল। তাঁর সহকারী রইলেন প্রবীণ ডাক্তার এম. চোলকার। এছাড়া রইলেন তিনজন সদ্য পাশ তরুণ চিকিৎসক : বাংলাদেশের ডাক্তার ডি. মুখার্জি এবং ডাক্তার বিজয়কুমার বসু ও বোম্বাইয়ের ডাক্তার কোটনিস্।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে ওঁরা জাহাজযোগে রওনা দিলেন বোম্বাই বন্দর থেকে। ভেষগাচার্য চরকের দেশের পাঁচজন চলেছেন, ভেষগার্ণব চ্যাঙ-চুং-চিঙের দেশে। সেই সহস্রাব্দী-চিহ্নিত জলপথ : সুবর্ণভূমি-শ্রীবিজয়-চম্পা ঘুরে; যে-পথে গিয়েছিলেন কা-হিয়াঙ, ইৎ-সিঙ প্রভৃতি। পেনাঙ-হংকং হয়ে অবশেষে ক্যান্টন। ক্যান্টন বন্দরে ভারতীয় মিশনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে জাহাজে দেখা করতে এলেন ডাক্তার সুন ইয়াৎ-সেনের বিধবা পত্নী মাদাম সুঙ চিং-লিং।

হ্যাঙ্কাও, চাংশা, চুংকিঙ হয়ে ওঁরা উপনীত হলেন লাল চীনের মূল কেন্দ্র ইয়েনান-এ। চীনে তখন যুক্তফ্রন্ট; তাই একদিকে মাদাম চিয়াঙ-কাই-শেকের জাঁক-

জমকপূর্ণ নিমন্ত্রণও যেমন রাখতে হচ্ছিল, তেমনি লালফৌজের দুর্ধর্ষ সমরনেতাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগও পেয়েছিলেন তাঁরা : চু তে, চৌ এন-লাই, মাও ৎসে-তুঙ। অবশ্য ওদের আসল কাজ ছিল আর্তের সেবা। সম্মুখ রণাঙ্গনের পিছনেই আছে হাসপাতাল—প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের মধ্যে, গুলি বিনিময়ের ভিতর তাঁরা নিরলস নিষ্ঠায় সে-কাজ করে গেছেন।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে নভেম্বর নয় মাস ভারতীয় মেডিক্যাল-মিশন কাজ করেছিল খাস ইয়েনানে—সামরিক হাসপাতালে। সেই সময়েই ওঁরা মাও ৎসে-তুঙের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ইয়েনান হচ্ছে লঙ্-মার্চের শেষ-তীর্থ ; লাল-ফৌজের রাজধানী বলা যায়। যদিও রাজধানীতে কোনোও রাজপ্রাসাদ ছিল না, বাড়িই ছিল না বস্তুত। অজন্তা কিংবা উদয়গিরি খণ্ডগিরির মতো পার্বত্য-গুহার ভিতর বাস করতেন সবাই। ঐ গুহাতেই সামরিক দপ্তর, স্কুল, হাসপাতাল, সৈন্যাবাস! এখান থেকেই স্বাস্থ্যের কারণে ডাঃ চোলকার এবং ডাঃ মুখার্জি ভারতবর্ষে ফিরে যান আর বাকি তিনজন অষ্টম রুশ আর্মির সর্বাধিনায়ক চু তের আহ্বানে তাঁর হেড-কোয়ার্টার্স 'উসিয়াঙ'-এ আসেন। সেখানে সম্মুখ রণাঙ্গণে তাঁরা বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। তবু অদম্য নিষ্ঠায় চিকিৎসার কাজ করে যান। এর পর ডঃ অটলও অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যান—বাকি রইলেন দুজন : ডঃ বিজয়কুমার বসু আর ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস্।

আরও মাসখানেক পরের কথা। অবশিষ্ট দু'জনের কাছে নির্দেশ এলো—যেতে হবে : উটাই। দেড়-হাজার মাইল দূরে। সেখানে আছে একটি হাসপাতাল। সেই হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার নর্মান বেথুনের শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। ডাক্তার নর্মান বেথুন! কে তিনি? হাসপাতালে তাঁর স্থানটাই বা হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল কেমন করে? ওঁরা শুনলেন সে কাহিনী :

ডঃ নর্মান বেথুন এক আশ্চর্য মানুষ। আদি নিবাস কানাডায়—ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী সে রাজ্য ; কিন্তু বেথুন ছিলেন সাম্যবাদের পূজারী। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে অগাধ বিশ্বাসী। স্পেনের গৃহযুদ্ধে সবহারার দল বিনা-চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে শুনে তিনি এক মেডিক্যাল-মিশনের সঙ্গে মার্কিন মহাদেশ থেকে এসেছিলেন য়ুরোপে। তারপর খবর পেলেন একই লড়াই লড়ছে এশিয়াবাসী চীনারা। চলে এলেন পৃথিবীর অপর প্রান্তে। দিনে আঠারো-বিশ ঘণ্টা তিনি কাজ করতেন। উপায় কি? হাজার-হাজার আহত সৈনিক যে তাঁর মুখ চেয়ে প্রহর গুনছে! শেষে একদিন ঘটলো দুর্ঘটনা! বিনা দস্তানায় একটি অপারেশন করতে গিয়ে তাঁর শরীরে প্রবেশ করলো বীজাণু! ১৯৩৯ সালের ১২ই নভেম্বর জন্মভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে শহীদ হলেন

নর্মান বেথুন। মাও ৎসে-তুঙ সে সংবাদ পেয়ে একটি জনসভায় বলেছিলেন, "একজন বিদেশী কেন স্বার্থচিন্তা বিসর্জন দিয়ে অজানা-অচেনা চীনাদের মুক্তি সংগ্রামে এভাবে আত্মাহুতি দিতে ছুটে এসেছিলেন ? তার কারণ তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল : আন্তর্জাতিকতা, সাম্যবাদের ভাবধারা—যা থেকে প্রতিটি চীনা কম্যুনিস্ট শিক্ষা নিতে পারে। লেনিন আমাদের বলে গেছেন—ধনতান্ত্রিক দেশের সর্বহারার দল যেদিন সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের মুক্তি-সংগ্রামে অংশ নিতে হাত বাড়িয়ে দেবে সেদিনই হবে বিশ্বমানবতার মুক্তি ! কমরেড বেথুন লেনিনের সেই বাণীকেই সার্থক করতে ছুটে এসেছিলেন।"[৩]

উটাই হাসপাতালে সেই নর্মান বেথুনের শূন্য স্থান পূরণ করতে ডাক এলো ওঁদের কাছে। বিজয় বসু আর দ্বারকা কোটনিসের কাছে। দুজনেই গিয়েছিলেন সেখানে —কিন্তু বিজয়বাবুকে পুনরায় ইয়েনানে ফিরে আসতে হলো। কারণ ছিল। ইতিমধ্যে ডঃ কোটনিস চীনা ভাষাটা মোটামুটি শিখে ফেলেছেন, তাই তাঁকে দেওয়া হলো ফুপিং হাসপাতালের সংলগ্ন কলেজে ছেলেদের পড়ানোর কাজ। আর ডঃ বসু ইয়েনানে ফিরে এলেন শুধুমাত্র আর্তের সেবার জন্য। ফলে দুই বন্ধুতে একদিন ছাড়াছাড়ি হলো। বিদায় নেবার সময় দুই বন্ধু পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুত হলেন যে, দুজনে একসঙ্গে দেশে ফিরবেন। তখন দুজনের কেউই জানতেন না, সেই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ।

চীন-ভারতের যোগাযোগ বর্তমানে বন্ধ। কিন্তু চীন ও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এবং সীমান্ত-বিরোধ ঘনিয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত বহু ভারতীয় চীনে গেছেন— সাংস্কৃতিক মিশনের ডেলিগেটরূপে, আমন্ত্রিত হয়ে, ব্যবসায়ের খাতিরে, কূটনৈতিক মিশনে এবং সাম্প্রতিক-সংবাদ জানছি বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি দিয়ে রাঘববোয়ালদের ব্যবস্থাপনায় চোরাকারবারের উদ্দেশ্যে ! তাঁদের কথা বাদ দেওয়া যাক। তাহলে বলব, ঐ পাঁচজন মেডিক্যাল-মিশনের সদস্যই সেই সহস্রাব্দীকালের চীন-ভারত মৈত্রীর শেষ উত্তরসাধক ! কিন্তু আগেই বলেছি, ভারতীয় পরিব্রাজক যুগে যুগে চীনে গিয়েছেন দেশের বন্ধন চিরতরে ছিন্ন করে, কেন্দ্রাতিগ বেগে। সে-হিসাবে কাশ্যপমাতঙ্গ, কুমারজীব, ধর্মক্ষেমার শেষ উত্তর-সাধক হচ্ছেন ডাক্তার দ্বারকানাথ কোটনিস্। ডাক্তার নর্মান বেথুনের নামে উৎসর্গীকৃত সেবামন্দিরে তিনি তাঁর শেষ অর্ঘ্য দিয়েছিলেন ১৯৪২-সালের ৯ই ডিসেম্বর ! ডক্টর কোটনিস্‌কে প্রণাম জানিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক :

দ্বারকানাথ কোটনিস্ ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ওঁর বাবা ছিলেন শোলাপুরের কোনো একটি কারখানার সামান্য কেরানী। 'নুন-আনতে পান্তা-ফুরানো'র

সংসার। সেই কেরানীর সংসারে 'আঁধার-ঘরের মানিক' ছিলেন দ্বারকানাথ—স্কুল-কলেজে বরাবরই খুব ভালো রেজাল্ট করেছেন। দ্বারকানাথের শিক্ষকদল তাঁর বাবাকে আশ্বাস দিতেন—'আপনার এ-ছেলে বড় হয়ে দেশের একজন হবে; আপনার সব অভাব-অনটন দূর করবে। শেষজীবনে অন্তত অর্থকৃচ্ছ্রতায় কষ্ট পেতে হবে না আপনাকে।' বৃদ্ধ কেরানীও সেটা অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন। ছেলেকে তিনি বোম্বাই মেডিকেল কলেজে পড়তে পাঠালেন। দ্বারকানাথের পরীক্ষার নম্বর দেখে ভর্তি হতে কোনো অসুবিধা হলো না। মেডিকেল-কলেজের শিক্ষকরাও বলতেন, দ্বারকানাথ একজন অত্যন্ত কৃতী ডাক্তার হবেন। এর পর দীর্ঘ পাঁচ বছর বৃদ্ধ কোট-নিস্ কীভাবে ছেলের পড়ার খরচ জুগিয়েছেন সে-কথা দ্বারকানাথ বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারেন নি। বৃদ্ধ ক্রমাগত ঋণ করে গেছেন—মিত্র থেকে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে, মহাজনের কাছে। পুত্রকে তিনি কিছুই জানতে দেন নি—পাছে তার পড়া-শোনায় ব্যাঘাত জন্মায়।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে সম্মানের সঙ্গে দ্বারকানাথ যখন ডাক্তারী পাশ করে বের হলেন তখন তাঁর পিতৃদেব আকণ্ঠ ডুবে আছেন ঋণের সমুদ্রে। তিনি স্থির করলেন, এবার সব কথা খুলে বলবেন ছেলেকে। এবার সে রোজগার শুরু করবে—এবার তিল তিল করে পিতাকে ঋণমুক্ত করবে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন পুত্রের পাশ করার সংবাদ পেয়ে। দ্বারকানাথের একটি বোনও ছিল, তার বিবাহের ব্যবস্থাও করতে হবে।

কিন্তু ওঁদের সব হিসাব গুলিয়ে গেল যে-দিন সদ্য পাশকরা দ্বারকানাথ ফিরে এলেন কলেজ হোস্টেল থেকে। পিতার পদধূলি গ্রহণ করে দ্বারকানাথ বললেন, 'বাবা, আপনাকে একটা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ দিচ্ছি। ভারতীয় কংগ্রেস চীনে একটি মেডিকেল মিশন পাঠাতে চায়। তাতে মাত্র পাঁচজন ভারতীয় ডাক্তার যাবেন। বহু বহু ডাক্তার আবেদন করেছিল। ডাঃ জীবরাজ মেহ্‌টা, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের একটি কমিটির উপর কংগ্রেস দায়িত্ব দিয়েছিল সেই দরখাস্তের ভিতর থেকে মাত্র পাঁচজনকে নির্বাচন করতে। ওঁরা আমাকে নির্বাচন করেছেন। আমি চীনে যাচ্ছি! আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

বৃদ্ধ কোটনিস পাথর হয়ে গেলেন!

পুত্রের এতবড় সাফল্যে তিনি কি উৎফুল্ল না হয়ে পারেন? তাছাড়া ছেলে চাইছে আর্তের নিঃস্বার্থ সেবা করতে—এক পরাধীন দেশের মানুষ অপর এক পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে চাইছে—তিনি বাধা দেবেন কেমন করে?

বৃদ্ধ কোটনিস সর্বান্তঃকরণে পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। নিজে তিনি উপস্থিত

ছিলেন বোম্বাইয়ের ব্যালার্ড-পায়ার বন্দরে যেদিন ভারতীয় মিশন যাত্রা করল চীনের উদ্দেশে।

তারপরের কথা দ্বারকানাথ জানেন না। নিরবচ্ছিন্ন বোমা বর্ষণের মধ্যে তিনি আর্তের সেবা করে গেছেন। হাসপাতাল—অপারেশন থিয়েটার—ট্রেঞ্চ—মেডিকেল-স্কুল—হাসপাতাল! তিনি কেমন করে জানবেন, হাজার হাজার মাইল দূরে তাঁর বৃদ্ধ পিতা কীভাবে ঋণজালে আটক পড়ে ছটফট করছেন! সে-সব কথা তো কোনোদিন বলেন নি তিনি পুত্রকে। সমস্ত ব্যাপারটা দ্বারকানাথ জানতে পারলেন একদিন ইয়েনানে বসে।

সারাদিন হাসপাতালে কাটা ছেঁড়ার মধ্যে দিন কেটেছে। সন্ধ্যাবেলায় ওঁরা কজন ফিরে এলেন ব্যারাকে। শোনা গেল ভারতবর্ষের 'ডাক' এসেছে। প্রত্যেকের ঘরের টেবিলের উপর পড়ে আছে ভারতবর্ষের ডাকটিকিট-লাঞ্ছিত চিঠি। মাসের মধ্যে এমন দিন দুটো একটা আসে কি আসে না। দেশের চিঠি পেয়ে সবাই আত্মহারা। যে-যার চিঠি বেছে নিয়ে পড়তে থাকেন। হঠাৎ ডাক্তার বিজয় বসুর নজর পড়ল কোটনিসের দিকে—ফায়ারপ্লেসের ধারে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছেন দ্বারকানাথ—দু'চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল ঝরে পড়ছে।

বিজয়বাবু এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, কী হয়েছে কোটনিস? কোনো খারাপ খবর?

: বাবা মারা গেছেন!

: সে কি! কী ভাবে?

: আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

আত্মহত্যা! কেন? কী মর্মান্তিক প্রয়োজন হলো সেই বৃদ্ধের জাগতিক বন্ধন এভাবে ছিন্ন করে ফেলতে? সৌজন্যের খাতিরে সে কথা কেউই জানতে চান না। দ্বারকানাথ নিজে থেকেই বললেন। যে কথা এতাদন তিনি নিজেও জানতেন না, এইমাত্র জেনেছেন, তাই জানালেন বন্ধুদের: আমার পড়ার খরচ চালাতে তিনি প্রচুর ঋণ করেছিলেন। সে কথা আমাকে কোনোদিন বলেন নি। ঋণের বোঝা বহন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত—

কী মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! সহকর্মীরা পরামর্শ দিলেন কোটনিসকে—অবিলম্বে দেশে ফিরে যেতে। বাবা নেই—কিন্তু মা তো আছেন, আছে ছোট বোন। আর তাছাড়া আছে দুর্বহ সেই ঋণের বোঝাটা। কোটনিসের পিতার রক্তে তো আর সে ঋণ শোধ হয়ে যায় নি। এবার সেই জগদ্দল ঋণের বোঝা চাপবে সন্তবিধবার স্কন্ধে, নাবালিকা ভগ্নীর স্কন্ধে!

কিন্তু সেই মর্মভেদী শোকের মাঝখানেও তরুণ দ্বারকানাথ ব্রতচ্যুত হতে স্বীকৃত হলেন না। বললেন : তা হয় না। কংগ্রেস আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আমার এখানে আসবার খরচ জুগিয়েছে হাজার হাজার পরাধীন গরীব ভারতীয় মুষ্টিভিক্ষা তুলে। তাই আসবার আগে আমাদের দিয়ে এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করানো হয়েছে যে, একবছর পূর্ণ হবার আগে আমরা কেউ ফিরে যাব না। বাবা যখন চরম আত্মোৎসর্গ করেছেন, তখন যে সেবাব্রতের প্রতি তাঁর এত শ্রদ্ধা ছিল তাকে এভাবে আমি ত্যাগ করতে পারি না। আমি যোগভ্রষ্ট হয়ে যাব তাহলে।

চীনে বিদেশীদের নিজেদের 'ভিজিটিং কার্ডে' চীনা হরফে চীনা নাম ছাপিয়ে নিতে হয়। চীনে না গিয়ে স্বয়ং 'বুদ্ধদেব' হয়েছিলেন 'ফু', আর চীনে পৌঁছে 'কুমারজীব' হয়েছিলেন 'চিউ-মো-লো-শীহ্'। সেই ঐতিহ্য অনুসারে ডাক্তার বিজয়-কুমার বসু হলেন 'বা স্যু-হুয়া', আর ডাক্তার দ্বারকানাথ কোটনিসের সংজ্ঞা হলো 'খো তৈ-হুয়া'।

ডাঃ কোটনিসের জীবনাবসান হয় ১৯৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর, উত্তর চীনের কো কুঙ্ গ্রামে। ডাঃ বিজয় বসু তাঁকে কুপিঙের হাসপাতালে রেখে ইয়েনানে ফিরে যাবার পর তাঁর জীবনের শেষ দুবছরের বিস্তারিত সংবাদ আমরা জানি না। যেটুকু জানা যায় তা তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ঐ ডাঃ বসুকে লেখা খানকয়েক চিঠি থেকেই। "তিনি এখানে বেথুন মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও মেডিকেল স্কুল সংগঠন ও পরি-চালনার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করলেন। তখন তিনি চীনা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন ; যে কোনো চীনা ডাক্তারের মতোই সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে তিনি কাজ চালাতে লাগলেন। ক্রমেই তিনি চীনের প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়ে উঠছিলেন। প্রথমে যখন চীনে আসেন, তখন তিনি দুঃসাহসিক-অভিযান-প্রবণ যুবক মাত্র, কোনো গভীর চিন্তা বা উদ্বেগ তাঁর ছিল না। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনের বিভীষিকাময় অবস্থার বাস্তব সংস্পর্শে এসে তিনি ফ্যাসিবাদের প্রতি দৃঢ় এবং সুচিন্তিত বিরোধিতার ভাব পোষণ করতে লাগলেন। অনবরত রাষ্ট্রনীতি ও অর্থশাস্ত্র পড়ে এবং আলাপ-আলোচনা করে তিনি এইটথ্ রুট আর্মির কম্যুনিস্ট সহকর্মীদের সঙ্গে একই আদর্শ-বাদের ছাঁচে গড়ে উঠছিলেন।"[৪]

চীনা কম্যুনিস্টদের মনোবল বিধ্বস্ত করতে জাপ-বাহিনী প্রতি বছর একবার করে ব্যাপক অভিযান চালাতো—চীনা ভাষায় তাকে বলে 'সাও দাং', যার আক্ষরিক অনুবাদ 'ঝেঁটিয়ে সাফ্ করা।' নর্মান বেথুনের স্মৃতি-বিজড়িত ঐ হাসপাতালের উপরেও সেই জাপ-সম্মার্জনীর বাৎসরিক আঘাতটা ছিল অনিবার্য। তখন হাস-

পাতাল হয়ে যেত চলমান—গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে আহতদের নিয়ে, যন্ত্রপাতি-ঔষধ-পত্র নিয়ে ডাক্তার কোটনিসকেও আশ্রয় নিতে হতো পাহাড়ে জঙ্গলে। অবিরাম গোলা-বর্ষণের ভিতর সেই জঙ্গলে রাত জেগে আহতদের চিকিৎসা করতে করতে ক্রমেই ডাঃ কোটনিসের স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিশ্রাম কোনোটাই হচ্ছে না —নর্মান বেথুনের স্মৃতিবিজড়িত প্রতিষ্ঠানের উত্তর সাধক যেন বেথুনের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন! এই সময় পীয়েঞ্চু জঙ্গল থেকে ১৬।১।৪১ তারিখে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে আবার কোটনিসের জীবনযাত্রার খবর পাচ্ছি। চিঠিখানি লিখছেন ডাঃ 'খো তে হুয়া', তাঁর বন্ধু 'বা সুস্থ-হুয়াকে' :

"তুমি চলে যাবার মাসখানেক পরে শত্রুর আশঙ্কিত 'সাও দাং' শুরু হলো। এবার তারা রীতিমতো অভিযান চালাবার রাজকীয় ব্যবস্থা করে এসেছিল। উত্তর-চীনে ওদের জঙ্গী বড়কর্তা স্বয়ং হাজার-বিশেক সৈন্য পরিচালনা করেন বলে শুনেছি। মাসখানেক আমরা স্যাঙাতদের দৃষ্টি এড়িয়ে অনবরত 'মার্চ' করেছি। সময় সময় নাকি সাঙাতদের কান ঘেঁষেও যেতে হয়েছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ যেভাবে এই 'মার্চিং' পরিচালনা করছিলেন তা প্রশংসনীয়। শেখবারও অনেক কিছু আছে তাতে। মেডিকেল ছাত্ররা সংবাদ সরবরাহ করত, রাত জেগে পাহারাও দিত। জাপানীদের হাতে এ পর্যন্ত পাঁচটি ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এবার নিজের কথা বলি : খুব তড়িঘড়ি করে প্রথম তিন দল ছাত্রের শেষ পরীক্ষা নিতে হলো, আগামীকাল তাদের সমাবর্তন উৎসব। অস্ত্র চিকিৎসার শিক্ষা ওদের খুব দ্রুতগতিতে দিতে হয়েছে—তাই আর সকলের মতো আমিও খুব ব্যস্ত ছিলাম এতদিন। তার ওপর আমি কিজ্যসি-র (এ স্থানটি পীপিং জাপ বিরোধী শিবিরের পশ্চিমে) ডঃ প্'-য়েঙ্কে সার্জারি শেখাচ্ছি, তাই সময় আরও কম। সে যাই হোক্, ওরই মধ্যে সময় করে আমি এদের জীবনে জীবন যোগ করার চেষ্টা করছি, যাতে আমাতে গানের পসরা ব্যর্থ না হয়। চুপি-চুপি জানাই—নিজের মধ্যে একটা গভীর পরিবর্তন অনুভব করছি।"

'নিজের মধ্যে একটা গভীর পরিবর্তন' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন ডঃ কোটনিস্? রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তন? জানি না। তবে দেখছি—ঐ সময়েই তাঁর জীবনে ঘটতে চলেছে আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যার প্রভাব ছাব্বিশ বছরের কোনোও অবিবাহিত যুবকের জীবনে কম নয়।

ডঃ কোটনিসের হাসপাতালে মেয়েদের নার্সিং শেখাতে এলো একটি তরুণী। পিকিঙের মেডিকেল স্কুলে সে ডাক্তারী পড়েছিল। সেখানেই হয়তো জীবন কেটে যেত তার, কারণ পিকিঙের একটি সচ্ছল পরিবারের মেয়ে সে। কিন্তু ওভাবে তার

জীবন কাটল না। যুদ্ধের আবর্তে বেচারিকে ভেসে পড়তে হয়েছে। নিজের পরিবার পরিজনদের কাছ থেকে কেমন করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সে আর এক কাহিনী। পশ্চাদ্ধাবনকারী জাপানী সৈনিকদের হাত থেকে জীবন আর ইজ্জত বাঁচিয়ে শত শত মাইল পায়ে হেঁটে সে কেমন করে ওখানে এসে পৌছালো সে কথা লিখতে হলে আর এক লঙ্‌-মার্চের ছোট-খাটো সংস্করণ শোনাতে হয়। মোট কথা মেয়েটি যখন ভ্রাম্যমান বেথুন হাসপাতালে এসে পৌছালো তখন কর্তৃপক্ষ ওকে শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত করলেন। অভিজ্ঞান-পত্রটি দাখিল করতে মেয়েটি প্রবেশ করল অধ্যক্ষ মশাই-য়ের ঘরে। ভেবেছিল, হোমড়া-চোমড়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখবে অধ্যক্ষের চেয়ারে; দেখল—ছাব্বিশ বছরের তারুণ্যে ভরপুর এক বিদেশী যুবককে। পরনে খাকি পোশাক, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, মাথায় খাকি ক্যাপ, দুটি চোখে জলন্ত দৃষ্টি। শুনল—উনি ভারতীয়; নাম—'খো তে হুয়া'। না, খো-তে হুয়া কেন হবে? ওঁর নাম দ্বারকানাথ কোটনিস্‌।

নিয়োগপত্রের উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি ডঃ কোটনিস্‌ এতক্ষণে মুখ তুলে চাইলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। দেখলেন, তাঁর টেবিলের ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাইশ বছর বয়সের একটি ফুটফুটে চীনা মেয়ে। লম্বায় পাঁচফুট, চাঁদের মতো সুন্দর মুখ, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। ডঃ কোটনিস্‌ বললেন, আপনার নাম?

মেয়েটি হাসল। বললে, আমার নিয়োগপত্রেই তো লেখা আছে। আপনি চীনা ভাষা পড়তে পারেন না ডক্টর খো তে হুয়া?

কোটনিস্‌ লজ্জা পেলেন, আর প্রথম সাক্ষাতেই ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে প্রায় মিথ্যা কথাই বলে বসলেন, ভাষাটা ভালো করে শিখতে পারি নি। আপনার নাম তো দেখছি কুও চিং লান্‌। আপনাকে পেয়ে আমাদের খুব সুবিধা হলো। আপনি আজই কাজে লেগে যান। যখন যা অসুবিধা হবে আমাকে অসংকোচে জানাবেন।

ডঃ কোটনিসের অধীনেই কুও চিং লানকে কাজ করতে হতো। একই কর্মস্থল, একই পরিবেশ। কেমন করে দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তা আমাদের অনুমান করে নিতে হবে। সে ইতিহাস কেউ লিখে যায় নি। যেটুকু জানা যায় তা এই—কুও চিং লান সাধারণ চীনা মেয়েদের মতো লাজুক প্রকৃতির ছিল না আদৌ। সে রীতিমতো শিক্ষিতা—ওর চশমার পুরু লেন্সটাই তার প্রমাণ। অনর্গল ইংরাজিতে সে কথা বলতে পারত—ইংরাজি সাহিত্যও তার পড়া ছিল ভালোরকম।

কোটনিসের সঙ্গে চিং লান-এর নানাবিষয়ে আলোচনা হতো—ভারতবর্ষ, চীন, পৃথিবী এবং ক্রমে দুজনের ব্যক্তিগত কথা। কোনো কোনো দিন কর্মক্লান্ত সন্ধ্যায় চিং লান হয়তো শোনাতো তার বাল্যের কথা, কৈশোরের কথা—বাবা, মা, ভাই-

বোনের কথা। তারা কেমন করে একে একে খোয়া গেছে ওর জীবন থেকে সে-কথা বলতে বলতে ওর চশমার লেন্স ঝাপসা হয়ে যেত। আবার কোনোদিন হয়তো কোটনিস্ শোনাতেন তাঁর মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি—তাঁর বাবা কীভাবে তাঁর কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন নিদারুণ অর্থাভাবের কথা।

শান্তির সময় প্রেম হয় অলসগমনা—প্রতি পদক্ষেপে দ্বিধায়-জড়িত চরণ; কিন্তু মাথার উপর বোমারু বিমানের শীৎকার শুনলে কমরেডকে বুকে টেনে নিয়ে ট্রেঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়তে মুহূর্ত বিলম্ব সয় না! অচিরেই ওঁরা দুজনে বুঝলেন যে, তাঁরা ভালবেসেছেন—শুধু তাই নয়, অপরের অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছেনও। তবু ডঃ কোটনিস্ তাঁর মন মেলে ধরতে পারেন নি। উনি জানতেন, চীনারা বিদেশীর সঙ্গে চীনা মেয়ের বিবাহ সহজে মেনে নেয় না। বিবাহ বন্ধনের ব্যাপারে প্রাচীন যুগ থেকেই চীনারা বিদেশীদের বরদাস্ত-করে না। চীনা সমাজবিধানে আন্তর্জাতিক বিবাহ নিন্দিতই হতো, নন্দিত নয়। তাই তিনি ভাবলেন, কুও চিং লানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলে চীন-ভারত সৌহার্দ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে মহান ব্রত উদ্‌যাপন করতে তিনি চীনে গিয়েছেন ভারতের প্রতিনিধি হয়ে সেই ব্রতচ্যুত হবেন তিনি। ডঃ কোটনিস্ তাই স্থির করলেন—মেয়েটিকে কোনোদিন প্রকাশ্যে জানতে দেবেন না তাঁর মনের কথা।

একে তো দৈহিক নানা অনাচার চলছিলই, খাদ্য ও বিশ্রাম নিয়মিত পান না—তার উপর অত্যধিক পরিশ্রম এবং জাপানী 'সাও দাং'-এর সম্মার্জনীর সম্মান—এতদিনে তার সঙ্গে যুক্ত হলো মানসিক যন্ত্রণা! একটি মেয়েকে তিনি ভালবাসেন, তার ভালবাসাও পেয়েছেন—অথচ তা স্বীকার করা চলবে না!

অসুস্থ হয়ে পড়লেন ডাঃ কোটনিস্। ডাক্তারের উপর ডাক্তারি করতে এগিয়ে এলেন ওঁর এক সহকর্মী। বললেন, তোমার ভালো নার্সিং দরকার। কুও চিং লানকে—

: না!—আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠেন ডক্টর কোটনিস্।—যেন ডাক্তার ওঁর আহত অঙ্গটাই মাড়িয়ে দিয়েছে!

ডাক্তার বন্ধু বিস্মিত হয়ে বলেন, না! কেন? আজকাল কুও চিং লানকে কেন সহ্য করতে পার না, সত্য করে বল তো? ওর নাম শুনলেই তুমি লাফিয়ে ওঠ! কেন?

আতুরে নিয়ম নাস্তি। বাধ্য হয়ে অপরাধ স্বীকার করলেন রোগী তাঁর চিকিৎসকের কাছে। কেন তিনি কুও চিং লানকে এড়িয়ে যেতে চান! কেন তার নাম শুনলে লাফিয়ে ওঠেন!

সব শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন বন্ধুটি। বললেন, তাই বল! এতক্ষণে রোগ নির্ণয় করেছি! ওষুধও আছে আমার কাছে! একটি পুরিয়ায় নিরাময়। সে ওষুধ

হচ্ছে মিষ্টি মেয়ে কুও চিং লান !

খবরটা জানাজানি হবার পর সেদিন হাসপাতালে সবাই কী খুশি ! এমন কি আশপাশের গ্রামের বৃদ্ধ চীনারা এসে হাজির হলো তাদের প্রিয় ডাক্তারবাবুকে অভিনন্দন জানাতে। ডঃ কোটনিস্ তাঁর একনিষ্ঠ সেবার মাধ্যমে চীনে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন ইতিমধ্যে। স্থানীয় গ্রামের গাঁওবুড়ো তাঁকে খেতাব দিয়েছিল "চুঙ্গুও হাইজা" অর্থাৎ 'চীনের সন্তান' ; এবার সেই আদর করে দেওয়া খেতাব 'চীনের সন্তান' সত্যিকারের খেতাব 'চীনের জামাতা' হতে চলেছে জেনে সবাই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। গভীর হৃদ্যতা আর আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে হাসপাতালে একদিন বিবাহ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। ঐ সময় একটি চিঠিতে (তাং ৪।১।৪২) তিনি ডঃ বসুকে লিখছেন :

"...গত বছর আমি যা-কিছু করেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো আমার নিজের চরিত্রগত পরিবর্তন। ইয়েনানে আসবার আগে আমার রাজনৈতিক জ্ঞান কত সংকীর্ণ ছিল তা তুমি জানো—আমার মাথা তখন ছিল নানান জাতের 'বুর্জোয়া' মতবাদে বোঝাই ; জাতীয় আবেগ আমার খুব তীব্র ছিল, অথচ বিপ্লবী কর্মপন্থা সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল ভাসা ভাসা ধরনের। এইটথ্ রুট-আর্মি ভুক্ত হয়ে এখানে একবছর কাজ করতে করতে, সভাসমিতিতে ও ব্যক্তিগত আলোচনায় কমরেডদের আলোচনা শুনে শুনে, আমার চরিত্রে ও মতবাদে আমূল পরিবর্তন হয়েছে।...

"ভারতবর্ষে ফিরে যাবার কথা অলোচনা করার আগে আমি তোমাকে একটি ব্যক্তিগত সংবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। গত বৎসর ২৫শে নভেম্বর আমি একটি চীনা-মেয়েকে বিবাহ করেছি। কমরেড কুও চিং লান : সেই যে চশমা-পরা যে মেয়েটি আমাদের মেডিকেল স্কুলে পড়াতে এসেছিল। বিবাহের সিদ্ধান্তে আসার আগে আমি এ বিষয়ে গভীর ভাবে ভেবেছি। আশ্চর্যের কথা, এই বিয়ের ব্যাপারে 'প্রাচ্য জাতিমণ্ডলীর ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ' আমাকে বিশেষ ভাবে সমর্থন করেছে। ইয়েনানে এই সংঘ গঠন করার কাজে তুমি তো একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলে, সেখান থেকে তুমি সীমান্ত-সরকারের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলে। এই ব্যাপার থেকেই আমি আন্দাজ করতে পারি তুমি রাজনীতি ক্ষেত্রে খুবই আত্মমগ্ন হয়ে আছ। আমারও ফিরে যাবার কোনো জরুরী তাগাদা ছিল না। তা ছাড়া আমারও মত যে, আমাদের দুজনের একসঙ্গে ফেরা উচিত এবং ভবিষ্যতে যথাসম্ভব একযোগে কাজ করা উচিত।"

ঐ চিঠি লেখার ছয় মাস পরে দেখছি (জুন '৪২) কোটনিস্ বন্ধুকে পুনরায়

লিখছেন :

"তুমি হয়তো আমার আগের চিঠিখানা পাওনি, তাই জানাচ্ছি—গতবছর আমার জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের স্কুলের শুশ্রূষা-শিক্ষয়িত্রী কমরেড কুও চিং লানকে আমি বিবাহ করেছি। গতবছর নভেম্বরে। আমার চিঠি তোমার হাতে পৌছাতে পৌছাতে আমাদের দুজনের জীবনে একটি নবীন অতিথির আবির্ভাব ঘটবে। ইয়েনানে ফিরে যেতে এখন খুবই ইচ্ছা করছে। দুটি ব্যাপারের জন্ম একটু দেরি হবে। প্রথমত অস্ত্র-চিকিৎসার উপর একটি পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব পড়েছে আমার উপর—সেটা শেষ করা; দ্বিতীয়ত আমাদের সন্তানের জন্ম। এ বছরের শেষে কিংবা আগামী বছরের গোড়ার দিকে হয়তো আমরা ইয়েনানের পথে রওনা হতে পারব। অবশ্য তোমার কাছে পৌছাতে কতদিন লাগবে তা একমাত্র তথাগতই জানেন! ...শুনলাম, তুমি আপাতত ভারতবর্ষে ফিরছ না। আশাকরি, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে। সত্যি অপেক্ষা করবে তো?

"ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, চীনে আর বেশীদিন থাকা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। ভারতের সংগ্রামক্ষেত্রে তোমার-আমার প্রয়োজন হবে। তোমার কি মনে হয়?"

অকৃত্রিম বন্ধুকে লেখা ডঃ কোটনিসের এই শেষ চিঠি। ঐ চিঠিতে তিনি ডঃ বিজয়কুমার বসুকে লেখেন 'বছরের শেষে...রওনা হতে পারব। অবশ্য তোমার কাছে পৌছাতে কতদিন লাগবে তা একমাত্র তথাগতই জানেন।' ডঃ কোটনিস তাঁর কথা রেখেছিলেন। ৯ই ডিসেম্বর তিনি রওনা হন! ডঃ বসুও তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন—এই বৃদ্ধ বয়সে আজও তিনি বন্ধুর পথ চেয়ে বসে আছেন! 'পৌছাতে কতদিন লাগবে তা শুধুমাত্র তথাগতই জানেন।'

বিবাহের তের মাস পরে ৯ই ডিসেম্বর ডঃ কোটনিস্ যে ভাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তাও এক আবামশ্র 'ট্র্যাজেডি'।

জাপানীদের 'সাও দাং' অভিযানের সময় শরীরের উপর যে অত্যাচার হয়, তাতেই কোটনিসের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। এক বছরের উপর তাঁর মাঝে মাঝে মৃগী রোগের আক্রমণ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি তো তাঁর পিতারই সন্তান—ব্যক্তিগত ব্যাধি-যন্ত্রণার কথা কাউকে জানতে দেন নি, এমনকি নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত নয়! নিজে ডাক্তার—তাই মৃগীর আক্রমণ হবার আগেই তিনি টের পেতেন; তখন চুপিচুপি একা পাহাড়ের দিকে চলে যেতেন! আক্রমণ শেষ হলে একটু সুস্থ হয়ে আবার চুপিসারে ফিরে আসতেন—যাতে তাঁর জন্য কেউ উদ্বেগ বোধ না করে, তাঁকে কেউ বিশ্রাম নিতে

না বলে! বিশ্রাম এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অবিরাম অতিরিক্ত কাজের চাপ, উপযুক্ত ঔষধপত্রের অভাব—এই রকম সপ্তরথীর আক্রমণে সেই তরুণ সৈনিক একদিন শেষ-শয্যা নিলেন।

উত্তর চীনের এক অখ্যাত গ্রামের পর্ণকুটিরে মাদুরের উপর শেষবারের মতো শুইয়ে দেওয়া হলো তাঁকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। চিরনিদ্রার অন্ধতিমিরজাল তাঁর চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেবার পূর্বমুহূর্তে ডাক্তার কোটনিস্ শেষবারের মতো একবার এই পৃথিবীর দিকে চাইলেন। দেখলেন, শয্যাপার্শ্বে বসে আছে নতনয়না সেই মেয়েটি—তার চাঁদের মতো সুন্দর মুখে বলয়গ্রাসের ধূসর ছায়াপাত ঘটেছে। বাপ-মা-ভাই বোন সবই যে খুইয়েছে পথে পথে—আজ বিদায় দিচ্ছে স্বামীকে। কিন্তু না—ঐ মেয়েটিকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে যাচ্ছেন না তিনি। ওর কোলে রয়েছে ফুটফুটে ফুলের মতো সুন্দর একটি ছয়মাসের শিশু! হাসলেন ডক্টর কোটনিস্ সেই শিশুটিকে হাসতে দেখে। চীন-ভারত মৈত্রীর ঐ শিশুটিই যে জীবন্ত স্মারক! তারপর তাঁর চোখ দুটি ধীরে ধীরে মুদে এলো—শুধু হাসিটি লেগে রইল ওষ্ঠপ্রান্তে।

কুটিরের বাইরে অপেক্ষা করছিল চীনা সামরিক বাহিনীর লোকেরা, হাসপাতালের কর্মচারীবৃন্দ। বিষাদে মাথা নোয়ালো তারা এই বিদেশীকে শেষ সম্মান জানাতে—ঠিক যেমনভাবে একদিন তারা শেষ সম্মান জানিয়েছিল তাদের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ আর এক বিদেশীকে—ডক্টর নর্মান বেথুনকে!

সুদূর ভারতবর্ষে প্রেরিত হলো একটি তারবার্তা। ভারতবর্ষ! 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে তখন সেই পরাধীনা বিক্ষুব্ধা, বিদ্রোহিনী। টেলিগ্রাফের পোস্ট তখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এখানে-ওখানে। তবু ঐ মর্মান্তিক বার্তা একদিন এসে পৌছালো জন্মদাত্রী বিধবা জননীর কাছে। কৃতী-সন্তানের শেষ কীর্তি!

ভারতবর্ষে প্রেরিত এক বাণীতে মাদাম সুন ইয়াৎ-সেন জানালেন:

> "ডাক্তার কোটনিসের স্মৃতি শুধুমাত্র আমাদের এই দুই মহাজাতির নয়—স্বাধীনতা ও মানবসভ্যতার অগ্রগতির জন্য যাঁরা অনমনীয় দৃঢ়তায় আত্মোৎসর্গ করেছেন, সেই মহান যোদ্ধাদের তালিকায় অক্ষত হয়ে রইলো তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী কীর্তি। তিনি তো বর্তমানের নয়, তিনি যে ভবিষ্যতের! কারণ তিনি ঐ ভবিষ্যতের মুখ চেয়েই সংগ্রাম করেছেন, তারই জন্য তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছেন।"[৫]

সেই ভবিষ্যত আজ বর্তমান—যে বর্তমানে দাঁড়িয়ে চীনের প্রতি 'পবিত্র ঘৃণা'র আগুন 'অনির্বাণ শিখা'য় জ্বালিয়ে রাখার সঙ্কল্প নিচ্ছি আমরা—'শিল্পীর স্বাধীনতা'য় বিশ্বাসী এ 'দেশের' জ্ঞানী-গুণী-শিল্পী-সাহিত্যিকেরা! 'লি-আই-লিয়েন-চিহ্' আমাদের মন্ত্র! আমরা 'নবজীবনে'র অভিসারী!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ কথা

'লঙ্-মার্চ'-এর তুলনা ভারতবর্ষে নেই, একথা আগেই স্বীকার করেছি। কিন্তু মে-ফোর্থ আন্দোলন? কিয়াংসি সোভিয়েত? চিম্বানশান পাহাড়ের গেরিলাবাহিনী? সাংহাইয়ের নির্মম হত্যাকাণ্ড? তাদের কোনো উপমান কি খুঁজে পাওয়া যায় এ উপ-দ্বীপে? জবাব দিতে এবার আমি ইতস্তত করব। স্বীকার করতেই হবে—ব্যাপ্তিতে, বিশালতায়, সংখ্যাতত্ত্বে কিংবা সাফল্যের নিরিখে সমান্তরাল চিত্র নেই;—কিন্তু সেটাই তো শেষ কথা নয়। শেষ কথা: আন্তরিকতা আর আত্মদানের নিরিখে উপমান হয়তো আছে।

১৯৬৭ থেকে আজ পর্যন্ত এই সাত-আট বছরে এ-দেশে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তা চোখ বুজে অস্বীকার করি কেমন করে? ভারতবর্ষের উপর চীনের প্রভাবের কথা লিখতে বসলে আমাকে অনিবার্যভাবে বলতে হবে সে-কথাও। আমি বলছি: নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলাম, মুশাহরি, লখিমপুর, ডেবরা-গোপীবল্লভপুর, কলকাতা, বহরমপুর, নদীয়া, আর বীরভূমের কথা। আর সেটাই আমার শেষ কথা।

৪ঠা মে-র আন্দোলনের পর দেখেছি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা-ছাত্ররা গভীর রাত্রে পাঁচিল ডিঙিয়ে কলেজ-প্রাঙ্গণে ঢুকছে; মোমবাতির আলোয় মার্কস-এ্যাংগেলস্ লেনিনের লেখা পড়ছে, ডক অঞ্চলে আর কলকারখানায় গোপনে ঢুকে মেহনতী-মানুষের কানে বিদ্রোহের মন্ত্রণা দিচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী দালালদের লেখা বইয়ের বহ্ন্যুৎসব করছে। সে-জাতীয় কোনো কাণ্ডকারখানা এই কলকাতা-যাদবপুরের ছাত্ররাও করেছে কি? আমি তা কেমন করে জানব বলুন? আমাকে বিশ্বাস করে ওরা তো তার বিবরণ শুনিয়ে যায় নি। আমি এই ষাট কিংবা সত্তরের দশকের কথা-সাহিত্যিক —আমাকে ওরা বিশ্বাস করে না, ভয় করে। আমি সাহিত্য-বাসরে বক্তৃতা দিই: ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চাকরির মায়া ত্যাগ করে কীভাবে 'আনন্দমঠ' লিখে-ছিলেন; আমি পঁচিশে বৈশাখে শ্রোতৃবৃন্দকে শোনাই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে নাইট-হুড ত্যাগ করেছিলেন। আমি আগামী শরৎ জন্মশতবার্ষিকীতে বক্তৃতা দেব—শুনতে আসবেন—কাশীর শচীন সান্যালের মুখে রাসবিহারীর কীর্তি-কাহিনী শুনে শরৎচন্দ্র কীভাবে রাজরোষ-উপেক্ষা করা 'পথের দাবী' লিখেছিলেন। ব্যস! 'শিল্পীর স্বাধীনতা'য় বিশ্বাসী ষাট-সত্তরদশকের

সাহিত্যিক হিসাবে আমি আর কি করতে পারি বলুন? তাই ওরা আমাকে সে-সব কথা বলে যায় নি।

ঘেঁটেছি বই—জাতীয় গ্রন্থাগারে। হদিস পাই নি। পাব কোথা থেকে? সমকালীন শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকেরা একেবারে নিশ্চুপ। যেন এতবড় ঘটনাটা আমাদের চোখের সামনে আদৌ ঘটে নি। না নিন্দা, না প্রশংসা। স্বীকার করি: বিপদ ছিল, বিপদ আছে। প্রশংসা করায় এবং নিন্দা করায়। উভয়তই। একদিকে রাজরোষ, অপরদিকে নকশালরোষ। কিন্তু তাই বলে সমকালীন এতবড় ঘটনাটায় এ-দশকের বাংলাসাহিত্যের একমাত্র অবদান হবে: উপেক্ষা?

দ্বিতীয় কথা: কেন এই বিক্ষোভ? দেশ তো স্বাধীন হয়েছে! বিদেশী শাসক বিতাড়িত—স্বদেশী দেশশাসকদের আমরাই তো ভোট দিয়ে নির্বাচন করেছি। তাঁরা গদিতে উঠে বসলে সানন্দে 'যুগ-যুগ-জিও' নাচ নাচছি! তাহলে? স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর উন্নতি হয় নি একথা তো বলতে পারব না—জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে একচল্লিশ শতাংশ; খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ডবল, পাকা রাস্তা স্বাধীনতার পর প্রথম বিশ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণের ওপর। তবে কেন সাধারণ মানুষ এত অসন্তুষ্ট? ক্ষেপে ওঠার উপাদান ওরা পেল কোত্থেকে?

অর্থনীতির ছাত্র জবাবে বললেন, তুমি সংখ্যাতত্ত্বগুলি পেশ করলে একটু কায়দা করে! জাতীয় আয় বৃদ্ধির শতাংশটা ঘোষণা করলে, কিন্তু জানালে না সাধারণ মানুষের মাথাপিছু গড় আয় কতটা বেড়েছে, আর তুলনায় জিনিসপত্রের দাম কতটা বেড়েছে। তুমি উল্লেখ করতে ভুলেছ, সমাজের কোন্ অংশ এতে কতটা উপকৃত হচ্ছে! তিনি যুক্তি পেশ করলেন, দেশের বারো-আনা জমি মাত্র দশ শতাংশ লোক আজও দখল করে বসে আছে; ভারতীয় কৃষক-জনতার বারো-আনা মানুষ, সরকারী খতিয়ান হিসাবেই, ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের নিচে রয়ে গেছে আজও, অথচ বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা আয়-বিশিষ্ট লোকদের আয় স্বাধীনতার প্রথম সাত বছরে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১]

তিনি আরও বললেন, তুমি স্বাধীনতার পর উন্নতির যে খতিয়ানটা দেখালে তার মূল্যায়ন করতে হলে একটা তুলনামূলক বিচার করা উচিত। ভারত ও চীন প্রায় একই সঙ্গে স্বাধীন হয়েছে—ভারত ধনতন্ত্র মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের পথে এবং চীন সাম্যবাদের পথে প্রথম বিশ বছরে কতটা অগ্রসর হয়েছে সেটা পাশাপাশি রেখে দেখ, বুঝবে কে কোন্ পথে কতটা অগ্রসর হয়েছে:[২]

দেশ	বিষয়	হিসাবের একক	১৯৫০-৫১	১৯৭০-৭১	বৃদ্ধির শতাংশ হার
ভারত	জাতীয় আয়	কোটি টাকা	১৩,২৯৪	১৮,৭৫৫	৪১%
চীন	ঐ	ঐ	২১,০০০	১,৩৫,০০০	৫৪৩%
ভারত	মাথাপিছু আয়	টাকা	৩০৬	৩৪৭	১৩%
চীন	ঐ	ঐ	৩৫০	১,৮৭৫	৪৩৬%
ভারত	খাদ্যশস্য	লক্ষ টন	৫৫০	১,০৭০	৯৫%
চীন	ঐ	ঐ	১,০৮০	২,৫০০	১৩১%
ভারত	রেলপথ	মাইল	৩৪,০৭৯	৪১,০০০	২০%
চীন	ঐ	ঐ	১২,০০০	৪৮,০০০	৩০০%
ভারত	পাকা রাস্তা	ঐ	৯৮,০০০	৩,২৪,৯৪০	২৩২%
চীন	ঐ	ঐ	৭৫,০০০	৬,০০,০০০	৭০০%
ভারত	বিদ্যুৎশক্তি	কোটি কিলোওয়াটে আওয়ার	৬৬০	৫,৪৮০	৭৪৫%
চীন	ঐ	ঐ	৪৩১	১২,৯৩০	২,৯০০%

মোট কথা একশ্রেণীর চিন্তাবিদ্ মনে করলেন, মূল গলদটা আমাদের উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য করতে না পারায়। তাঁদের বিশ্বাস হলো, এ গলদ দূর করার একমাত্র উপায় শাসনব্যবস্থার কাঠামোটা আমূল বদলে ফেলা। ভোট দিয়ে আমরা যে-কোনো রাজনৈতিক দলকেই ক্ষমতার গদীতে বসাই না কেন, কোনো লাভ হবে না। সেই রাজনৈতিক দল গদীতে চড়েই একটা 'নবজীবন আন্দোলন' শুরু করবেন; 'লি-আই-লিয়েন-চিহ'-র জয়গান গাইবেন এবং শাসন-শোষণ চালিয়ে যাবেন। তাঁরা এই বিপদ থেকে উত্তরণের নির্দেশ পেলেন মাও-ৎসে-তুঙ প্রবর্তিত পন্থায়। এই পরীক্ষার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল উত্তর বাংলায় একটি গ্রামে—নকশালবাড়িতে। শিলিগুড়ির উত্তরে নকশালবাড়ি গ্রামে ৩. ৩. ৬৭ তারিখে তীর-ধনুক, লাঠি-বল্লম নিয়ে একদল ভূমিহীন কৃষক জোর করে একখণ্ড জমি দখল করল। তার সীমানায় লালনিশান পুঁতে দিয়ে ঘোষণা করলো: এ জমি কিষাণ-সভার।

মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে প্রায় ষাটটি সংবিধান-স্বীকৃত পিনালকোডের নিরিখে বে-আইনি কাজ ওরা করে বসল একের পর এক—জোর করে জমি দখল, জোর করে ফসল-কাটা, জোতদারের ধান ও চালের গদি লুট করে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া এবং অত্যাচারী জমিদার, সুদখোর, মহাজনদের আক্রমণ। এই দু-তিন মাসে ঘটনার ক্ষেত্র বিস্তারিত হয়েছিল নিকটবর্তী আরও দুটি থানায়—খড়িবাড়ি আর

ফাঁসিদেওয়ায়। খোঁজ নিলে জানা যেত, এই আন্দোলনের পিছনে ছিলেন কয়েকজন কৃষকনেতা : কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, খোকন মজুমদার, সৌরেন বসু আর তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন : চারু মজুমদার।

এই হলো সূত্রপাত।

আপনি হয়তো বলবেন: কেন? নকশালবাড়িতেই সূত্রপাত বলা হচ্ছে কেন? তার আগে কি তে-ভাগা আন্দোলন নেই? তেলেঙ্গানা নেই?

আমি বলব, আছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখুন তফাতটা কোথায়।

তে-ভাগা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল উৎপন্ন ফসলের বৃহত্তর অংশ। সেটা যে-কোনো শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে তুলনীয়। গোটা সমাজব্যবস্থাটা তারা পাল্টাতে চায়নি, রাষ্ট্রব্যবস্থা তো নয়ই। বরং নিজামের রাজত্বে এবং পরে প্রজাতন্ত্রী ভারতসরকারের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানাতে যে বিদ্রোহ হয়েছিল, সেটা ছিল চীন-প্রদর্শিত গেরিলা যুদ্ধের ঢঙে। তার ব্যাপকতাও বড় কম নয়—নলগোণ্ডা, ওয়ারাঙ্গেল, খাম্মান প্রভৃতি জেলায় প্রায় ষোল হাজার বর্গমাইল এলাকায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ এ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নির্দেশেই সে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছিল। অবিভক্ত কম্যুনিস্ট-পার্টির নেতা অজয় ঘোষ, ডাঙ্গে, রাজেশ্বর রাও প্রভৃতি মস্কো ঘুরে এসে রাশিয়ার নির্দেশেই নাকি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। সেখানেই তেলেঙ্গানা-আন্দোলনের যবনিকাপাত।

অপরপক্ষে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল—জমি দখল নয়, ধান লুট নয়, রাজশক্তি দখলের লড়াই!

তাছাড়া অঙ্কের হিসাবটাও বলছে—নকশালবাড়িতেই সূত্রপাত হবার কথা। অঙ্কের হিসাবটা কি? বলি শুনুন: চীনে বিদেশী শক্তিকে তাড়িয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১২ সালে। সেই প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম জেগে ওঠে কিয়াং-সিতে ১৯৩১ সালে। অর্থাৎ উনিশ বছরের ব্যবধান। ভারতবর্ষ বিদেশী শক্তিকে তাড়িয়ে স্বাধীন হয় ১৯৪৮-এ। আমাদেরও যদি উনিশ বছর সময় লাগে তবে প্রতিবাদ জেগে ওঠার কথা—১৯৬৭তে।

প্রজাতন্ত্রী চীনের পয়লা-নম্বর শত্রু ছিলেন মাও ৎসে-তুঙ। প্রজাতন্ত্রী ভারতের পয়লা-নম্বরের শত্রু : চারু মজুমদার। তাঁকে চিনতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত বছর চারেক।

১৯৬৩ সাল। অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ তখন অনেকেই আছেন জেলে। সেই সময়ে জেলের ভিতরেই দলীয় নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য প্রখর হয়ে উঠলো।[৩] দুটি দলের চিন্তাধারা দু-পথে চলছে। একদল মস্কো-পন্থী, অপরদল চীন-পন্থী।

অথবা বলা যায় নরমতম-পন্থী এবং চরম-পন্থী। শেষোক্ত দলের আবার দুটি ভাগ। নরম-গরম-পন্থী ও চরম-গরম-পন্থী। তাঁদের নেতা যথাক্রমে জ্যোতি বসু আর প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদবাবুর অনুগামীরাও দ্বি-ধারায় বিভক্ত। একদল—তাঁরাই দলে ভারী, তাঁরা চাইছিলেন জ্যোতিবাবুর দলের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নিতে, যাতে যৌথভাবে মস্কোপন্থীদের বিরুদ্ধে মতাদর্শ নিয়ে লড়া যায়। দ্বিতীয় দল, তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও চরমতমপন্থী—তাঁদের ধারণা জ্যোতিবাবু আসলে সংশোধনবাদী। অর্থাৎ যতশীঘ্র জ্যোতিবাবু ঐ নরমতম মস্কোপন্থী দলে যোগ দেন ততই ভালো। এই শেষোক্ত দলে ছিলেন যেসব নেতা তাঁরাই শেষ পর্যন্ত গঠন করেন সি. পি. আই. (এম-এল) পার্টি। তাঁরা হচ্ছেন : চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত প্রভৃতি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বসু আর প্রমোদ দাশগুপ্তের মতের মিল হলো। পরের বছর, ১৯৬৪ সালে যখন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সি. পি. আই. (এম) জন্ম নিল তখন জ্যোতি বসু হলেন তার অন্যতম কর্ণধার—নয়জনের পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য।

তার তিন বছর পরে। ১৯৬৭-র ফেব্রুয়ারীতে কংগ্রেস নির্বাচনে হারল। ১লা মার্চ ময়দানে হলো যুক্তফ্রণ্টের প্রথম জনসভা। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায় হলেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলো সি. পি. আই (এম)। নকশালবাড়ির প্রথম বিপ্লব তার মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা পরের ঘটনা। ২৩শে মে নকশালবাড়িতে পুলিশের সঙ্গে কৃষকদের হলো এক সশস্ত্র সংঘর্ষ। যে তিনজন পুলিশ আহত হলো তার ভিতর একজন পরদিন হাসপাতালে মারা যায়। তাকে পরে মরণোত্তর রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়[৪]। ২৫শে তারিখ পুলিশ গেল সেই গাঁয়ে, বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে। পুরুষরা অধিকাংশই তখন ছিল না। একদল স্ত্রীলোক পুলিশদলকে ঘিরে ফেলে। পুলিশ গুলি চালায় এবং পাঁচজন স্ত্রীলোক আর একটি শিশুকে হত্যা করে ফিরে আসে।[৫]

মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে গেলেন। ২৭শে তিনি খোদ নকশালবাড়িতে একটি জনসভায় কড়া ভাষায় বললেন,"প্রত্যেক নাগরিকের জীবন, ধন ও সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার আছে।…জমির মালিক গরীব বা বড়-চাষী যাই হোক জবরদস্তি করে কারও জমি দখল করা সমাজ-বিরোধী কাজ বলেই গণ্য হবে।"[৬]

প্রমোদবাবু কিন্তু ঐ উত্তরবঙ্গে বসেই তখন বিবৃতি দিচ্ছেন—পুলিশের পক্ষে প্রতিশোধ নিতে এই গুলিচালনা করা অন্যায় হয়েছে। যুক্তফ্রণ্টের আঁতুরঘরেই

নকশালবাড়ি প্রসঙ্গে বিরোধ ঘনিয়ে উঠল। যাই হোক মূলত সি. পি. এম.-এর বিরোধিতার জন্য অজয়বাবু সেই পুলিশী কঠোরতা দেখাতে পারেন নি যে-কঠোরতা দেখিয়েছিল ইংরাজের পুলিশ বেয়াল্লিশ সালে, অজয়বাবুর অনুগামীদের উপর তমলুকে। মন্ত্রিমণ্ডলীকে উত্তরবঙ্গে আদেশ পাঠাতে হলো—উপদ্রুত এলাকায় পুলিশের টহল দেওয়া আপাতত বন্ধ থাক।

সি. পি. এম আশা করেছিল দলের চরমতমপন্থীদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারা যাবে। বামপন্থী সরকার যখন পশ্চিমবঙ্গে গড়া গেছে তখন পার্লামেণ্টারী পন্থায় আপাতত চললে কী ক্ষতি? কিন্তু চরমপন্থীরা তাতে সম্পূর্ণ গররাজী। গলদটা মূল দৃষ্টিভঙ্গিতেই। সি. পি. এম. তখন যুক্তফ্রণ্টের শরিক—আইন-শৃঙ্খলারক্ষার বিশেষ দায়িত্বটা বর্তেছে তারই উপর। আর বেশ বোঝা গেল নকশালপন্থীরা আসলে জমি চাইছে না, উৎপন্ন দ্রব্যের বৃহত্তর অংশ চাইছে না, কলকারখানার ধর্মঘটী মজদুরের মতো মাহিনাবৃদ্ধি বা বোনাসের দাবি নিয়ে ওরা আসে নি—ওরা চায় রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। ২৮শে জুন পিকিঙ রেডিও থেকে শোনা গেল ঘোষণা—চীন পরিষ্কার ভাষায় বলছে, উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে মাওপন্থী কৃষকদল ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ঐ ২৮শে জুন তারিখেই সি. পি. এম.-এর এক-দল কর্মী কলকাতার 'দেশহিতৈষী' সংবাদপত্রের অফিস জোর করে দখল করল। 'দেশহিতৈষী' ছিল তখন পার্টির অন্যতম মুখপত্র। পরের সপ্তাহেই 'দেশহিতৈষী' অফিস থেকে বিতাড়িত চরমপন্থী সুশীতল রায়চৌধুরী আর সরোজ দত্তের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হলো নকশালপন্থীদের মুখপত্র: দেশব্রতী।

সি. পি. এম. এবার নকশালপন্থীদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিল। প্রথম ক্ষেপেই শ'চারেক সদস্যকে বিতাড়ন করা হলো। তাদের মধ্যে ছিলেন: চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, পরিমল দাসগুপ্ত, অসিত সেন প্রভৃতি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিতাড়িতের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করল।

দুটি বছর উগ্রপন্থীরা গোপনে কাজ করে চলে। তারপর জন্ম নিল ওদের নূতন পার্টি—২২. ৪. ৬৯ তারিখে: সি. পি. আই. (এম-এল); মহান নেতা লেনিনের জন্মশতবর্ষের সূচনাদিবসে মে-দিবসে কলকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক প্রকাণ্ড জন-সভায় সে-কথা ঘোষণা করলেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কানু সান্যাল। তিনি পূর্ববৎসর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে মুক্তিও পেয়েছিলেন। তার পিছনেও রয়ে গেছে ছোট্ট একটা ইতিহাস। উনি গ্রেপ্তার হন প্রথম যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে যাবার পর, রাষ্ট্রপতির শাসন আমলে। তারপর হলো ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী

নির্বাচন। সি. পি. এম. তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিল যে, গদী পেলে তারা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবে। তাই ক্ষমতায় এসেই সি. পি. এম. কানু সান্যালকে মুক্তি দিয়েছিল।

মে-দিবসে কলকাতা ময়দানের একপাশে যখন উগ্রপন্থীরা সি. পি. আই.(এম-এল) পার্টির জন্মলাভের কথা ঘোষণা করছে ঠিক তখনই ঐ ময়দানের অপরাংশে সি. পি. এম. একটি পৃথক জনসভা করছিল। সেই সভায় তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী জ্যোতি বসু নকশালপন্থীদের কঠোর হস্তে দমনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন।

এদিকে তাঁর সভামণ্ডপের অনতিদূরে তখন কানু সান্যাল বলছেন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিশাল বিস্তৃতি ঘটেছে ইতিমধ্যে। এই দু'বছরে নকশালবাড়ির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে—আসাম, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মহীশূর, কেরল, পঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায়।[৭]

নকশালপন্থীদের জনসভা ছিল বে-আইনি। সে সভায় এমন অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন যাঁদের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ছিল। পুলিশের চোখের সামনেই তাঁরা বক্তৃতামঞ্চে ঘোরাফেরা করছিলেন, অথবা ভাষণ দিচ্ছিলেন—কিন্তু সেই বিশাল জনসমাবেশের মাঝখান থেকে তাঁদের কাউকে গ্রেপ্তার করার কোনোও চেষ্টা পুলিশে করে নি। সভা ভঙ্গ হলে ছুটির দিনের জনস্রোতে সেই সব নেতা এমন সুকৌশলে মিশে গেলেন যে, তাঁদের আর খুঁজে পাওয়া গেল না।[৮]

কানু সান্যাল সেই মে-দিবসের সভায় আন্দোলনের বিস্তৃতি বিষয়ে যে বিরাট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের কথা শোনালেন তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা আজও পাই নি। দেশব্রতী, লিবারেসন এবং পার্টির প্রচার-পুস্তিকা ঘেঁটে হয়তো একটা ধারাবাহিক রচনা খাড়া করা যায়। কিন্তু তা আজ প্রকাশ করার উপায় নেই। সে সব দলিল নিষিদ্ধ পত্রিকা। সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশই নিহত, কিছু আছেন কারাপ্রাচীরের ওপারে, মুষ্টিমেয় যাঁরা আত্মগোপন করে আছেন তাঁদের শোনা-কথাও ছাপা যাবে না। ওদের এই কয়-বছরের সংগ্রাম বিষয়ে সমসাময়িক সাহিত্যিক-সাংবাদিক-প্রাজ্ঞ এবং বিজ্ঞজন কিছু লিখে না গেলেও ঘরোয়া আলোচনায় তাঁদের মতামত একাধিকবার শুনেছি। কেউ বলেছেন—ওরা ছিল অপরিণামদর্শী, মূর্খ, হঠকারী; কেউ বলেছেন: উন্মাদ! তবু একটা কথা কিন্তু তাঁরাও স্বীকার করেছেন—ঐ মূর্খ ছেলেগুলো অধিকাংশই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরের টুকরো ছাত্র, টুকে-পাশ করার দলের মস্তান নয়! আরও একটা কথা। ওদের মূর্খামিতে ব্যক্তিগত স্বার্থগন্ধ ছিল, পার্টির নামে চাঁদা তুলে ম্যাটিনী শো দেখত এমন অভিযোগ কিন্তু কেউ করেন নি। ফলে ওদের সেই মূর্খামির ইতিহাসটা

আপাতত রহস্যঘন হয়েই রইল। আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা যেমন ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকী-বাঘাযতীন কিংবা রাসবিহারীর মূর্খামিতে তিতিবিরক্ত হয়ে বলতেন, 'পড়াশুনাটা চালিয়ে যা, আখেরে কাজ দেবে' আমরাও কি তেমন কথা বলে গেলাম আমাদের ছেলেমেয়েকে ? কে জবাব দেবে এ প্রশ্নের? আজকের আমরা তার জবাব দিলাম না; কিন্তু আমি যেভাবে কীটদষ্ট পুলিশ-রেকর্ড ঘেঁটে একদিন রাসবিহারীর মূর্খামির মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলাম সেইভাবে কি একবিংশ শতাব্দীর গবেষক লালবাজারের নথী ঘেঁটে ওদের মূর্খামির মূল্যায়ন করতে বসবেন ? জানি না। তবু অ-বাজেয়াপ্ত সংবাদপত্রে যেটুকু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তারই ভিত্তিতে ওদের সংগ্রামের সংক্ষিপ্তসার লিখে যাই—আমার সমকালের আপনাদের জন্য ততটা নয়, যতটা সেই একবিংশ শতাব্দীর গবেষকের উদ্দেশ্যে :

শ্রীকাকুলাম : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম অঞ্চল—বার্থাপুরম, পদমপুর, বুড়িবাঁকা, থাকুপল্লী, গরুড়ভদ্র প্রভৃতি গ্রামে ঘনিয়ে ওঠে এই বিদ্রোহ। ও অঞ্চলে আদিবাসীদের বাস—তাদের বলে গিরিজন বা 'পাহাড়িয়া' ; আসলে তারা শবর শ্রেণীর আদিবাসী। ওখানেই শুরু হলো—ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। শ্রেণীশত্রুদের অর্থাৎ ভূমিহীন শবরজাতীয় কৃষকদের যারা যুগ-যুগান্ত ধরে নানাভাবে অর্থনৈতিক শোষণ করে এসেছে তাদেরই ওরা শেষ করতে শুরু করল। 'শেষ' তো নয়, কথাটা 'খতম' অর্থাৎ হত্যা। ভূম্যধিকারী জমিদার, জোতদার, সুদখোর মহাজন এবং যারা নানাভাবে তাদের মদৎ জোগায়। প্রথম-প্রথম হত্যাকারী দলে পনের-বিশজনের বেশী লোক থাকত না—গ্রামবাসী নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকত ; কিন্তু অচিরেই দেখা গেল গ্রামের সাধারণ মানুষও এ হত্যা-উৎসবে যোগ দিয়েছে। কে ওদের বন্ধু, কে শত্রু তা ওরাই স্থির করত। অচিরেই পুলিশকে সক্রিয় হতে হলো—ফলে পুলিশও হয়ে গেল ওদের শত্রুদলভুক্ত। মে-মাসের মাঝামাঝি এক খণ্ডযুদ্ধে এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা পাঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তি সমেত ছয়জন বিদ্রোহী-নেতা পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন ; কয়েক সপ্তাহ পরে কৃষ্ণমূর্তির স্ত্রী নির্মলাও একইভাবে নিহত হন।

চারু মজুমদার স্বয়ং শ্রীকাকুলাম পরিদর্শনে আসেন '৬৯ সালের গোড়ার দিকে। ঐ বছরের ভিতর প্রায় তিনশ' গ্রামে তিন-চারশ' গেরিলাবাহিনী কাজ করে যাচ্ছিল—পাঁচশ বর্গমাইল এলাকায়, তার ভিতরে এক-পঞ্চমাংশ ছিল অরণ্য-পর্বত। ফলে পুলিশ সহজে ওদের খুঁজে পেত না। পুলিশের পক্ষে আরও একটি অসুবিধা ছিল এই যে, ইতিপূর্বে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে যেসব সশস্ত্র এবং হিংসাত্মক আন্দোলন হয়েছে সে-সব ক্ষেত্রে নেতৃত্বের নির্দেশ আসত উপর থেকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুব-

কেন্দ্র শহরাঞ্চলের গোপন ঘাঁটিতে বসে 'অ্যাকশনের' পরিকল্পনা করতেন ; ফলে পুলিশের এজেন্ট ছদ্মবেশে সেইসব ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ত। এক্ষেত্রে 'এ্যাকশনের' পরিকল্পনা হয় একেবারে গ্রামের ভিতর, যেখানে পুলিশের এজেন্ট গেলেই চিহ্নিত হয়ে পড়ে। যে যায়, সে আর ফেরে না! শ্রীকাকুলামের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভি. সত্যনারায়ণ; তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক স্কুলমাস্টার—একজন শবর মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি নিজেও জানতেন না কোন্ গ্রামে, কোন্ গেরিলা স্কোয়াড কবে, কোথায় কাকে খতম করতে যাচ্ছে! শ্রীকাকুলামে দ্বিতীয় আর একজন নেতা হচ্ছেন এ. কৈলাশন। ওঁরা দুজনেই '৭০ সালের জুলাই মাসে পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিহত হন; যদিও ঐ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শব্দটা নিয়ে মত-বিরোধ আছে।

মোট কথা দুটি বছরে শ্রীকাকুলামের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিদ্রোহীরা এক 'তথাকথিত সন্ত্রাসের রাজত্ব' প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। কুখ্যাত জমিদার, জোতদার, সুদখোর মহাজনদের হত্যা করে, তাদের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি, ধানের গোলা, লুট করে এবং মহাজনের সিন্দুকে আবদ্ধ বন্ধকী-তমশুক পুড়িয়ে দিয়ে যেভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল তা অভূতপূর্ব। পুলিশও যে পদ্ধতিতে এ বিদ্রোহ দমন করে সেটা ইংরাজ যুগের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নয়।

মুশাহারি, বিহার : মজঃফরপুরের অন্তর্গত মুশাহারি এবং পার্শ্ববর্তী দশ-বারোটি গ্রামে যে বিদ্রোহ হয় তার সম্বন্ধে বস্তুত কোনো বিবরণই পাই নি; শুনেছি আট-দশ হাজার লোক তাতে অংশ নিয়েছিল।

পালিয়া, যুক্ত প্রদেশ : লখিমপুর জেলার অন্তর্গত পালিয়াকে কেন্দ্র করে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি গ্রামে নকশালপন্থীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এখানে শুরুতে নাকি মাত্র বারোজনের একটি সংগ্রাম-কমিটি হয়েছিল, ক্রমে বাড়তে বাড়তে সংখ্যাটা হাজার পাঁচেকে দাঁড়ায়। এ অঞ্চলে জমি-দখলের কর্মসূচীটাতেই জোর দেওয়া হয়—প্রায় বিশ-হাজার একর জমি ভূমিহীন কৃষকেরা কেড়ে নিয়ে চাষ করে।

ডেবরা-গোপিবল্লভপুর, পশ্চিমবঙ্গ : মেদিনীপুর জেলার গোপিবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ধর্মপুর গ্রামে সংগ্রামের সূচনা হয় '৬৯ সালেই এবং ঐ বছর শেষ হওয়ার আগেই ওরা অন্যূন বাইশজন শ্রেণীশত্রুকে 'খতম' করে বলে দাবি করে। পরের বছরের প্রথম চার মাসেই সংখ্যাটা বেড়ে গিয়ে হয় ষাট। সংগ্রাম যখন শেষ পর্যায়ে তখন সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় সওয়া শ'! কয়েক মাসের মধ্যেই আন্দোলন পাশের কয়েকটি থানায় ছড়িয়ে পড়ে—এমনকি পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও; অর্থাৎ উড়িষ্যায় এবং বিহারে। ডেবরা থানায় বিদ্রোহ পরিচালনা করছিলেন আদিবাসী

নেতা গুণধর মুর্মু। আর এই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় পূর্ণ দায়িত্ব ছিল যাঁর উপর তাঁর নাম অসীম চট্টোপাধ্যায়।

অসীম প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র। কলেজে থাকতেই তিনি ঐ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর ছিল অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি, আর তার মূলে ছিল তাঁর সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি, ধৈর্য, সাহস, আন্তরিকতা এবং সবাইকে ভালবাসা। নেতা হবার সব গুণই ছিল তাঁর; ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজের সেরা ছেলের দল, যারা লেখাপড়া না ছাড়লে অনায়াসে আই. এ. এস্. হয়ে এ-দেশকে শাসন করতে পারত, অসীমের অনুগামী হয়ে পড়ে এবং অসীম নিজে নকশালবাড়ির নেতা চারু মজুমদারের নেতৃত্ব মেনে নেন। যেহেতু চারুবাবুর কর্মপদ্ধতি প্রথম যুগে ছিল সম্পূর্ণ গ্রামকেন্দ্রিক তাই কলকাতার ঐ সব সেরা ছাত্রের দল কলেজ ছাড়ল—ক্রমে তার সঙ্গে যোগ দিল মফঃস্বলের ছাত্ররাও। ওরা চলে গেল গ্রামাঞ্চলে। একটি দল নিয়ে অসীম চট্টোপাধ্যায় চলে যান মেদিনীপুরের সেই অংশে যেটা বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তে।

অত্যন্ত অল্প সময়ের ভিতরেই ঐ অরণ্য পর্বত অঞ্চলে বিদ্রোহীরা এক সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থাপন করল। শহরাঞ্চলে পুলিশের দাপট যতই থাক, গ্রামাঞ্চলে তারা মুষ্টিমেয়; গ্রামবাসীর সহযোগিতা ছাড়া সেখানে তাদের জীবনধারণই অসম্ভব। অথচ ঐ সব গ্রামের মানুষ মূলতঃ বিদ্রোহীদেরই পক্ষে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কত লোক অংশ নিয়েছিল ঠিক জানি না; পুলিশের হিসাবে অন্তত হাজার চল্লিশ গ্রামবাসী ছিল এই বিদ্রোহী দলের পূর্ণ সমর্থক। গ্রামে পুলিশ ঢুকতে সাহস পায় না, ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার হুকুম জারী করলেন: বিদ্রোহ দমনের জন্য খড়্গপুরের ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্‌কে নিযুক্ত করা হোক।

আঞ্চলিক আন্দোলনের হিসাব-নিকাশ বন্ধ করে এবার বরং ছাত্রসমাজের কথা বলি। নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছিল মূলতঃ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। ক্রমে কলকাতা এবং মফঃস্বলের ছাত্রদলের এক বৃহদংশ এ আন্দোলনে সামিল হয়। এমনটা চীনেও হয়েছিল। নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের বোঝালেন—এ বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থায় যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো ওভাবে নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। ছাত্রদের কাজে নেমে পড়তে হবে। কাজ বলতে গ্রামাঞ্চল—শহরের কলকারখানায় ততটা নয়; কারণ ওঁদের বিশ্বাস ভারতবর্ষের বিপ্লব রাশিয়ার ঢঙে ঘটবে না, চীন বিপ্লবের পথে রূপায়িত হবে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সন্ত্রাসবাদীরা প্রধানত শহরাঞ্চলেই গোপন ঘাঁটি খুলতেন—ক্লাব আখড়া-সমিতি। স্বদেশী ডাকাতি এবং এ্যাকশনের পরিকল্পনা সেখানেই হতো—ব্রত-উদ্‌যাপন তাঁরা নিজে হাতেই করতেন। অপর পক্ষে এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের বললেন—তোমরা গ্রামে চলে যাও, গ্রামবাসীদের মধ্যে মিশে যাও, একাত্ম

হয়ে যাও। মাও ৎসে-তুঙ প্রদর্শিত বিপ্লবের বাণী ওদের শেখাও—ওদের কী সমস্যা নিজেরাও তা বুঝে নাও—জীবনে জীবন যোগ করে। গ্রামে গ্রামে গেরিলা স্কোয়াড তৈরি কর। গ্রামের মানুষকেই বুঝে নিতে দাও, বেছে নিতে দাও—কে তাদের বন্ধু কে শত্রু। শত্রুকে 'খতম' করার কর্মসূচীও নেবে ঐ গ্রামবাসী গেরিলা স্কোয়াড। তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবে তারাই—তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী।

ফলে রাইফেল, বন্দুক, রিভলভার, বোমার প্রয়োজন হলো না। গ্রামের মানুষ যে অস্ত্রটাকে চেনে, যা দিয়ে তারা 'বাপপিতেমোর' আমল থেকে বাঘ-সাপ-ডাকাতদের সঙ্গে লড়েছে তাই ব্যবহার করতে শুরু করল তারা—তীর-ধনুক, বল্লম, কুঠার, হেঁসো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের ছাত্রটি এ্যাক্‌শনের সময়ে নিজে উপস্থিত থাকত না! এমন কি সে হয়তো জানতেও পারত না—কে, কবে, কোথায় খতম হচ্ছে!

নিরলস নিষ্ঠায় কীভাবে ছাত্ররা গ্রামে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করত তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে যদি আমরা একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি। বীরু মণ্ডলকে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পাশাপাশি তিনটি গ্রামে। বীরু ঐ তিনটি গ্রামের অর্থনৈতিক চিত্র একটি তালিকার আকারে পেশ করেছিল পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরে। তার একটি গ্রামের চিত্র আমরা এখানে সবিস্তারে পেশ করলাম :

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার একটি গ্রামের চিত্র :

গ্রামে সর্বমোট পরিবারের সংখ্যা ... ৮৭টি

(১) অবস্থাপন্ন পরিবার [যাদের ন্যূনতম চাষের জমি ৫০ বিঘা, ঊর্ধ্বতম ২৫০ বিঘা—এরাই গ্রামের সমাজপতি, গ্রামের যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এঁদের উপর। এঁরাই গ্রামের পরিচালক।] ... ৫টি

(২) মালিক চাষী [জমির পরিমাণ ৮-১৪ বিঘা। সারা বছর গ্রাসাচ্ছাদন কোনোক্রমে করতে পারেন। উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না।] ...৮টি

(৩) আধা-মালিক চাষী [জমির পরিমাণ ১-৫ বিঘা। বছরে চার থেকে ছয় মাস সংসার চলে। বাকি সময় বিকল্প রোজগার করেন।] ... ১৭টি

(৪) ভাগচাষী [নিজস্ব জমি নাই, প্রথম দুটি শ্রেণীর জমি ভাগে চাষ করেন। রীতিমত অভাবের সংসার।] ... ১৪টি

৪৪টি

(৫) মজুর চাষী [জমি নাই, ভাগচাষ করতে যেটুকু অর্থ বিনিয়োগ করতে

হয় তাও নাই। ফলে মালিক অথবা বর্গাদারের জমিতে
মজুর হিসাবে খাটেন। দারিদ্র্যের শেষ সীমায়।] ··· ৪৫টি

৮৭টি

শেষোক্ত ঐ শতকরা পঞ্চাশজনের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কারণ বছরে পাঁচ-ছয় মাসই তাঁরা বেকার। যেহেতু তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর কোনোও সম্পত্তি নেই, তাই তাঁরা কোনোও ঋণ পান না।

ঐ গ্রামের অর্থনৈতিক তারতম্যের অবস্থাটা বোঝাতে বীরু মণ্ডল তাঁর সঙ্কলিত পরিসংখ্যানে আরও লিখেছেন :

গ্রামের সবচেয়ে ধনী পরিবারের বার্ষিক রোজগার	···	১,৬৭,৭৫০
ঐ পরিবারের বার্ষিক ব্যয়	···	২৮,৮৬০
ফলে ঐ পরিবারের বার্ষিক সঞ্চয়	···	১,৩৮,৮৯০

গ্রামের সবচেয়ে গরীব পরিবারটির বার্ষিক আয়	৭৭৫ টাকা
ঐ " " ব্যয়	১,৭৪৫ "
ফলে বার্ষিক ঋণের প্রয়োজন	৯৭০ টাকা

সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ বোধ করি এবার বলবেন, পশ্চিমবাংলার আটত্রিশ হাজার গ্রামের ভিতর ঐ রকম একটা গ্রাম বেছে নিয়ে সংখ্যাতত্ত্ব পরিবেশন করলে কিছুই প্রমাণিত হয় না; তার মানে এ নয় যে, স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরে এই হচ্ছে সাধারণ গ্রাম-বাংলার অবস্থা। সে দাবী বীরু মণ্ডলও কিন্তু পেশ করে নি। সে বলে নি, পঁচিশ বছরে চালটা কতদূর সিদ্ধ হয়েছে তা সমঝে নিতে যে-কোন একটা ভাতের দানা টিপে দেখাই যথেষ্ট; বরং বলতে চেয়েছিল—তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে অবস্থাটা ছিল ঐ রকম; সে শুধু বলেছিল—তার আবির্ভাবের আগে থেকে সেই গ্রামে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল। গ্রামের ৮৪টি পরিবার ওর প্রস্তাবমত অবস্থাটা পাল্টাতে গররাজি হয় নি।

প্রথম পার্টি কংগ্রেস : মে '৬৯ থেকে মে '৭০—এক বছর পরে নকশাল-পার্টি সালতামামি করতে বসলো খাস কলকাতায়। সর্বভারতীয় নেতারা যোগ দেবেন পার্টির প্রথম কংগ্রেসে। কোথায় হবে? কেমন করে সম্ভব? যাঁরা অধিবেশনে যোগ দিতে আসবেন তাঁরা সকলেই মার্কা-মারা। তাঁদের প্রত্যেকের নামে আছে 'বডি-ওয়ারেন্ট'। তবু প্রথম কংগ্রেস নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হলো। অগ্নিযুগে মহা-সম্মেলন হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটিতে—অমাবস্যার ঘনান্ধকারে—মিলিত হয়েছিলেন বাঘা যতীন, রাসবিহারী আর অমরেন্দ্রনাথ। এবার মহা-সম্মেলন হলো আলোকোজ্জ্বল এক প্রাসাদোপম বাড়িতে; কোনো পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে নয়!

মার্কা-মারা বিয়ে বাড়ি। ইংরাজি হিসাবে সেটা মে মাস, বাঙলা—বৈশাখ। বিয়ের তারিখ লেগেই আছে। ভাড়া নেয় অজানা অচেনা মানুষ—সার বেঁধে মটোরগাড়ি আসে, বিয়ে হয়, এঁটো পাতায় ডাস্টবিন উপচে পড়ে; পরদিন ভাঙা-হাটে ডেকরেটার এসে খুলে নিয়ে যায় বাতিদান আর ত্রিপল। প্রতিবেশীরা এতে অভ্যস্ত। এবারও তাই হলো। যথারীতি বর ও বধূ এলো, এলো বরযাত্রীর দল—একটি কিশোর ছেলে সবার হাতে-হাতে ধরিয়ে দিল বেলফুলের মালা। বরণ হলো, বিবাহ হলো, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো বিয়ে বাড়ি। গাড়ি করে এলেন নানান জাতের বরযাত্রী আর নিমন্ত্রিতেরা। প্রতিবেশীরা এতে অভ্যস্ত, পুলিশও। নিচের হলে যখন 'যদিদং হৃদয়ং তব…' মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে তখন উপরের রুদ্ধদ্বারকক্ষে নির্বাচিত হচ্ছেন কার্যকরী সমিতির সভ্যরা: চারু মজুমদার, ভি. সত্যনারায়ণ, এ. কৈলাসন, নাগভূষণম পট্টনায়ক, আপ্পালাসুরাই, সুনীতি ঘোষ, কানু সান্যাল, অসীম চট্টোপাধ্যায়, আম্বাদি মেনন, বিজয়, সত্যনারায়ণ সিংহ, আর. পি. শর্ফ, রাজকিশোর, মহেন্দ্র সিং, এস. কে. মিশ্র, সরোজ দত্ত, আপ্পু, সৌরেন বসু এবং সুশীতল রায়চৌধুরী—একুনে উনিশজন। চারু মজুমদার সর্বসম্মতিক্রমে হলেন পার্টির সর্বাধিনায়ক—জেনারেল-সেক্রেটারী। এ-ছাড়া চারটি জোনাল-ব্যুরো বা আঞ্চলিক বিভাগ খোলা হলো—তাদের কর্ণধার হলেন সর্বশ্রী কৈলাসন, শর্ফ, মিশ্র এবং সৌরেন বসু। পার্টির মুখপত্র প্রকাশনার দায়িত্ব নিলেন সুনীতি ঘোষ আর সরোজ দত্ত।

এই প্রথম পার্টি কংগ্রেসের দু'মাসের মধ্যেই দুঃসংবাদ এলো শ্রীকাকুলাম থেকে। সত্যনারায়ণ এবং কৈলাসন হত হয়েছেন পুলিশের গুলিতে। ঠিক ঐ সময়েই নাগ-ভূষণম পট্টনায়েক এবং আপ্পালাসুরাই কলকাতায় এসেছিলেন সর্বাধিনায়কের সঙ্গে দেখা করতে। চারু মজুমদার তখন অসুস্থ, আছেন একটি নার্সিং হোমে। সেখানেই ওঁরা দুজন গ্রেপ্তার হলেন—চারু মজুমদার যে কীভাবে এবারও পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন সেটা রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

শ্রীকাকুলামের আন্দোলন বস্তুত শেষ হয়ে গেল—একসঙ্গে ঐ চারজন নেতার অভাবে। এর মধ্যে দলপতি সত্যনারায়ণের ভূমিকাটাই ছিল প্রধান। সাংবাদিক সুব্বা রাও বলছেন:

> "গিরিজনদের চোখে সত্যনারায়ণ ছিলেন জাগ্রত দেবতা। তাঁকে ঘিরে নানান অলৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছিল। যেমন বলা যায়, অশিক্ষিত আদিবাসীদের ধারণা ছিল তিনি অমর। এই ধারণাটার উৎপত্তি হয়েছিল একাধিকবার অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যাওয়ায়। পুলিশের গুলিতে তাঁর

মৃত্যু হয়েছে এ সংবাদে তাই আদিবাসীরা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল।…
তারা নিঃসংশয়ে বুঝে নিল ওদের আন্দোলনের এখানেই শেষ। সর্বহারার
রাজ্য আর কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হবে না।"৭

এছাড়াও নানান কারণে পার্টির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মত-বিরোধ দেখা দিয়েছিল। বিরোধের সূত্রগুলির সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা গেলেও কে যে কোন্ মতের স্বপক্ষে ছিলেন, কে কোন্ নির্দেশ জারী করেছিলেন তা সঠিক জানতে পারি নি।

প্রথম যুগে যেসব ছাত্র পার্টিতে নাম লিখিয়েছিল তাদের পক্ষে শীর্ষস্থানীয় নেতৃ-বৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হতো। ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে যাবার পর এবং পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার পর তাদের পক্ষে নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে পড়ল। প্রথম যুগে ক্যাডারদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয়েছিল গ্রামে—সেখানে তারা কীভাবে কাজ করবে তার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীও করা ছিল। পরবর্তী যুগে পাড়ায়-পাড়ায় যেসব ছাত্র নকশাল দলে নাম লেখালো তারা সব সময়ে প্রকৃত নেতৃত্বের নির্দেশ পেত না। আঞ্চলিক কর্মকর্তার নির্দেশে অথবা নিজেরাই কর্মসূচী প্রণয়ন করতে থাকে। তারা অনেকেই গ্রামে গেল না—শহরাঞ্চলেই কিছু একটা করতে চাইল। কীভাবে তাদের কর্মপদ্ধতি রূপায়িত হলো, কার নির্দেশে তারা এ জাতীয় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল জানি না; কিন্তু পরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের এ-জাতীয় কাজ অনুমোদন করেছেন দেখা যাচ্ছে। শহরাঞ্চলের ছাত্রদলের কর্মসূচী ছিল নিম্নোক্ত ধরনের :

- স্কুল-কলেজ, পরে সরকারী অফিসে ঢুকে লাল-পতাকা উত্তোলন।
- শিক্ষায়তনের, পরে অফিস-আদালতে মাওয়ের বাণী, চিত্র এবং নকশাল-পন্থীদের শ্লোগান লিখে দেওয়া।
- শিক্ষায়তন ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা—অফিসের রেকর্ড নষ্ট করা, কাঁচ ভাঙা, ল্যাবরেটারি ভাঙা, বই পোড়ানো।
- গান্ধীজীর রচনা, মার্কিন প্রচার-পুস্তিকা (পরে রাশিয়ান প্রচার-পুস্তিকাও) পোড়ানো।
- দেশনেতাদের মূর্তি কলুষিত করা।
- ট্রাফিক পুলিসদের হত্যা করা।

যতদূর শুনেছি, ঐ ল্যাবরেটারি ভাঙা এবং দেশনেতাদের মূর্তি কলুষিত করার বিষয়েই মতবিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। সুশীতল রায়চৌধুরী এবং পরে অসীম চট্টোপাধ্যায় এ-দুটি কর্মসূচী মেনে নিতে পারেন নি, প্রতিবাদ করেছিলেন—এমন অনুমান করার

পক্ষে যুক্তি আছে। দেশনেতাদের মূর্তি কলুষিত করার কর্মসূচী কীভাবে চালু হলো সে-কথা আমাকে জানিয়েছিল একটি আত্মগোপনকারী ছাত্র। তার মতে একদল বিরুদ্ধ-রাজনৈতিক মতাবলম্বী কংগ্রেসী ছাত্র মাও ৎসে-তুঙ-এর কুশপুত্তলিকা দাহ করা থেকেই নাকি এর সূত্রপাত। সূত্রপাত যা থেকেই হোক এই কর্মসূচী যখন ব্যাপক আকারে গ্রহণ করা হলো, দেখা গেল পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তা অনুমোদন করছেন। এ-বিষয়ে ওদের কী বক্তব্য ছিল তা আমরা শুনিনি; তবু আন্দোলনের বাইরে থেকে সাধারণ বুদ্ধিজীবী মানুষের মনে হয়েছে এই কর্মসূচীর জন্য শিক্ষিত মানুষের একটি বৃহদংশের সহানুভূতি ওরা হারিয়েছিল। মূর্তি কলুষিত করার প্রবক্তা-দের মতে হয়তো—রামমোহন-বিদ্যাসাগর শোষকশ্রেণী প্রবর্তিত বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে চেয়েছিলেন; রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান, বুর্জোয়া কবি; বিবেকানন্দ অহিফেন-রূপী ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত, সুভাষচন্দ্র নাৎসীবাদের সাহায্য নিয়েছেন—তাই তাঁরা বরেণ্য নন। ঠিক জানি না, হয়তো এই জাতীয় যুক্তিই ওঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল মূর্তি বিকৃত করার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন-চিন্তাধারাকে নিশ্চিহ্ন করতে। এ প্রসঙ্গে অনেক কথা বলার আছে;—কিন্তু প্রতিবাদী-পক্ষ যখন বাধ্যতামূলকভাবে নীরব তখন একতরফা সে-সব যুক্তি আজ পেশ করাটা হবে 'হিটিং বিলো দ্য বেল্ট'। তবু ওদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কয়েকটি কথা না বলে থামতে পারছি না:

প্রথমত, ওঁরা ছিলেন চীনপন্থী। চীনে কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এ জাতীয় আন্দোলন হয় নি, হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়—অনেক পরে।

দ্বিতীয়ত, যাঁদের নিয়ে ওঁদের আন্দোলন সেই নিরন্ন নিরক্ষর কৃষকদের কাছে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ অপরিচিত—তাঁরা ওদের শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী নন; ফলে এইসব শহুরে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মূল আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

তৃতীয়ত, শুনেছি 'সুভাষ প্রসঙ্গ' নামে একটি প্রচার-পুস্তিকায় জনসাধারণকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল—কেন ওঁরা সুভাষচন্দ্রকে শত্রুপক্ষ মনে করছেন। সে অভিযোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, সুভাষচন্দ্র গত বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী ও জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন—যে জার্মানী ও জাপান ছিল রাশিয়ার বিপক্ষে, অর্থাৎ 'জন-যুদ্ধের' বিরুদ্ধে। এ অভিযোগ ত্রিশ বছরের পুরাতন। '৪২-এর আন্দোলনে ভারতবর্ষ যখন ইংরেজকে বলছে 'ভারত-ছাড়' তখনও অবিভক্ত কম্যুনিস্ট-পার্টি 'জনযুদ্ধের' খাতিরে এ্যাংলো-মার্কিন ব্লককে যুদ্ধে সাহায্য করতে বলেছিল। সেসব পুরানো কাসুন্দি এ আন্দোলনে না ঘাঁটলেই কি ওঁরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন না? শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে-অংশ প্রতিক্রিয়াশীল নয়, তারাও ভেবেছে—ইটালীর স্বাধীনতা-কামী গ্যারিবল্ডী একদিন ঐভাবে অষ্ট্রিয়ান শত্রুদলের সাহায্য নিয়েছিলেন, ইমন-

ডি ভ্যালেরা নিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য, জর্জ ওয়াশিংটন নিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের সাহায্য—তবে কি গ্যারিবল্ডী, ভ্যালেরা বা ওয়াশিংটন সাঁচ্চা দেশপ্রেমিক নন? কিন্তু ওখানেই তো শেষ নয়, ইতিহাস ঘেঁটে দেখছি—স্বয়ং সুন ইয়াৎ-সেন চীনের মাঞ্চু সরকারের হাত থেকে দেশটাকে স্বাধীন করতে ঐ জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যই নিয়েছিলেন! আর সবচেয়ে বড় কথা স্বয়ং মাও ৎসে-তুঙ্ বলছেন, "আমাদের দেশটা যদি বিদেশীদের পদানত হয়ে থাকে তবে আমাদের সব স্বপ্নই ব্যর্থ হয়ে যাবে।...যে দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতাই লাভ করে নি সে-দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাতুলতা।"[১০]

আর সেজন্যেই সুভাষচন্দ্র যেভাবে জাপানের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গড়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই স্বয়ং মাও ৎসে-তুঙ চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সবচেয়ে বড় শত্রু চিয়াং কাই-শেকের লালফৌজের রক্তরাঙা হাতে হাত মিলিয়েছিলেন। বারে বারে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

দেশনেতাদের মূর্তি কলুষিত করা ছাড়া সায়েন্স-ল্যাবরেটারি ভাঙার ব্যাপারেও মতপার্থক্য ছিল। মার্ক্স-লেনিন বা মাও কেউই বিজ্ঞানকে শত্রু বলে মনে করেননি। সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও ল্যাবরেটারির প্রয়োজন ফুরাবে না। ঠিক জানি না, বোধহয় ট্রাফিক পুলিশ হত্যা করা ব্যাপারেও মতপার্থক্য ছিল।

মোট কথা দেখছি, কয়েকটি বিষয়ে দলীয় নির্দেশের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়ে সুশীতল রায়চৌধুরী পার্টির জেনারেল সেক্রেটারীকে একটি পত্র লেখেন '৭০ সালের শেষাশেষি। ১৪.১.৭১ তারিখের সভায় এ নিয়ে আলোচনা হয় এবং সুশীতলের প্রস্তাব সম্পূর্ণ নাকচ হয়ে যায়। সুশীতল তখন ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য পদত্যাগ করেন, এবং অবিলম্বে তা গৃহীতও হয়। সুশীতলের পরিবর্তে সরোজ দত্ত স্টেট কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এই ঘটনার ঠিক একমাস পরে আত্মগোপন অবস্থাতেই কলকাতার একটি নার্সিং হোমে সুশীতল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অসীম চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবাদ জানান '৭১ সালের মে মাসে। মাস-তিনেক পরে তাঁর প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় সমিতির বিচারে নাকচ হয়ে যায়। এর পর অসীম ডেবরা-গোপিবল্লভপুর-বহুরাগড়া এলাকায় পৃথকভাবেই কাজ করতে থাকেন, যদিও শেষপর্যন্ত খাতা-কলমে তিনি চারু মজুমদারের নেতৃত্ব অস্বীকার করেননি। অসীমের সহকারী ছিলেন ও এলাকায় অমল সান্যাল গুণধর মুর্মু, সন্তোষও মদন রাণা প্রভৃতি। ৩.১১.৭১ তারিখে ধানবাদে অসীম চট্টোপাধ্যায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন।

বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ: বীরভূমে নকশাল আন্দোলন শুরু হল '৭১ সালে।

অসীম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি বীরভূম, হয়তো যাঁরা এ বিপ্লব রূপায়িত করেন তাঁদের উপর অসীমের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু বিপ্লব যখন ধূমায়িত হয়ে ওঠে অসীম তখন অন্য কর্মক্ষেত্রে। বীরভূম হচ্ছে বাঙলায় নকশালপন্থীদের তৃতীয় বিস্ফোরণ। '৬৯-তে নকশালবাড়ি এলাকায় মূল লক্ষ্য ছিল জমি দখল ও ধান কেড়ে নেবার লড়াই, '৭০ সালে ডেবরা-গোপিবল্লভপুর এলাকায় ওদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল শ্রেণী-শত্রুদের 'খতম' করা;—এবার বীরভূমে ওদের মূল লক্ষ্য হলো 'আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ'। '৭১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ওরা প্রায় দেড় শ' বন্দুক জোর করে ছিনিয়ে নেয়। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের বিশেষ সংবাদবহ শ্রীশঙ্কর ঘোষ লিখছেন, "নির্দিষ্ট সময়ে একদল যুবক গৃহস্বামীর বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করে—তারা বলে নির্বিবাদে বন্দুকটা হস্তান্তরিত করলেই তারা ফিরে যাবে। গৃহস্বামী প্রতিবাদ করার চেয়ে সেই নির্দেশ মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ্য দিবালোকে বিদ্রোহীরা এভাবে এসে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে কাঁধে বন্দুক ফেলে নিশ্চিন্ত মনে হেলতে দুলতে চলে।

সরকারী তথ্যে জানা যায়, অন্তত দুটি ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের সংখ্যা ছিল হাজারের উপর—তারা অধিকাংশই ভূমিহীন চাষী। তারা পর পর দুজন কুখ্যাত সুদখোর মহাজনের বাড়ি চড়াও হয়। ঘটনাস্থলেই গণ-আদালতে সেই মহাজনের বিচার এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ সর্বসমক্ষে পালিত হবার পর ওরা যখন কাঁধে বন্দুক ফেলে চলে যাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল ওরা বুঝি এক সৈন্যদল।[১১]

বীরভূমের এই সশস্ত্র সংগ্রাম জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে—বোলপুর, দুবরাজপুর সিউরি ও রামপুরহাট। নকশালবাড়িতে গিয়েছিল পুলিশ; ডেবরা-গোপিবল্লভপুরে পুলিশ হালে পানি পায়নি, তাই সেবার প্রেরিত হয়েছিল আধা-সামরিক বাহিনী: ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্। এবার বীরভূমের বীরবৃন্দকে দমন করতে এলো খোদ মিলিটারী।

চারু মজুমদার গ্রেপ্তার হলেন ১৬.৭.৭২ তারিখে।

তার দুদিন আগে, ১৪ই তারিখে কলকাতার গুপ্ত আবাস থেকে তিনি শিলি-গুড়িতে তাঁর স্ত্রীর কাছে একটি চিঠি লেখেন। এই পত্রখানিই বোধকরি তাঁর শেষ দলিল। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—ছয়দিন পরে ভিয়েৎনাম দিবসে কলকাতায় একটি শোভাযাত্রার আয়োজন তিনি করেছেন। আরও লিখেছিলেন, পার্টির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সাময়িকভাবে ভাটার টান পড়েছে। তার অন্যতম কারণ—'too much emphasis on annihilation programme' (খতম করার কাজে বেশী জোর দেওয়া)। লিখেছিলেন, "সি.পি.আই. (এম. এল.) একটা নতুন পার্টি, তার অভিজ্ঞতা সামান্য; সুতরাং ভুলভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমি বরং আশান্বিত, কারণ ভুলভ্রান্তিগুলি কমরেডদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না।"

এই চিঠিখানি নিয়ে একজন বিশ্বস্ত ক্যাডার স্বয়ং শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন। শেয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর কী-ভাবে তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় সেটা সহজেই অনুমেয়। ঐ দিনই চারু মজুমদারের আর দুজন বিশ্বাসী অনুগামী—দীপক বিশ্বাস আর দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন।

পরদিন, ১৬ই ভোর রাত্রে পুলিশের গুপ্তচর যখন চারু মজুমদারের বাসাতে হানা দিল তখন তিনি অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। পুলিশই তাঁকে ঠেলা দিয়ে ঘুম থেকে তোলে। প্রতিরোধের কোনো চেষ্টাই করেন নি তিনি। প্রশ্নমাত্র স্বীকার করেন তাঁর নাম ও পরিচয়। চারু মজুমদার তখন ভারতরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেণ্ট তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর ছবি-সম্বলিত হাজার হাজার লিফলেট বিতরণ করে জানিয়েছিল: জীবিত অথবা মৃত চারু মজুমদারকে ধরে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই মহাবিপ্লবী ধরা দিলেন বিনা প্রতিবাদে। তিনি তখন অত্যন্ত কাহিল: শারীরিক অর্থে!

মাত্র বারো দিন পরে ২৮.৭.৭২ তারিখে তিনি হৃদরোগের আক্রমণে পুলিশের হেপাজতেই মারা যান। চারু মজুমদারের মৃত্যুই বস্তুত পার্টির প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনের যবনিকা। গ্রেপ্তার হবার সময়ে পার্টির উনিশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন চারু মজুমদারের অনুগামী হিসাবে। বাকি আঠারোজন হয় নিহত, নয় জেলে অথবা তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে গেছেন। শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলার জেলখানাতেই তখন অন্তত ষোলো হাজার নকশালপন্থী বন্দী হয়ে আছে। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার মতে ১৯.১০.৭১ পর্যন্ত অন্তত চারশ' নকশালপন্থী ছাত্র পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

চৈনিক চিন্তাধারায় ভারতবর্ষের প্রভাবান্বিত হবার এই হল শেষ হিসাব।

জানি, আমার অনবধানতায় অনেক ভুলত্রুটি রয়ে গেল এ হিসাবে। অনেক খবর জেনেও বলতে পারলাম না। সরোজ দত্তের শেষ অন্তর্ধান বিষয়ে আমি নীরব থেকেছি, বরাহনগর-কাশীপুর-চণ্ডীতলার বীভৎস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ জেনেও জানাতে পারিনি।

* *

আমি কথা-সাহিত্যিক। এ আন্দোলনের রাজনৈতিক মূল্যায়ন করার দায়িত্ব আমার নয়। অন্নদাশঙ্করের ভাষায়: 'সব কাজে সবাইকে ডাকতে নেই'। কিন্তু এ

আন্দোলন যে আমার জীবদ্দশায় আমার আশ-পাশেই ঘটে গেল। তাই দু-একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা না জানিয়ে বিদায় নিতে পারছি না :



১৯৭০ সালের সেটা নভেম্বর মাস। কলেজ স্ট্রীটে পাবলিশার্স পাড়ায় গেছি প্রুফ জমা দিতে। দেখলাম, বিখ্যাত প্রকাশক ক-বাবু বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন।

বললাম, কী ব্যাপার? খুব ব্যাজার হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে?

ক-বাবু বললেন, ভিতরে আসুন, বলছি।

জনান্তিকে টেনে এনে তিনি পকেট থেকে বার করে দিলেন একটি প্রেমপত্র! বললেন, পড়ুন। তারপর বলুন আমার কী করা উচিত।

পড়লাম চিঠিখানা। আদ্যন্ত লালকালিতে ব্লক-ক্যাপিটালে ইংরাজীতে লেখা। প্রেরকের নাম 'জনৈক ছাত্র'। চিঠির বক্তব্য প্রাঞ্জল : "মাননীয় মহাশয়, আপনি গত বৎসর অমুক-অমুক বিদ্যায়তনের হেডমাস্টার ও সেক্রেটারিগণকে উৎকোচ প্রদান করিয়া স্কুলে আপনার প্রকাশিত বই ধরাইয়াছেন। এজন্য আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বিচার আমরা করিয়াছি। আপনার পূর্বতন অপরাধ ক্ষমা করা হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান বৎসরে কোনও পাঠ্যপুস্তক আদৌ ছাপিলে আপনাকে সম্যক শাস্তি পাইতে হইবে।"

ক-বাবু অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, কী করি বলুন তো মশাই? অনেক টাকা যে ইতিমধ্যে ঢেলে বসে আছি! বই ছাপা তো অর্ধেক শেষ।

প্রতিপ্রশ্ন করলাম, চিঠিতে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য?

: কেন আর লজ্জা দেন মশাই? —ক-বাবু লজ্জিত হয়েছেন মনে হলো।

আমি কী পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তিনি শেষ পর্যন্ত কী করেছিলেন সে প্রশ্ন এ কাহিনীতে অবান্তর; কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না; ঐ ইংরাজী চিঠিতে একটি মাত্র বর্ণাশুদ্ধিও খুঁজে পাইনি আমি। মায় ইংরাজী হরফে 'বুর্জোয়া' বানান! আর চিঠির মুন্সিয়ানা দেখে মনে হয়েছিল ক-বাবুর ছাপা পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন অন্তত ঐ 'জনৈক ছাত্রটির' আর হবে না। ইংরাজীটা সে ভালই শিখেছে।



তারিখটা মনে নেই। ঘটনাটা আছে। সরকারী কাজে ট্যুরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কলেজ-জীবনের সহপাঠীর সঙ্গে। মনে করুন তার নাম মুরারী। তার সঙ্গে একসঙ্গে বি. এস্‌সি. পড়েছি। তারপর আমি চলে গেলাম এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, সে গেল ডাক্তারী লাইনে। পরে বিলেত থেকে বিলাতী ডিগ্রীও নিয়ে এসেছে। মাঝে-মাঝে দেখা হয়, খবর পাই। শুনেছি, বাড়ি-গাড়ি, বত্রিশ-টাকা-ভিজিটের

পশার, সুন্দরী বউ সবকিছুই পেয়েছে জীবনে। ট্রেনের কামরায় অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়ায় খুশিয়াল হয়ে উঠি। বলি, কী রে মুরারী, কেমন আছিস ?

বললে, কাছে সরে আয়, বলছি।

ফার্স্ট ক্লাস কামরা। ভীড় নেই। তবু আমরা ছাড়া তৃতীয় একজন শিখ সহযাত্রী আছেন। ঘনিয়ে এসে বলি, কী ব্যাপার ?

: আমি কোন্ পাড়ায় বাড়ি বানিয়েছি সেটা মনে আছে ?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বলি, হ্যাঁ, তুই তো আছিস খাস কলকাতা শহরের ভিতর নকশালবাড়ি গ্রামে !

: তার পরেও জানতে চাস্ কেমন আছি ?

: সেই জন্যেই তো জানতে চাইছি—কেমন আছিস ?

মুরারী একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, ভালয়-মন্দয় !

: ভালয়-মন্দয় ! মানে ? একটু বিস্তারিত করে বল ?

: আমাদের পাড়ায় ছিঁচ্‌কে-চুরি, সিঁদেল-চুরি, গুণ্ডামি-মস্তানি বিলকুল বন্ধ। ত্রি-সীমানায় পুলিশ আসে না। আমাদের পাড়ায় স্টেশনারি দোকানে হরলিক্স, বেবিফুড পাওয়া যায়, ওষুধের দোকানে ওষুধ, মুদিখানায় কেরোসিন-ডালডা-সরষের তেল পাওয়া যায়, মায় মাছের বাজারে ন্যায্য দামে মাছ পর্যন্ত পাওয়া যায়। কোনো শালা দাম বাড়াতে সাহস পায় না—

অবাক হয়ে বলি, বলিস্ কি রে ! তবু তুই বলছিস ভালয়-মন্দয় ? আমাদের এদিকের তুলনায় তো স্বর্গরাজ্যে আছিস্ রে—

মুরারী আচমকা আমার তলপেটে একটা খোঁচা মারলো। তার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে আমার 'ভাইবোনে'র সম্পর্ক পাতিয়ে আত্মীয় সম্বোধন করে বললে, তুই তো বলবিই। মাস-কাবারি বাঁধা মাইনে তোর ! আমার কি হাল হয়েছে জানিস ? এক ফতোয়ায় ভিজিট বেঁধে দিয়েছে চার-টাকায় !

: তোর ভিজিট চার টাকা ! বলিস্ কি রে ? সংসার চলে কি করে তবে ?

: চালাতে হয়। ভিজিট ওয়ান-এইটথ্ হয়ে গেছে, ফলে আটগুণ পরিশ্রম করতে হবে। আগে দিনে চার-পাঁচটি রোগী দেখতুম, এখন সে-হিসাবে গোটা ত্রিশ-চাল্লিশ দেখার কথা। তা পেরে উঠি না, তাই গোল্ডফ্লেক ছেড়ে চারমিনার ধরেছি। খাবি ?

একটি চারমিনার প্যাকেট আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বিলাতী খেতাবধারী বাল্যবন্ধু !

●

'৭০ সালের মাঝামাঝি। দিনকাল খারাপ। অফিস ছুটি হলেই ছুটি বাড়ি-পানে। সন্ধ্যার পর পারতপক্ষে পথে পা বাড়াই না। সেদিন কি একটা কারণে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। এসপ্ল্যানেডের গুমটিতে ট্রাম ধরবো বলে দাঁড়িয়ে আছি। আলো-আঁধারের মধ্যে একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে, ক'টা বাজে স্যার?

একমুখ গোঁফ-দাড়ি, পরনে একটা ময়লা পায়জামা, গায়ে টুইলের হাফ-শার্ট, পায়ে চপ্পল। বয়স তেইশ-চব্বিশ। অন্যমনস্কের মতো ঘড়ি দেখে বললাম, পৌনে ন'টা।

তারপর খেয়াল হলো ছেলেটা চলে যায় নি। হয়তো সেও আছে ট্রামের ধান্দায়। এবার চোখ তুলে তার দিকে চাইতেই মনে হলো—এ ছেলেটি আমার চেনা, খুবই পরিচিত। কে ও? দাড়ি-গোঁফ না থাকলে ওকে কেমন দেখতে লাগবে?

ছেলেটি নিজে থেকেই বললে, চিনতে পেরেছেন তাহলে?

চমকে উঠে বলি, তুই?

ইতিমধ্যে আরও দু-একটি অফিস-ফের্তা এসে জুটেছে ট্রামস্টপে। ও বললে, এদিকে সরে আসুন। পরের ট্রামে যাবেন।

ছেলেটি আমার অতি নিকট আত্মীয়, অত্যন্ত স্নেহভাজন। বছর চারেক নিরুদ্দেশ। তার আগে ছিল প্রেসিডেন্সির সেরা ছাত্র। ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড-মেডালিস্ট। টোকাটুকি করে নয়, কারণ তার পরীক্ষার সেণ্টার ছিল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। বললাম, কোথায় আছিস্ আজকাল?

: মেদিনীপুরে।

: মেদিনীপুরের কোথায়?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ও আমার পারিবারিক কুশল জানতে চায়। অমুক কি পড়ছে? তমুক কেমন আছে?

প্রশ্ন না করে পারি না, হ্যাঁরে, তোর নামে কি এখনও বডি-ওয়ারেণ্ট আছে?

হাসলো। বললে, কী হবে জবাবটা জেনে?

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলি, আপত্তি আছে জানাতে?

সপ্রতিভভাবে বলে, আছে বই কি। সেটা না-জানা পর্যন্ত আপনি কোনও বে-আইনি কাজ করছেন না আমার সঙ্গে এভাবে গল্প করে—

নিজের কথা কিছুই বললো না। কোথায় আছে, কী করছে। ওর বাবা-মা ভাই-বোনদের খবর নিল। যতটা আমি জানি। বললে, ওঁদের বলবেন, আমি ভাল আছি।

ইতিমধ্যে আমি বার দুই ঘড়ি দেখেছি। তাই বললে, আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো?

চমকে উঠে বলি, না, না! পাগল নাকি!

ও কি মনে করলো তা ওই জানে। শেষে বলে, আপনার টেলিফোন নাম্বারটা কত বলুন তো, যদি আবার কখনও কলকাতায় আসি—

আমি মনিব্যাগ থেকে নামাঙ্কিত একটা কার্ড বার করে ওকে দিতে গেলাম। নিল না। বললে, এখানে অন্ধকার। নাম্বারটা বলুন শুধু।

ছয়টা সংখ্যা উচ্চারণ করে বললাম, তবু কার্ডটা রাখ। ভুলে গেলে—

আবার হেসে বলে, আপনি সরকারী গেজেটেড অফিসার, আমার পকেটে আপনার নামাঙ্কিত ভিজিটিং কার্ড থাকাটা কি ঠিক?

আমি প্রতিবাদ করি, কেন নয়? তোর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক, আমি মরলে তোর দশ'দিনের অশৌচ হবে, আর তাছাড়া তোর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে কি না সেটা না-জেনেই তো এটা দিচ্ছি। বে-আইনি কাজ তো আমি করছি না—

ট্রামটা এসে পড়েছে। ও গলাটা খাটো করে বললে, আরও একটা অসুবিধা আছে, ছোট কাকু। আমি যে গাঁয়ে থাকি সেখানে সবাই জানে যে, আমি নিরক্ষর মজুর-চাষী। থাকি খালি গায়ে, খালি পায়ে—সারাদিন ক্ষেত-খামারে কাজ করি আর দিনান্তে টিপছাপ দিয়ে মজুরি নিই। ও ছাপানো কার্ড আমি রাখবো কোথায়?

আমার মুখটা যে কেন ম্লান হয়ে গেল, তা ও বুঝলো না, বললে, ভয় নেই ছোটকাকু, নম্বরটা আমি ভুলবো না। দেখবেন, হঠাৎ ফোন করবো একদিন—

সে বিশ্বাস আমারও ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড-মেডেলিস্ট ছাত্র ঐ নিরক্ষর চাষীটা যে ছ'টা সংখ্যা মনে রাখতে পারবে ওর স্মৃতিশক্তির উপর আমার সে-আস্থা ছিল। আমি শুধু ভাবছিলাম—টিপ-ছাপ দিয়ে ও দৈনিক ক-আনা মজুরি পায়? সপ্তাহে ক'দিন পান্তা খায়, আর ক'দিন উপোস?

লাল আলোর সঙ্কেত মাথায় নিয়ে টালিগঞ্জের ট্রামটা অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসছে!



১৭. ৭. ৭২। আমি তখন ইউরোপে। সেদিন আমি ইটালীর পীসা শহরে। সারাদিন শহরের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখেছি—ডুমা, মিউনিসিপ্যাল হল, গ্যালারি, গীর্জা এবং 'লিনিং টাওয়ার অব পীসা'। সন্ধ্যায় আশ্রয় নিয়েছি শহরপ্রান্তের এক ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে। একদল ইটালিয়ান ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ঐ ক্যাম্পিংগ্রাউণ্ডেই। সন্ধ্যা থেকে তাদের সঙ্গে এই বুড়ো বয়সেই মেতেছি ক্যাম্প-ফায়ারে। নাচ-গান-হৈ-হল্লা মাউথ অর্গান। ভাষা বুঝি না কেউ কারও। হাত-পা নেড়ে মনের ভাব

প্রকাশ করছি। আমাদের দলের অসীম 'খর বায়ু বয় বেগে' গাইল, ওদের একটি মেয়ে ব্যাঞ্জো বাজিয়ে সুরটা তৎক্ষণাৎ তুলে ফেলল। মোট কথা খুব আনন্দে কাটল সন্ধ্যাটা। রাত বারোটা নাগাদ হলো জাতীয় সঙ্গীত। গোল হয়ে আমরা সবাই দাঁড়ালাম আগুনটা ঘিরে। ওরা গাইল ওদের জাতীয় সঙ্গীত, আমরা 'জনগণমন'। 'ভিভা ইতালি—ভিভা ইন্দিয়া' শুনে ও শুনিয়ে বিদায় নিলাম।

যে-যার ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ পিছন থেকে ডাকলো স্টিভ্‌নার্স।

হের স্টিভ্‌নার্স আমাদের গাইড, খাস জার্মান—সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে আজ তিন সপ্তাহ। বললে, মিস্টার সানিয়াল, আপনি ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলের লোক? বেঙ্গলি? নয়?

বলি, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

: আজ সন্ধ্যায় বার্লিন রেডিও জার্মান ভাষায় যে নিউস্ বুলেটিন দিয়েছে তাতে খাস কলকাতার একটি খবর আছে—

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি, কী খবর?

: কলকাতা পুলিশ কমরেড চারু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে, কাল সকালে!

সংবাদটা হজম করতে আমার সময় লাগা স্বাভাবিক। অবাক হতে হলো একাধিক কারণে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই—এ খবরটা কি এতই আন্তর্জাতিক যে, বার্লিন রেডিও জার্মান ভাষায় তা প্রচার করেছে?

আমাকে নীরব থাকতে দেখে স্টিভ্‌নার্স প্রশ্ন করে, কমরেড চারু মজুমদারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়! শোনেন নি?

আমি প্রতিপ্রশ্ন করি, আপনি কি করে শুনেছেন সে-কথা ভেবেই আমি অবাক্ হচ্ছি! আপনি তাঁর সম্বন্ধে কতটুকু জানেন?

স্টিভ্‌নার্স শ্রাগ করলো। বললে, সামান্যই।

: তবু বলুন না। আমার প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে জানতে। তাঁর সম্বন্ধে একজন জার্মান যুবক কতটুকু খবর রাখেন।

স্টিভ্‌নার্স হেসে বললে, ঐ তো বললাম, সামান্যই জানি। শুনেছি, তিনি ভারতবর্ষে বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন।

: আর কিছু? রাজনীতি নয়, মানুষটার সম্বন্ধে?

হাসলো জার্মান ছেলেটি। বললে, না, মানুষটির সম্বন্ধে কিছুই জানি না। শুনেছি, তিনি ছিলেন শারীরিক-অর্থে দুর্বল মানুষ। হাঁপানিতে ভুগতেন। তবে আমার মনে হয়েছে, তিনি ছিলেন উত্তর-বাঙলার সেই বোকা বুড়ো! গাঁইতি হাতে দুই ছেলের হাত ধরে একাই গিয়েছিলেন একটা জগদ্দল পাহাড়কে কেটে সাফ করে ফেলতে।

ভুল বললাম ?

আমি ওঁর হাতটা টেনে নিয়ে বলেছিলাম, 'না, হের স্টিভ্‌নার্স'! কিছুই ভুল বলেন নি। আপনি বুলস্‌-আই হিট করেছেন! কমরেড চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর বোধকরি ঐ কথাটাই লেখা থাকবে তাঁর স্মৃতি-ফলকে :



"এইখানে শুয়ে আছে উত্তর-বাংলার
সেই বোকা-বুড়ো যে, গাঁইতি হাতে
একাই গিয়েছিল একটা জগদ্দল
পাহাড়কে কেটে সাফ করে ফেলতে।